মাশরাফি

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়



টেস্টে তার এক ইনিংসে ৫ উইকেট নেই। ওয়াসিম, ম্যাকগ্রার মতো শত শত উইকেট নেই তার। ব্রেট লি, শোয়েব আখতারের মতো গতিদানব নন তিনি।
তাহলে তিনি কে?
তিনি মাশরাফি বিন মুর্তজা।
ক্রিকেটের পরিসংখ্যান, স্পিড গানের হিসাব দিয়ে যাকে চেনা যাবে না। কাগজ-কলম আর বই খুলে যাকে চিনতে পারবেন না। শুধু টেলিভিশন আর ছাপার অক্ষর যার পরিচয় দিতে পারবে না। সেই মাশরাফি বিন মুর্তজা।
মাশরাফি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার। এই দেশের প্রথম গতিতারকা। মাশরাফি বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে সফল অধিনায়কদের একজন। মাশরাফি দেশের ক্রিকেটারদের সবচেয়ে বড় প্রেরণার নাম। ক্রিকেটার কেবল নয়; কোনো জাতির ইতিহাসে এমন মানুষই আসে শতবর্ষের আরাধনায়। মাশরাফি হলো গ্রিক ট্র্যাজেডি আর ভারতীয় রোমান্টিকতার মিশেলে এক মহাকাব্য। এমন মহাকাব্যকে ধরতে পারতেন মহাকবি হোমার বা মহাঋষি বেদব্যাস।
মহাকবি বা মহাঋষি নয়, নিতান্ত এক কলম-শ্রমিকের লেখায় বই– মাশরাফি।

প্রচ্ছদ : নওরোজ ইমতিয়াজ

প্রচ্ছদের ছবি : রতন গোমেজ

অনলাইন ডেলিভারি পার্টনার : ajkerdeal.com

মাশরাফি

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক
বাংলাদেশ ক্রিকেট সাপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন

পরিবেশক
ঐতিহ্য

মাশরাফি
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৪২২, জানুয়ারি ২০১৬

চতুর্থ সংস্করণ
ফাল্গুন-১৪২২; ফেব্রুয়ারী ২০১৬

প্রকাশক
বাংলাদেশ ক্রিকেট সাপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন
কনকর্ড রিজেন্সী, ৩২১-২২ (৪র্থ তলা)
পান্থপথ, ঢাকা

পরিবেশক
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
প্রিন্ট গ্যালারি
১১৬/২, হাজী ম্যানশন (৪র্থ তলা), বক্স কালভার্ট রোড
নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য
ছয়শত পঁচাত্তর টাকা (৬৭৫.০০)
US $ 15.00

MASHRAFE
By Debbrata Mukherjee
Email: debbrata.mk@gmail.com
Date of publication: Januray, 2016
Published by: Bangladesh Cricket Supporter Assosiation
Distributor: Oitijjhya

প্রাক্‌কথন : ডেভ হোয়াটমোর
ভূমিকা : সাইদুজ্জামান

সম্পাদনা :
নোমান মোহাম্মদ
আরিফুল ইসলাম রনি
কাওসার মুজিব অপূর্ব

গবেষণা সহায়তা :
সামিউল ইসলাম শোভন
আল মামুন
মোহাম্মদ আল মাসুম

ফটোগ্রাফি :
সামসুল হক টেংকু
ফারজানা গোধূলি
অনুপম হোসেন পূর্ণম
মাশরাফির পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ
মাশরাফির বন্ধুরা
লেখক

অলংকরণ
সাঈদ জুবায়ের
আশিষ কুমার সূত্র ধর (জিতু)

উৎসর্গ

আরিফুর রহমান বাবু

ক্রীড়া সাংবাদিকতার মাশরাফি বিন মুর্তজা তিনি। তার আঘাতগুলো দেখা যায় না। অধিনায়ক থাকুন আর না-ই থাকুন, আমাদের নেতা। বাংলাদেশের ক্রীড়া সাংবাদিকদের পরম সৌভাগ্য যে, এই মানুষটি প্রতিদিন প্রেসবক্সে আসেন এবং তার অভিজ্ঞতা এখানে ছড়িয়ে দেন এবং আমাদের জীবনচিন্তায় প্রভাব ফেলেন।

সূচি

মাশরাফি

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

SCAN & EDITED BY:

ShOpNoHiN

কৃতজ্ঞতা

মাহফুজা দোলা, খালেদ ইমাম,

A_R

আশীর্বাণী

ডেভ হোয়াটমোর



ডেভনেল ফ্রেডরিক হোয়াটমোর

শ্রীলঙ্কায় জন্ম ও বেড়ে ওঠা ডানহাতি এই ব্যাটসম্যান পিতৃভূমি অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৭টি টেস্ট ও ১টি ওয়ানডে খেলেছেন। ২০০৩ থেকে ২০০৭ সালে বাংলাদেশের ক্রান্তিকালে কোচিং করিয়েছেন; জাতীয় দলকে এনে দিয়েছেন স্মরণীয় সব অর্জন।

বয়স হয়েছে। ধোঁয়ায় ঢাকা একটা ঘটনা মনে পড়ছে।

দিনটাও মনে হয় কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল। আমরা বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে প্র্যাকটিস করছিলাম। কে একজন দেখিয়ে দিল কুয়াশা ভেদ করে এগিয়ে আসতে থাকা ছেলেটিকে। দীর্ঘদেহী, শক্ত গড়নের, লিকলিকে একটা ছেলে। কাছে আসতে শিশুদের মতো মুখটা নজর কাড়ল। কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছিল। আমি ইংরেজি বলছিলাম বলে মনে হয় একটু বেশি সংকুচিত ছিল।

একটু সময় নিয়ে ওর জড়তা ভাঙানোর জন্যই জানা নামটা আবার জিজ্ঞেস করলাম। মাথা নিচু করে একটু লাজুক হেসে বলল–মাশরাফি বিন মুর্তজা।

হ্যাঁ, আপনাদের জন্য মাশরাফি বিন মুর্তজা; ম্যাশ। আমার কাছে পাগলা।

সম্ভবত কোনো একটা ইনজুরি কাটিয়ে ফেরার পর পাগলার সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। এরপর এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়টা কালক্রমে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। জীবনে কখনো কোনো খেলোয়াড়ের প্রতি পক্ষপাত দেখাইনি; পাগলার প্রতিও দেখাইনি। তবে এটুকু বলতে পারি, মানুষ হিসেবে আমার জীবনে

পাওয়া সবচেয়ে প্রিয় মানুষগুলোর একজন হয়ে উঠেছে পাগলা; আজও তাই আছে।
দুনিয়ার সব বোলারই একটু পাগল হয়। ফাস্ট বোলাররা হয়তো একটু বেশিই হয়। মাশরাফিকে কয়েকটা দিন দেখার পর মনে হলো, ও তাদেরই মতো বা তার থেকে একটু বেশি। বাংলাদেশে আসার পর থেকে ওর সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছি। জোরে মোটরসাইকেল চালায়, খুব দুষ্টুমি করে, প্রথম সংকোচ কেটে যাওয়ার পর মুখে আর লাগাম থাকে না। একসঙ্গে কাজ শুরু করার পর দেখলাম, সবই সত্যি। ওর দমকা হাওয়ার মতো চরিত্রটা দেখে একটা কথাই মনে হলো–ক্রেজি।
কে যেন আমাকে 'ক্রেজি' শব্দটার বাংলা বলল–পাগলা।
আমি তো এই শব্দের অর্থ জানতাম না। কিন্তু শব্দটা শুনেই মনে হলো, ম্যাশের সঙ্গে এর চেয়ে ভালো শব্দ আর যায় না। সেই থেকে ওকে আর কখনো আমি মাশরাফি বা ম্যাশ বলে ডাকিনি। আমার কাছে পাগলাই রয়ে গেছে মাশরাফি।
আজকের বাংলাদেশের অসাধারণ নেতা, বাংলাদেশের ক্রিকেটের আইকন এখনো আমার কাছে পাগলাই বটে।
পাগলার সঙ্গে আমার সম্পর্কটাকে কী বলা যায়?
আমি জানি, লোকে এটাতে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক হিসেবে ভাবতে পছন্দ করে। আমি কখনো তা বলি না। আমার কোনো ক্রিকেটারের কাছে কখনো 'পিতা' হয়ে উঠতে চাইনি। অবশ্যই আমি যত দিন বাংলাদেশে ছিলাম, পাগলার সঙ্গে আমার কোচ-ক্রিকেটারের চিরায়ত সম্পর্কই ছিল। হ্যাঁ, আমি তো বুড়ো মানুষ। বয়সের পার্থক্যটা অনেক ছিল; বেশির ভাগ ক্রিকেটারের সঙ্গেই অনেক বয়সের পার্থক্য ছিল আমার। সে জন্য হয়তো লোকেরা বুড়ো মানুষটাকে কিশোর পাগলার সঙ্গে মেলাতে গিয়ে এই সম্পর্কের ধরন ভেবে নিয়েছে!
সত্যি বলি, আর দশটা ক্রিকেটারের চেয়ে আলাদা করে কখনো ওকে ভাবিনি। হ্যাঁ, আমার পেস বোলিং দলের নেতা ছিল সে। তার মধ্যে সেই নেতৃত্বগুণটা ছিল। যে জন্য হয়তো তাকে কেন্দ্র করে আমাকে কিছু পরিকল্পনা করতে হতো। একটু বেশি কথা বলতে হতো। এর চেয়ে বেশি কিছু না।
আমি কখনো পাগলার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলতে চাইনি। পাগলা চেয়েছে কি না, বলেছে কি না; সেটা আলাদা আলোচনা। তবে আমি যেটা করতাম, দীর্ঘ আড্ডায় জীবন বোধ, জীবনযাপন এগুলো নিয়ে আমার চিন্তাটা হয়তো বলতাম। সেটার প্রভাব তার ওপর কখনো পড়েছে কি না, সে এগুলোতে আদৌ একমত ছিল কি না; আমি জানতাম না।
তবে কখনোই যেচে তার মাঠের বাইরের জীবন নিয়ে মন্তব্য করতাম না। হ্যাঁ, তার প্রয়োজন হলে হয়তো আলোচনাটা উঠত।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, মাঠের বাইরে ওর চমৎকার একটা উপভোগ্য জীবন ছিল। এই বয়সী ছেলেদের মতো উদ্যাম একটা জীবন ছিল। সেখানে আমার অংশগ্রহণ খুব জরুরি ছিল না।
হ্যাঁ, আমি ওর সঙ্গে অনেক মিশেছি, অনেক প্রলম্বিত আড্ডা দিয়েছি আমরা। ওর

বাড়িতে গিয়ে মজা করেছি। ওর বিয়ের অনুষ্ঠানে সবাই একাকার হয়ে গেছি। সেগুলোর সবই ছিল আসলে আমাদের দলের যে পারস্পরিক অসাধারণ সম্পর্ক, তার বহিঃপ্রকাশ।

আমি জানি, আমি বাংলাদেশ থেকে চলে যাওয়ার পর বা থাকতেও আমাদের সম্পর্ক অনেক সময় আলোচ্য হয়ে উঠেছে। তবে আমি মাশরাফির প্রতি কখনো পক্ষপাত দেখিয়েছি, এমন কথা শুনে বিস্মিত হয়েছি। ওর তো পক্ষপাতের কোনো প্রয়োজন ছিল না।

হ্যাঁ, ওর সঙ্গে একটু বেশি কথা বলতাম।

কারণটা বুঝতে হবে। মাশরাফি প্রায়ই ইনজুরিতে পড়েছে তখন। মানুষ হিসেবে আমার কী করা উচিত ছিল? আমাকে ওর সঙ্গে কথা বলতে হতো; অনেক কথা বলতে হতো। চেষ্টা করতাম, ওর উৎসাহটা ধরে রাখতে। এমন হতে পারে, এই অতিরিক্ত সময় কাটানো, অতিরিক্ত গল্প করা হয়তো লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবে। তবে এটুকু জোর গলায় বলি, পাগলাকে আমি জীবনে কখনো একবিন্দু বাড়তি সুবিধা দিইনি।

সেটা পাগলার দরকার হবে কেন!

দুর্ভাগ্যজনকভাবে একটার পর একটা ইনজুরিতে পড়েছে। প্রতিটা ইনজুরি ওর ক্যারিয়ার শেষ করে দেওয়ার মতো যথেষ্ট ছিল। কিন্তু নিজের চেষ্টায়, একমাত্র নিজের চেষ্টায় ভীষণ কষ্টকর সেই পুনর্বাসন-পর্ব শেষ করে ফিরে এসেছে প্রতিবার; আগের চেয়েও পরিণত হয়ে ফিরেছে। এমন লোকের পক্ষপাতের দরকার হয় না।

হ্যাঁ, জীবনে কখনো কখনো হয়তো সহজ রাস্তা খোঁজ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু একটা কথা খুব তীব্রভাবে জানত যে, ও সাফল্য চায়। ইনজুরি থেকে প্রতিবার ফিরে আসার এই যে আপ্রাণ চেষ্টা, এটাই আসলে প্রমাণ করে, ও এই ক্রিকেট খেলাটায় থাকতে, সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকতে কতটা তীব্রভাবে চায়। আমি শুধু ওর এই ভীষণ চেষ্টা দেখে একটু পাশে থাকার চেষ্টা করেছি, সমর্থন দিয়েছি।

ইনজুরিকে বারবার এড়িয়ে ফিরে এসেছে বটে। তবে এই ইনজুরি আসলে মাশরাফির সেরাটা দেখতে দিল না। একটা তো সোজা হিসাব, ইনজুরির ফলে পাগলা মোট কতগুলো ম্যাচ খেলতে পারেনি, কতটা বছর জীবন থেকে তার হারিয়ে গেছে, সেটা হিসাব করলে ধারণা পাওয়া সম্ভব যে, আরও কতগুলো উইকেট তার থাকতে পারত।

কিন্তু এই হিসাবটা আমরা করব, বারবার ইনজুরিতে পড়ে ক্ষমতা হারাতে থাকা, ছন্দ হারাতে থাকা একজন মানুষের বোলিং গড় দেখে। পাগলা যদি কখনোই ইনজুরিতে না পড়ত, যদি সে সব সময়ই তার শুরুর শারীরিক সামর্থ্যটা ধরে রাখতে পারত, সে ক্ষেত্রে যে কয়টা ম্যাচ খেলেছে, তাতেও উইকেটসংখ্যা থাকত চোখে পড়ার মতো। আমি এককথায় মনে হয় বলতে পারি, ইনজুরি এভাবে বারবার এসে ওকে লাইনচ্যুত করে না দিলে, সে সম্ভবত গ্রেট ফাস্ট বোলারদের একজন হয়ে উঠত।

তবে ইনজুরি পাগলার কাছ থেকে যেমন অনেক সময় ও উইকেট কেড়ে নিয়েছে, তেমনই পাগলা এই বিরাট অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে অসাধারণ পরিণত হয়ে

উঠেছে। আমি টেলিভিশনে ওর খেলা দেখি এখন। পাগলার হয়তো সেই গতি নেই, যা দিয়ে একসময় সে আতঙ্ক তৈরি করত। তবে পাগলা এখন জানে, অফ স্টাম্প কোথায় থাকে। এই যে পরিণত হয়ে ওঠা, এই মানসিকভাবে আরও দৃঢ় হয়ে ওঠা; এটা পাগলাকে দারুণ এক নেতায় পরিণত করেছে।

হ্যাঁ, তার মধ্যে একটা নেতৃত্বগুণ অন্তত ছোটবেলা থেকেই দারুণভাবে ছিল। দলের প্রতিটা খেলোয়াড়ের জন্য, আসলে প্রতিটা মানুষের জন্য ওর ভেতরে একটা মানবিক আবেগ আছে। ওর আশপাশে থাকা প্রতিটি মানুষকে আলাদা করে ভালোবাসতে চায়। এটা আপনাকে নেতা হিসেবে অনেক বড় করে তুলবে, এ রকম গুণ থাকলে আপনার দলের প্রত্যেকে আপনার প্রতি দারুণ নিবেদিত হবে। আজকের পাগলা নিশ্চয়ই ওই গুণের সর্বোচ্চ প্রতিদান পাচ্ছে।

মাশরাফি অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান তাকে করে তুলেছে এক দারুণ নেতা। প্রতিটি ইনজুরি থেকে ফেরার পর তাকে লড়তে হয়েছে। যেকোনো একটা বিরতির পর এসে দলের অংশ হওয়াটা আরেকটা লড়াই। পাগলা বারবার লম্বা বিরতির পর ফিরে এসে দলের অংশ হয়েছে এবং দলের সবার প্রিয় চরিত্রই থেকেছে; এটাকে আপনার খুব গুরুত্ব দিতে হবে। এতে তার সতীর্থদের সঙ্গে মেশার ক্ষমতাটা বোঝা যায়।

অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞান বাড়ে, দায়িত্ববোধ বাড়ে এবং নেতৃত্বগুণ তৈরি হয়। আর এই সবকিছু মিলিয়ে আমি বলব, পাগলা এখন ওয়ানডে ক্রিকেটের উল্লেখযোগ্য এক অধিনায়ক হয়ে উঠেছে।

এটা সবাই মানবেন যে, মাশরাফির জীবনের মতো নাটকীয় জীবন, গল্পের জীবন খুঁজে পাওয়া কঠিন। মানুষকে যেমন আনন্দে হাসায়, নিজেকে অনেক কাঁদতে হয়েছে। আমি বাংলাদেশ ছাড়ার পরও ঘটনাক্রম অনুসরণ করেছি। ২০১১ বিশ্বকাপে সুযোগ না পাওয়াটা পাগলার জীবনের একটা বড় ট্র্যাজেডি ছিল। এটা ঠিক কি ভুল বলার মতো অবস্থায় আমি নেই। হয়তো ক্রিকেটীয় কারণেই তাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। তবে এটুকু বলতে পারি, এমন হাসি-কান্নার নাটকীয়তাতেই ভরা পাগলার জীবন।

ঘটনাক্রমে আমি এবার যখন ছুটিতে অস্ট্রেলিয়া এসেছি, ঠিক তখনই ডিএম (দেবব্রত মুখার্জি) জানাল, সে পাগলার এই নাটকীয় জীবনটা লিখে রাখতে চায়, একটা জীবনী লিখতে চায়। এর চেয়ে দারুণ উদ্যোগ আর হতে পারে না। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি, বিশ্বের অনেক অসাধারণ ক্রিকেটার ও মানুষের মতো পাগলার সংস্পর্শে কখনো আসতে পেরেছিলাম।

আজ আরও সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে যে, ডিএম আমাকে পাগলার জীবনীর জন্য কিছু লিখতে বলেছেন। এটা আমার জন্য একটা প্রাপ্তি।

আমি নিশ্চিত নাটকীয় এই জীবনকাহিনী পড়ে লোকেরা আনন্দিত হবেন, ভবিষ্যতের তরুণ ক্রিকেটাররা অসাধারণ অনুপ্রেরণা পাবেন নিজেদের বড় করার ব্যাপারে। বইয়ের জন্য শুভকামনা রইল। শুভকামনা রইল প্রিয় সাংবাদিক ডিএম-এর জন্য। আর একজন ক্রিকেটার, একজন মানুষের জন্য আমার সারা জীবনের অন্তহীন ভালোবাসা ও শুভকামনা পাগলা। ভালো থেকো, পাগলা।

যে মাশরাফিকে চিনি

সাইদুজ্জামান



১৭ বছরের কিশোর ঢাকায় আবির্ভাবেই চমকে দিয়েছে সবাইকে। বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের মরা উইকেটেও গতিতে ব্যাটসম্যানের নাভিশ্বাস তুলছে আর ব্যাট হাতে নামলেই বোলারকে তুলে তুলে মারছে। তিনি তখনো হালের মুস্তাফিজুর রহমান নন কিংবা মোসাদ্দেক হোসেন। তবে ২০০০ সালে বাংলাদেশের ক্রিকেটে এমন কারো আবির্ভাব সাড়া ফেলে দেওয়ার মতো ঘটনাই। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লও নামটা, কৌশিক, তার নিজের আঞ্চলিক উচ্চারণে যা 'কৈশিক'। আমরা এ তরুণকে দেখে বিস্ময়াভিভূত হলাম, ক্রমশ কৌশিক পল্লবিত হলেন মাশরাফি বিন মুর্তজায়, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠী পরিণত হলাম তাঁর ভক্তে। এ ভক্তি শুধুই তাঁর ক্রিকেটীয় সামর্থ্যের জন্য নয়, বরং

অনেকটাই মানুষ মাশরাফি, নেতা মাশরাফি এবং লড়াকু মাশরাফির জন্য।
তিনি অসাধারণ। সত্যিই কি তাই? নাকি আমাদের মাঝে স্বাভাবিক মানবীয় গুণাবলির অভাব বলেই মাশরাফিকে অসাধারণ মনে হয়? তাঁর পরিবারের

সঙ্গে একটু-আধটু যোগাযোগের সূত্র ধরে জানি পারিবারিক পরিমণ্ডলে এমন আত্মিক যোগাযোগটা শৈশবে আমরাও দেখেছি, উপভোগ করেছি। এখন সেই সুতোর টানটা আর নেই। নেই বলেই মাশরাফির ঢাকার ফ্ল্যাটে আত্মীয়-পরিজনের মেলা দেখে বিস্মিত হই। মাশরাফির বন্ধুবাৎসল্য দেখে আমাদের অনেকের বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে, আহা, আমারও তো অনেক বন্ধু ছিল! অভাবী একটি ছেলের উচ্চশিক্ষার ভার বছর পাঁচেক ধরে মেটাচ্ছেন মাশরাফি। আমাদের অনেকের পরিবারেরও এভাবে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার অতীত আছে। খেতে না পাওয়া মানুষকে নিজের খাবারের ভাগ দেওয়াটাও তো অসাধারণ কিছু নয়! নড়াইলের বাড়িতে মাশরাফির মা নাহয় একটু বেশিই দায়িত্ব নিয়েছেন, মায়ের ভালোবাসা দিচ্ছেন জনা দশেক কিশোরকে।

একুশ শতকে এই ব্যাপারগুলোই অসাধারণ মনে হয়, কারণ আত্মকেন্দ্রিক সমাজে মানবিক এ বিষয়গুলোই এখন যে বিরল! মাশরাফির আয়নায় আমাদের নিজেদের দেখতে দারুণ লাগে। কিন্তু আমাদের সিংহভাগের সে আয়নাটা বড্ড ঝাপসা, কখনো কখনো স্বার্থ উঁকি মারে। অগত্যা আমরা আয়না থেকে মুখ সরিয়ে নিই, আরো বেশি মাশরাফি-ভক্ত হয়ে উঠি। ভাবি, কী অসাধারণ রকমের সাধারণ এই মাশরাফি।

ক্রিকেট-মানচিত্রে মাশরাফি এসেছিলেনই যেন অসাধারণত্বের মশাল জ্বালাতে। প্রথম শ্রেণীর কোনো ম্যাচ না খেলেই সরাসরি জাতীয় দলে ডাক পাওয়া দিয়ে শুরু। আবার প্রথম সফরেই চোট নিয়ে মাঠ থেকে ছিটকে পড়া মাশরাফি–ক্যারিয়ারের শুরু থেকে অদ্যাবধি এভাবেই টান পড়ছে 'নড়াইল এক্সপ্রেস'-এর চেইনে। তিনি যখন জোরে ছোটেন, তখনই চেইনে টান। অন্তত সাতবার তাঁর ক্রিকেট ক্যারিয়ারই পড়ে গিয়েছিল প্রবল হুমকির মুখে। কিন্তু প্রতিবারই অমানুষিক কষ্ট আর ত্যাগ স্বীকার করে ফিরে এসেছেন তিনি। এ ঘটনা এতটাই বিস্ময়কর যে বিদেশি সাংবাদিকদের অনেকে এটা বিশ্বাসই করতে চান না! জীবনযুদ্ধে লড়াইয়ের এ অংশটায় ক্রিকেট তো বটেই, আর সব ক্ষেত্রেও বিরল।

মাশরাফি নিজে একজন মানুষকে এ জন্য কিছুটা কৃতিত্ব দেন। ক্যারিয়ারে দ্বিতীয়বার বড় ইনজুরিতে পড়ার পর লম্বা সময় মাঠের বাইরে কাটাতে হয়েছিল তাঁর। সে সময়টা যে কী দুর্বিষহ হতাশায় কেটেছে মাশরাফির! আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে যাওয়া মানে সবার মনোযোগ থেকে দূরে সরে যাওয়া। তো সে সময়টায় জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার বলেছিলেন, 'তোর সামনে দুটো চয়েস আছে। খেলা ছেড়ে দিয়ে চিত্রা নদীর পাড়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারিস। তখন কেউ তোকে মনে রাখবে না। যদি ক্রিকেটে বেঁচে থাকতে চাস, তাহলে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ।' মাশরাফি গা-ঝাড়া দিয়ে সেরে উঠেছিলেন। ডেনিস লিলির আত্মজীবনীতে কঠিন ইনজুরি

নিয়ে পেস বোলিং করার অনুপ্রেরণাও নিয়েছিলেন। তবে মাশরাফির ক্রিকেটে টিকে থাকার পেছনের মূল চালিকাশক্তি তাঁর অদম্য ক্রিকেটপ্রেম। মাশরাফির কাছে কঠিন সব প্রশ্নেরই উত্তর মেলে, কিন্তু ক্রিকেট ছেড়ে দেওয়ার পর কী করবেন জিজ্ঞেস করলেই বাকহারা হয়ে যান তিনি। অনেক ভেবেচিন্তে যে উত্তর দেন, তার পুরোটা জুড়েই থাকে ক্রিকেট। এখন ক্রিকেট খেলে চলেছেন, খেলা ছাড়ার পর ক্রিকেটকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার প্রবল ইচ্ছা তাঁর। কোচিং-প্ল্যানিং কিংবা ছোট্ট পরিসরে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে হলেও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরি করতে চান মাশরাফি। তার মানে ক্রিকেটেই আছেন এবং থাকছেন তিনি, তা যে পরিচয়েই হোক না কেন।

২০০১ সালের এপ্রিলে প্রথমবার পূর্ণাঙ্গ বিদেশ সফরে যায় বাংলাদেশ দল। সে দলে ছিলেন না মাশরাফি। তবে সে বছরই নিউজিল্যান্ড সফরের পরিকল্পনার মধ্যমণি তিনি। এ দুটো সফরের মাঝেই বাংলাদেশ 'এ' দল গিয়েছিল ভারতে। অনূর্ধ্ব-১৭ টুর্নামেন্টে সাড়া ফেলে দেওয়া মাশরাফির সামনে শেষ 'হার্ডল' ছিল ওটাই। হার্ডলটা অনায়াসেই টপকেছেন তিনি। দলের সঙ্গে যাওয়া জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক রকিবুল হাসান ফিরে বলেছিলেন, 'ছেলেটা ১৪৫ কিলোমিটার গতিতে বোলিং করেছে', যা বাংলাদেশ ক্রিকেটের তৎকালীন প্রেক্ষাপটে চরম বিস্ময়ের। আর অধিনায়ক খালেদ মাহমুদ গর্ব করে বলেছিলেন, 'মুম্বাইয়ে একটা ম্যাচে বাউন্সারে এক ব্যাটসম্যানের হেলমেটের গ্রিল ভেঙে ফেলেছিল কৌশিক। খেলার পর ওরা ঠাট্টা করে বলছিল তোমরা কৌশিককে দিয়ে আমাদের একজন ব্যাটসম্যানকে নিয়ে যাও!'

মাশরাফিকে কেন ছাড়বে বাংলাদেশ! গোলাম নওশের প্রিন্স, হাসিবুল হোসেন শান্তর পর পেস বোলারের মরুভূমিতে মাশরাফির আগমন তো ভরা নদী খুঁজে পাওয়ার স্বস্তিই। ভারতে 'এ' দলের সফরের পর বলাবলি শুরু হয়ে গেছে, মাশরাফিই কি তাহলে এ দেশের সর্বকালের সেরা পেস বোলার? সে সময়কার আলোচনাটা নিছকই আবেগতাড়িত। তো তিনি নিউজিল্যান্ড গেলেন এবং বোঝা গেল দলের ভেতরেও মাশরাফির গুরুত্ব অত্যধিক বেশি। এতটাই যে এক দিনে ২৮ ওভার বোলিং করিয়ে ফেললেন অধিনায়ক। মাশরাফি তখন টগবগে তরুণ, অধিনায়ক বল হাতে দিলেই ছোটেন এক্সপ্রেস ট্রেনের গতিতে। ইনজুরি-টিনজুরি সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণাও নেই। সেটা হয়ে গেল ক্যারিয়ারের প্রথম টেস্টেই! সে সময়কার অধিনায়ক খালেদ মাসুদকেও দোষ দেওয়া যায় না। ইনজুরির চর্চা তো তখন জাতীয় দলেও সেভাবে নেই। আর মাশরাফি তখন এতটাই তরতাজা এবং কার্যকর যে ওই কন্ডিশনে তাকে দিয়ে বেশি বোলিং করানোর লোভ সামলানোই কঠিন। মাশরাফি নিজেও সে অনুযোগ ভুলে যান এ যুক্তিতে। আজকের মুস্তাফিজ যে যত্ন পান কোচ, কোচিং স্টাফ আর অধিনায়কের, তখন সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না বাংলাদেশ দলে।

সেই তখন থেকেই মাশরাফি কঁকিয়ে ওঠেন যন্ত্রণায় আর আঁতকে ওঠে বাংলাদেশ। মাশরাফি ফিরছেন, ফিরেছেন এবং আবার ইনজুরিতে পড়ে ছিটকে গেছেন–আমরা ছুটি ডাক্তারের কাছে। মনে আছে, ২০০৩ সালে চট্টগ্রামে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্টে চোট নিয়ে মাশরাফি সোজা হাসপাতালে, আমরা মাঠের খেলা ফেলে কাচের দরজা দিয়ে মাশরাফির চোখে বেদনার ছাপ মাপার চেষ্টা করছি! ট্রলিতে শুয়ে থাকা তাঁর জল টলমল চোখজোড়া আজও ভুলিনি। মনে হচ্ছিল এবার শেষ, আর ফেরা হবে না মাশরাফির।

কিন্তু তিনি ফিরেছেন, আবার ইনজুরিতে পড়েছেন এবং আবারো ছুটেছেন বল হাতে। তত দিনে হাঁটুর ইনজুরির ব্যাপারে অনেক সতর্ক মাশরাফি। হাঁটুতে কিছু হলে ডাক্তারি পরীক্ষার আগেই বলে দিতে পারেন চোটটা কোন মাপের, মাঠে ফিরতে কত দিন লাগবে। রসিকতা করে নিজেকে লিগামেন্ট বিশেষজ্ঞও বলেন মাশরাফি! এতটাই যে, ২০১৫ বিশ্বকাপের আগে তামিম ইকবালের ইনজুরি নিয়ে সবাই যখন চিন্তাগ্রস্ত তখন মাশরাফি নির্দ্বিধায় জানিয়ে দেন, 'যে সময় আছে তাতে তামিমের বিশ্বকাপ খেলতে কোনো বাধা নেই।' তামিম বিশ্বকাপ খেলেওছিলেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, এর পেছনে চিকিৎসকের চেষ্টা, তামিমের ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে অনুপ্রেরণা ছিলেন মাশরাফিও।

এটাই, অনুপ্রাণিত করার গুণটাই মাশরাফির অসাধারণত্ব। যে ড্রেসিংরুমের তিনি নেতা, ক্রিকেটারদের সে অন্দরমহলে মাশরাফির প্রবেশ ঘটেছিল ১৭ বছর বয়সে। তখনকার ড্রেসিংরুম কালচারটাও ছিল অদ্ভুত। সেখানে সিনিয়ররা খেয়ালি বস, আর নবাগত মানেই ক্রিকেট খেলার পাশাপাশি সিনিয়রদের ফুট-ফরমাশ খাটা। তবে মাশরাফির অভিজ্ঞতাটা ছিল মিশ্র। বিদেশ সফরে আদিষ্ট হয়ে সিনিয়রের কাপড় ধুয়ে দিয়েছেন মুখ বুজে। আবার বিষয়টি জানার পর অন্য সিনিয়ররাই প্রতিহত করেছেন সেটি। বাকি জীবনে ড্রেসিংরুমে স্নেহ-ভালোবাসা-শ্রদ্ধাই পেয়ে আসছেন মাশরাফি। মাঝে কিছুদিন সমস্যা গেছে। বিশেষ করে ২০০৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজে চোট নিয়ে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে থেকে দলে ফিরে নিজের ছেড়ে যাওয়া ড্রেসিংরুমটাকে আর চিনতে পারছিলেন না মাশরাফি। নিজেকে এতটা গুরুত্বহীন আর কখনো মনে হয়নি তাঁর। তো, একদিন রাগ করে বিনা নোটিশে হোটেল ছেড়ে চলে যান মাশরাফি। আনুষ্ঠানিকভাবে বলেছিলেন মায়ের অসুস্থতার কথা। তবে তাঁর চলে যাওয়াটা যে তৎকালীন কোচ জেমি সিডন্স আর অধিনায়ক সাকিব আল হাসানের ওপর রাগ-অভিমান থেকে, সেটি গোপন থাকেনি।

বরাবরের মতোই আমরা মিডিয়া পক্ষ নিলাম মাশরাফি, সমালোচনার আঁচ জেমি সিডন্স পেরিয়ে লাগল সাকিবের গায়েও। তাই তাঁর পিছু নিলাম চট্টগ্রামে। হোটেল পেনিনসুলার রেস্টুরেন্টে বসে সাকিব যে ব্যাখ্যা দিলেন, তাতে বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে সাকিব ইচ্ছা করে মাশরাফিকে অবজ্ঞা করেননি। তিনি তখন সদ্যই

আনুষ্ঠানিকভাবে অধিনায়কত্ব পেয়েছেন আর ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের ছক আঁকতে এতটাই ডুবে ছিলেন যে, অন্য কিছু তাঁর পক্ষে খেয়াল করাও কঠিন। আমরা ভুল করেছিলাম, মাশরাফির ক্রিকেট-জীবনেও ওটা একমাত্র বড় ভুল আছে। মাশরাফির প্রোফাইল এবং মিডিয়ার কথা ভেবেই সম্ভবত কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

অবশ্য সাকিব নয়, সে সময় মাশরাফির ক্ষোভের কেন্দ্রে ছিলেন জেমি সিডন্স। অস্ট্রেলীয় এ কোচের কাছে সাকিব-তামিমই তখন বাংলাদেশের ক্রিকেট। সাফল্যের নিক্তিতে এমনটা ভাবা অন্যায় নয়, তবে সিডন্স এতটাই পক্ষপাতী ছিলেন যে অন্যদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার যোগ্যই মনে করতেন না! আর সেটা সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারকে নির্দয়ভাবে জানিয়ে তাঁকে মানসিকভাবে চুরমার করে দেওয়ার ঘটনাও আছে। যেমন মাহমুদউল্লাহ কিংবা ইমরুল কায়েসের বেলায়ও হয়েছিল। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের ড্রেসিংরুমে বিভেদের শক্ত দেয়াল তুলে দিয়েছিলেন ব্যাটিং কোচ হিসেবে দারুণ সিডন্স। ২০০৭ ওয়ার্ল্ড টি-টোয়েন্টি থেকেই কোচের সঙ্গে মাশরাফির ঝামেলা শুরু। একদিন প্র্যাকটিসে হাঁটুর যন্ত্রণার কথা বলতেই মাশরাফিকে শুনিয়ে কোচিং স্টাফের একজনকে সিডন্স বলেছিলেন, 'ওকে তো দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া উচিত!' সেই থেকে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া দুজনের বাক্যবিনিময়ও হতো না।

২০১১ বিশ্বকাপ যেন তারই হিসাব মিলিয়ে দিল! আগের বছর প্রিমিয়ার লিগের একটি ম্যাচে আবার হাঁটুতে চোট পান মাশরাফি। সামনেই বিশ্বকাপ, তাই জীবনের সবকিছু বাজি রেখে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার চেষ্টা করেন তিনি। দল ঘোষণার দিনও মিরপুরের শেরেবাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুশীলন করছিলেন তিনি। একাডেমি ভবনে দল ঘোষণার পর মাঠে মাশরাফির বিহ্বল অভিব্যক্তি আর আর্তনাদ শুনে ২০০৩ সালে হাসপাতালের ট্রলিতে শুয়ে থাকা মাশরাফিকে মনে পড়ছিল। সেদিন ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। আর ২০১১ সালের জানুয়ারিতে তিনি শোকাহত, ক্ষুব্ধ ঘরের মাঠের বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন না জেনে। রাগটা তাঁর কোচ আর নির্বাচকদের ওপর। আর অভিমান অধিনায়ক সাকিব আল হাসানের ওপর। না, স্কোয়াডে মাশরাফির অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেননি অধিনায়ক, তবে তিনি নিজে থেকে চাইলে মাশরাফিকে স্কোয়াডে না রাখার দুঃসাহস সে সময়কার ক্রিকেটে কারোর ছিল না। চোট থেকে সেরে উঠে ম্যাচ প্র্যাকটিস ছাড়াই মাশরাফিকে খেলানো ঠিক হবে না বলেই হয়তো সেদিন নীরব ছিলেন সাকিব। যুক্তি দিয়ে মাশরাফি মেনে নেন তো পরের মুহূর্তেই তাঁর অনুযোগ অভিমান হয়ে আছড়ে পড়ে সাকিবের ওপর। ২০১৫ সালে জেল থেকে ছাড়া পাওয়া ক্রিকেটার বিশ্বকাপ খেলেছেন, চোট-সমস্যা ছিল আরো দুজনের। তবু তাঁরা স্কোয়াডে ছিলেন এবং খেলেছেনও। সেখানে ১৫ জনের

স্কোয়াডে ৮০ ভাগ ফিট মাশরাফি কি থাকতে পারতেন না? বাংলাদেশ ক্রিকেট তো তখন এমন কোনো জায়গায়ও পৌঁছেনি, যেখানে এটুকু ছাড় দেওয়া যেত না! বিশ্বকাপের ওই আসরে ৫৮ আর ৭৮ রানের লজ্জার পর মাশরাফির বাদ দেওয়াটা আরো প্রশ্নবিদ্ধ। অবশ্য সে প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজিনি। সময় আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে নতুন খবরের খোঁজে! অভিমান করে মাশরাফির হোটেল ছেড়ে যাওয়া যদি বড় ভুল হয়, তবে ২০১১ বিশ্বকাপ স্কোয়াডে তাঁকে না রাখাটা মহা ভুল। জেমি সিডন্স কি সেদিন নীরবে হেসেছিলেন? জানা নেই, তবে তাঁর মেয়াদ বাড়ানোর পক্ষে বোর্ডে জোর মত দিয়েছিলেন সাকিব ও তামিম। কিন্তু বোর্ড কিছুতেই এ অস্ট্রেলীয়কে রাখার পক্ষপাতী নয়। তখন অন্তত ব্যাটিং কোচ হিসেবে যেন জেমিকে রাখা হয়, সে অনুরোধটা করেছিলেন মাশরাফি। বোর্ড সে অনুরোধও রাখেনি, তবে দেশে ফেরার ফ্লাইটে বসে মাশরাফিকে আবেগঘন একটা 'এসএমএস' করেছিলেন সিডন্স। বলার অপেক্ষা রাখে না, সে শব্দগুলো কৃতজ্ঞতা আর অনুতাপে ভেজা ছিল।

জেমি সিডন্সের সঙ্গে মাশরাফির দূরত্বের পেছনে সম্ভবত আরেক কোচ ডেভ হোয়াটমোরেরও পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। থাকারই কথা। ২০০৩ বিশ্বকাপের পর হোয়াটমোর যখন দায়িত্ব নেন, মাশরাফি তখন ফর্মের তুঙ্গে। বাংলাদেশের মাটিতে মাশরাফির মতো পেসারের জন্ম হতে পারে, এ বিশ্বাসটাই শুরুতে ছিল না অস্ট্রেলীয় হোয়াটমোরের। তাই মুহূর্তেই তাঁর প্রিয় ছাত্র মাশরাফি, নিয়ম ভাঙলেও কড়া শাসন করেননি কখনো। উল্টো ক্ষেত্রবিশেষে জেমির চেয়েও বেশি পক্ষপাত করেছেন তিনি। ২০০৩ সালের পাকিস্তান সফরে টেস্টে সেঞ্চুরি করে ড্রেসিংরুমে এসে জাভেদ ওমরকে ঘুমাতে দেখে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়েছিলেন হোয়াটমোর। অথচ ড্রেসিংরুমে তখন নিয়মিতই ঘুমান মাশরাফি। এ ব্যাপারে হোয়াটমোরের ব্যাখ্যা ছিল, 'পাগলার (মাশরাফি) মতো ক্রিকেটার কোথায় পাবে তুমি? মাঠের বাইরে ও যা-ই করুক, মাঠের ভেতরে ওর তুলনা নেই। দলের জন্য জান দিয়ে দেবে!' তাঁর সতীর্থদের অনেকের কাছেই শুনেছি, 'বাইরে দেখে মনে হয় অলসের চূড়ান্ত কিন্তু সীমানাদড়ির ভেতরে ঢুকলেই মাশরাফি একেবারে অন্য রকম। যা চাইবেন, তার চেয়েও বেশি করতে চাইবে।'

সেই মাশরাফি এখন মাঠের বাইরে আগের মতো নেই। জীবনে কতবার যে ম্যাচের পরই পাবলিক বাসের পেছনের সিটে চড়ে নড়াইল চলে গেছেন। পাড়ায় হইহল্লা করেছেন। মাশরাফি স্বীকার করেন না, তবে গুঞ্জন আছে তাঁর একটি ইনজুরির পেছনে ভূমিকা আছে নড়াইলে গাছ থেকে ডাব পাড়া কিংবা ব্যাডমিন্টন খেলার। চিত্রা নদীর উল্টোস্রোতে সাঁতরে শরীরটাকে দারুণ মজবুত বানিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু পোক্ত সে শরীরেরও তো ধকল নেওয়ার একটা সীমারেখা আছে। ব্যস্ত ক্রিকেট আর সর্মাধিক ডানপিটে জীবন তাঁর শরীরটা 'নিতে' পারেনি, দুমড়ে-মুচড়ে

গেছে বারবারই। সময় মাশরাফিকে শিখিয়েছে, এখন আর আগের মতো পাবলিক বাসে হুটহাট নড়াইল ছোটেন না, খুলনায় জাতীয় লিগের ম্যাচ নড়াইল থেকে প্রতিদিন 'শাটল' করে গিয়ে খেলা ঠিক হবে কিনা, তা নিয়ে দুবার ভাবেন। আরো কী কী করেন, তার অনেকগুলোই অবিশ্বাস্য। ট্রেনারের পরামর্শ মেনে মাছ-মাংস স্রেফ পুড়িয়ে খান। প্রথম প্রথম বমি-টমি করে দিতেন, এখন মানিয়ে গেছে। শরীরের ওজন এক-দুই কেজি বেড়ে গেলেই কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে তাঁর। নিয়ম করে ছুটে যান ফিজিও-ট্রেনারের কাছে। কাউকে নিয়ম অমান্য করতে দেখলে আক্ষেপ করেন। সময় তাঁকে প্রতিনিয়তই শিখিয়েছে এবং তিনি শিখেওছেন।

শিখেছেন জীবনে প্রথম বাংলাদেশের ড্রেসিংরুমে পা দেওয়ার দিন থেকেই। সিনিয়র-জুনিয়রের নির্মম বিভাজনটা মাশরাফির কখনোই ভালো লাগেনি। বড় ক্রিকেটার-ছোট ক্রিকেটারের ব্যবধানটাও তাঁর ভালো লাগে না। ড্রেসিংরুমটা ১৫ জনেরই–অধিনায়ক হওয়ার পর তাঁর প্রথম মিশন এ বিশ্বাসটা ছড়িয়ে দেওয়া। সে মিশনে মাশরাফি সফল, আর কাকতালীয়ভাবে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বর্তমান কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহে। বোর্ড আগের মতো চোখ বুজে নেই, মিডিয়াও এ ব্যাপারে ক্রমোন্নতির পথে।

মাশরাফির সবই যে দলের সবার ভালো লাগে, বিষয়টা সে রকমও নয়। তবে ব্যক্তিত্ব আর সততা দিয়ে ড্রেসিংরুমের পাওয়ার গেমে ব্যালান্সিং ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছেন মাশরাফি বিন মুর্তজা। সিনিয়রদের আলাদা ডেকে কথা বলেন আবার জুনিয়রদের সমর্থনের পাশাপাশি প্রয়োজনে কঠোর হতেও দ্বিধা করেন না তিনি। এত দিন বাংলাদেশ দলে মোটিভেট করতেন শুধু বিদেশি কোচই, হালে সে দায়িত্বটা ভাগ করে নিয়েছেন অধিনায়কও। এ অবপ্লানটা গড়ে তুলতে এক যুগেরও বেশি সময় লেগেছে মাশরাফির।

এক যুগেরও বেশি, প্রায় ১৩ বছর। অধ্যবসায় আর সততার অনন্য উদাহরণ তাই মাশরাফির জীবন। আইপিএলে সাড়ে ৬ লাখ ডলারে কলকাতা নাইট রাইডার্সে নাম লেখানোর চেয়েও যে প্রাপ্তি সহস্র গুণ বেশি। কৌশেকের সে গতি মাশরাফির বোলিংয়ে নেই, ব্যাটসম্যানের বুকেও তাই কাঁপন ধরে না। বাঁহাতি ব্যাটসম্যানের বিপক্ষে বোলিং করার ক্ষেত্রে অস্বস্তিটাও রয়ে গেছে। তবু মাশরাফির চতুরতা আর অভিজ্ঞতার কাছে পরাস্ত হন ব্যাটসম্যান, সঙ্গে অসাধারণ নেতৃত্বগুণ তাঁকে নিশ্চয়তা দিচ্ছে একাদশে।

ক্রিকেট, নেতৃত্বগুণ, লড়াইয়ের শক্তি আর ব্যক্তি মাশরাফি–সব মিলিয়ে তাঁর বিজ্ঞাপন বাজারও এখন অভাবিত রকমভাবে চড়া। ২০১৫ বিশ্বকাপের আগে-পরে ঢাকার বিলবোর্ডে সাকিবের সঙ্গে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা মাশরাফির। আমাদের সবার জন্য এটাও এক অনুপ্রেরণা। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে অবিচল থেকে নিজের

লড়াইটা চালিয়ে যাও, একদিন সাফল্য আসবেই।
মাশরাফি বিন মুর্তজার চেয়ে বড় উদাহরণ হাতের কাছে খুঁজে পাই না। আমি ক্রিকেটের কথা বলছি।

এবং দেবব্রত
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। প্রথম দর্শন থেকেই তার বিস্ফারিত চোখ দেখে আসছি। লেখার হাতটাও বিস্ময়কর। সব সময় কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে মুগ্ধ। সাকিব আল হাসান কিংবা মাশরাফি বিন মুর্তজার ক্রিকেটমেধা কিংবা ব্যক্তিত্বে অবশ্য মুগ্ধতার এমনিতেই রাশি রাশি উপকরণ আছে। আমি নিশ্চিত দেবব্রতর লেখনীতে মাশরাফি বিন মুর্তজার জীবনালেখ্যও পাঠকদের মুগ্ধ করবে।
সাকিব আল হাসানকে নিয়ে দেবব্রতর বই এরই মধ্যে বাজারে আছে। মাশরাফি বিন মুর্তজারটাও এল। ভবিষ্যতে আরো আসবে, আশা করি পাঠক সমাদৃতও হবে।
এখানে দেবব্রতকে ছোট্ট করে একটা ধন্যবাদ দিয়ে নেয়া জরুরি। আত্মজীবনী কিংবা জীবনচরিত লেখার খুব একটা চল নেই এ দেশের ক্রীড়াঙ্গনে। হাতে গোনা কিছু আছে বৈকি, তবে তা মোটেও যথেষ্ট নয়। দেবব্রতকে ধন্যবাদ টানা দ্বিতীয় বছরে আরেকজন ক্রীড়াবিদের বেড়ে ওঠা নিয়ে কাজ করার জন্য। আশা করছি এ শুরু থামবে না, সংক্রমিত হবে ঝড়ের বেগে।
শুভকামনা।
সাইদুজ্জামান
ক্রীড়া সম্পাদক, দৈনিক কালের কণ্ঠ

নেপথ্যের কথা



১.

২০০২ সালের কথা।

মফস্বলের গন্ধ শরীরে নিয়ে সবে ঢাকায় এসেছি। প্রথম আলোতে তখনো চাকরি শুরু করিনি; প্রদায়ক হিসেবে লিখি এবং ভবঘুরে জীবনযাপন করি। মেজো ভাইয়ের এক বন্ধুর মেসে খাই আর ঘুমাই। হঠাৎ ঢাকায় খুব তোলপাড়–পাকিস্তান এসেছে।

এক বন্ধুকে নিয়ে ৪০ টাকার টিকিট কেটে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে চলে গেলাম বাংলাদেশ-পাকিস্তান টেস্ট দেখতে। মাঠে খেলা চলছে। হঠাৎ দেখি ক্রাচে ভর করে তিনি আস্তে আস্তে বাউন্ডারির কাছে একটা চেয়ারে বসলেন। কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। আমরা ঠিক পেছন দিকটায় ছিলাম।

সমানে চিৎকার চলছে, 'মাশরাফি, মাশরাফি।'

একটু হাত তুলে আবার কথায় মন দিচ্ছেন। আমার হঠাৎ মনে হলো ডাকনামে ডেকে দেখা যাক। জোরে একটা হাঁক দিলাম–কৌশিক!

এবার ঘাড় ঘুরিয়ে তিনি ফিরে তাকালেন;

কাউকে খুঁজলেন মনে হয়। খুঁজে না পেয়ে স্মিত একটা হাসি উপহার দিলেন। আমাকে দেখতে পাওয়ার কথা না। তারপরও আমি কল্পনা করে নিলাম, আমাকে লক্ষ্য করেই একটা স্মিত হাসি উপহার দিলেন।

আমার বন্ধুটি জানে, আমি আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলাম–আমাদের তরুণ নায়ক আমার ডাক শুনে হেসেছে!

আজও মাশরাফি আমার দিকে চেয়ে হাসলে আমার সেই একই অনুভূতি হয়, এই এক যুগ পার করে আজও তার প্রতি সেই একই মুগ্ধতা নিয়ে আমি চেয়ে থাকি। আজও আমার কেবলই মনে হয়, শতবর্ষের সাধনার ফলে একজন নায়ককে কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার।

আমি জানি, এ অনুভূতি কেবল আমার নয়। বাংলাদেশের কয়েক লাখ মানুষ এ খেলোয়াড়টি সম্পর্কে এই একই আবেগ নিয়ে ঘোরাফেরা করে। আমার একটা সাধারণ ধারণা ১৬ কোটি মানুষের এই দেশে লাখ খানেক মানুষ আছেন, যারা আসলেই এই ছেলেটার জন্য নিজের হাঁটুটা খুলে দিতে পারেন–ভাইয়া, এটা দিয়ে খেলেন।

মাশরাফি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার। মাশরাফি নিঃসন্দেহে এই দেশের প্রথম গতিতারকা। মাশরাফি বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে সফল অধিনায়কদের একজন। মাশরাফি দেশের ক্রিকেটারদের সবচেয়ে বড় প্রেরণার নাম।

তবে এই মাশরাফি নয়, চিরকাল আমার আগ্রহের কেন্দ্রে বসবাস করেছে মানুষ মাশরাফি বিন মুর্তজা।

ক্রিকেট দল-ফল নয়; কোনো জাতির ইতিহাসে এমন মানুষও আসে শতবর্ষের আরাধনায়। আমি বলি, মাশরাফি হলো গ্রিক ট্র্যাজেডি আর ভারতীয় রোমান্টিকতার মিশেলে এক মহাকাব্য। এমন মহাকাব্যকে ধরতে পারতেন মহাকবি হোমার বা মহাঋষি বেদব্যাস।

স্রষ্টা আমাকে, এই নশ্বর একজন মানুষকে হোমারের মতো 'দৃষ্টি' দিয়ে পাঠাননি। মহর্ষি ব্যাসের মতো দেবতার সন্তানও নই আমি। তাহলে কেন আমি মাশরাফিকে নিয়ে লেখার দুঃসাহস করলাম!

সেই একই কথা–চাঁদ ছোঁয়ার বাসনা।

মাশরাফিকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখছি বছর দশেক ধরে। সাংবাদিকতার সূত্রে এই এক দশক ধরে প্রতিনিয়ত তাকে দেখেছি, যোগ্যতাহীনভাবেও বন্ধুত্বের মর্যাদা পেয়েছি, ঘুরেছি, মুগ্ধ হয়েছি, বিস্মিত হয়েছি এবং স্বপ্ন দেখেছি এই মানুষটাকে দুই মলাটের ভেতর বেঁধে ফেলার। আমি জানি, এটা আমার যোগ্যতা অনুমোদন দেয় না। তারপরও মূর্খের চেষ্টা বলেও একটা ব্যাপার আছে।

মাশরাফির নাটকীয় জীবন বইয়ে তুলে আনতে যে মেধার দরকার ছিল; তা আমার নেই, এটা বলে সময় নষ্ট করার অর্থ হয় না। এমনকি তাকে বুঝতে যে

ক্রিকেটজ্ঞান, জীবনবোধ বা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা প্রয়োজন; এর কোনো কিছুই আমার নেই। তারপরও নিজের সীমাবদ্ধতা ভুলে অমর হওয়ার বাসনা কার না হয়! বছর দুই ধরে সেই অমর হওয়ার চেষ্টার ফল এই বইখানা।

আমি জানি, এই বইটি একটি বিষয়কে হয়তো নষ্ট করল। আমার আশপাশেই অনেককে চিনি, অনেককে জানি, যারা মাশরাফিকে নিয়ে একটা বই লিখলে সেটা সত্যিই একটা সম্পদ হতে পারত। সময়ের অভাবে তারা হয়তো এখনো কাজে হাত দেননি। আমি অকর্মা মানুষ; আগে আগে ধরে বিষয় নষ্ট করে ফেললাম।

তবে এই আশাটা বুকের মধ্যে রইল যে, এর পরে যোগ্য একাধিক হাতে মাশরাফি মলাটবন্দী হবেন অনেকবার। বারবার মাশরাফিকে ফিরে দেখা হবে তার আয়নায়। সে সময়ও আমি দুষ্টের মতো হেসে বলতে পারব–প্রথম চেষ্টাটা আমিই করেছিলাম; হোক না সে ব্যর্থ চেষ্টা!

২.

বলা হয়–প্রতিটা সাধারণ মানুষের জীবনেও একটা অসাধারণ গল্প আছে।

সে হিসেবে মাশরাফি নিশ্চয়ই অসাধারণ কিছু। কারণ এই মানুষটির শুরু থেকে শত শত গল্প আর গল্প। কখনো মজার গল্প, কখনো দুষ্টুমির গল্প, কখনো হাসির গল্প, কখনো কান্নার গল্প; কখনো আনন্দ অশ্রুর গল্প। চোখ বুজে বলে দেওয়া যায়, বাংলাদেশের খেলাধুলার ইতিহাসে সবচেয়ে নাটকীয়তায় ভরপুর জীবনের মালিক মাশরাফি বিন মুর্তজা।

এই এক শ নাটক, গল্প লিখে ফেলার ব্যাপারটা শুনতে খুব ভালো লাগে। কিন্তু ব্যাপারটা খুব জটিল–আসলে কোন কোন গল্প বলবেন আপনি?

এই বইয়ের কাজের শুরুর দিকে মাশরাফির স্ত্রী সুমনা হক মজা করে বলছিলেন, 'বইয়ে নতুন কী বলতে পারবেন? কৌশিককে নিয়ে তো সবই সবাই জানে।'

এই বইটা লেখার আসলে প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল এটাই। সবার জানা গল্পগুলোই বলতে হবে, ফলে বিরক্তি তৈরি হওয়ার যথেষ্টই সম্ভাবনা আছে। সেই চ্যালেঞ্জ মাথায় নিয়েই মাঠে নামা গেল।

এই জানা গল্প বলার আরেকটি সমস্যা আছে। গল্পটা সবাই জানেন, ঘটনাটা সবাই জানেন; কিন্তু সেই ঘটনার সূত্র কী?

একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক।

মাশরাফির ক্রিকেট নিয়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় গল্প হলো, অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে একটা ঝোড়ো ইনিংস খেলে প্রথম দৃষ্টি কেড়েছিলেন। এই গল্পটা আমি নিজে অন্তত তিনটি সংস্করণ শুনতে পেলাম। একজন বললেন, তিনি নিজে এই খেলাটা দেখেছেন–কুয়েতের বিপক্ষে জগন্নাথ হল মাঠে। আরেকজন বললেন, খেলাটা বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে ছিল। একজন দুর্বল স্বরে বলেছিলেন, এটা আসলে বিকেএসপির একটা মাঠের ঘটনা।

এর সঙ্গে কত বলে আসলে কত রান করেছিলেন, সে নিয়ে গণ্ডা গণ্ডা গল্প তো আছেই।

এখন এই সত্যি গল্পটা কোথায় পাব? দুর্ভাগ্যচক্রে বাংলাদেশের রেকর্ড, পরিসংখ্যানের সংরক্ষণপ্রক্রিয়া বলে সে রকম কিছুর অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া কঠিন। কয়েক দিন বোর্ড অফিসে ঘোরাঘুরি করে হতাশ হয়ে ফিরতে হলো। শেষ অবধি অবশ্য অনলাইনের যুগ বলে এই বিপদ থেকে মুক্তি মিলল–পাওয়া গেল টুর্নামেন্টের সবগুলো স্কোরকার্ডই।

এটা গেল লুপ্তপ্রায় ঘটনার উদ্ধার করার সমস্যা। এরপর আছে, একেবারে চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনার ভিন্নমুখী ব্যাখ্যা। জীবনীকার হিসেবে আমার পক্ষে কোনো একটা ব্যাখ্যা গ্রহণ করাটা মোটেও শোভন ব্যাপার হতো না। তাই এ ক্ষেত্রে প্রতিটি বিকল্প ব্যাখ্যা রেফারেন্সসহ হাজির করতে হয়েছে।

রেফারেন্সের কারণেও কেউ কেউ বইয়ের প্রতি বিরক্ত হতে পারেন। তবে এটা না করে আসলে উপায় ছিল না। মাশরাফির ক্যারিয়ারের বয়স দেখতে দেখতে ১৫ বছর হয়ে গেল। যেমনটা বারবার বলেছি, এর প্রতিটা বছরই ছিল ঘটনাময়। এত ঘটনার সবই আমাদের স্মৃতিতে হয়তো আছে। কিন্তু মুশকিলটা হলো, হুবহু প্রতিটা ঘটনা পর্যায়ক্রমে মনে করাটা একটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তাই দিনের পর দিন নিজে এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহায়তায় ঘাঁটতে হয়েছে এই দীর্ঘ সময়ের একাধিক দৈনিক পত্রিকার ফাইল।

ফাইল-পরিসংখ্যান আমাদের পেছাতে পেছাতে মাশরাফির ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে; সে সময় ঢাকায় যাত্রা শুরু করেছিলেন তিনি। এরপর আমার সামনে চ্যালেঞ্জ দাঁড়াল, এই ১৭টি বছরের গল্প বের করা এবং তারও আগের সূত্র খুঁজে বের করা।

সে জন্য একমাত্র উপায় ছিল নড়াইল-যাত্রা।

নড়াইলে মাশরাফি ছোটবেলা, কিশোরবেলা আবিষ্কারের জন্য তার পরিবার, বন্ধু, কোচ, শিক্ষক থেকে শুরু করে এলাকার সাধারণ চায়ের দোকানি বা পথচারীর সঙ্গে কথা বলেছি। এত আগের গল্পের ক্ষেত্রে যেটা সমস্যা হয়, বারবার বলার ফলে প্রত্যেকে তার মতো করে গল্পটাকে একটু বদলে ফেলেন। চেষ্টা করেছি, তার জীবনের প্রতিটি গল্প একাধিক মুখ থেকে শুনতে; যাতে সবে মিলিয়ে আমার একটি নিজস্ব গল্প তৈরি হয়!

হ্যাঁ, বইয়ে এই 'ডিসক্লেইমার'টা দিয়ে দেওয়া খুব জরুরি।

যেসব ঘটনা বিভিন্ন পত্রিকার বা লেখার রেফারেন্স থেকে উল্লেখ করা হয়েছে, তার সত্যতা নিশ্চিত করার দায় আমার নয়। তবে যেহেতু 'ছাপার অক্ষরে' প্রকাশিত হয়েছে, তাই আমরা সেই আদিকালের মতোই ধরে নিয়েছি এগুলো সত্য। তবে রেফারেন্স ছাড়া যত ঘটনা ও কথোপকথন বইয়ে পাবেন, কোনোটাকেই প্রামাণ্য বলে না ধরে নেওয়ার অনুরোধ করব।

এর কোথাও কোথাও আমি ঘটনাটা শুনেছি–কথোপকথন তৈরি করে নেওয়ার স্বাধীনতা গ্রহণ করেছি। আবার কোথাও কোথাও কথোপকথনের বর্ণনাও এক পক্ষ থেকে শুনেছি। ফলে এমনও হতে পারে যে, আদৌ এসব কথোপকথন এই ভঙ্গিতে কখনো হয়নি।

তবে এটুকু বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, জ্ঞানত অর্ধসত্যও আমার ভাষ্য হিসেবে এই বইয়ে উপস্থাপন করিনি কোথাও। নিজের মতো করে নিশ্চিত হয়ে তবেই প্রতিটা ঘটনার উল্লেখ করেছি। এই বারবার নিশ্চিত হতে গিয়ে অনেকের বিরক্তির কারণও হয়েছি। ছোট্ট একটা তথ্য আরেকবার 'ক্রসচেক' করতে অনেক রথী-মহারথীকে রাতদুপুরে ফোন করে তুলে ফেলেছি।

একটা ঘটনার কথা বলি।

এই সেদিন চট্টগ্রাম টেস্ট চলছে। শ্রদ্ধেয় ক্রীড়া সংগঠক মাহবুব আনাম প্রবল বর্ষার মধ্যে গাড়ি চালিয়ে চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে আসছেন। এ অবস্থায় তাকে ফোন করে বললাম, 'মাহবুব ভাই, মাশরাফি চেন্নাইতে যে মারামারি করেছিল, ওটার মীমাংসা কীভাবে করেছিলেন?'

মাহবুব ভাই হতভম্ব হয়ে গেলেন। ভাবলেন মাশরাফি এখন বোধ হয় চেন্নাই চলে গেছে আর গিয়ে কোনো গন্ডগোল করেছে, 'দেবু! মাশরাফি চেন্নাই গেছে কেন! আর ওখানে মারামারিই বা কেন করছে? কী হয়েছে, বল তো।'

আরেকটু পরিষ্কার করে বললে আশ্বস্ত হলেন যে, আমি ২০০২ সালের কথা বলছি! মাহবুব ভাই অত্যন্ত স্নেহ করেন বলে সে যাত্রা পিটুনি দেননি আমাকে। তবে এমন অসময়ে, অকালে, অস্থানে ফোন করে, সামনাসামনি ধরে লোকেদের যে কী পরিমাণে বিরক্ত করেছি, তা কেবল সেই মানুষগুলোই জানেন।

৩.

বইটির গঠন প্রসঙ্গে খুব একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার মতো কিছু আছে বলে আর মনে হয় না।

মাশরাফির পূর্বপুরুষের গল্প থেকে শুরু হয়ে মূল জীবনী শেষ হয়েছে ২০১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ বিজয়ের সময়ে। এখানে একটা প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই ছিল–জীবনী কেন এভাবে জীবনের মাঝপথে শেষ হবে? আসলে এই অর্থে এটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী নয়।

মাশরাফির বিশাল জীবনের একটি চক্র আমি বইয়ে ধরার চেষ্টা করেছি।

২০১৫ বিশ্বকাপে অধিনায়কত্ব পাওয়ার ভেতর দিয়ে মাশরাফির জীবনের একটি চক্র পূর্ণ হয়েছে বলে মনে হয়। মানে সিনেমার যেমনটা প্রয়োজন হয়–তেমন একটা উত্থান ও বীরোচিত জয়ই ছিল এই সিনেমার ক্লাইমেক্স। এরপরও প্রলম্বিত করে মৌসুমটা শেষ করা গেল। কিন্তু এ মুহূর্তে জীবনী লেখার জন্য তার অবসর বা বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছানো জরুরি বলে মনে হয়নি।

ভবিষ্যতে তেমন পরিস্থিতি তৈরি হলে চক্রের পরিধি বৃদ্ধি করে আরেকটু অগ্রগামী হওয়া যেতেই পারে। অবশ্য আদৌ যদি এই অক্ষম লেখকের লেখা নিয়ে পাঠকের সে আগ্রহ তৈরি হয়, তবেই সে সুযোগ মিলবে।

মাশরাফির জীবনচক্র শেষে তার পরিবার, দর্শন, বন্ধুদের নিয়ে কয়েকটা অধ্যায় আছে। যা আসলে জীবনের গল্প বলতে গিয়েও মাঝে মাঝে বলে ফেলা যেত। কিন্তু মাশরাফির জীবনে এই অধ্যায়গুলো এতটাই আলাদাভাবে তাৎপর্যপূর্ণ যে, এই বিষয়গুলো জোরের সঙ্গে আলাদা প্ল্যান দাবি করে।

বইয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা বিষয় সংযোজিত হয়েছে মূল জীবনীর পরে। এখানে আমি চারটি সাক্ষাৎকার রেখেছি। জীবনীগ্রন্থের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার ব্যাপারটা যায় না। কিন্তু এই বইয়ের ক্ষেত্রে এ চারটি সাক্ষাৎকার অপরিহার্য মনে হয়েছে।

প্রথমেই মাশরাফির নিজের একটা সাক্ষাৎকার। তিন পর্বের এই বিশাল ব্যাপারকে অবশ্য সাক্ষাৎকার বলে ফেলাটা খুব কঠিন। এখানে মূলত জীবনের ও খেলার নানা দিক নিয়ে মাশরাফির সঙ্গে ধারাবাহিক কথোপকথন হয়েছে। বই বাদ দিন, এই কথোপকথন ক্রিকেট বা খেলাধুলার গণ্ডি পার হয়ে আমাদের জীবন ও জাতীয় চিন্তার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে উঠেছে। সেই হয়ে ওঠার কৃতিত্ব যে আমার নয়, বক্তার; তা বলে দেওয়াটা নিশ্চয়ই বাহুল্য।

এরপর পর্যায়ক্রমে দুটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন হাবিবুল বাশার ও সাকিব আল হাসান।

মাশরাফির ব্যাপারে বাংলাদেশের প্রায় সকলের এবং বিশ্বের অনেকেরই অনেক কিছু বলার আছে। আমি নিশ্চিত একেবারে অপরিচিত একজন মানুষেরও হয়তো মাশরাফির ব্যাপারে একেবারে নতুন একটা কথা বলার থাকতে পারে। কিন্তু প্রতিটা ঝিনুক উল্টে মুক্তো পাওয়ার ঝুঁকি নেওয়া গেল না। বেছে নিতে হলো এই দুজনকে।

হাবিবুল ও সাকিবের দুই ধরনের গুরুত্ব আছে মাশরাফির জীবনবিচারে।

হাবিবুল বাশার সেই মানুষ, যিনি মাশরাফিকে ক্রিকেটে পা রাখা শুরু করে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সময় ধরে টানা দেখছেন। জাতীয় দলে অধিনায়ক হিসেবে ও সতীর্থ হিসেবে, খুলনা দলে বন্ধু ও অধিনায়ক হিসেবে এবং শেষ অবধি নির্বাচক হিসেবে মাশরাফির প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি ঘটনা তিনি দেখেছেন। ফলে তার মূল্যায়ন হয়ে উঠেছে মাশরাফির ব্যাপারে সবচেয়ে মূল্যবান।

সাকিব আল হাসান বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার। এই হিসেবেই মাশরাফিকে তার দেখাটা গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া মাশরাফির জীবনের উত্থান-পতনের সময়গুলোতে সাকিব কোনো না কোনো ভূমিকায় জড়িয়েছিলেন সক্রিয় চরিত্র হিসেবেই। কখনো দুজন মুখোমুখি হয়েছেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কাঁধে কাঁধ রেখে লড়েছেন। দুজনের সম্পর্কে একটা রোমাঞ্চকর দ্যোতনা আছে। সেটাই ধরতে চেয়েছি সাকিবের

কণ্ঠে।
স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই, দুজনের কাছেই যা শুনতে চেয়েছিলাম, তার চেয়ে অনেক গুণ ভালো কিছু শুনিয়েছেন তারা।

৪.
ঈদের সময়।
বন্ধুরা সবাই যার যার পরিবারের সঙ্গে ঈদ করতে চান; বছরে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগও তো এ রকম বেশি আসে না। তাই কাউকেই পাওয়া যাচ্ছিল না। এর মধ্যে বন্ধুবর শোয়েব সর্বনাম বললেন, তিনি নড়াইল যাত্রা করতে চান।
ঠিক আছে।
এক শুভ সকালে আমরা দুজন তল্পিতল্পা বেঁধে নড়াইল যাত্রা করলাম। মাশরাফি জানেন, আমরা পরদিন যাব; তিনিও পরদিন আসছেন। আমরা এক দিন আগেই পৌঁছে গেলাম। ভাবলাম, মাশরাফি পৌঁছানোর আগে পরিচয় না দিয়ে একটা দিন নড়াইল শহরে ঘুরে তার ভাবমূর্তি সম্পর্কে একটা ধারণা নেওয়া যাক।
সে উদ্দেশ্য সাধনে একটি হোটেল নামক ঘরে উঠলাম আমরা।
পরদিন ভোরবেলায় মাশরাফির ফোন, 'আপনারা কখন পৌঁছাবেন?'
আমি তো তো করে বললাম, 'এই দুপুরের মধ্যে পৌঁছে যাব। যশোর আছি। এখান থেকে যাব।'
তিনি জানালেন, তার বাবা আমাদের স্বাগত জানাবেন।
আমরা খানিকটা গড়িয়ে নিয়ে স্বাগত পাওয়ার অপেক্ষা না করে, কাউকে ফোন না দিয়ে ক্ল্যাসিক একটা ভ্যান করে মাশরাফিদের বাড়ি চলে গেলাম। ছোট্ট একটা টিনের ছাউনি দেওয়া বাড়ি। বাড়ির সামনে একটা উপন্যাসের মতো বটগাছ। বাড়ির দরজা হাট করে খোলা।
দুটো ভিনদেশি লোক সেই দরজায় ব্যাগ-বোঁচকা নিয়ে উপস্থিত দেখে ভেতরে খবর গেল। আটপৌরে পোশাক পরা একজন মায়াবী চেহারার নারী ছুটে এলেন, 'তোমরা কারা বাবা? ভিতরে আসো।'
দেখুন, তখনো তিনি পরিচয় জানেন না, কোত্থেকে আসছি জানেন না; বলছেন–ভিতরে আসো।
ভেতরে ঢুকে নিজেদের ওজন বাড়াতে একটু পরিচয়টাও বাড়িয়ে বললাম, 'আমি কৌশিকের বন্ধু। আমরা ঢাকা থেকে আসছি।'
সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলা চিৎকার শুরু করলেন, 'ওরে আমার কপাল। তুমি কৌশিকের বন্ধু। ওরে, কে আছিস। তাড়াতাড়ি আয়। বাবার ব্যাগটা ভিতরে রাখ। বাবা তোমরা এদিকে আসো। একটু হাত-মুখ ধুয়ে নাও। বাবা, কিছু খাও। এই খাটে শুয়ে পড়তে পারো। ইস্, মুখটা কালো হয়ে গেছে। পথে খুব কষ্ট হয়েছে?'

আমার মা অনেক দিন হয় চলনশক্তি হারিয়ে বিছানায় পড়ে আছেন।
আগে যখন ঢাকা থেকে মাসে, দুই মাসে বাড়ি ফিরতাম; এমনটা অভ্যেস ছিল। তারপর কতগুলো বছর হয়ে গেল, এই কথাগুলো শুনি না। আমি তখন কীভাবে এই বেয়াড়া চোখের জল সামলাই। এক অচেনা-অজানা ভদ্রমহিলা এক লহমায় আমার মায়ের প্রতিরূপ হয়ে আমাকে শাসন শুরু করলেন, আদর শুরু করলেন; বুড়ো বয়সে স্রষ্টা আমার জন্য নড়াইলে এই মায়াটুকু রেখে দিয়েছিলেন।
এই বইখানা লেখা হোক, আর না-ই হোক, এই বই দুনিয়ার কেউ নাই-বা পড়ুক; বইয়ের কাজ করতে গিয়ে নড়াইলে চার দিনের ভ্রমণে গিয়ে যে প্রাপ্তি আমার হয়েছে, তা চার যুগের সাধনাতেও দুনিয়ার আর কোথাও পেতাম বলে মনে হয় না।
নড়াইল গিয়েছিলাম সাংবাদিক-লেখক সত্তা নিয়ে। ভেবেছিলাম, খুব একটা গবেষক গবেষক ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়াব। কিন্তু চার দিন পর আমি যখন গাড়িতে উঠছি, পেছনে তাকিয়ে দেখি আমাকে বিদায় দিতে একঝাঁক মানুষ চলে এসেছেন। মাশরাফির বন্ধুরা, মাশরাফির পরিবারের প্রত্যেকে হাজির সেখানে। সেই ভিড়ে মাশরাফি বরং একটু পেছনে পড়ে গেছেন। এক লহমার জন্য আমার বিভ্রম তৈরি হয়েছিল, মাশরাফির পরিবারে নয়, চারটি দিন কাটিয়ে এলাম নিজেরই কোন জনমের ভুলে যাওয়া এক পরিবারে।
মাশরাফির মা, আমাদের বলাকা আন্টির ওই ঝড়ের মতো সমাদরে শুরু হয়েছিল আমাদের নড়াইল পর্ব। একটু পর অবশ্য খুব একটা ধমক সহ্য করতে হলো। মিনিট পনেরো যেতে না-যেতে হাজির হয়ে গেলেন মাশরাফির বাবা–গোলাম মুর্তজা; আমাদের স্বপন আঙ্কেল।
তিনি এসে চোখ মোটা করে বললেন, 'আপনারা ঢাকা থেকে এসেছেন?'
'জি।'
'গতকাল রাতে হোটেলে ছিলেন?'
'জি, মানে...'
'হোটেলেই যখন ছিলেন, এখানে এসেছেন কেন! আমি খুব রাগ করেছি! আমার বাড়িটা ছোট। তাই বলে আমার দুজন আত্মীয় এসে হোটেলে থাকবে, এটা কেমন কথা।'
কী একটা যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। স্বপন আঙ্কেল ধমক দিয়ে বললেন, 'কোনো কথা বলবেন না। আপনি কৌশিকের বন্ধু। কৌশিকের বাড়িতে থাকবেন; এখানে যেমন জোগাড় হয়, তেমন থাকবেন-ঘুমাবেন।'
সেই জোগাড়-যন্তরটা কেমন হলো, তাও একটু বলি।
মাশরাফিদের নিজেদের যে বাড়িটা, সেখানে অনেকগুলো রুম; অনেক লোকেরই থাকার ব্যবস্থা। ঈদের ছুটি বলে লোকজন আরও বেশি। তবে এর মধ্যে একটা রুম তার বাবা-মায়ের জন্য একটু আলাদা করে সাজানো। বিকেল গড়াতে জেনে

ফেললাম, কয়েকজন অনাথ শিশুকে নিয়ে এই রুমে স্বপন আঙ্কেল আর বলাকা আন্টি ঘুমান। আন্টি এসে বললেন, 'তোমরা কিন্তু এখানে ঘুমাবে।'

'আপনারা?'

'সে হবে নে। তোমরা কষ্ট করে আসছো, তোমরা এই কটা দিন এখানে ঘুমাবা।'

চাইলে আমরা এমনকি পাশেই মাশরাফির মামার বাসায়, তার কাছাকাছি কোনো একটা রুমে আশ্রয়ও নিতে পারতাম। তার মামা তাই চাচ্ছিলেন। কিন্তু আমরা খানিকটা স্যাডিস্ট। মাশরাফির বাবা-মাকে কষ্ট দিয়ে এই আদর এক সেকেন্ডের জন্যও মিস করতে চাইনি।

আসলে এই দুটো পরিবারই কেমন যেন।

এরা অনাহূত অতিথির জন্য নিজেদের শোবার ঘর ছেড়ে দিতে পারে, রাতদুপুরে কারো চায়ের প্রয়োজন হলে চুলা জ্বালিয়ে ফেলতে পারে, ভাগনের বন্ধুদের জন্য নিজের সব মিটিং-অনুষ্ঠান বাতিল করে আড্ডায় মেতে উঠতে পারে। এরা একটু অন্য রকমের মানুষ।

এই মানুষদের কথা বলতে গিয়ে, মাশরাফির মামার বাসার কথা না বললে পাপ হবে।

মাশরাফি নিজে জন্ম থেকে পাঁচ মিনিট দূরত্বের সেই বাসাতেই থাকেন। আমাদের রাতের আশ্রয় তার বাড়িতে, কিন্তু সন্ধ্যা গড়াতে না-গড়াতে বুঝলাম, দিন-রাতের আড্ডা ওই মামার বাসায়। সেখানে নাহিদ মামা ও কুহু মামি নামে দুজন সদা হাস্যময় মানুষ তৈরি আছেন শত শত মানুষের উৎপাত সহ্য করার জন্য।

সে এক কল্পতরু বৃক্ষ যেন। নাহিদ মামাকে বললেই হলো, এই চাই। দেখবেন, কোত্থেকে এসে হাজির হয়ে গেল ব্যাপারটা। অবশ্য এই কল্পতরুর কাছে বেশি কিছু চাওয়ার সুযোগ পাবেন না। কারণ, তিনিই ক্ষণে ক্ষণে সবাইকে জিজ্ঞেস করছেন, 'এই তোদের আর কিছু লাগবে।'

মনে হতে পারে, আমরা সাংবাদিক বলে, আমরা ঢাকা থেকে গেছি বলে সবার এই বিশেষ সমাদর। প্রথম দিনটায় আমিও এই ভ্রান্তির মধ্যে ছিলাম। পরে দেখলাম, দুটো বাড়িতে আসলে এলাকার সবারই একই একই যত্ন, এই একই প্রবেশাধিকার। এর মধ্যে কে সাংবাদিক, কে উকিল, কে নরসুন্দর–কিছুই কোনো বিবেচ্য নয়। পরিচয় একটাই–কৌশিকের বন্ধু।

মাশরাফির বন্ধুদের নিয়ে এখানে কিছু বলব না।

এটা বলাটা খুব জরুরি যে, মাশরাফির বন্ধুদের কাছ থেকে আমরা যে অভ্যর্থনা পেয়েছি, সেটাও ছিল অকল্পনীয়। বিশাল একঝাঁক মানুষ, শুধু তাদের বন্ধুকে নিয়ে বই হবে জেনে যেভাবে আমাদের বরণ করে নিল, তা এখনো বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। মাশরাফির খোঁজ নেই, আন্টি ভাত বেড়ে বসে আছেন; আমরা রাজু-সাজুদের সঙ্গে রাজা-উজির শিকার করে বেড়াচ্ছি।

কেউ একজন পেয়ারাগাছ থেকে একটা 'ডাসা' পেয়ারা নিয়ে লাফ দিয়ে পড়ছে,

'দাদা, এইটে খেয়ে দেখেন; খুব স্বাদ।'
খুব যে স্বাদ, সে কী আর বলে দিতে হবে!

৫.

মাশরাফির সঙ্গে পরিচয় প্রায় এক যুগের। সে সুবাদে এটা আশা ছিল যে, তার জীবনী লিখতে গিয়ে কিছু সহযোগিতা তার কাছ থেকে পাব। কিন্তু সেটা যে এত আন্তরিক, এত অর্থবহ এবং এত সক্রিয় সহযোগিতা হবে; তা আসলেই কল্পনা করতে পারিনি।

এই বইয়ের জন্য কাউকে কৃতজ্ঞতা জানালে, সেটা অবশ্যই প্রথমে স্বয়ং মাশরাফিকে জানাতে হবে।

প্রায় দুই বছর আগে প্রথম যখন তার জীবনী লেখার প্রস্তাব দিই, খুবই স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, 'ধুর! আমার জীবনী কেন লিখবেন? এটা একটা লেখার বিষয়!'

পরে আরেকটু চাপাচাপি করতে আপত্তির আরেকটা স্তর বেরোল, 'দাদা, জীবনী লিখলে লোকে আমাকে মহান ভেবে বসবে। সেটা যে হতে চাই না।'

পইপই করে কথা দিলাম যে, এই বইটা কোনোভাবেই তার প্রশস্তিতে ভরা থাকবে না, তাকে মহান 'বানানো' হবে না। বরং আমরা খুঁজে পেলে তার দোষ-ত্রুটিটাকেই বেশি সামনে আনব। সে কথা আমি রাখিনি, এই অপবাদ দেবেন না। আমি চেষ্টা করেছি। এখন দোষ-ত্রুটি খুঁজে না পেলে, সে দোষ কি আমার!

যা-ই হোক, বইয়ে মাশরাফির ভূমিকার কথা বলছিলাম।

বলা বাহুল্য, তার সক্রিয় সমর্থন না পেলে এই বই একটি আবর্জনায় পরিণত হতো। সেটা তিনি হতে দেননি। নিজের সম্পর্কে কম বলবেন বলে একটা কথা নিয়ে রেখেছিলেন। এ ছাড়া তার সম্পর্কে তথ্য জানার, গল্প জানার যত উৎস থাকতে পারে, প্রতিটা জায়গায় মাশরাফি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

নড়াইল সফরে নিজে সঙ্গে নিয়ে নিয়ে তার পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে, কোচদের সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছেন। বলেছেন, কারো কিছু বলার থাকলে, কোনো ভুলে যাওয়া ঘটনা থাকলে জানাতে; নিজেই বলে দিয়েছেন, সে ঘটনা তার জন্য নেতিবাচক হলেও জানালে ক্ষতি নেই।

মোটরসাইকেলের পেছনে বসিয়ে বুঝিয়েছেন, কেন তার গতির নেশা এমন মিথ হয়ে আছে এই শহরে। রাতের অন্ধকারে চিত্রা নদীর পাড়ে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়েছেন, কেন তার একান্ত প্রেমিকা হয়ে আছে এই সৌম্য, মিষ্টি নদীটি।

মাশরাফি নিজে একটা বড় উপকার করেছেন, জীবন নিয়ে দীর্ঘ কথোপকথনে একপর্যায়ে রাজি হয়েছেন। অন্তত চারটি পর্বে আমরা রেকর্ডারের সামনে বসে আড্ডা দিয়েছি। প্রবল ব্যস্ততার মধ্যে, কিছু পারিবারিক দুশ্চিন্তার মধ্যে এই যে সময়টা বের করে বসতে পেরেছেন, শুধু এ জন্যই তার কাছে আমার হাজার

বছরের কৃতজ্ঞতা।

মাশরাফির পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে তার পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে। তার বাবা ও মাকে কৃতজ্ঞতা জানানো এই হরফের ভাষা দিয়ে সম্ভব নয়। যেভাবে গভীর রাতে মুখোমুখি বসে আমরা সেই কালের গল্প শুনেছি, তাকে প্রথামাফিক কোনো কৃতজ্ঞতা দিয়ে আটকানো যায় না।

প্রবল কৃতজ্ঞ আমি নাহিদুর রহমান বা নাহিদ মামার প্রতি।

মাশরাফির ছোটবেলা থেকে এই পর্যন্ত সবচেয়ে বড় অভিভাবক, বন্ধু এই মানুষটি আমাদের নানা রকম গল্প শুনিয়েছেন, যত্ন করেছেন; এটুকুই যথেষ্ট ছিল না। এরপর তিনি নিজে আবার অনেক গল্পের উৎস দেখিয়ে দিয়েছেন।

মাশরাফির স্ত্রী সুমনা হক সুমী যে শুধু আমাদের উৎপাত নিয়মিত সহ্য করেছেন, সে জন্য তার কাছে হাত জোড় করে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত। তিনি এর চেয়েও বেশি করেছেন। দারুণ ছোটাছুটির মাঝে কোনোক্রমে ছেলেমেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে মাশরাফির পাশে বসে আমাদের গল্প শুনিয়েছেন, জীবন নিয়ে গল্প করেছেন।

এরপর দুজনের কথা বলতে হবে। তারা হয়তো এখনো এসব কৃতজ্ঞতা-টতার ব্যাপার বুঝতে না। কিন্তু মাশরাফির কন্যা ও পুত্র–পাঁচ বছর বয়সী হুমায়রা ও নয় মাসের সাহেলের ঈদের ছুটিটা অন্তত আমরা যেভাবে নষ্ট করেছি, তাতে তাদের কাছে ভবিষ্যতের জন্য একটু ক্ষমা চেয়ে রাখা উচিত।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই ধারাবাহিকতায় খুবই শক্তভাবে উল্লেখ করা দরকার মাশরাফির বন্ধুদের কথা।

মাশরাফির ছোটবেলা সম্পর্কে, এমনকি বিয়েবেলা সম্পর্কেও, তারা বিচিত্র সব গল্প শুনিয়ে অশেষ উপকার করেছেন। এখানে প্রত্যেকের নাম আলাদা করে উল্লেখ করলাম না। সকলকেই সমান কৃতজ্ঞতা। তার মধ্যেও অসীম, বাবলু, দুই ভাই রাজীব, সজীবদের কথা একটু বিশেষভাবে মনে করতে হচ্ছে। কারণ এদের যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা অসীম।

অবশ্যই আলাদা করে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত মাশরাফির ছোটবেলায় খেলাধুলার অন্যতম অভিভাবক মোহাম্মদ আলীকে। এই চিরায়ত ঘরানার সংগঠক সেই সময়ের বর্ণনা দিয়ে গোটা পরিবেশটা বুঝতে সহায়তা করেছেন।

৬.

বইয়ের জন্য কয়েকজন মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাটা আমার স্রেফ সৌজন্য বিনিময়ের মতো কাগুজে ব্যাপার হয়ে যায়। এই বইটা যতখানি আমার, ততখানি তাদেরও। তাই এই মানুষগুলোর কথা বলে তাদের বিরক্তি তৈরি করাটা অন্যায়।

তারপরও শ্রদ্ধেয় সাইদুজ্জামানের পদস্পর্শ করে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত আমার। অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও কালের কণ্ঠ পত্রিকার এই ক্রীড়া সম্পাদক বইটার জন্য

একটা ভূমিকা লিখে দিয়েছেন; যে কাজে তার চেয়ে যোগ্য লোক আমার খুঁজে পাওয়া কঠিন হতো। কেবল সাংবাদিক হিসেবেই তার প্রতিটি শব্দকে আমার গুরুত্ব সহকারে নেওয়া উচিত। তবে সাইদুজ্জামান শুধু সাংবাদিক নন, তিনি মাশরাফির ঘনিষ্ঠতম মানুষদের একজন।

মাশরাফি অত্যন্ত সাংবাদিকবান্ধব একজন ক্রিকেটার। সে হিসেবে দেশের শীর্ষস্থানীয় ও আমার মতো নিম্নবর্গের সকল সাংবাদিকের সাথেই তার বন্ধুতুল্য সম্পর্ক। তবে সাইদুজ্জামানের ব্যাপারটা ভিন্ন। তিনি মাশরাফির পারিবারিক বন্ধু বা বড় ভাই বললেও কম হয়। অনেক ব্যাপার আছে, যা কখনোই খোলাসা করা যাবে না। মাশরাফি ও সাইদুজ্জামানের সম্পর্কটা যেন তেমনই!

বন্ধুতুল্য সহকর্মী নোমান মোহাম্মদ, আরিফুল ইসলাম রনি, জান-এ আলম এবং কাওসার মুজিব অপূর্বর পদস্পর্শ করে কৃতজ্ঞতা জানাতে গেলে প্রহরিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তারা এসব নাম উল্লেখের ধার কখনোই ধারেন না। দেবব্রত কিছু একটা করছে, ফলে তাদের পাশে থাকতে হবে–এমন একটা নিয়ম আছে যেন। সেই নিয়মের দড়িতে বাঁধা পড়ে এই কয়েকজন বন্ধু আমার বইটাকে আরও একবার ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ নামগুলো বলতে গিয়ে আমার এই শ্রমসাধ্য কাজে যারা নীরবে সহায়তা করেছেন, সত্যিই ঘাম ঝরিয়েছেন, তাদের কথা ভুলে গেলে ওপরে গেলেও ক্ষমা মিলবে না।

প্রথমেই বলতে হবে শোয়েব সর্বনামের কথা। আমার এই সহকর্মী-বন্ধু নিজের সব কাজকর্ম ফেলে আমার সঙ্গে নড়াইল ছুটেছেন, পরিশ্রম করেছেন। এরপরও বই নিয়ে, বইয়ের নাম নিয়ে, বইয়ের প্রচ্ছদ নিয়ে সময়ে সময়ে দারুণভাবে সহায়তা করেছেন।

নড়াইল-যাত্রায় এবং পরেও দারুণভাবে পাশে থেকেছে অনুজপ্রতিম অনুপম হোসেন পূর্ণম। সে শুধু সঙ্গে থাকেনি, রীতিমতো চিত্রগ্রাহক হয়ে উঠে এগিয়ে দিয়েছে কাজ। বই লেখার কাজ যখন পুরোদমে চলছে, তখন আমার খুব দরকার ছিল বিভিন্ন তথ্য, পরিসংখ্যান ও হঠাৎ করে হারিয়ে যাওয়া পত্রিকার কপি সংগ্রহ করা। এই কাজগুলো করতে আক্ষরিক অর্থেই রাত জেগেছে সামিউল ইসলাম

শোভন ও বিশিষ্ট মাশরাফি-ভক্ত মেহেরিনা কামাল মুন।

আর প্রথম থেকে দিনের পর দিন লাইব্রেরিতে পড়ে থেকে আর্কাইভ থেকে নানা তথ্য উদ্ধার করে দিয়েছে মাসুম।

এদের কি মুখের কৃতজ্ঞতা জানানোর কাজ!

প্রবল ব্যস্ততার মধ্যে আমাকে মাশরাফির সম্পর্কে কিছু কিছু ঘটনা শুনিয়ে এই বইটাকে সমৃদ্ধ করেছেন ক্রীড়া সংগঠক ও মাঠ সংরক্ষক, মাশরাফির অতি ঘনিষ্ঠজন জাহিদ রেজা বাবু। কৃতজ্ঞ করেছেন বাংলাদেশের অতি শ্রদ্ধেয় ক্রীড়া সংগঠক মাহবুব আনাম, সাবেক ফাস্ট বোলার ও বর্তমান প্রখ্যাত কোচ দীপু রায়

চৌধুরী এবং সাবেক অধিনায়ক, ক্রীড়া সাংবাদিক ও ম্যাচ রেফারি রকিবুল হাসান, ঢাকার ক্লাব ক্রিকেটের সংগঠক রাকিব হায়দার পাভেল। মাশরাফির ইনজুরি ও তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিভিন্ন দিক বুঝিয়েছেন বিসিবির প্রধান চিকিৎসক দেবাশিস চৌধুরী।

কৃতজ্ঞতার শেষ নেই অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী বাঙালি ব্যবসায়ী আবদুল একরাম বাবুর কাছে। মাশরাফির প্রতিটা অপারেশনে যেমন উদার হস্তে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন, তেমনই সেই মেলবোর্ন থেকে তথ্য দিয়ে, গল্প বলে এগিয়ে দিয়েছেন বই লেখার কাজ।

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে মাশরাফির নিত্যদিনকার বন্ধু ও সার্বক্ষণিক সঙ্গী মোহাম্মদ কাশিফ বাবলু লম্বা সময় ধরে তাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও মাশরাফির ঢাকার জীবন বোঝাতে সহায়তা করেছেন।

মাশরাফির ঘনিষ্ঠতম দুই বন্ধু সৈয়দ রাসেল ও আবদুর রাজ্জাকের কাছে কৃতজ্ঞ; তারা বন্ধুকে বুঝতে সহায়তা করেছেন। মাশরাফির প্রথম অধিনায়ক ও বন্ধু নাফীস ইকবাল, দীর্ঘদিনের বন্ধু তালহা জুবায়ের ভয়ানক ব্যস্ততার মধ্যেও ফোনে সময় দিয়েছেন।

এভাবে নাম ধরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ঋণ শোধ করার নয়।

বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্রীড়া সাংবাদিকদের কাছে আমার ঋণ অসীম। মিরপুর শেরেবাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের প্রেসবক্সের সব সাংবাদিকের নামই আসলে আলাদা করে বলা উচিত। যখন যে যেভাবে পেরেছেন সহায়তা করেছেন, তথ্য দিয়েছেন, ফোন করে খবর নিয়েছেন কাজ কেমন চলছে। সবচেয়ে বড় কথা, কেউ মনে করেননি যে কাজটা তাদের নয়।

বিভিন্ন দৈনিকের অসংখ্য লেখা থেকে আমি সহায়তা নিয়েছি। যাদের প্রতিবেদন নিয়েছি, যেসব পত্রিকা থেকে নিয়েছি; সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা রইল।

৭.

সবশেষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোকদের কথা।

আমার স্ত্রী ও পুত্র।

আমার এই বইটি করার যে দীর্ঘ প্রক্রিয়া তা আসলে আমার পরিবারের জন্য এক অনন্ত যন্ত্রণার নাম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সংসারী লোকমাত্রই জানেন, চাকরি সামলে বাসায় ফিরে পরিবারকে সময় না দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লিখতে থাকাটা পরিবারের জন্য কী যন্ত্রণার।

আমার স্ত্রী সেই যন্ত্রণা সহ্য করেছে। বাসায় গৃহস্থালি কাজ করিনি, সংসারে অশান্তি তৈরি করেছি; তারপরও সে অসীম ধৈর্য নিয়ে সহ্য করেছে। বিশেষ করে আমার পুত্র শুদ্ধর জন্য এটা একটা ভয়ানক ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। দিনশেষে বাবাকে যে অল্প সময়ের জন্য তার পাওয়ার কথা, সেই সময়টা বাবা দরজা আটকে খট খট

শব্দ করে। সে বাইরে থেকে চিৎকার করে কাঁদে, আমি লেখার চেষ্টা করি।
একটা পর্যায়ে পুরো ব্যাপারটা সীমার বাইরে চলে গেল। আমি অসুস্থ আচরণ শুরু করলাম। শত শত পেপার কাটিং সামনে নিয়ে তালগোল হারিয়ে বাসায় অসংলগ্ন আচরণ করি, স্ত্রী-পুত্রের কাছে হঠাৎ অচেনা এক মানুষ হয়ে উঠলাম। এই সময় আমার স্ত্রীই বুদ্ধিটা বের করল।
লম্বা ছুটি নিয়ে ল্যাপটপ কাঁধে করে আমরা বাগেরহাট চলে গেলাম।
সেখানে গিয়ে উঠলাম শ্বশুরালয়ে। স্ত্রী-পুত্র অন্তত এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেল। তারা ঘুরে বেড়ায় আর আমি লিখি। আমার শ্বশুরালয়ের প্রত্যেকেই এই সময়কালে ভেবেছে তাদের জামাতা বুঝি এবার উন্মাদ হয়ে গেছে। একই চেয়ার-টেবিলে বসে খায়, লেখে আর মাঝে মাঝে একটু ঘুমায়।
তাদেরও এই সুযোগে কৃতজ্ঞতা জানানো যাক লম্বা সময় ধরে এই অত্যাচার সহ্য করার জন্য।

৮.
এই পর্যায়ে এসে আমার উচিত প্রকাশকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কিন্তু কে এই বইয়ের প্রকাশক?
কাগজে-কলমে সেই দায়িত্বটা পালন করেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট সাপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন বা বিসিএসএ। কিন্তু এই কাগজ-কলমের প্রকাশনার বাইরে যে এক অসামান্য গল্প রচিত হয়েছে, সে কথা কে জানে!
বিসিএসএ কী? বিসিএসএ কারা?
সর্বশেষ কলম্বো টেস্টের ঘটনা।
সারা বিশ্বের চোখ আটকে ছিল শ্রীলঙ্কার এই বন্দর নগরীতে; এখানেই শেষ টেস্ট খেলছেন আধুনিক কিংবদন্তি কুমার সাঙ্গাকারা। হঠাৎ চোখে পড়ল গ্যালারির একটা ব্যানার : বাংলাদেশের ক্রিকেট-ভক্তদের পক্ষ থেকে বিদায়ী শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে সাঙ্গাকারাকে।
কারা করল এই কাজ?
বাংলাদেশ ক্রিকেট সাপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিসিএসএ)।
২০১৩ সালে যাত্রা শুরু করা বাংলাদেশি সমর্থকদের এই সংগঠন ইতিমধ্যে সারা ক্রিকেট-দুনিয়াতেই ছড়িয়ে পড়েছে। দুই বছরের পথচলায় বাংলাদেশের ক্রিকেট নিয়ে উল্লেখযোগ্য সব কাজ করেছে এই সংগঠনটি। ক্রিকেট নিয়ে সেমিনার, আলোচনা সভা, প্রদর্শনী, সাবেক ক্রিকেটার, কোচদের সম্মাননা প্রদানের মতো কাজ করছে তারা। ক্রিকেটে বর্ণবাদ ও দুর্নীতিবিরোধী প্রচারণা চালায় সংগঠনটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ চলাকালে। বাংলাদেশ জাতীয় দলের পাশাপাশি বয়সভিত্তিক দল ও নারী দলের খেলার পাশেও এই সংগঠনের সরব উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো।
বিসিএসএ-এর সাথে আমার সম্পর্কটা সব সময়ই রোমান্টিক জুটির মতো।

বছর দুই আগে বিসিএসএ যখন যাত্রা শুরু করে, আমার খুব ঈর্ষা ছিল–আমি কেন এই সংগঠনে নেই! খুব ঘরকুনো মানুষ বলে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সংগঠনের সদস্য হওয়া হয়নি এখনো। তবে মনে মনে নিজেকে আমি তাদের একজন বলেই মনে করি। মাঝে মাঝে ফোন করে সংগঠনের প্রাণপুরুষ জুনাইদ পাইকারকে নানা রকম উদ্ভট পরামর্শ দিয়ে, নানান ক্রিকেট-বিষয়ক আলাপ করি। যেন আমাদেরই সংগঠন এই বিসিএসএ।

মাশরাফির জীবনীগ্রন্থটা নিয়ে যখন কাজ করছি, তখন আমাকে হঠাৎ হঠাৎ হতাশা ঘিরে ধরত। আমাকে এই একজন মানুষ ফোনে, ফেসবুকের ইনবক্সে টোকা দিয়ে দিয়ে চেষ্টা করেছেন বাঁচিয়ে রাখতে, চেষ্টা করেছেন বইটা যাতে লেখা বন্ধ না হয়, সেই ব্যবস্থা করতে।

সবশেষে আমি একবার ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম, বই লিখে আমার যে কিছুই অর্থলাভ হয় না, সে নিয়ে। হতাশাও ছিল।

সেই স্ট্যাটাসের ফল ছিল জুনাইদ পাইকারের ফোন, ‘আমি তো পাবলিশার নই। হলে দেখিয়ে দিতাম, আপনার বই কত মানুষের হাতে পৌঁছায়।’

নিয়তির কী খেল!

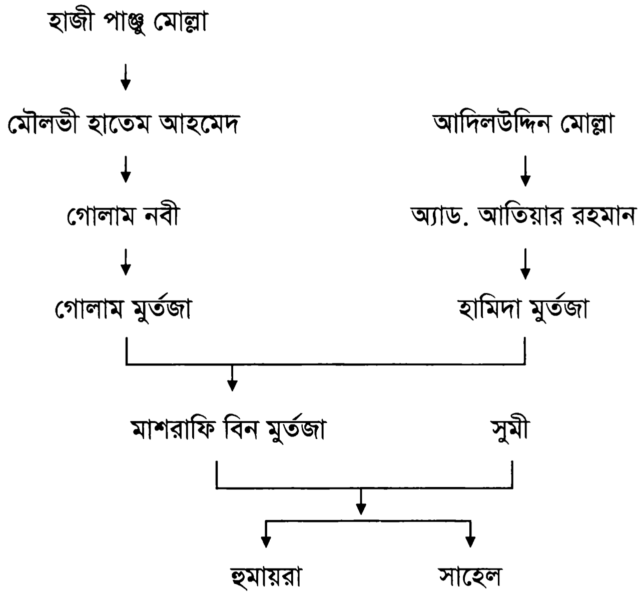
কয়েক মাস পর সেই জুনাইদ পাইকার আমার পাণ্ডুলিপি বগলদাবা করে ছুটছেন, চোখ তার রোমাঞ্চে রঙিন–তিনি আমাকে উদ্ধার করবেন, মাশরাফির নাম বাঁধিয়ে রাখবেন!

বিসিএসএর প্রসঙ্গে আরও দুটো মানুষের কথা বলতে হয়। এই সংগঠনের যোগাযোগ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রনি। যে আবার আমার পূর্বোক্ত বন্ধু হওয়ায় নিজে বরের ঘরের মাসি, কনের ঘরের পিসি হিসেবে ছোটাছুটি করেছে। আরেকজন মানুষ হলেন মাছরাঙা টেলিভিশনের জনপ্রিয় ক্রীড়া সাংবাদিক ও বিসিএসএর সহসভাপতি জাহিদ চৌধুরী।

জাহিদ ভাই বিভিন্ন সময় আমার সাথে এই বই নিয়ে আলোচনা করেছেন, শিরোনাম নিয়ে ভিন্নমত দিয়েছেন। তিনি যখন বিসিএসএ ও মাশরাফির বইয়ের সম্ভাবনাটা উপলব্ধি করলেন, আমাকে ফোন দিয়ে বললেন, ‘দেবু, অনেক টেনশন নিয়েছেন জীবনে। এবার চুপ করে বসে পরের বইয়ের কথা ভাবেন। আর এই বই নিয়ে কী কী স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা আমাকে মেইল করেন। আপনি লেখক, আপনার কাজ টেনশন করা না। আপনার স্বপ্ন সত্যি করার জন্য আমরা কয়েক শ মানুষ সাথে আছি।’

আমি ইদানীং কাঁদতেও ভুলে গেছি!

বংশলতিকা


হাজী পাঞ্জু মোল্লা
মৌলভী হাতেম আহমেদ
আদিলউদ্দিন মোল্লা
গোলাম নবী
অ্যাড. আতিয়ার রহমান
গোলাম মুর্তজা
হামিদা মুর্তজা
মাশরাফি বিন মুর্তজা
সুমী
হুমায়রা
সাহেল

ভুলে যাওয়া স্মৃতি, বিস্মৃত অক্ষর



১.

কেবল সন্ধ্যা মিলিয়েছে তখন।

বাড়ির সামনের রাস্তায় কোলাহল একটু কমে এসেছে, বৃষ্টিও একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। একটু দূরে মাঠের ভেতর জমে ওঠা বৃষ্টিও পানিতে ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে। দূরে কোথাও এক কিশোরী হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান ধরেছে–বরিষ ধরা-মাঝে...।

মুখোমুখি বসে আছি আমরা দুজন; আমি আর গোলাম মুর্তজা স্বপন।

নানা রকম স্মৃতিচারণা–কখনো নিজের গল্প, কখনো ছেলের গল্পে কেটে যাচ্ছে এক একটা পল। হঠাৎ দরজা ঠেলে ঢুকলেন হামিদা মুর্তজা বলাকা।

হামিদা মুর্তজার অবশ্য বসে গল্প করার মতো সময় তখন একটুও নেই। ছেলে মাশরাফি বিন মুর্তজা আসছে আজ রাতে। বউমা আর দুই নাতিকে নিয়ে আসছে। তিনি ছেলে-বউ-নাতিদের বরণ করার জোগাড়যন্ত্র নিয়ে মহাব্যস্ত। এখানে কাউকে বাজার করতে পাঠিয়েছেন, ওখানে কাউকে পাঠাচ্ছেন।

এর মধ্যে ছেলের বন্ধুরা, আত্মীয়স্বজনের ভিড় জমে গেছে বাড়িতে। তাদের

আপ্যায়নের বিষয়টাও দেখতে হচ্ছে। এমন সময়ে বসে গল্প করার সময় কই! তারপরও তিনি থমকে গেলেন। জোর পায়ে ঢুকে প্রশ্নটা শুনেই চলাটা ধীর হয়ে গেল হামিদা মুর্তজার। প্রশ্ন করেছিলাম, 'আপনাদের কী প্রেম করে বিয়ে?'
গোলাম মুর্তজা স্বপন খানিকটা আপত্তি করার চেষ্টা করছেন। মুখের লাজুক হাসিটা অবশ্য কিছুতেই লুকাতে পারছেন না। হামিদা মুর্তজাও 'না, না' বলে আপত্তি করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মুখের কথার চেয়ে চোখের হাসিটা অনেক প্রকট হয়ে উঠল। দিব্যি বোঝা গেল, কোনো এক গোপন বাক্সে হাত দিয়ে ফেলেছি আমরা।
তারা দুজন চোখে চোখ রেখে হাসছেন, আমরা এক স্বর্গীয় দৃশ্য দেখছি।
নীরবতা ভেঙে বলে উঠতে হলো, 'আপনাদের প্রেমের গল্পটা একটু শুনি।'
আরও লজ্জা, আরও লাল হয়ে গেল দুজন মানুষের মুখ। একটু সামলে উঠে স্বপন বললেন, 'আমাদের তো কত গল্প! কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি।'
তাহলে গল্পই হোক। এমন বর্ষার রাত, এমন কদম ফুলের দিন, এমন প্রেমের যুগে বসে গল্প ছাড়া আর কী চলতে পারে?
গল্পের এই দিনে হারিয়ে গেল সব ব্যস্ততা, সব ধরাবাঁধা রুটিন; হারিয়ে গেল সব পরিকল্পনা। রাত জেগে চা-মুড়ি আর গল্প চলল। প্রেমের গল্প, লড়াইয়ের গল্প, ঝগড়ার গল্প, ভালোবাসার গল্প এবং মাশরাফি বিন মুর্তজার গল্প।
ওহ হো, ভুল বলেছি–কৌশিকের পূর্বপুরুষের গল্প।

২.
গল্পটার শুরু করা যেতে পারে হাজী পাঞ্জু মোল্লাকে দিয়ে।
ব্রিটিশ আমলের প্রথমভাগের কথা। যশোর জেলার নড়াইল মহকুমা সদরেরই মানুষ হাজী পাঞ্জু মোল্লা। সেই আমলে সৌদি আরবে গিয়ে হজ করে আসাটা ছেলেখেলা ছিল না।
আজকের মতো ঢাকা থেকে বিমান চেপে চলে যাওয়ার মতো মুখের কথা ছিল না। নড়াইল থেকে হেঁটে যশোর। সেখান থেকে ট্রেনে চেপে কলকাতা। তারপর ট্রেনে করেই বোম্বে। আর সেই বোম্বে থেকে কয়েক মাসের জাহাজযাত্রায় সৌদি আরব। সে কালের এই দারুণ কষ্ট করে হজ সম্পন্ন করে আসা মানুষ হিসেবে পাঞ্জু মোল্লার একটা বিশেষ সমাদর ছিল চারঘাট গ্রামে। অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ এবং হাজী মানুষ; দুইয়ে মিলে পাঞ্জু মোল্লা একজন বিশিষ্ট মোড়ল ছিলেন বলা যায় গ্রামের।
পাঞ্জু মোল্লার ছেলে মৌলভী হাতেম আহমেদ এদিক থেকে বাবাকেও ছাড়িয়ে গেলেন। তিনি একেবারে আটঘাট বেঁধে এলাকার রাজনীতিতে নেমে পড়লেন। ঠিক ইচ্ছে করে রাজনীতিতে নেমেছিলেন, তা নয়। আসলে লোকজন ধরে এলাকার মাতবর বানিয়ে দিল।
ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন করলেন মৌলভী হাতেম। তার বিপক্ষে পায়ের তলে মাটি শক্ত করে দাঁড়ানোর মতো মানুষও ছিল না। একেবারে ভূমিধস বিজয় পেলেন নির্বাচনে। হয়ে গেলেন ইউনিয়ন পরিষদের সভাপতি।
হাতেম মৌলভীর ছেলে গোলাম নবী।

মৌলভীর নামে তখন চারঘাটের নদীতে বাঘ আর গরু নাকি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পানি খায়। এমন দাপুটে মৌলভী ঠিক করলেন ছেলেটাকে উচ্চশিক্ষিত করতে হবে। ছেলে গোলাম নবীও ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী মানুষ। দারুণ কৃতিত্বের সঙ্গে পড়াশোনা শেষ করে বড় চাকরিও পেয়ে গেলেন।

শুল্ক বিভাগের কমিশনার হিসেবে চাকরি শুরু করলেন। প্রথম পোস্টিং হলো রংপুরে। কিছুকালের মধ্যে সুন্দরী এক পাত্রী দেখে ছেলে গোলাম নবীর বিয়েও দিয়ে দিলেন হাতেম মৌলভী। নড়াইল জেলা শহর থেকে সামান্য দূরের লাহুরিয়া গ্রামের এক অভিজাত পরিবারের মেয়ে সৈয়দ রোকেয়া সুলতানাকে ছেলের বউ করে আনলেন হাতেম মৌলভী। নববিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে গোলাম নবী বদলি হয়ে চলে গেলেন ভোলায়।

সুখের সংসারে পরপর তিনটি মেয়ে এল গোলাম নবী ও রোকেয়া সুলতানার কোলজুড়ে। শাহানা, ইরু ও রানুকে নিয়ে রীতিমতো স্বর্গের পরিবেশ। এরপর জন্ম পরিবারের বড় ছেলের।

ভোলার দৌলতখানে ভাড়া বাসায় সাজানো সংসারে দুজনের কোলজুড়ে এল ছেলে গোলাম মুর্তজা স্বপন। এরপর আরও দুটি ছেলের বাবা হলেন গোলাম নবী–ফরহাদুল ইসলাম তপন ও সালাউদ্দিন রেজা।

তিন মেয়ে আর তিন ছেলে নিয়ে দারুণ সুখের সংসার। বেশ চলছিল জীবন।

বদলির চাকরি। রোমান্টিসিজমে ভরা জীবন। আজ এখানে, কাল ওখানে ঘুরে বেড়ান স্ত্রী ও দুই পুত্র নিয়ে। স্বপ্ন দেখেন নানা রকম–ছেলেদের বড় করবেন, বাড়িতে বিষয়-আশয় করবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, নিয়তি টেনে নিয়ে যায় আরেক দিকে।

এই সুখ সইল না।

গোলাম নবীর চাকরি তখন আবার রংপুরে। তখনই অসহ্য মাথাব্যথা নিয়ে একদিন গেলেন ডাক্তার দেখাতে। ভেবেছিলেন হয়তো দিনরাত পরিশ্রম করার ফলে এই ব্যথা; অল্প কিছু ওষুধ দিলে সেরে যাবে। কিন্তু ঢাকা থেকে ঢের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়ে এনে ডাক্তার ঘোষণা করলেন–গোলাম নবীর মাথায় এক টিউমার।

সে শুধু টিউমার নয়; ঘাতক টিউমার।

রোগটা ধরা পড়তে পড়তে বড় দেরি হয়ে গেছে। টিউমার থেকে দুষ্ট ক্ষত ছড়িয়ে পড়েছে পুরো মাথা এবং শরীরের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে। তখনকার দিনে অন্তত এই রোগের তেমন কোনো চিকিৎসা করা কঠিন ছিল।

কটা দিন শান্তিতে রাখার জন্য এলাকায় নিয়ে আসা হলো নড়াইলে। কিন্তু গ্রামের বাড়িতেও বেশি দিন থাকা হলো না গোলাম নবীর। বাড়িতে আসার কয়েকটা দিন পরই ডাক এল। বিশাল সংসার রেখে, একঝাঁক মানুষকে হতবিহ্বল ও অসহায় করে দিয়ে চলে গেলেন গোলাম নবী।

গোলাম মুর্তজা স্বপনের বয়স তখন ৯ কি ১০।

৩.

নড়াইল শহরের প্রতিটা রাস্তা, প্রতিটা চায়ের দোকান, প্রতিটা মাঠে গোলাম মুর্তজা

স্বপনের গল্প ছড়িয়ে আছে।

রূপগঞ্জ বাজারের চায়ের দোকানে বসে পানি উন্নয়ন অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা বলছিলেন, 'স্বপন ভাই! স্বপন ভাই ছিল আমাদের হিরো। ফুটবল খেলা হলে স্বপন ভাই সেরা স্ট্রাইকার, খ্যাপ খেলতে হলে স্বপন ভাই আমাদের ভরসা। আবার জেলা, বিভাগ, এমনকি ঢাকায় গিয়েও স্বপন ভাই অ্যাথলেটিকসের মেডেল নিয়ে আসত। স্বপন ভাইয়ের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল–দারুণ গানের গলা।'

এই পর্যন্ত এক নিঃশ্বাসে বলে বসলেন, 'এখনো অনুরোধ করে দেখবেন, কী মিষ্টি গান করে।'

তা ঘটনা সত্যি। মিষ্টি গানে গোলাম মুর্তজা স্বপনের জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু এই মানুষটার কৈশোর মোটেও এত মিষ্টি ছিল না।

মাত্রই কৈশোরে পা দিয়েই বাবাকে হারিয়েছিলেন স্বপন।

মাথার ওপর তিনটি বড় বোন, আর কোলের কাছে দুটো ছোট ভাই। এই নিয়ে স্বপনের পথচলা শুরু। দাদা হাতেম মৌলভীও তত দিনে প্রয়াত হয়েছেন। ফলে ছয় সন্তান নিয়ে মা রোকেয়ার এক অসামান্য সংগ্রামের সময় ছিল সেটা।

এখানে মাশরাফির দাদি, মানে স্বপনের মায়ের বীরত্বটা চোখে পড়ার মতো।

সন্তানদের হয়তো বিলাস-ব্যসনে রাখতে পারেনি। ঈদে সব সময় নতুন জামাকাপড় জোগাড় করে দিতে পারেননি। হয়তো নতুন নতুন খাবার দিয়ে পেট ভরাতে পারেনি ছয় সন্তানের। কিন্তু মানুষের মতো মানুষ করে তুলতে কোনো কসুর ছিল না এই সংগ্রামী নারীর।

প্রতিটা ছেলে-মেয়েকে পড়ালেখা করিয়েছেন, উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সর্বস্ব বিক্রি করে। আর মেয়ে তিনটিকেই পড়ালেখা করিয়ে ভালো পাত্র দেখে তবে বিয়ে দিয়েছেন। পোশাকে, খাবারে আপস করেও জীবন ও শিক্ষা নিয়ে এতটুকু আপস করতে দেননি তিনি।

সে কারণেই খেলার পাগল হয়েও পড়াশোনাতে এতটুকু ফাঁকি দেওয়ার উপায় ছিল না স্বপনেরও।

বাড়ির সামনেরই বয়েজ স্কুল থেকে বেরিয়ে নড়াইলের ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়াশোনা চলেছে। পড়াশোনা অবশ্য চলার জন্যই চলেছে। আসলে চলেছে স্বপনের খেলাধুলা, গান, রাজনীতি ও অনুষ্ঠান।

রাজনীতি করতেন; ছাত্ররাজনীতি। দেশের উত্তাল সময়টাতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের হয়ে নড়াইল শহর কাঁপিয়ে বেড়িয়েছেন। টুকটাক দাপটও দেখাননি, তা নয়। ১৯৮০ সালে ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগের প্যানেল থেকে সাংস্কৃতিক সম্পাদকও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সাংস্কৃতিক সম্পাদকই তার হওয়ার কথা। কারণ, স্বপন মানেই তো গান আর খেলা।

গানের স্বপনের গল্প নড়াইলের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। কলেজের নবীনবরণ উৎসব কিংবা সন্ধ্যার পরের জলসা; সবখানেই স্বপনের গান ছিল অপরিহার্য। এখনো তার

বন্ধুরা দিব্যি মনে করতে পারেন 'কফি হাউজের সেই আড্ডা'র সুর আর গল্প। গানটা ছিল নিতান্তই বিনোদন। মন ছিল আসলে খেলার মাঠে।
ফুটবলার হিসেবে এলাকায় বেশ নামকরা স্ট্রাইকার ছিলেন গোলাম মুর্তজা স্বপন। হায়ারে খেলতে যেতেন দূর দূর জেলায়। নিজেরও স্বপ্ন ছিল জাতীয় পর্যায়ে খেলবেন। সেই স্বপ্ন বুকে নিয়ে ঢাকায়ও এসেছিলেন। যোগাযোগ করেছিলেন, তখনকার আবাহনী ও জাতীয় দলের সুপারস্টার ইউসুফের সঙ্গে। মোটামুটি একটা কথাও হয়েছিল যে, ডিফেন্ডার ইউসুফ স্বপনকে কোনো একটা দলে যোগাযোগ করিয়ে দেবেন।
কিন্তু সেই নিয়তি!
নড়াইলে একটা ম্যাচ খেলতে গিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন ডান পায়ের লিগামেন্ট। শেষ হয়ে গেল স্বপনের ফুটবল ক্যারিয়ার। 'লিগামেন্ট' শব্দটা শুনে কিছু মনে পড়ছে? হ্যাঁ, এই লিগামেন্ট শব্দটা মুর্তজা পরিবারের পরের কয়েকটা দশক সবচেয়ে আতঙ্কের শব্দে পরিণত হয়েছে।
এই লিগামেন্ট ছিঁড়ে ফুটবল বাদ দেওয়ার আগেই অবশ্য ঢাকায় এসে খেলাধুলার পতাকা উড়িয়ে গেছেন গোলাম মুর্তজা স্বপন। আজ অনেকে শুনলে অবাক হবেন, এই স্বপন, মানে এই মাশরাফির বাবা একসময় দেশসেরা হাইজাম্পারদের একজন ছিলেন!
অ্যাথলেটিকসে ট্র্যাক ও ফিল্ড- দুই ধরনের ইভেন্টেই অংশ নিতেন। এলাকায় ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার স্প্রিন্টে শ্রেষ্ঠত্ব তার ধরাবাঁধাই ছিল। তবে জাতীয় পর্যায়ে অংশ নিয়েছেন শুধু উচ্চলাফে।
তখনকার বাংলাদেশের সেরা দল বিজেএমসির হয়ে জাতীয় অ্যাথলেটিকসে অংশ নিয়েছিলেন ১৯৮০ সালে। যারা বিজেএমসি ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন না, তাদের জন্য বলি, এটা তখন বাংলাদেশের খেলাধুলায় বার্সেলোনা বা রিয়াল মাদ্রিদের মতো ব্যাপার ছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের সেরা সব অ্যাথলেটকে নিয়ে দল করত। বলা হয়, বাংলাদেশের খেলাধুলা থেকে এই দলটির অবলুপ্তিই দেশের অন্যান্য খেলাকে কার্যত শেষ করে দিয়েছে।
সেই বিজেএমসির হয়ে সেবার জেলা ও বিভাগীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে এসেছিলেন স্বপন। বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে বসেছিলেন জাতীয় অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপের আসর।
স্বপন তার জীবনের সেরা লাফটা কি দিতে পেরেছিলেন?
বলা মুশকিল; খুব মুশকিল। কারণ, স্বপনের সেই লাফের চেয়ে মাত্র একটা সেন্টিমিটার ওপরে উঠে গেলেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এক অ্যাথলেট। ফলাফলটা দেখে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের মাটিতে মুখ চেপে ধরেছিলেন সেদিন গোলাম মুর্তজা স্বপন।
প্রকৃতির রহস্য করার বড় স্বভাব।
সেই লাফের বিশ বছর পর আবার একটা লাফ দিয়েছিলেন স্বপন। সেই বঙ্গবন্ধু

স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে বসে। কারণ, সেদিন জীবনে প্রথমবারের মতো অ্যাথলেট স্বপনের ছেলে কৌশিক টেস্ট জার্সি পরে ছুটতে শুরু করেছিলেন বল হাতে। দুর্বার ডেলিভারিটায় বধ হয়ে ফিরে আসছিলেন গ্র্যান্ট ফ্লাওয়ার।
লাফ দিয়ে উঠেছিলেন স্বপন; এবার নিশ্চয়ই উচ্চলাফের শ্রেষ্ঠত্ব তারই ছিল!

৪.

চারখাদা ও নড়াইল; নড়াইল জেলারই দুটো জায়গা।
দুটো জায়গার মধ্যে দূরত্ব ৫-৬ কিলোমিটার। এই দূরত্বটাই আমাদের এই গল্পে এবার ঘুচে যাবে। এই গল্প আদিলউদ্দিন মোল্লার গল্প; এই গল্প একজন 'বেলা ম্যাডামের' গল্প।
বেশি রহস্য না করে আগেই বলে রাখা যাক–বেলা ম্যাডাম, মানে খালেদা রহমান বেলা হলেন মাশরাফি বিন মুর্তজার নানি। মাশরাফির জীবনকে বলা যায় তার নানির আশীর্বাদ, মাশরাফির জীবন-দর্শনকে বলা যায় তার নানির উপদেশমালা।
বেলা ম্যাডামের দাদার নাম আদিলউদ্দিন মোল্লা।
নড়াইলের সম্ভ্রান্ত এক ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবী মানুষ ছিলেন এই আদিলউদ্দিন মোল্লা। ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতি বা খেলাধুলার মতো কোনো কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না কখনো। এই সম্পর্কটা তৈরি হয়েছিল আদিলউদ্দিন মোল্লার পুত্র অ্যাডভোকেট আতিয়ার রহমানের মারফতে।
অ্যাডভোকেট আতিয়ার রহমান; সেকালের নড়াইলের সম্ভবত সবচেয়ে নামজাদা রাজনীতিবিদ ও বিদ্যোৎসাহী মানুষ। আদিল সাহেবের এই ছেলেটি ছোটবেলা থেকে এলাকায় সুনাম কুড়িয়েছিল দারুণ পড়ুয়া হিসেবে। নড়াইলে স্কুলজীবন শেষ করে আরও ভালো পড়াশোনার নেশায় আতিয়ার রহমান পাড়ি জমান খুলনায়।
খুলনার নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিএল কলেজে উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হন। আর এই বিএল কলেজই আসলে ঘুরিয়ে দেয় আতিয়ার রহমানের জীবন। এখানেই তিনি পরিচিত হন বাম রাজনীতির প্রতি, পরিচিত হন মওলানা ভাসানীর রাজনীতি ও দর্শনের সঙ্গে।
বিএল কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক শেষ করে আতিয়ার রহমান চলে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথমে অর্থনীতিতে, এরপর আইনে পরপর দুটি স্নাতক ডিগ্রি গ্রহণ করেন। মেধাবী ছাত্র আতিয়ার রহমান পড়াশোনার পাশাপাশি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) রাজনীতির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন।
দলটির নিয়মিত কর্মী হিসেবে একের পর এক আন্দোলন-সংগ্রামে অংশ নিতে থাকেন। মনে মনে হয়তো পরিকল্পনা করেছিলেন, ঢাকাতেই আইন অনুশীলন করে উজ্জ্বল একটা ক্যারিয়ার গড়বেন। কিন্তু রাজনীতির টানেই মন বদলাতে হলো।
আতিয়ার রহমান চললেন নড়াইলে।
নড়াইল জেলা আদালতে অনুশীলন শুরু করলেন অ্যাডভোকেট আতিয়ার রহমান। তার চেয়ে বেশি করে শুরু করলেন সক্রিয় রাজনীতি। জেলার রাজনীতিতে তখন আতিয়ার রহমানের দারুণ প্রভাব। ঢাকা থেকে স্বয়ং মওলানা ভাসানী থেকে শুরু

করে গুরুত্বপূর্ণ সব নেতা আসেন।
আতিয়ার রহমানের বাড়িটা হয়ে ওঠে নড়াইলের রাজনীতির এক কেন্দ্র।
এই বাড়ির সকল দুয়ার খোলা। প্রতি বেলায় অগুনতি লোকের রান্না হচ্ছে হাঁড়িতে, সব সময় চুলায় ফুটছে চায়ের জল এবং রাতে তিনতলা বাড়িজুড়ে সরাইখানার মতো করে সারি সারি লোকের নিদ্রার ব্যবস্থা হচ্ছে। সে এক মহাযজ্ঞের ব্যাপার।
এই মহাযজ্ঞ সামলাতে কয়েক মাইল দূরের মহিষখোলা গ্রাম থেকে আতিয়ার রহমানের স্ত্রী করে আনা হলো খালেদা রহমান বেলাকে। অত্যন্ত শিক্ষিত, সংস্কৃতিমনা এই ভদ্রমহিলা জন্মসূত্রে গানবাজনার মধ্যে বড় হয়ে উঠেছেন। তার বাবার বাড়িটাও লোকদের জন্য সব সময়ের উন্মুক্ত দুয়ার এক বাড়ি।
মহিষখোলা থেকে নড়াইল এসে তাই জলের মাছের মতোই স্বাভাবিকভাবে আতিয়ার রহমানের সংসার সামলাতে শুরু করলেন বেলা ম্যাডাম। শুধু সংসার সামলানো নয়, বেলা ম্যাডাম সামলাতের আসলে গণ্ডা গণ্ডা দুষ্টু শিশুও। পেশায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন খালেদ রহমান বেলা। সকাল-বিকেল এই শত লোকের জন্য হাঁড়ি ঠেলে আবার স্কুল। কোনো কিছুতেই মানুষটির কান্তি নেই। সচ্ছল পরিবার থেকে এসেছিলেন, সচ্ছল স্বামীর স্ত্রী হয়ে এসেছেন। কোনো অর্থের, বিলাসের অভাব ছিল না। কিন্তু বিলাস শব্দটার সঙ্গে কিছুতেই খাতির করতে পারেননি কখনো বেলা ম্যাডাম।
কথিত আছেন, বেলা ম্যাডামের আলমারিতে ২৫ ভরি সোনা ছিল। কিন্তু তিনি খালি হাত, খালি গলায়, খালি কানে ঘুরে বেড়াতেন; শরীরের কোথাও এক বিন্দু গয়না নেই। কেন?
বেলা ম্যাডামের একটা ব্যাখ্যা ছিল–আমার সব আত্মীয় সোনা পরার সামর্থ্য নেই, আমার সব ছাত্রের মা এমন সোনার গয়না পরতে পারে না; আমি পরে তাদের বেদনার কারণ কেন হব!
বুঝতে পারছেন, মাশরাফির আজকের দর্শনের জন্মটা কোথায়?
বেলা ম্যাডামের দুটো শাড়ি ছিল। প্রতি সকালে উঠে গোসল করে একটা শাড়ি শুকাতে দিতেন রোদে। আরেকটা পরে স্কুলে যেতেন। আবার পরদিন একই রুটিন। বেলা ম্যাডামের তৃতীয় শাড়ি কখনো কেউ দেখেনি। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নানি বা মায়ের চেয়েও দীনহীন জীবনযাপন করেন হয়তো। কিন্তু সম্পদের সাগরের মধ্য থেকে এমন জীবনযাপন করতে মনের জোর লাগে।
একদিকে ন্যাপ নেতা, সর্বত্যাগী আতিয়ার রহমান; অন্যদিকে এই মানুষের 'ম্যাডাম' খালেদা রহমান বেলা। এমন দম্পতির ঘরেই জন্মাতে পারে প্রদীপের আলো। এই দম্পতির কোলজুড়ে একে একে তিনটি সন্তান এল–হামিদা রহমান বলাকা, মাহমুদুর রহমান ও নাহিদুর রহমান।
তিনটি সন্তানই আমাদের গল্পের চরিত্র; তিনটি সন্তানকেই আমরা এই গ্রন্থের বাঁকে বাঁকে পাব। তবে আমাদের নজর এখন বলাকার দিকে। আমাদের চোখ এখন শিশুর মতো সরল, বৃদ্ধের মতো জ্ঞানী এবং গৌতমের মতো উদার বলাকার দিকে;

একজন মাশরাফির মায়ের দিকে।

৫.

মেয়েটা একটু কেমন যেন।

এই বয়সী মেয়ে বাড়ির মধ্যে থাকবে, শুধু রান্না শিখবে; বড়জোর একটু সেলাই-ফোঁড়াই। কিন্তু বলাকা মেয়েটা কেমন যেন। গাছে উঠছে, পেয়ারা পাড়ছে, নদীতে নামছে, ফুল তুলছে। চেনা-অচেনা গরিব মানুষ পেলেই ধরে নিয়ে আসছে খাওয়াবে বলে। নিজের পাতের ভাত তুলে দেয় ভিখারিকে, রাস্তায় কাঁদতে থাকা বাচ্চাটার জন্য হাউমাউ করে কাঁদে।

মেয়েটা একটু কেমন যেন। এই একটু কেমন বলেই নানা-নানি আদর করে ডাকেন–পাগলি।

বুঝতে পারছেন, কার কথা বলছি। আতিয়ার রহমান ও খালেদা রহমান বেলার কন্যা হামিদা রহমান বলাকা। বলাকা একটু হাঁটতে-চলতে শেখার পরপরই তাকে নানি এসে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে। এদিকে দুই ছেলে নিয়ে সংসার করতে থাকলেন বেলা ম্যাডাম। অন্যদিকে সেই মহিষখোলা গ্রামে অবাধে বেড়ে উঠতে থাকল 'পাগলি মেয়ে' বলাকা।

এই মহিষখোলা গ্রামটার কথা একটু বিশেষ করে বলাটা খুব জরুরি।

গ্রামটা একেবারে চিত্রা নদীর পাড়েই; সে সারা নড়াইলই দাঁড়িয়ে আছে চিত্রা নদীর পাড়ে। তবে মহিষখোলার এই বলাকাদের নানি বাড়িটা একেবারে নদীর কোলে। সেই বাড়িরই পাশে কালক্রমে চিত্রা রিসোর্ট নামে নামকরা এক বনভোজনকেন্দ্রও গড়ে উঠেছে।

বুঝতেই পারছেন, কেমন নদী আর প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা এই বলাকার।

ছোটবেলা থেকে পেয়ারাগাছ, জামগাছ, আমগাছে চড়ে পাড়া মাথায় করে রাখাটা তো ছিলই। ছিল নদী এপার-ওপার করা। পরবর্তীকালে জনে জনে মাশরাফি বিন মুর্তজার নদীর পোকা হয়ে ওঠার গল্প শুনে ও চোখে দেখে নিশ্চিত হওয়া গেল, এই বৈশিষ্ট্যটাও বুঝি, মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছে সে।

অবশ্য মাশরাফির কোন বৈশিষ্ট্যটা তার মায়ের থেকে আলাদা, সে বোঝা কষ্ট!

সেই একই রকম মানুষের জন্য কান্না, একই রকম গাছ আর নদীর প্রতি ভালোবাসা এবং একই রকম বিশাল একটা হৃদয় নিয়ে ঘুরে বেড়ানো। আর সর্বোপরি পাগল মায়ের পাগল ছেলে!

বলাকা অবশ্য দাবি করেন, তার মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য এসেছে তার নানির কাছ থেকে। সেদিনও সন্ধ্যায় সুদূর অতীতে হারিয়ে গিয়ে বলছিলেন, 'আমার মা-নানি কাউকে কোনো দিন গয়না পরতে দেখিনি। আমার মনে আছে, একদিন ভরদুপুরে নানাবাড়িতে এক ফকির এসেছেন। তখন আমাদের সবার খাওয়া হয়ে গেছে, নানি কেবল খেতে বসেছেন। হাঁড়িতে আর ভাত নেই। নানি খাওয়া ছেড়ে উঠে প্লেটের সব ভাত-তরকারি ওই ফকিরকে দিলেন। জিজ্ঞেস করলে বললেন–আমি তো রাতে খেতে পারব, উনি পাবেন কি না কে জানে!'

আহ!
এই দর্শন আমরা মিরপুরে, নড়াইলে বারবার দেখেছি মাশরাফির মধ্যে। এই মিলটা খেয়াল করেছেন মাশরাফির মা নিজেও। তিনি বলছিলেন, 'কৌশিক যখন এতটুকু। তখন একদিন এক ফকির এসেছে আমাদের বাড়িতে। সেই ফকিরের পা কেটে রক্ত পড়ছে। কৌশিক দৌড়ে গিয়ে তার পা কোলে নিয়ে সে কী কান্না। ও আমার নানির মতো হয়েছে।'
কার মতো হয়েছে বলা কঠিন। কৌশিকের নানির মতো? নাকি কৌশিকের মায়ের নানির মতো? নাকি খোদ কৌশিকের মা, বলাকার মতো।
আমরা বলাকার গল্প করছিলাম।
বলাকা অবশ্য শুধু এই নদী আর গাছ নিয়ে ব্যস্ত ছিল না। আরেকটা দারুণ গুণ ছিল তার–রবীন্দ্রসঙ্গীত। বলাকার নানাবাড়িটা ছিল সঙ্গীতের এক সর্গবিশেষ। সে বাড়িতে একেবারে গান করতে না-পারা লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন। সেই ধারায় রোজ ভোরে আর সন্ধ্যায় বলাকাও হারমোনিয়াম খুলে মিষ্টি গলায় গান ধরত–আহা আজি এ বসন্তে!
এমন মধুর করেই কেটে যাচ্ছিল কৈশোর। কিন্তু নানিবাড়ি একসময় ছাড়তে হলো। নানি পরলোকে পাড়ি জমালেন, এসএসসি পরীক্ষা দিলেন বলাকা নড়াইল গার্লস স্কুল থেকে। আর এই পরীক্ষার পরই চলে এলেন নড়াইলে নিজেদের বাড়িতে। চলে এলেন মা বেলা ম্যাডামের কাছে।
এখানেই একদিন কলেজে যাওয়ার পথে দেখলেন ভিক্টোরিয়া কলেজে খুব হইচই। কেন? কী এক অভিষেক অনুষ্ঠান চলছে। নিজে গানপাগল মানুষ বলে একটু থেমে কান পাতলেন। কানে এল মান্না দের মায়াবী কণ্ঠ, 'ও কেন এত সুন্দরী হলো!'
একটু থমকে বান্ধবীকে বলাকা জিজ্ঞেস করলেন, 'কে গান করে?'
'ওর নাম স্বপন; চারখাদার স্বপন।'
তখনো আমরা জানি না যে, ভবিষ্যতের এক দারুণ রোমান্টিক জুটির যাত্রা শুরু হয়ে গেল এই সাক্ষাতের ভেতর দিয়ে।

৬.
সে এক দারুণ বিভ্রাট।
স্বপন এমনিতে ভালো ছেলে। তবে একটু ভবঘুরে টাইপের আর কী!
সারাটা দিন বাড়ি ছেড়ে ঘোরাঘুরি, কোথায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কোথায় কলেজের নির্বাচন, কোথায় ফুটবল, কোথায় দৌড়ঝাঁপ; এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সন্ধ্যা হলে আবার মান্না দে, কিশোর কুমারের গানে পাড়া মাতায়।
এ হেন স্বপনের নামে অভিযোগ, সে নাকি পাশের বাড়ির বলাকাকে উত্ত্যক্ত করেছে!
'উত্ত্যক্ত করেছে' মানে কী? একটু খোঁজখবর করতে জানা গেল, বলাকাদের বাড়ি গিয়ে একেবারে তাদের শোবার ঘরে ঢুকে পড়েছে স্বপন। শুধু ঢুকে পড়লে কথা ছিল না। সকাল-বিকেল সারগাম করা বলাকার হারমোনিয়াম টেনে নামিয়ে নিজে

কী এক গান শুনিয়ে এসেছে।

এই গান শোনানো নিয়ে পাড়ায় খুব তোলপাড়। স্বপনের মায়ের কাছে বিচার এল। মা শান্তভাবেই ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী রে, তুই বলাকাদের বাড়ি গিয়ে এসব করেছিস?'

'বলাকা!'–এই নামে কোনো মেয়েকে মনেই করতে পারে না স্বপন।

বিস্তারিত অভিযোগ শুনে মাথায় আগুন ধরে গেল। এলাকার 'বড় ভাই' স্বপন একেবারে তেড়েফুঁড়ে ছুটল আতিয়ার সাহেবের বাড়ির দিকে; এই আতিয়ার সাহেবের মেয়ে হলো বলাকা।

বাড়ির ভেতরে ঢুকেই চিৎকার করে পাড়া মাথায় করল স্বপন, 'নাহিদ, নাহিদ।'

বেরিয়ে এল বলাকার ছোট ভাই। স্বপন তেড়ে মেরে উঠেছে তখন, 'নাহিদ, তোর বোনরে আমি কবে কী কইছি? কবে তোগো বাড়ি এসে গান করছি!'

নাহিদ কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। গোলমাল শুনে বেরিয়ে এল বলাকা স্বয়ং। সে এসে আধো আধো গলায় বলল, 'কী হয়েছে স্বপন ভাই?'

'কী হয়েছে, মানে! তুই নাকি আমার নামে নালিশ করিছিস?'

'না তো!'

'না তো, মানে কী! তুই বলিছিস, তোগো বাড়ি এসে হারমোনিয়াম নামিয়ে আমি গান করেছি।'

এবার বলাকার মুখে হাসি, 'ও, তাই বলেন! সে তো আপনি না। সে হলো ওই উত্তরের পাড়ার স্বপন।'

এই কথা শুনেই স্বপনের মাথাটা আরও গরম হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল, এবার একটা কিছু ঘটিয়েই ফেলবে। একটা উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে দেবে মেয়েটাকে। কিন্তু হলো না।

মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে আর কোনো শব্দ করতে পারল না স্বপন; হাসি আর নিচু হয়ে থাকা চোখ দুটো সব রাগ কেড়ে নিল। কোনো এক অচেনা জগতে হারিয়ে গেল বাউণ্ডুলে ছেলেটি।

ফুটবল, গান আর দৌড়ঝাঁপে ব্যস্ত থাকা ছেলেটি আবিষ্কার করল নতুন এক জগৎ। সেই জগৎ যেন আর পুরোনো হয় না।

চার দশক পার করে স্বপন-বলাকা এখন বাবা-মা। বাংলাদেশের সবচেয়ে গর্বিত বাবা-মা সম্ভবত। দেশের অন্যতম বড় ক্রিকেট তারকা, অন্যতম বড় ক্রিকেট ব্যক্তিত্ব মাশরাফি বিন মুর্তজা তাদের ছেলে। স্বপন-বলাকা এখন দাদা-দাদিও হয়েছেন। কিন্তু এখনো যেন সেই কিশোর-কিশোরীই রয়ে গেছেন।

এখনো সেই চোখের জগতে হারিয়ে যান দুজন; এখনো লাজুক হাসিতে, হেমন্তর গানে ভরে ওঠে সন্ধ্যাটা–এই পথ যদি না শেষ হয়!

এল নন্দের নন্দন



১.

১৯৮২ সাল।

বাংলাদেশের ইতিহাসে উত্তাল এক সময়। রাজনীতিতে চলছে নানান উত্থান-পতন। কিশোরীর মনের চেয়েও দ্রুত বদলাচ্ছে দেশের ইতিহাস।

এই উত্তাল হাওয়ার ঢেউ নড়াইলেও এসে লাগে। ন্যাপের নেতা অ্যাডভোকেট আতিয়ার রহমানের কাছে নানা রকম প্রস্তাব আসতে থাকে। তার দল সেই গৌরবোজ্জ্বল সময় পার করে এসেছে। কেউ এদিকে, কেউ ওদিকে পাড়ি জমাচ্ছেন। নির্বাচন করা, নতুন নতুন দলে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব আসতে থাকে। কিন্তু আতিয়ার রহমান মওলানা ভাসানীর প্রজ্ঞা আর মার্ক্সসীয় দর্শন বুকে নিয়ে চোয়াল শক্ত করে বসে থাকেন–দল বদলাব না।

গুমোট এই সময়টা স্বাভাবিকভাবে আতিয়ার রহমানের পরিবারেও প্রভাব ফেলার কথা। কিন্তু জীবনের একটা মজা হলো, সে কিছুতেই থমকে যেতে পারে না। চুপ থাকতে পারে না। তাই এমন

উত্তাল সময়েও আতিয়ার রহমানের বাড়িতে বিসমিল্লাহ খানের সানাই বেজে ওঠে। আজ আতিয়ার রহমানের বড় মেয়ে হামিদা রহমান বলাকার বিয়ে।
চারখাদা গ্রামের গোলাম নবীর পুত্র, এলাকার ডাকাবুকো ছেলে গোলাম মুর্তজার সঙ্গে মহা ধুমধাম করে বিয়ে দিচ্ছেন মেয়ের। সেই সময় প্রেমের সম্পর্ক মেনে নিয়ে বিয়ে দেওয়াটা অন্য কোনো অভিভাবকের জন্য একটা কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক জীবনাচরণের কারণে এসব সংস্কারে কখনোই বাঁধা পড়েননি আতিয়ার রহমান। উদার হাতে তাই বরণ করে নিয়েছেন মেয়ের পছন্দকে।
দিনটা ছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি।
তারিখটার বিশেষত্ব মনে করে আজও হাসিতে ভরে যায় মাশরাফির বাবা ও মায়ের মুখ। বাবা গোলাম মুর্তজা স্বপন হাসতে হাসতেই বলেন, 'তখন তো আর বুঝিনি যে, এটা ভালোবাসা দিবস। আজকাল যখন ছেলেমেয়েরা এই দিনে ভালোবাসা দিবস পালন করে; আমরা মনে মনে হাসি। না জেনেই ভালোবাসা দিবসে আমাদের এই জীবনের শুরুটা হয়েছে।'
মানুষের জানাটা তো জরুরি নয়; জরুরি হলো প্রকৃতিই ঠিক করে দিয়েছে ভালোবাসা দিবসের এই বন্ধনে বাঁধা পড়বেন স্বপন-বলাকা জুটি।

২.

আতিয়ার রহমানের বন্ধু হিসেবে নেপাল সরকারের খুব যাতায়াত ছিল এই বাড়িতে।
সেদিন এসে কেবল চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছেন, এমন সময় মনে হলো–যাই, ভেতরে গিয়ে অ্যাডভোকেট সাহেবের মেয়েটাকে দেখে আসি। মেয়েটার গর্ভে তখন সাত মাসের সন্তান।
মেয়েটার চোখ দুটো যেন একটু বসে গেছে।
বৃদ্ধ নেপাল সরকার বিছানার পাশে একটা চেয়ারে আস্তে আস্তে গিয়ে বসলেন। বলাকার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখি তো মা, তোর হাতটা দে। একটু দেখি।'
যদিও এসব বিষয়ে আতিয়ার রহমান, খালেদা রহমান বা বলাকা; কারোরই তেমন কোনো বিশ্বাস নেই। জ্যোতিষবিদ্যায় বিশ্বাস করার মতো কোনো প্রয়োজনও তারা মনে করেননি। তারপরও নেপাল কাকার অনুরোধ ফেললেন না। আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে দিলেন।
অনেকটা সময় নিয়ে হাত দেখলেন নেপাল সরকার।
আস্তে আস্তে বললেন, 'তোর কোলে তো রাজপুত্র আসছে রে, মা।'
একটু কৌতূহলী হয়ে উঠলেন বলাকা। চোখ বড় বড় করে শুনতে চাইলেন। নেপাল সরকার আপন মনে বলে চলেছেন, 'ছেলে হবে তোর। এই ছেলের

ছোটবেলায় অনেক বিপদ আছে; অনেক বিপদ।'
জ্যোতিষ বিদ্যায় বিশ্বাস থাকুক আর না-ই থাকুক; এমন অশুভ ভবিষ্যদ্বাণীতে কাল হয়ে যায় সকলের মুখ। নেপাল সরকার এই সবকিছুই যেন খেয়াল করেন না। তিনি আপন ভুবনে ডুবে গেছেন। কণ্ঠটা দৃঢ় করে মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করে বললেন, 'ষোল বছর বয়স পর্যন্ত যদি এই ছেলে বেঁচে থাকে, ওকে থামানোর মতো কেউ নেই এই দুনিয়ায়। পুরো দেশে রাজত্ব করবে বলাকার ছেলে, সারা পৃথিবী এক নামে চিনবে তোর এই ছেলেকে। গর্ভে তোর রাজপুত্তুর আসছে।'
বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী সকলের চোখে পানি। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত অনাগত এই ছেলেকে নিয়ে শঙ্কা এবং সুদূর ভবিষ্যতের এক সম্রাটের চেহারা কল্পনা করে আনন্দের দোলাচল। সব ছাপিয়ে ওই একটা বাক্যই বারবার বাজতে থাকল–রাজত্ব করবে একদিন বলাকার ছেলে।

৩.
রাজপুত্তুর, নাকি এলাকার মাস্তান–সন্তান কী হবে, সে নিয়ে তাদের দুজনের অন্তত কোনো দুশ্চিন্তা নেই।
সন্তান বেড়ে উঠছে, সুস্থভাবে বেড়ে উঠছে; এতেই আনন্দের শেষ নেই। আতিয়ার রহমান সাহেবের বিরাট বাড়িতে দুদণ্ড মুখোমুখি বসার সময় আর সুযোগ মেলে না। তখনকার দিনে গর্ভে সন্তান নিয়ে স্বামীর সঙ্গে গল্প করার সুযোগ তো খুব একটা মিলত না।
তারপরও নিশ্চয়ই এক লহমা সুযোগে, দুজন দুজনের চোখে চেয়ে একটু লাজুক হাসতেন!
সব বিষয়ে দুজন একমত। একটা বিষয় ছাড়া। বাবা গোলাম মুর্তজা স্বপন বলতেন, 'আমার একটা মেয়ে হবে।'
আর মা হামিদা মুর্তজা চোখ পাকিয়ে বলতেন, 'একটা ফুটফুটে ছেলে হবে।'
এই নিয়ে খুনসুটি, এই নিয়ে তর্ক। এমন সুখের তর্ক যেন দুনিয়ার আর হয় না।

৪.
৫ অক্টোবর, ১৯৮৩।
হাড় কাঁপানো শীত পড়বে এ বছর। অক্টোবর শুরু হতে না-হতেই নড়াইল শহরে শীত জাঁকিয়ে বসেছে।
আগের দিন সন্ধ্যাবেলাতেই বলাকার শরীরটা একটু খারাপ হতে শুরু করেছে। আতিয়ার রহমান সাহেব বুঝতে পারছেন না, ঠিক কী করবেন। দৌড়ে গিয়ে রাস্তার উল্টো পাশেই ডাক্তার সাহেবকে ডেকে আনলেন। তিনি মেয়েকে দেখে হাসতে হাসতে বের হলেন।

যাওয়ার সময় মজা করে বললেন, 'এত টেনশন করো না, উকিল সাহেব। তোমার ঘরে চাঁদের আলো আসবে। আর কিছু না। বাসায় বলে গিয়েছি। সময় হলেই ওরা আমাকে ডাক দেবে।'

শ্বশুরবাড়িতে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরতে থাকা গোলাম মুর্তজার কানেও গেল শব্দগুলো। তিনি বুঝতে পারলেন, জীবনের এক মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হতে চলেছে। এমন অনুভূতির মুখোমুখি আগে কখনো হননি। কত ডিফেন্ডারকে হতভম্ব করে, গোলকিপারকে দর্শক বানিয়ে গোল করেছেন। কত প্রতিপক্ষকে যোজন দূরে ফেলে দিয়েছেন দৌড়ে। কিন্তু এমন সময় বুঝি এর আগে আসেনি।

কী করবেন এখন গোলাম মুর্তজা?

তাকে অবশ্য কিছুই করতে হয় না। ভেতরে হামিদা মুর্তজার মা বেলা ম্যাডাম, খালারা এবং এলাকার অভিজ্ঞ সব মানুষেরা জোগাড়যন্ত্র করতে থাকেন। অভিজ্ঞদের কাছে এই সময়টা মোটেও নতুন কিছু নয়। এমন রাতজাগা তাদের অনেক চেনা। এমন মায়ের যন্ত্রণা দেখে দেখেই চুলে পাক ধরেছে তাদের।

কিন্তু মুর্তজা সাহেব? কিংবা হামিদা মুর্তজা বলাকা!

এমন সময় তো তাদের জীবনে আর আসেনি। ভোররাতে ভেতর থেকে যখন বলাকার কাতরানির শব্দ পেলেন, জীবনটা যেন তছনছ হয়ে গেল মুর্তজা সাহেবের–স্ত্রী তার এত কষ্ট পাচ্ছে!

যন্ত্রণায় জীবন ওষ্ঠাগত বলাকারও। হাত ধরে সান্তনা দেন, ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেন বলাকার মা। কিন্তু কিছুতেই সেই কষ্ট কমে না।

কোনোক্রমেই যেন রাত শেষ হতে চায় না।

অবশেষে আজানের শব্দ শোনা যায়। আতিয়ার রহমান, গোলাম মুর্তজা অজু করে নামাজে দাঁড়ান। আস্তে আস্তে অন্ধকার কেটে যায়। সূর্য হেসে ওঠে কুয়াশা কাটিয়ে। একটু একটু করে শীতের সকালে রোদ উজ্জ্বল হতে থাকে।

সকাল তখন ৮টা ৩০ মিনিট।

শীতের কুয়াশা চিরে ভেতর থেকে পরপর দুটো চিৎকার ভেসে আসে। বলাকার প্রবল চিৎকার। পরপরই একটা নতুন প্রাণ, এই জগতে এক নবাগত চিকন তারস্বরে জানিয়ে দেয় সে এসেছে। প্রবল চিৎকারে যেন পুরো বাংলাদেশ কাঁপিয়ে ঘোষণা করে দেয়–আমি, আমি এসেছি।

আমি চলে এসেছি রাজত্ব করব বলে।

৫.

হঠাৎ সব ব্যথা থেমে গেছে। কোনো এক জাদুর কাঠি যেন হঠাৎ শান্ত করে দিয়েছে দুনিয়াকে।

চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে, পৃথিবীটা যেন ঘুরছে। চোখ দুটো বুজে আসতে চাইছে।

ঘুম বড় টানছে। ঠিক এমন সময় চেনা একটা কণ্ঠ কানে এল, 'ছেলে দেখবি না, বলাকা?'

সব ঘুম পালিয়ে গেল, যে অজ্ঞান করতে এসেছিল; সেও যেন এক লহমায় দূরে চলে গেল।

নড়ার শক্তি নেই শরীরে। আস্তে আস্তে পাশের দিকে মাথা ঘোরান।

কে যেন তোয়ালেতে পেঁচানো ছোট্ট একটা পুতুল এনে মুখের সামনে ধরল। চোখের পানিতে ঠিকমতো দেখতেও পান না। মুখের সঙ্গে মিশল পুতুলটার মুখ। পৃথিবীর সব কষ্ট, সব বেদনা মিলিয়ে গেল। এই তো তার সুখের পাত্র দুনিয়ায় এসেছে।

বলাকা শুধু বিস্ময় আর মুগ্ধতা নিয়ে তাকিয়ে থাকেন–এই আমার ছেলে! এই ছেলেটাই ছিল আমার পেটে!

এতগুলো বছর পার করে আজও সেই গল্প বলতে গিয়ে বলাকার চোখ জলে ভরে ওঠে। মুখে হাসি, চোখে জল নিয়ে এক স্বর্গীয় দৃশ্য তৈরি করে বলেন, 'এত্তটুকু! এত্তটুকু ছিল। আমি শুধু দেখলাম, কী ফর্সা একটা পুতুল। আমি বললাম, এটা আমার ছেলে।'

হ্যাঁ, এটা আপনার ছেলে, বলাকা। এটা আপনার কৌশিক।

৬

আস্তে আস্তে দুটো হাত সামনে বাড়িয়ে দেন গোলাম মুর্তজা।

তোয়ালেতে পেঁচানো ছোট্ট একটা পুতুল যেন তুলে দেওয়া হয় তার হাতে। খুব সাবধানে, তুলর পুতুল ধরার মতো করে বুকের কাছে নেন মুর্তজা সাহেব। ঝাপসা চোখে পুতুলটার দিকে চেয়ে দেখেন। চোখ ভরে ওঠে পানিতে। সারা জীবন কতশত সাফল্য-ব্যর্থতার পেছনে ছুটেছেন। কত কী পেয়েছেন, কত কী না পাওয়ার আফসোস করেছেন।

এই একটা মুহূর্তে কোলে সন্তান নিয়ে মুর্তজা সাহেব শুধু ওপরে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতা জানান। আর নিজেকেই বলেন–জীবনের সেরা সম্পদটা পেলাম আজ।

'পাঁচটা ফোটা কই'



১.

বড়ই আচানক কাণ্ড।

সক্কাল বেলায় দোকানে এসেই তাজ্জব হয়ে গেলেন ইউসুফ সাহেব। দোকানের সঙ্গেই পেয়ারাগাছটায় একটা কাকের বাসা আছে। সেখানে একটা কোকিল ওড়াউড়ি করছে। কোকিলটাকে আবার একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে দুটো কাক।

কাকের বাসায় কোকিল ডিম পাড়ে–এটা ইউসুফ সাহেব শুনেছিলেন। কিন্তু সেই কোকিলকে ধাওয়া না করে এভাবে বসে বসে কাক দুটো দেখছে কেন? কোকিলটাকে কি কাক দুটো আগে থেকে চেনে?

আরেকটু ভাবলে এই রহস্যের হয়তো সমাধান করে ফেলতে পারতেন। কিন্তু সে সুযোগ পেলেন না। তার আগেই ভেতর থেকে ডাক এল–ইউসুফ! ইউসুফ! একটু ভেতরে আয়।

কাক-কোকিল সমস্যার সমাধান না করেই ভেতরে যেতে হওয়ায় একটু বিরক্ত ইউসুফ সাহেব। গিয়ে দেখেন বড় আম্মা নাতি কোলে নিয়ে বসে আছেন। নাতিটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে। ইউসুফকে

দেখে তিনি বললেন, 'একটু ডাক্তার ডেকে নিয়ে আয় না। ছেলেটা খুব কাঁদছে।'
'কী হইছে ওর?'
'মনে হয় পেটে ব্যথা।'
ইউসুফ সাহেব এবার স্বস্তি পেলেন, 'ডাক্তার লাগবে না। আমার কাছে দেন। ঠিক করে দেবানি।'
কেউ বাধা দেওয়ার আগেই বাচ্চাটাকে নিয়ে ইউসুফ বাইরের বারান্দায় চলে এলেন। কেরোসিনের বোতল থেকে এক ফোঁটা কেরোসিন নিয়ে দুই নাকে লাগিয়ে দিলেন। বাকি সবাই রে রে করে উঠল। ইউসুফ সাহেব নির্বিকার, 'এহ্! পেটে ব্যথায় ডাক্তার লাগে নাকি! কেরোসিনের ওপর ওষুধ নাই।'
ইউসুফ সাহেব লোকটাই এমন।
এই বাড়ির সরাসরি কারো আত্মীয় নন। তবে আত্মীয়র চেয়ে বেশি কিছু। আতিয়ার রহমান ও বেলা ম্যাডাম সেই ছোট্টবেলায় নিয়ে এসেছিলেন এই বাড়িতে। সেই থেকে বাড়ির বড় ছেলে হিসেবেই মানুষ হয়েছেন। আর এখন বড় হয়ে ওঠার পর দায়িত্ব নিয়েছেন বাড়ির পিচ্চিগুলোকে নিজের বানানো বিজ্ঞান অনুযায়ী বড় করে তোলার।
এই বিজ্ঞান গবেষণারই উপকরণ ছিল কৌশিক।
বেলা ম্যাডামের নাতি, বলাকার ছেলে কৌশিক একটু একটু করে হাঁটতে শিখেছে। আধো আধো শব্দ করে মুখে। দুই মামারই খুব ভক্ত। এর মধ্যে ছোট মামা নাহিদেরই যেন একটু বেশি নেওটা। আর সবচেয়ে ভক্ত ইউসুফ মামার। ইউসুফ মামা যা করে তাতেই আনন্দ।
ইউসুফ মামার আবিষ্কারগুলোও তো সেই রকম। বাচ্চা মানুষ করার জন্য কতগুলো যুগান্তকারী তত্ত্বও আবিষ্কার করে ফেলেছেন তিনি :

- ❑ দাঁত শক্ত করতে চাইলে দাঁত ব্রাশ না করেই চা-নাশতা খেতে হবে
- ❑ দিন শুরু করতে হবে চা দিয়ে; দুধ বা অন্য কোনো খাবার নয়
- ❑ দিনে দুবার ইটের খোয়া খেলে বড় হলে আর গ্যাস্ট্রিক হবে না
- ❑ শরীর ফিট রাখতে রোজ কিছুটা বালু খেতে হবে
- ❑ পেটে ব্যথার সেরা সমাধান কেরোসিন

বছর তিনেক বয়সের কৌশিক এর প্রতিটা ব্যাপারই অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে চায়। সেও চায় দুধ-ভাত নয়; মূল খাবার হয়ে উঠুক বালি আর ইটের খোয়া। সেও চায় জীবনটাই কেটে যাক দাঁত ব্রাশ না করে। এবং সে চায় সারাটা সময় দুখুর সঙ্গে বল খেলতে।
কিন্তু জগতের এসব মহৎ চাওয়া বেশির ভাগ সময়ই পূরণ হয় না। কারণ, ভেতরের মহল থেকে শোনা যায় বেলা ম্যাডামের হাঁক–কৌশিক!
নানির এই কণ্ঠটাকে বড় ভয় কৌশিকের।

২.

কৌশিকের শৈশবটাকে বলা যায় নানিকেন্দ্রিক এক শৈশব।

ছেলের জন্মের পর মা হামিদা মুর্তজা একটু অসুস্থই ছিলেন। ফলে মেয়ে আর মেয়ের এই ছেলেকে নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিলেন খালেদা রহমান বেলা।

মাশরাফির বাবার বাসা আর নানার বাসার দূরত্ব পাঁচ মিনিটেরও ছিল না। তাই শিশু মাশরাফির নানির কাছে থাকতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। শুরুতে মনে হয়েছিল, এই থাকাটা সাময়িক। কিন্তু সেটাই এখন পর্যন্ত মাশরাফির জীবনের সবচেয়ে স্থায়ী ব্যাপার হয়ে গেল–বাড়ি মানে, তার কাছে আসলে নানির বাড়ি।

নানির বাড়ি রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্তটা পাকা হয়ে গেল কৌশিকের ছয় মাস বয়সে।

মাশরাফির যখন ছয় মাস বয়স, তখন একটা বড় চাকরি পেয়ে গেলেন গোলাম মুর্তজা। একটা বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির কর্মাধ্য হিসেবে চাকরি পেলেন। বাড়িতে বললেন, ছেলে আর স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসতে চান। তখনকার দিনে এমন একটা চাকরি পেয়ে সেটাকে পায়ে দলা সম্ভব ছিল না। স্ত্রী তাই সম্মতিই দিলেন।

কিন্তু বাদ সাধলেন নানি। তিনি বললেন, 'তোমরা যাবে যাও। কৌশিককে নিতে পারবে না।'

কৌশিকের বাবা-মা যেমন তেমন, আশপাশের লোকও বলল, 'এতটুকু ছেলে, মা ছাড়া থাকতে পারবে!'

নানি কঠোর গলায় বললেন, 'অবশ্যই পারবে। আমি আছি কী করতে! ঢাকায় নিয়ে কোথাকার কী খাবার খাওয়াবে, কী সব দূষিত বাতাসে ছেলেটা নিঃশ্বাস নেবে। একটুও দরকার নেই ওসবের। আমার কৌশিক এখানেই থাকবে।'

মাশরাফি থেকে যান নানির কাছে। ছেলেকে দেখতে মা পনেরো দিন পর পর নড়াইল আসতেন। এর বছর দুই পর এমন ছোটাছুটি সহ্য করতে না পেরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়ি চলে আসেন গোলাম মুর্তজা। কিন্তু ততদিনে কৌশিক নানিবাড়ি স্থায়ী হয়ে গেছেন। ওখান থেকে তাকে সরায় আর কার সাধ্যি।

ছেলেকে শৈশবে কাছে রাখতে না-পারাটা যেকোনো মায়ের জন্য নিশ্চয়ই যন্ত্রণার ব্যাপার। কিন্তু এই ধারণাটাই আপনার আবার ভুল বলে মনে হবে হামিদা মুর্তজার সঙ্গে আলাপ করলে।

জগতে কোনো মা স্বীকার করার কথা নয় যে, তার সন্তানকে তার চেয়েও কেউ বেশি ভালোবাসতে পারে। কিন্তু কৌশিকের মা অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নেন, নানির কাছ থেকেই জীবনে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা পেয়েছে তার ছেলে, 'অনেকে বলে, মায়ের চেয়ে সন্তানকে বেশি ভালোবাসে যে, সে ডাইনি। ওটা আসলে ভুল ধারণা। কেউ যে মায়ের চেয়েও তার সন্তানকে বেশি ভালোবাসতে পারে, সেটা আমি কৌশিকের নানিকেই দেখেছি।'

কৌশিকের নানির এই মায়াবী রূপটাই শুধু একটা রূপ নয়। এটা আসলে মুদ্রার

একটা পাশ।

বেলা ম্যাডামের আসলে দুটো রূপ ছিল কৌশিকের কাছে–একদিকে অসম্ভব মায়াবতী নানি; যার কাছে দুনিয়ার সব আবদার চলে। অন্যদিকে সেই বেলা ম্যাডামই তার নাতির সবচেয়ে বড় অভিভাবক, সবচেয়ে কঠোর শাসনকারী।

বেলা ম্যাডামের শাসন নিয়ে একটা গল্প নড়াইলে এখনো কিংবদন্তি হয়ে আছে।

এই কিংবদন্তিটা লিখেছেন বাংলাদেশের কিংবদন্তি কোচ ও ক্রীড়া সাংবাদিক জালাল আহমেদ চৌধুরী। আমরা তার লেখা থেকেই শুনি গল্পটা :

প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সময়। কাস থ্রি-ফোর হবে। সহপাঠীরা টিফিনের সময় ছোঁয়াছুঁয়ি একটা খেলা খেলে। খেলার নাম বরফ-পানি। তা সে ছুঁয়ে দেওয়ার সময় গোঁয়ার কৌশিকের আঙুলের আঘাত সঞ্চিতা নামের এক সহপাঠিনীর পিঠে এতই জোরে পড়ল যে সে মেয়ে কেঁদেকেটে কৌশিকের নানির কাছে নালিশ জানাল। নানি বেলা আপা স্কুলের শিক্ষিকা। তাঁর শাসনপ্রণালি খুবই কঠোর। বেলা আপার হাতের পাখার ডাঁটের মার খায়নি এমন ভদ্রলোক নাকি নড়াইলে নেই। তা আদরের নাতিকে বেলা আপা সেদিন যে শাসন করলেন তা নাকি বাড়াবাড়ি রকমের নিষ্ঠুরতার শামিল। প্রহারে প্রহারে জর্জরিত শিশুকে বাঁচাতে সারা স্কুল ব্যস্ত হয়ে উঠল। সারা দেহে পাখার ডাঁটের বাড়ি নির্বিকারে সইল কৌশিক। ক্লান্ত নানি প্রহার থামালে দমিত অশ্রু নিয়ে নানিবাড়ির পথ ধরল ছেলে। [১]

আসলে কে বেশি কেঁদেছিল সেদিন? নড়াইলে কৌশিকের বন্ধুদের এখনো ধারণা, বাসায় ফিরতে ফিরতে কৌশিকের কান্নার চেয়ে অনেক বেশি পানি ঝরেছিল শাসন করা সেই নানির চোখ থেকেই।

এই তো সেই বিচারকের গল্প!

৩.

বলাকার কোলে রাজপুত্তুর আসবে, এ কথা সেই নেপাল সরকার বলেছিলেন।

নেপাল সরকারের কথাটাকে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না। কালক্রমে আমরা দেখেছি, মাশরাফির সত্যিই ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত একাধিক জীবন-মৃত্যু সংকট তৈরি হয়েছে। তারপর মাশরাফিকে সারা বিশ্ব চিনতে শুরু করেছে এবং একসময় অন্তত ক্রিকেটীয় অর্থে সারা দেশ শাসন করেছে মাশরাফি বিন মুর্তজা।

ফলে এই ভবিষ্যৎ দেখতে পাওয়াগুলো আমরা কীভাবে ফেলে দিই!

এমন ভবিষ্যৎ দেখতে পাওয়ার মুখোমুখি আরেকবার হয়েছিলেন কৌশিকের মা; হামিদা মুর্তজা বলাকা।

কৌশিকের বয়স তখন ছয় কি সাত মাস। ছেলেকে নিয়ে খুলনায় মামার বাসায় বেড়াতে গেলেন বলাকা। ক্রীড়া সংগঠক মফিজ মামা বা মাশরাফির এই মফিজ নানার আরও বড় ভূমিকা আমরা পরবর্তীকালে কৌশিকের জীবনে দেখতে পাব। আপাতত দেখতে পাচ্ছি, সেই ছয়-সাত মাস বয়সে মাশরাফির কপালে তিনি

আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন রাজটিকা!
মামার বাসায় একসময় সবার চোখে পড়ে শিশু কৌশিকের কপালে আলাদা একটা আলো খেলা করছে। কিংবদন্তিতে এই আলোর খেলাকে আমরা রাজটিকা বলি, সে রকম একটা কিছু। সেখানে মফিজ নানাসহ অনেকেই পরিষ্কার দাবি করেন, এই ছেলে দুনিয়া কাঁপানো কিছু একটা হতে চলেছে। সবাই বারবার করে সাবধান করে দিয়েছিলেন–ছেলেটাকে সাবধানে রাখিস।
বাড়ি এসে বলাকা যখন তার মাকে, মানে কৌশিকের নানিকে কথাটা বললেন তিনি শিউরে উঠলেন।
তিনি অনেক আগেই এই ব্যাপারটা খেয়াল করেছিলেন। কাউকে বলেননি। এবার কৌশিকের নানি কথাটা বলাবলি করতে মানা করেন। চিকচিক চিহ্নটা নাকি অনেক দিন ছিল। এরপর আরও অনেকেই এই চিহ্ন দেখেছে। অনেকেই একই কথা বলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু নানি বারবার চেষ্টা করেছেন, এই কথাটা যতটা আড়াল করে রাখা যায়।
কৌশিকের মা এই আড়াল করে রাখার ব্যাখ্যাটা দিচ্ছিলেন, 'রাজটিকা দেখে লোকে তো ভাবে, ছেলে বড় কিছু হবে। সেই সঙ্গে সবার এমন কথাবার্তায় ভয় হয়। আরেকটা ব্যাপার হলো, এসব কথা শুনলেই পলান কাকার কথাটা মনে পড়ে। ছেলেটা হয় খুব খারাপ হবে, না হলে খুব ভালো হবে। আর যা-ই হোক, সে জন্য ষোলো বছর অন্তত বাঁচতে হবে ওকে।'
এই খুব খারাপ হয়ে যাওয়ার শঙ্কায় বুক কাঁপে মা আর নানির।
আর বাকিদের বুকটা বারবার ফুলে ওঠে রাজটিকার লক্ষণ দেখে। ছেলের ভবিষ্যৎ কল্পনায় ডানা মেলেন সকলে। কেউ দেখতে পান, নানার মতো নামজাদা জনদরদি হবে। কেউ দেখতে পান, প্রপিতামহের মতো মুক্তিযোদ্ধা হবে। কেউ ভাবেন, বাবার মতো নামকরা খেলোয়াড় হবে।
বাবা গোলাম মুর্তজা স্বপন স্বপ্ন দেখেন–ছেলে তার বড় গায়ক হবে।
আমরা আজ জানি, গায়ক ছাড়া সবই হয়েছে মাশরাফি!

৪.
মা ছাড়া ছেলেকে মানুষ করাটা একেবারে সোজা কথা নয়।
এই মানুষ করার যন্ত্রণাটা নানি বেলা ম্যাডামই সামলাতেন সব সময়। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ তার বায়না হতো, এবার ছোট মামাকে সামলাতে হবে।
বাড়ির সবাই থাকে তিনতলা বাড়ির নিচতলায়। আর নাহিদ মামা রাতে ঘুমান তিনতলায়।
হঠাৎ করে রাত একটায় ঘুম ভেঙে যায় কৌশিকের। ঘুম ভেঙেই চিৎকার–মামা যাব, মামা যাব।
এমন আবদারের মুখে বেলা ম্যাডামের কঠোর ভাবমূর্তি ভেঙে পড়ে। তাড়াতাড়ি

দুখুকে দিয়ে তিনতলায় খবর পাঠান, 'নাহিদকে ডেকে নিয়ে আয়।'
নাহিদ মামা আসেন। সারাটা রাত ভাগনে কোলে নিয়ে পায়চারি চলে বারান্দাজুড়ে। কাঁধে মাথা রেখে ভাগনে তার ঘুমিয়েও পড়ে। কিন্তু ঘুমালেও শান্তি নেই। বিছানায় রাখতে গেলেই চিৎকার করে ওঠে, 'মামা, মামা।'
এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি মেলে না; কিন্তু গল্প করতে থাকা নাহিদ মামাকে দেখে মনে হয়, তিনি জীবনেও এই 'যন্ত্রণা' থেকে মুক্তি চাননি। বরং এই মধুর যন্ত্রণা কেন ফুরিয়ে গেল, কেন তার কাঁধে ভাগনেটা এখনো মাথা রেখে ঘুমায় না–এই নিয়ে গোপন একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।
হঠাৎ করেই এই ঘরে ঢুকে মহাতারকা মাশরাফি মামার এই কথাটা শুনে ফেলেন। এক লাফে মামার পাশে বসে কাঁধে মাথা এলিয়ে দেন। আমরা সেই বছর তিরিশেক আগের মামা-ভাগনের স্বর্গীয় দৃশ্যটা দেখতে পাই। ভাগনে কাঁধে নিয়ে মামা হাঁটছেন আর গান করছেন–বাবা ঘুমাল, পাড়া জুড়াল!
শুধু এই ছেলে ভোলোনো গান করে কি আর এমন দুষ্টু ছেলে ঠান্ডা রাখা যায়!
মাশরাফিকে ঠান্ডা করার আরেকটা অভিনব বুদ্ধি পাওয়া গেল। এই বুদ্ধিটাও নাহিদ মামা আবিষ্কার করলেন। রাতবিরেতে মাশরাফি যখন ঘুম থেকে উঠে কান্না করবে, ওর হাতে একটা ফিডারের নিপল ধরিয়ে দিতে হবে। শুরুতে শুরুতে এতে ভালোই কাজ হলো।
ফিডারের ওই নিপল মুখে দিয়ে কান্না থামিয়ে দেয় কৌশিক; এই জিনিসটাকে স্থানীয়ভাবে বোটা বলে ডাকা হয়। কিছুদিন পর দাবিটা বদলে গেল, 'আরেত্তো ফোটা কই?'
মানে, আরেকটা 'বোটা' কই?
ঠিক আছে, আরেকটা 'বোটা' জোগাড় করা হলো। আবার কিছুদিন পর বায়না, 'আমার তিনতে বোটা কই?'
তিনটে এল, চারটে এল; তাতেও কাজ হয় না; এবার পঞ্চম বোটা লাগবে। শেষমেশ অবস্থাটা দাঁড়াল এ রকম যে, কান্নাটান্না কিছু লাগবে না; কৌশিক ঘুমাতে যাওয়ার আগে তার বিছানার কাছে পাঁচটা ফিডারের নিপল জোগাড় করে রাখতে হবে। সে সুর করে করে গান করবে, 'আমার এত্তা বোটা কই? আমার দুটো বোটা কই?...'
আর একটা একটা করে নাহিদ মামা তার হাতে তুলে দেবে ঐতিহাসিক বোটা!
রাত হলে না হয়, ঘুম পাড়ানোর গান বা বোটা দিয়ে কাজ চলতে পারে। দিনের বেলায় কী করা যাবে?
ভরদুপুরে কৌশিকের আবদার ওঠে–আমি খেলতে যাব!
তিন-চার বছর বয়সের পিচ্চিকে তখন কে খেলতে নেবে? আর ঠিক দুপুর বেলায় ছোটদের সঙ্গে মাঠেও পাঠানো যায় না। তাহলে উপায়?
উপায় বলতে দুখু।

দুখুর নাম ওপরেই শুনেছেন। মাশরাফির মামার বাড়ির রক্তের আত্মীয় না হয়েও যে বেশ কয়েকজন নিকটাত্মীয় আছে, তাদেরই একজন দুখু। এখানে বড় হয়ে উঠেছে, এখানেই থেকেছে মানুষটা। এখানেই জীবন গড়েছে।

এই দুখুর ডাক পড়ত দুপুরবেলায় কৌশিকের খেলার বায়না শুরু হলে।

দুজন মিলে তো ফুটবল খেলা যায় না। তাই আবিষ্কার হলো ক্রিকেট। স্বামীর কল্যাণে সেই সময়েই ক্রিকেট খেলাটা সম্পর্কে একটা ধারণা ছিল তার নানির। নারকেলের ডাল কেটে, সুন্দর করে চেঁছে নানি বানিয়ে দিতেন ব্যাট। আর গাছ থেকে কেবল বড় হতে থাকা লেবু পেড়ে এনে রেডিমেট পাওয়া যেত বল।

বল-ব্যাট বানিয়ে নানি হাঁক দিতেন, 'দুখু!'

'জি।'

'যাও, বারান্দায় গিয়ে কৌশিকের সঙ্গে একটু ব্যাট-বল খেলো। তুমি ব্যাট করো, ও বল করবে।'

কৌশিক তেড়ে উঠত, 'নাহ। আমি ব্যাট করব। আমি ব্যাট করব বড় হয়ে।'

তা মাশরাফি হয়ে ওঠার আগ পর্যন্ত তো ব্যাটই করতেন এই কৌশিক।

৫.

গোলাম মুর্তজা স্বপন সঙ্গীতপ্রেমী মানুষ; এটা পুরোনা খবর। আমরা এতক্ষণে এটাও জেনে ফেলেছি যে, হামিদা মুর্তজা বলাকাও একজন দারুণ গানপাগল মানুষ।

এমন দম্পতির ছেলে বিশিষ্ট সঙ্গীতবিশারদ হবে, এটা আশা করাটা খুব অন্যায় ছিল না। সেই আশা থেকেই স্বপন টেনে বের করেছিলেন হারমোনিয়াম আর তবলা। দু-একদিন নিজেই তালিম দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

কাজ হয় না।

হারমোনিয়ামের রিড বা তবলার বোল, কোনোটাই টানে না কৌশিককে।

সুসাহিত্যিক জাহিদ রেজা নূর কৌশিকের সেই সঙ্গীতশিক্ষা বর্ণনা করেছেন বড় সরেসভাবে। আমরা নিজেরা কথা না বাড়িয়ে জাহিদ রেজা নূরের বর্ণনায় সেই সঙ্গীত আরাধনাটা ফিরে দেখি :

গানের শিক রাখা হলো। শিক দরদমাখা কণ্ঠে শুরু করলেন—সা রে গা মা পা ধা নি সা; মাশরাফি সেই সুরের মূর্ছনা অগ্রাহ্য করে তাকিয়ে থাকলেন এই মাঠের দিকে। বাবা বুঝলেন, এ ছেলেকে দিয়ে আর যা-ই হোক সংগীত হবে না। তাই সেখানেই ঘটল মাশরাফির সংগীতজীবনের ইতি। [২]

এই মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকার রোগ তো কৌশিকের ছোটবেলার সবচেয়ে বড় রোগ সম্ভবত।

থাকা-খাওয়া-খেলা সবকিছু নানির বাড়িতে হলেও পড়াশোনা করতে পাঁচ মিনিটের পথ হেঁটে প্রতিদিন দুবেলা বাবার কাছে নিজেদের বাড়িতে আসতে হতো

কৌশিককে। দুবেলা তাকে পড়ানোর কাজটা করতেন বাবা। বলে দিতে হয় না যে, বড় অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই পড়ায় অংশ নিতে আসতেন কৌশিক। কিন্তু মনটা পড়ে থাকত তার মাঠে।

মাঠে মানে, অনেক দূরে নয়।

মাশরাফিদের বাসার পাশেই ছোট্ট একটা রাস্তা; সেই রাস্তার ওপারেই বিশাল মাঠ। এই নড়াইলের সবচেয়ে বড় খোলা মাঠ। মাঠের এ পাশে টেনিস বলে ক্রিকেট, ও পাশে ক্রিকেট বলে ক্রিকেট চলে। মাশরাফির নিজের তখনো কোনো ক্রিকেটই খেলার বয়স হয়নি।

বয়স হয়নি মানে, তখনো তাকে দলে নেয় না কোনো পক্ষই। কিন্তু বাবার পড়ার মাঝেই মনটা পড়ে থাকে ওই মাঠে। বাবা বলেন, 'পড়ো অ-তে অজগর ওই আসছে তেড়ে।'

কৌশিক দেখত, বল হাতে বোলার ওই আসছে তেড়ে!

বই আর মাঠের এই শত্রুতায় পিঠে কড়া একটা দুটো চড়-কিল যে পড়ত না, তা নয়। কিন্তু পিচ্চিটার তাতে কী হবে!

পিচ্চিটার চাই খেলার মাঠ।

ওই যে আগেই বললাম, কোনো দলে তার ঠাঁই হয় না; সেটা এমন বয়স।

ঠাঁই না হলে বয়েই গেল। খেলতে তাকে নিতেই হবে। স্কুল শেষ করে, বাবার চোখ ফাঁকি দিয়ে নেমে যেত মাঠে। ব্যাট-বল যেহেতু পাওয়া যায় না, ফিল্ডিং করত। তাও আবার কোথায়? সোজা গিয়ে উইকেটকিপারের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ত। উইকেটকিপারের পাশে দাঁড়ানো মানেই শরীরে বল লেগে আহত হওয়ার ভয়। বড়রা ধরে সরিয়ে দিতে চাইত ছেলেটাকে।

ছেলেটাও কিছুতেই সরবে না। এই নিয়ে ধস্তাধস্তি। আর এই শোরগোলে গোলাম মুর্তজা টের পেয়ে যেতেন যে, ছেলে আবার মাঠে নেমে পড়েছে। হাতের কাছে খুন্তি, লাঠি যা পেতেন তাই নিয়ে ছুটতেন। এই বয়সেই এত মাঠপ্রেম ছাড়িয়ে টেবিলে বসাতে হবে। কিন্তু বললেই কি আর 'বাঁদর ছেলে' পড়ার টেবিলে বসে!

৬.

সেদিন সকাল থেকে নিখোঁজ কৌশিক।

নিখোঁজ সে প্রায়ই হয়। কিন্তু আর কেউ না হোক, নাহিদ মামা জানেন, কোথায় গেল ছেলেটা। যায় আর কোথায়? পাশের মাঠের কোনায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে; যদি একটু বড়রা খেলতে নেয়। কিন্তু কিছুতেই খেলার সুযোগ না পেয়ে সারাটা বিকেল খেলা দেখে তিন-চার বছর বয়সী বাচ্চাটা আবার ঘাস চিবুতে চিবুতে বাসায় ফেরে।

নাহিদ মামা এটা জানেন। জানেন, মানে তাকে বলেই যায়–মামা এট্টু মাঠে যাই? ফলে সবাই কৌশিককে 'নিখোঁজ' মনে করলেও নাহিদ মামা শান্ত থাকেন। তিনি

জানেন, কোথায় গেছে। কিন্তু এই দিনটা অন্য রকম। নাহিদ মামাও জানে না, কোথায় গেল কৌশিক।

রোজকার বিকেলের মতো খোঁজ পড়ল, নাহিদ মামা চুপ করে রইলেন। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো, কিন্তু কৌশিকের দেখা নেই। নাহিদ মামার ভ্রুটা একটু কুঁচকাল–এখনো আসে না কেন?

আস্তে আস্তে বের হয়ে প্রাইমারি স্কুলের পেছনের মাঠে চললেন। মাঠে পৌঁছেই বুকটা কেঁপে উঠল মামার–মাঠে তো কোনো জনপ্রাণী নেই। তাহলে কৌশিক কোথায় গেল? এবার ভয়টা পেলেন নাহিদ মামা–কৌশিক আসলেই নিখোঁজ!

শুরু হলো খোঁজাখুঁজি। হ্যাজাক, টর্চ, কুপিবাতি; যার যা আছে, তাই নিয়ে মহল্লা ধরে খোঁজা চলল। কেউ বাজারের দিকে গেল। কৌশিকের কয়েকটা বন্ধু তৈরি হচ্ছে তখন, তাদের বাড়িতে খোঁজ চলল। কোথাও নেই কৌশিক।

কৌশিকের বাবা একটা বড় লাঠি হাতে করে নাহিদ মামাদের বাড়ির সামনে পায়চারি করছেন; পেলেই আজ দু ঘা দেবেন। 'দু ঘা' দেওয়া তো পরের ব্যাপার, আগে তো ছেলেকে পেতে হবে।

রাত বাড়ছে।

সার্চ পার্টি নানা জায়গা থেকে ফিরে এসেছে। সবাই বাড়ির ভেতর জড়ো হয়েছে। এখন কি তাহলে পুলিশে খবর দিতে হবে?

কিছু ভাবতে পারছেন না নাহিদ মামা। মাথাটা একটু পরিষ্কার করতে বাইরে এসে রাস্তার পাশে দাঁড়ালেন। জীবনটা তার অর্থহীন মনে হচ্ছে। যে ভাগনে ছাড়া একটা মুহূর্ত কল্পনা করতে পারেন না; সেই ভাগনেকে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেল মামাটা তার?

–মামা!

ডাকটা শুনে ভূতের আওয়াজ শোনার মতো চমকে উঠলেন নাহিদ। কৌশিকের কণ্ঠ। কিন্তু কই সে!

আবার ডাকটা শুনলেন–মামা, আমি এই।

'এই' মানে!

এদিক-ওদিক তাকিয়ে আরও কয়েকবার 'কই, কই' জিজ্ঞেস করে বুঝতে পারলেন, বাড়ির সামনের পচা ড্রেন থেকে শব্দটা আসছে। একটু এগিয়ে গিয়ে টর্চের আলো ফেলতেই দেখলেন ড্রেনের মধ্যে সারা শরীরে কাদা মেখে উবু হয়ে বসে আছে কৌশিক।

হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠে কাছে গিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'এখানে কী করিস?'

'মামা, বাবা কি চলে গেছে?'

'কেন?'

'মামা, আমি তো খেলা দেখতে বাজারের ওপাশে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

এসে দেখি বাবার হাতে লাঠি। তাই ড্রেনে পালায়ে আছি।'

এই পালিয়ে থাকাটা খুব অযৌক্তিক নয়। এমন দেরি করে, না বলে ফেরার ফল যে কী হতে পারে তা কৌশিক জানে। নানির পিটুনি, বাবার লাঠি তো আছেই–বাবার খুন্তিপেটার ভয়ও আছে।

সেদিনের মতো নাহিদ মামা কী এক অদ্ভুত উপায়ে রক্ষা করেছিলেন কৌশিককে। তবে সব সময় এই রক্ষাটা হয়নি। নিজে খেলা শুরু করার আগে বহুবার এমন খেলার মাঠে পালিয়ে গিয়ে বাবার হাতে খুন্তির পিটুনি খেতে হয়েছে কৌশিককে।

এসব পিটুনি, এসব শাসন একেবারে খালি খালি নয়।

এমনিতেই জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী যে, ছেলেটার জীবনে ফাঁড়া আছে। তার ওপর সেই বছর খানেক বয়স থেকেই দুরন্তপনা করে দফায় দফায় নিজের জীবনকে শঙ্কায় ফেলেছে কৌশিক।

এই বছর খানেক বয়সেরই একটা ঘটনার কথা বলা যাক।

সেদিনও ও রকম কৌশিককে পাওয়া যাচ্ছিল না। একেবারে ভরদুপুরে।

খোঁজ শুরু হওয়ার আগেই রক্তাক্ত চেহারায় বাসায় এসে হাজির। বুক আর পেট থেকে অঝোরে ঝরছে রক্ত। সবাই চিৎকার করছে–কী হয়েছে, কী হয়েছে!

ওই এক বছর বয়সে তো ছেলে বলতেও পারে না কী হয়েছে। তবে রক্তের দাগ দেখে অনুমান করা গেল; ওই বয়সেই সে গাছে উঠতে চেয়েছিল: যার ফল আমগাছের শেকড়ে বেঁধেই বুক-পেট কেটে বাসায় ফেরা।

এ-যাত্রা গাছে ওঠাটা বন্ধ রাখতে হলো। তবে পরের কয়েকটা বছর বাড়ির ও বাড়ির পাশের গাছগুলোর জন্য করুণাই জানাতে হবে। এই রক্তপাতের মাশুল দিতে কৌশিকের হাতে নির্মমভাবে পরের বছরগুলোতে নির্যাতিত হয়েছে এই এলাকার প্রতিটা গাছ।

সেই সময়টার গল্প শুনে জালাল আহমেদ চৌধুরী লিখেছিলেন–শাখামৃগ!

সূত্র :

[১] নড়াইল এক্সপ্রেস এক অদম্য নায়ক; জালাল আহমেদ চৌধুরী (প্রথম আলো, ৭ নভেম্বর, ২০১৩)

[২] খেলার বাইরে মাশরাফি; জাহিদ রেজা নূর (প্রথম আলো, ৩০ মে, ২০১৫)

টারজান অব তুলসী-বাগান



১.

জোছনা রাত; চাঁদের আলোয় সবকিছুকেই বিভ্রান্তিকর মনে হয়।

আখের খেতের মাঝখান দিয়ে হাঁটতে গিয়ে তাই কোনটা কাদা, কোনটা জল বুঝে ওঠা কঠিন। এখন অবশ্য কাদা-জল দেখার সময় নেই। হাতের দা দিয়ে সপ সপ করে আখের গোড়ায় কোপ চলছে। সামনে থেকে একজন কেটে দিচ্ছে, পেছনে দাঁড়িয়ে আর দুজন আঁটি বাঁধছে। দেখতে দেখতে তিনটে আঁটি বাঁধা হয়ে গেল।

এবার সামনে থেকে আখ কেটে দিতে থাকা ছেলেটা চাপা গলায় বলল, ‘আইজকের মতো অনেক হইছে। এবার চল।’

বাকিদের আপত্তি করার কারণ নেই। আগামীকাল সারা দিন চিবুনোর মতো আখ হয়ে গেছে। এবার নিয়ে নদী পার হয়ে যেতে পারলেই হলো। তিনজন তিনটা আখের ইয়া বড় বড় আঁটি মাথায় করে কেবল খেত থেকে বেরিয়েছে; অমনি মুখের ওপর এসে পড়ল

টর্চলাইটের আলো!

ওপাশ থেকে চিৎকার শোনা গেল, 'দাদা, আইজ পাইছি। সেই মালগুলো আইজ আবার আইছে।'

তিনটে ছেলে জায়গায় একেবারে জমে গেল। ওদের টর্চের আলোতেই বোঝা গেল, কমপক্ষে ১০-১২ জন মানুষ হবে। প্রত্যেকের হাতে দা-কিরিচ; ধারালো সব অস্ত্র। এবার!

সর্দার ছেলেটা এক পা পিছিয়ে এল। ফিসফিস করে বলল, 'ধরা দেয়া যাবে না। পিছন ফিরে খেতের মধ্যি দিয়ে আমি কলি একসঙ্গে দৌড় দিবি। সোজা নদীতে।'

বাকিদের উত্তর দেওয়ার মতো অবস্থা নেই।

এর মধ্যে ওপাশ থেকে চিৎকার শোনা গেল, 'ওই। তোরা বাইর হয়ে রাস্তায় আয়। আইজ দেহি, তোরা আইখ নিয়ে যাইস কী কইরে।'

কথা শেষ হতে পারল না, সর্দার ছেলেটা আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'সাজু-রবি, পলা।'

এক চিৎকারেই কাজ হলো।

কার্ল লুইস, উসাইন বোল্টকে লজ্জা পাইয়ে দেওয়া দৌড়ে চোখের পলকে আখখেত, বড় রাস্তা পার করে নদীর কাছাকাছি চলে এল ছেলেগুলো। পেছনে 'ধর, ধর' চিৎকার আর দৌড়ের শব্দ চলছে।

নদীর কাছে এসে রবি বলল, 'এই আখের বোঝা পিঠে নিয়ে সাঁতরাতি গেলি ধরা পড়ে যাব।'

সর্দারটা এবার এগিয়ে এল। হাতের দা ফেলে দিয়ে বলল, 'তিনটে আঁটিই আমার পিঠে বেঁধে দে। তোরা নিজেরা পার হ।'

কেউ আপত্তি করার সাহস পেল না। দ্রুত হাতে তিন আঁটি আখ এক করে বেঁধে দেওয়া হলো ছেলেটার পিঠে। তিনজন একসঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল চিত্রা নদীর পানিতে। পোকার মতো তরতর করে এগোল তিনটি ছেলে। বাকি দুজন ওপার পৌঁছানোর আগেই চোখ তুলে দেখল কাঁধে তিনটে আখের আঁটি নিয়ে পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের বন্ধু।

তাদের বন্ধু চিত্রা নদীর পোকা, তাদের বন্ধু টারজান অব তুলসী-বাগান। তাদের বন্ধু কৌশিক।

২.

নড়াইল কেন বিখ্যাত?

এই শহরে বাস করতেন কিংবদন্তি চিত্রশিল্পী এস এম সুলতান। এই শহরে বাস ছিল বাংলার অন্যতম সেরা লোককবি বিজয় সরকারের। এই শহরের রাস্তায় রাস্তায় আছে এমন শত বছরের অনেক অনেক কিংবদন্তি।

তবে নড়াইলের রাস্তাঘাট, নদী আর গাছপালাগুলোর কাছে জিজ্ঞেস করলে শুনতে পাবেন এই শহরে সবচেয়ে বেশি ছড়িয়ে আছে কিশোর কৌশিকের দৌরাত্ম্যের গল্প। ছড়িয়ে আছে দস্যু ছেলে কৌশিকের অনেক অনেক উপকথা।

কৌশিকের বয়স বছর পাঁচেক হতে না-হতেই পাড়ায় একঝাঁক বন্ধু বানিয়ে ফেলেছিল। সেই বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক আজও অমলিন। আজও রাত জেগে তাদের সঙ্গে নড়াইলে আড্ডা চলে, আজও ফাঁক পেলে সবাই মিলে একটু নদীতে নামা চলে। আর এই বন্ধুদের সঙ্গে মিলেই পুরো নড়াইল শহরকে চঞ্চল করে রাখত কৌশিক।

এই দুষ্টু ছেলের দলের দৌরাত্ম্য করার প্রধান জায়গা ছিল চারটি–মামাবাড়ির একেবারে কোলের তুলসী বাবুর বাগান, চিত্রা নদীর পাড়ে কুন্ডুদের বাগান, চিত্রা নদী এবং স্কুলের বড় মাঠ।

তবে দস্যুবৃত্তির সবচেয়ে বেশি শিকার ছিল তুলসী বাবুর বিরাট বাগান; কৌশিকদের ভাষায়–তুলসী-বাগান।

আমরা যখন নড়াইল গেলাম, এই ২০১৫ সালে সেই তুলসী-বাগানের বিশালত্ব, ঘনত্ব কিছুই আর নেই। এখন সে বাগানের মধ্যে মধ্যে বাড়ি তৈরি হয়েছে। সেই দৌরাত্ম্যের স্মৃতি হয়ে কয়েকটা সেকালের আমগাছ, নারকেলগাছ এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

কৌশিকের জনা বিশেক বন্ধু আর স্বয়ং কৌশিক এক একটা গাছ দেখিয়ে আটটা-দশটা করে গল্প করতে পারে। একটা নারকেলগাছ হঠাৎ করে যেন ডাক দিল। গাছটা দেখিয়ে সেই কালের গল্প একটা না বললেই নয়।

সেদিন বিকেল বেলায় সবাই খেলা থেকে ফিরেছে। খুব পানির তৃষ্ণা পেয়েছে।

কে কষ্ট করে পানি আনতে চাপকল পর্যন্ত যায়! সিদ্ধান্ত হলো কৌশিক কয়েকটা ডাবই পেড়ে নিয়ে আসুক। সিদ্ধান্ত হতে দেরি আছে, তরতর করে নারকেলগাছে চড়তে একটুও দেরি নেই। ওপর থেকে কৌশিক একটা করে ডাব ছিঁড়ে ফেলছে; আর নিচে দাঁড়িয়ে রবি বা সুমন সেগুলো ক্যাচ ধরছে। হঠাৎ একটা ডাব ছেড়ে দিলে সেটা মাটিতে পড়ার শব্দ হলো।

কৌশিক বিরক্ত–ডাবটা ক্যাচ ধরতে পারল না কেউ?

ধরবে কী করে! নিচে তাকিয়ে কৌশিক দেখে সেখানে কেউ নেই। সব পালিয়েছে। দাঁড়িয়ে আছেন তুলসী বাবু স্বয়ং। এবার উপায়? এবার তো হাতেনাতে ধরা।

হাতের লাঠি নেড়ে তুলসী বাবু বললেন, 'এবার নিচে আয়। আজ তোর একদিন কি আমার একদিন।'

সে তো কৌশিকও জানে। নিচে হাতের কাছে পেলেই তুলসী বাবু চামড়া তুলে নেবে। তাই বলে কি সারা দিন গাছের মাথায় বসে থাকা যাবে! নিচে তো নামতেই হবে।

নিচে নামল কৌশিক। তবে গাছ বেয়ে নয়। সেই মাথা থেকে ধপ করে লাফ দিয়ে পড়ল একেবারে তুলসী বাবুর সামনে। অত বড় নারকেলগাছের মাথা থেকে অমন দুম করে একেবারে সামনে ছেলেটার পড়া দেখে ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব মেরে গেলেন তুলসী বাবু। আর এই সুযোগটাই খুঁজছিল কৌশিক। পায়ে ব্যথা নিয়েও এবার সে এক দৌড়ে। দৌড়ে চিত্রা নদীর পাড়ে।

৩.

নাহিদ মামা ভেবেছিলেন, ছেলেটা তার বাবার মতো খেলোয়াড় হতে পারে। তবে ফুটবল-ক্রিকেট নয়; ছেলেটা হবে হয়তো সাঁতারু।

মনে না করার কোনো কারণ নেই।

কৌশিককে চিত্রা নদীর মাছদের একটা বলে মনে করায় কোনো অন্যায় ছোটবেলায় অন্তত ছিল না। বন্ধুদের মধ্যে সব কাজেই তো সর্দার ছিল। কিন্তু নদী তোলপাড় করায় শুধু সর্দার নয়, সম্ভবত নড়াইলের কিশোরকুলের সর্বকালের সেরা ছিল এই কৌশিক।

চিত্রা নদীই তার ঘর, চিত্রা নদীই তার বাড়ি।

ছোটবেলার এক বন্ধু রাজু বলছিলেন, 'আমরা সবাই নদীতে গোসল করতাম। কিন্তু ও আমাদের এক ঘণ্টা আগে নদীতে নামত। আর উঠত এক ঘণ্টা পর। ওর জ্বালায় এলাকার লোকজন নদীতে গোসল করতে যেতে পারত না। কারণ, যখনই আপনি নদীর পাড়ে যাবেন, দেখবেন দিব্যি সাঁতার কাটছে কৌশিক।'

কৌশিকের সে সাঁতার কাটা নিয়ে অনেক মিথও চালু আছে চিত্রা নদীর পাড়ে।

বলা হয়, স্রোতের বিপরীতে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার সাঁতার কাটত ছেলেটা। স্রোতের ব্যাপারে নিজে নিজেই অনেক চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছিল সে।

যারা স্রোতস্বিনী নদীতে সাঁতার কেটেছে, তারা জানেন এখানে সরলরেখায় নদী পার হওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। স্রোত আপনার সাঁতারের দিক বদলে দেবেই। কৌশিক একটা কাজ করত–দুপাশে দুদল বন্ধুকে বসিয়ে দিত; একেবারে সরলরেখা বরাবর।

তারপর আটবার, দশবার করে নদী পার হতো। ঠিক এপাশ থেকে সরলরেখায় যাত্রা করে ওপারের নির্ধারিত বিন্দুতে উপস্থিত হওয়া। স্রোতের পুরোটা প্রতিরোধ উপেক্ষা করে শারীরিক শক্তি দিয়ে সরলরেখাটা অক্ষুণ্ন রাখা।

নদী সাঁতারের ক্ষেত্রে আরেকটা চ্যালেঞ্জ ছিল তার। বন্ধুদের কাউকে পিঠে নিয়ে সাঁতার কাটা। একবার রাজুকে পিঠে নিয়ে সরলরেখায় আটবার নদী এপাশ-ওপাশ করেছিল বলেও কিংবদন্তি আছে!

নদী তো শুধু সাঁতার কাটার জন্য নয়; মাছ ধরার জন্যও বটে। তবে বড়শি বা জাল দিয়ে কৌশিকদের মাছ ধরার গল্প খুব একটা পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল মাছে

ভরপুর সেই বর্ষার সময়ে চিত্রা নদী থেকে হাত দিয়েই দু-চারটি মাছ ধরে বাড়িতে ফেরার গল্প।

যখন এই গল্প চলছে, তখনই কৌশিকের বাড়িতে বাজার এসেছে। নদী থেকে সদ্য ধরা মাছ দেখে 'আহা, উঁহু' করে উঠতে স্বয়ং টারজান-রাজ বললেন, 'আরেহ! এইটুকু মাছ দেখে এমন করছেন! রবি তো হাত দিয়ে এর চেয়ে ঢের বড় মাছ ধরে আনত। ঝাঁপ দিয়ে পড়লেই মাছ।'

চিত্রা নদীতে এই ঝাঁপিয়ে পড়ার কোনো রুটিন ছিল না।

সকালবেলায় ইচ্ছে হলো, স্কুলের আগে একবার সাঁতার কাটা। স্কুল শেষ করে একবার সাঁতার কাটা। আর বিকেলে খেলার পর তো নদী জয়। খেলার পর সোজাসুজি নদীতে নামলেও কথা ছিল। এই নদীতে নামার পথটাও বড় বিস্ময়কর। খেলা শেষ করে রাস্তা পার হয়েই শুরু হলো কুন্ডুদের বাগান।

হেঁটে এই বাগান পার হয়ে তবে চিত্রা নদী। এই হাঁটার 'কষ্ট' করাটা খুব আপত্তির ব্যাপার কৌশিকদের কাছে। এর চেয়ে সহজ হলো গাছের মাথায় মাথায় ঝুলে নদীর পাড়ে চলে যাওয়া!

বিশ্বাস হচ্ছে না?

একেবারে যারা গ্রামের মানুষ তারা এমন গাছের মাথায় মাথায় ঘুরে বেড়ানোর কৌশলটা দেখে থাকবেন। এ ক্ষেত্রে মূলত সুপারিগাছ ব্যবহার করা হয়। একটা সুপারির গাছে উঠে একটু দোল দিতে হয়; আস্তে আস্তে দোল বাড়লে গাছটা বাঁকা হয়ে পাশের গাছের কাছে চলে যায়; তখন লাফ দিয়ে পাশের গাছে চলে যেতে হবে। এই প্রক্রিয়াটা একবার শুরু করতে পারলে পরের ধাপগুলো চলতেই থাকে। প্রথম গাছ থেকে দ্বিতীয় গাছে লাফ দিয়ে এলে প্রতিক্রিয়া সূত্র অনুযায়ী পরের গাছটা এমনিতেই তার পরের গাছটার দিকে ঝুঁকে যায়। তখন একটার পর একটা পার হলেই চলে।

শুনতে কত সহজ শোনায় না? টারজান তো এমন সহজ সহজ কাজই করত!

এই টারজানীয় প্রক্রিয়ায় কুন্ডু বাগানের শেষ প্রান্তে এসে শেষ সুপারিগাছটার ওপর থেকে সরাসরি নদীতে দিতে হবে ঝাঁপ। এমন দৃশ্য চলচ্চিত্রে দেখে থাকবেন; নায়কেরা এমন করে থাকে বটে। এখানে পার্থক্য হলো নায়কের স্টান্টম্যান নেই কোনো!

৪.

পরদিন দুদলের ফুটবল খেলা।

খেলায় কিছু একটা পুরস্কার তো থাকতে হবে। পুরস্কার হিসেবে পছন্দ করা হলো তিন কাঁদি পাকা কলা। পছন্দ অনুযায়ী তুলসী বাবুর বাগান থেকে নিয়ে আসা হলো কলা; চুরি নয়, না বলে নেওয়া আর কী!

কলা এনে কৌশিকের মামাবাড়ির তিনতলায় নাহিদ মামার পাশের রুমে লুকিয়ে রাখা হলো।

কিন্তু কী দুর্ভাগ্য! খেলা শুরুর আগেই দুদলে ঘোরতর গোলমাল লেগে গেল। ফলে খেলা হলো না, পুরস্কারও আর দেওয়া হলো না। ঘটনার একদিন পর সব মিটমাট হয়ে গেলে কলার খোঁজ পড়ল।

কোথায় কলা!

তিনতলার ছাদে তিনটি কাঁদি পড়ে আছে। আর তার পাশে হতাশ হয়ে স্তূপ জমিয়েছে একগাদা কলার খোসা। কলার কোনো খবর নেই। কলা খেয়ে ফেলল কে বা কারা?

কারা নয়; বন্ধুরা একবার চোখ বুলিয়েই বুঝে ফেলল। চিৎকার উঠল, 'ওই কৌশিক! একা সবগুলো খাইছিস! দাঁড়া।'

কৌশিক তখন ছাদ থেকে সরাসরি তুলসীর বাগানে।

তিন কাঁদি কলা একবারে খেয়ে ফেলাটা শুনতে অনেক বড় শোনায় তবে কৌশিকের কাছে সেটা খুব বড় কোনো ব্যাপার নয়। এই পিচ্চি বয়সেই 'খাদক' হিসেবে বিশেষ নাম করেছিল আজকের বাংলাদেশের নায়ক। বাজি ধরে একবারে কাঁদি ধরে কলা খাওয়া, এক বসায় এক কুড়ি পেয়ারা খেয়ে ফেলার মতো ব্যাপারস্যাপার তো ছিলই। এমনকি বন্ধুদের সঙ্গে বাজারে গিয়ে গোলমাল দেখতে দেখতে হাত সাফাই করে কলা খেয়ে ফেলারও নজির আছে।

কৌশিকের খাওয়ার ব্যাপারে একটা গল্প খুব চলে।

তারা একবার ফুটবল খেলে পাশের পাড়ার ক্লাবের সঙ্গে ম্যাচ জিতল। সেই আনন্দে পাড়ার বড় ভাইয়েরা পুরস্কার ঘোষণা করলেন। হোটেলে পুরো দলকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'তোদের যা খুশি খা।'

বেশি কিছু নয়। কৌশিক নাকি নয় প্লেট ভাত খেয়ে ফেলেছিল!

৫.

সেদিন চৈত্র মাস।

ভরদুপুর। নামাজ শেষ করে কোরআন শরিফ পড়ছিলেন বেলা ম্যাডাম।

ওপরে তিনতলায় নতুন চালু হওয়া কোচিং সেন্টারে কাস চলছে। কৌশিক লাফঝাঁপ করে বেড়াচ্ছে। বন্ধু সাজু এসে বলল, 'চল ছাদে গিয়ে ছোঁয়াছুঁয়ি খেলি।' কত বয়স হবে, তখন? নয় কি দশ।

ছাদে দুজনের খুব ছোটাছুটি চলছে। হঠাৎ করেই সাজুর কী মনে হলো, কৌশিকের পিঠে একটা কিল দিয়ে দৌড়। এবার সাজুকে তো ধরতেই হবে। সাজু ছাদের কার্নিশ বেয়ে সুপারিগাছের দিকে ছুটল। পেছন পেছন ছুটছে

কৌশিকও। রেলিংয়ে হাত রেখে লাফ দিয়ে পড়ল কার্নিশে। কার্নিশেই স্তূপ করে রাখা পাটকাঠি।
পাটকাঠির ওপর পা পড়ল; পায়ের নিচ থেকে পুরো পৃথিবীটাই যেন সরে গেল। হাতে ধরার কিছু নেই, পা শূন্যে। তিনতলা থেকে ছিটকে পড়ল কৌশিক।
তারপর সব অন্ধকার।
***
জানালার পাশের রুমটাতেই কোরআন শরিফ পড়ছিলেন বেলা ম্যাডাম।
হঠাৎ ধড়াম করে বিশাল একটা শব্দ হলো। তারপরই 'মা' বলে একটা আর্তচিৎকার–কৌশিকের কণ্ঠ না!
কিছু বুঝতে বাকি রইল না নানির। কৌশিক ছাদ থেকে পড়েছে। কোরআন শরিফ বুকে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করলেন নানি। লোকজন পাগলের মতো ছুটছে। শুধু কানে শব্দ আসছে, 'কৌশিক ছাদেত্তে পড়িছে, কৌশিক ছাদেত্তে পড়িছে।'
চোখের পলকে পুরো পাড়া ভেঙে পড়ল বাড়ির মধ্যে।
কৌশিকের জ্ঞান আছে। কিন্তু কথা বলছে না। ঠিক কী হয়েছে বোঝার উপায় নেই। যেখানে পড়েছে, সেখানটায় এক বস্তা ইটের খোয়া রাখা ছিল। পাশেই বিশাল কংক্রিটের একটা স্ল্যাব। কোনটায় লেগেছে, কতটা ক্ষতি হয়েছে; বোঝার উপায় নেই।
খবর রটতে সময় লাগে না। বাড়ি থেকে মা ছুটে এসেছেন। পাগলের মতো ছেলেকে বুকে নিয়ে কাঁদছেন–এই কি সেই ফাঁড়া! নেপাল সরকারের বলা সেই ফাঁড়া!
****
নাহিদ মামা তখন কন্ট্রাকটারি করেন।
সকালবেলায় উঠে মোটরসাইকেল নিয়ে বেরিয়েছেন কাজের জায়গায় যাবেন বলে। মাঝপথে গিয়ে দেখেন মোটরসাইকেলটা একটু বিগড়ানোর লক্ষণ দেখাচ্ছে। কাজে না গিয়ে ফিরে এলেন বাড়িতে।
বাড়ির সামনে ফিরেই বুঝলেন, গোলমাল; অনেক বড় গোলমাল।
কে একজন তাকে দেখেই চিৎকার করে উঠলেন, 'ওরে নাহিদ, তোর ভাইগনে তো ছাদেত্তে পড়িছে।'
মোটরসাইকেলে স্টার্ট বন্ধ করা হলো না, চাবি লাগানো রইল, ফেলে দিলেন রাস্তার ওপরে। ছুটে ভেতরে চললেন। কয়েকটা মুহূর্ত কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। চারদিকের কান্না, কৌশিকের নীরবতা ও আচ্ছন্নতা দেখে পুরো পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে গেল।
কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নিজেকে সামলে নিলেন। বসে থাকলে চলবে না।
কৌশিককে বুকে জড়িয়ে নিয়ে ছুটলেন শহরের দিকে। মোটরসাইকেলটাও যেন

জোরে ছুটছে না। হাতের মধ্যে একটু কি অসাড় হয়ে যাচ্ছে কৌশিকের দেহ! নাহিদ মামা ডাক দিলেন, 'কৌশিক।'
একটু নড়ে উঠল ছেলেটা। একটু পর জিজ্ঞেস করল, 'মামা, আমি কি বাঁচবানি?'
এই একটা প্রশ্নে দুনিয়ার তাবৎ জল ঝরতে শুরু করল মামার চোখ থেকে। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'বাবা রে, তোর কিছু হবে না। আমি বেঁচে থাকতে তোর কখনো কিছু হবে না।'
আজও সেই প্রতিজ্ঞা মাথায় নিয়ে ঘোরেন। দুনিয়ার সব বদলে যেতে পারে, সারা দুনিয়ার সব মিত্র একদিন শত্রু হয়ে যেতে পারে। নাহিদ মামা থাকতে মাশরাফির কিছু হতে পারে না, কিছু হতে পারবে না।
সেদিন সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সদর হাসপাতালের চিকিৎসক নাহিদ মামাকে ডেকেছিলেন, 'নাহিদ, তোমার ভাগনের কপাল বলতে হবে। তিনতলা থেকে পড়ে এই ছেলের তো বাঁচারই কথা না। কিন্তু তার কিছু হয়নি। চামড়া-টামড়া যা ছিলে গেছে, ওষুধ দিয়ে দিলাম। শরীরে আর কোনো সমস্যা নেই। আঘাত ওর কিছু করতে পারবে না।'
সেটা তো এখন আমরা জানিই। আঘাত কৌশিকের কিছু করতে পারে না।

৬.

লোকটা ভালো লোক নয়।
স্থানীয় রাজনীতির পান্ডা, নেশা করে, এলাকায় মাস্তানি করে, লোকজনকে হুমকিধমকিও দেয়। এমন লোককে 'ভিলেন'ই বলা উচিত। কিন্তু জীবনটার একটা মজা হলো, এখানে ভিলেন আর নায়ক এমন সাদা-কালো নয়। একজন নায়কের মধ্যে থাকতে পারে লুকানো ভিলেন। আবার একজন ভিলেনের মধ্যেও কিছুটা নায়ক থাকতে পারে।
পলাশ ওস্তাদ লোকটার ভেতর খানিকটা নায়কোচিত ব্যাপারও লুকানো ছিল নিশ্চয়ই। আপাদমস্তক বখে যাওয়া এই লোকটার কিছু গুণের কারণেই হয়তো মাশরাফি বিন মুর্তজা আজ ক্রিকেটার!
আরেকটু পরিষ্কার করে বলা যাক।
পলাশ নামের এই লোকটাকে এখনো সবাই 'ওস্তাদ' পলাশ নামেই মনে করে। এমনিতে শতেক খারাপ গুণ থাকা সত্ত্বেও একটা দারুণ ব্যাপার ছিল, এলাকার পিচ্চিদের এক করে মাঠের খেলায় সংযুক্ত করে রাখা। কৌশিকরা যখন বড়দের সঙ্গে খেলার জন্য কাকুতি-মিনতি করেও সুযোগ পাচ্ছিল না, তখনই তাদের একত্র করে খেলার একটা সুযোগ করে দিলেন ওস্তাদ পলাশ।
রোজ সকালে প্রায় ৬০-৬৫ জনের এই বাহিনীকে নিয়ে মাঠের একপাশে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দিলেন।

কখনো সবাই মিলে গোলপোস্ট বানিয়ে দলে দলে ভাগ হয়ে ফুটবল খেলা, কখনো লাইন ধরে দাঁড়িয়ে পিটি করা এবং কখনো সস্তা কাঠের ব্যাট আর টেনিস বল দিয়ে ক্রিকেট খেলা। খেলা যা-ই হোক, ওস্তাদ পলাশ আছেন। আর আছে তার এই কচিকাঁচার আসর।

লোকটার হয়তো আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল।

এই বিশাল পিচ্চিদের দলটাকে পিটি করিয়ে, কিছু শারীরিক কসরত শিখিয়ে জাতীয় দিবসগুলোতে তার দলের ব্যানারে স্টেডিয়ামে হাজির করা। সে উদ্দেশ্য খুব একটা চরিতার্থ হয়নি কখনো। তবে কাজের কাজ হয়েছে। তার বেতের বাড়ির ভয়ে ভোররাতে ঘুম থেকে উঠে মাঠে এসে দৌড় শুরু করে দিয়েছে কৌশিকরা। তার রক্তচক্ষুর ভয়ে খেলাটাকে সিরিয়াস একটা ব্যাপার হিসেবে নিয়েছে এই বিশাল বাহিনী।

সেই বছর সাত-আটেক বয়স থেকে খেলাটা কেমন সিরিয়াস হয়ে উঠল, সে কথা বলছিলেন মাশরাফির ক্রিকেট বিষয়ে আলোচনা করার অন্যতম সঙ্গী, সাবেক জাতীয় পর্যায়ের ক্রিকেটার ও নড়াইলের সেই বন্ধু বাহিনীর একজন মানস কুন্ডু, 'আমরা সেই বয়স থেকেই খেলাধুলাটাকে খুব সিরিয়াসলি নিয়েছি। শুধু মজার জন্য তো খেলেছিই। কিন্তু আমাদের কাছে কখনোই মনে হয়নি, খেলাটা একটা টাইম পাস। ওস্তাদ পলাশের সিরিয়াসনেসের জন্যই এটা হয়েছে হয়তো। আজ আমরা অনেকেই খেলার সঙ্গে নেই। কিন্তু খেলাটা এখনো আমাদের কাছে সিরিয়াস ব্যাপার।'

পরের জীবনে এটা হয়তো আরও সিরিয়াস হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই বয়সটা ছিল আসলে টেপ টেনিসে বিশ্বজয়ের বয়স।

সব খেলাই চলত তখন স্কুলমাঠে। বর্ষায় ফুটবল, শীত এলে বড়দের কোর্টে এক ফাঁকে একটু ব্যাডমিন্টন, স্কুলে একটু টেবিল টেনিস। সেটা তো সব খেলারই বয়স। তবে টেপ টেনিস খেলা নিয়েই ছিল সেই বয়সের সব উত্তেজনা।

টেপ টেনিস ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন?

এমনি এই টেনিস বল। সেটার ওপরে টেপ পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে শক্ত করে তোলার চেষ্টা আর কী!

এই টেপ টেনিসে সে সময়ের সেরা ব্যাটসম্যান হয়ে উঠল কৌশিক। বেশির ভাগ সময়ই দলের হয়ে ওপেন করত। ২০ ওভারের ম্যাচেও সেঞ্চুরি করে ফেলার রেকর্ড আছে মারকুটে এই ওপেনারের।

সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই; টেপ টেনিসের এই ক্রিকেট চলছে। ২০ ওভারের ম্যাচ হয়, ৫০ ওভারের ম্যাচ হয়, দুই ইনিংসেরও ম্যাচ হয় তাদের নিজেদের মধ্যেই। আবার লিগও হয় বছরের লম্বা একটা সময় ধরে।

এদের সিরিয়াসনেস বোঝার সবচেয়ে মজার তথ্য হলো, প্রতিটি ম্যাচের বিস্তারিত

পরিসংখ্যান সংরক্ষণ করা হতো। প্রতিটি ম্যাচ শেষে কে কত রান করল, কে কত উইকেট পেল; এই নিয়ে হিসাব চলত। কে কত করলে কাকে টপকাবে, সেই নিয়ে উত্তেজনা। মৌসুম শেষের সেরা ব্যাটসম্যান ও সেরা বোলারের তো মাটিতে পা পড়ে না!

জানা গেল, এই টেপ টেনিসের ক্রিকেটে যত দূর মনে করা যায় টানা পাঁচ মৌসুম সর্বোচ্চ স্কোরার ছিল কৌশিক; জি, আজকের ফাস্ট বোলার মাশরাফি বিন মুর্তজা। একই সঙ্গে আরেকটা দুঃখজনক তথ্য–প্রায় কোনো মৌসুমেই মাশরাফি সেরা পাঁচ বোলারের মধ্যে থাকতে পারত না।

৭.

ভেতরের ঘর থেকে ডাক এল, 'কৌশিক।'

'জি।'

'এখন দুপুর বেলায় খেলতে যেয়ো না। একটু ঘুমাও।'

'জি। ঠিক আছে।'

বাধ্য ছেলের মতো কথাটা মেনে নিয়ে ঘরে এল কৌশিক। বিছানায় চুপ করে বসল। যেন কারো জন্য অপেক্ষা করছে। একটু পরই বোঝা গেল ব্যাপারটা।

জানালায় দেখা গেল একটা মুখ–রাজু। কোনো বাক্যবিনিময় হলো না। চুপি চুপি উঠে গিয়ে পা টিপে টিপে একটা পলিথিনের কালো ব্যাগ এনে ধরিয়ে দিল কৌশিক; ব্যাগের মধ্যে বেশ কয়েকটা জামাকাপড় বলে মনে হচ্ছে। পলিথিনের ব্যাগটা নিয়ে রাজু আস্তে আস্তে উধাও হয়ে গেল।

আবার কয়েকটা মুহূর্ত বিছানার ওপর বসে রইল কৌশিক।

এবার আস্তে আস্তে উদাস ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল বাইরের দিকে। পায়ের শব্দ পেয়েই নানি হাঁক দিলেন, 'কৌশিক! কোথায় যাচ্ছ?'

'কোথাও না নানি। একটু টয়লেটে যাব।'

টয়লেটে যাওয়ার ভঙ্গিতেই লুঙ্গি পরে আস্তে আস্তে উঠোনে নেমে এল। তারপরই হঠাৎ পুরো চলচ্চিত্রের গতি গেল পাল্টে। ধীরে চলতে থাকা সাদা-কালো সিনেমা এক লহমায় রঙিন হয়ে গেল; কৌশিক ভোঁ একটা দৌড় দিল লুঙ্গি মালকোচা দিয়ে!

মালকোচা ব্যাপারটা মনে হয় বুঝিয়ে বলা দরকার; এরপরও আমাদের এই বইয়ে এই 'পোশাক'টার কথা বারবার আসবে। এটা আসলে লুঙ্গি পরার একটা স্টাইল। লুঙ্গিটা পায়ের ভেতর থেকে উল্টো দিকে গুটিয়ে এনে পেছনে কোমরের দিকে লুঙ্গির বাঁধনের ভেতরই গুঁজে দেওয়াটা হলো কোচা-মারা। আর এটারই একেবারে সংক্ষিপ্ততম স্টাইল হলো মালকোচা। যেখানে লুঙ্গি ছোট হয়ে কোনোক্রমে লজ্জা নিবারণ করবে অন্তর্বাসের মতো।

লুঙ্গি থাকবে; তবে না থাকার মতো করে!

মাশরাফির প্রথম ক্রিকেট অভিভাবক শরীফ মোহাম্মদ বলছিলেন, 'কালো পলিথিনে ভরে ট্রাউজার আর জার্সি নিয়ে মাঠে আসত। আমরা দূর থেকে মাঝে মাঝে দেখতাম, মালকোচা দিয়েই হয়তো ব্যাট করছে। কোনো কারণে হয়তো নানিকে লুকিয়ে পলিথিনের ব্যাগ আনতে পারেনি।'

তবে এই টেপ টেনিস খেলার আরও একটা বিড়ম্বনা ছিল।

এদিকে নানির বাড়ি থেকে পালিয়ে তো আসা গেল। কিন্তু খেলা তো সেই নিজেদের বাড়ির পাশেই। বাড়ি থেকে জানালা দিয়ে তাকালেই মাঠ দেখা যায়। বাড়ির মধ্যে বাবা ঘোরাঘুরি করেন। তিনি যদি দেখে ফেলেন!

এরও একটা বুদ্ধি বের হলো–মাশরাফি ফিল্ডিং করবে টিনের ঘরের পেছনে।

আশ্চর্যজনকভাবে মাশরাফিদের বাড়ির কাছেই মাঠের কোনায় একটা টিনের শেড আছে। ওই শেডে বসে অনেকে খেলা দেখেন। এই শেডটা তার আত্মরক্ষার কাজে লাগানোর বুদ্ধি হলো। কৌশিকের ফিল্ডিংয়ের স্থায়ী পজিশন হলো ওই শেডের গায়ে। ওখানে থাকলে বাসা থেকে দেখা যাবে না!

৮.

শরীফ মোহাম্মদ একজন মোষ তাড়ানো মানুষ।

অবস্থাসম্পন্ন ঘরের ছেলে। নিজে একসময় ক্রিকেট খেলতেন। স্বপ্ন ছিল, ঢাকায় খেলবেন, নাম করবেন। কিন্তু দশচক্রে সে আর হয়ে ওঠেনি। কালের স্রোতে খেলা ছাড়ি ছাড়ি করছেন। নিজে টুকটাক ক্রিকেট বলে খেলেন তখনো। কিন্তু মূল নেশা নড়াইল থেকে সত্যিকারের ক্রিকেট বলের খেলোয়াড় তৈরি করা।

পড়ন্ত বয়সের খেলোয়াড় শরীফ মোহাম্মদ তত দিনে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট সেক্রেটারিও হয়ে গেছেন। শুধু একটা লক্ষ্য নিয়েই ছুটে বেড়ান–কী করে জেলা ক্রিকেট দলটাকে আরও শক্তিশালী করে তোলা যায়।

আরও শক্তিশালী একটা দল করতে ছোট ছোট ছেলেদের ক্রিকেট বলে সত্যিকারের প্রশিক্ষণ দিতে হবে, এটা বোঝেন। ছোট ছেলেগুলোর খেলা দেখেন পাশে দাঁড়িয়ে। বুঝতে পারেন, এই দলে একঝাঁক অসম্ভব প্রতিভাধর খেলোয়াড়ও আছে। একটু শেখালে এবং নিয়মিত অনুশীলন করালে এরা সম্পদ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সমস্যা হলো, এই দুষ্টু ছেলের দল টেপ টেনিসে ছাড়া ক্রিকেট খেলবে না। আর টেপ টেনিস দিয়ে তো দেশ জয় করতে পারবেন না শরীফ মোহাম্মদ।

মানস, রিমনের মতো দু-একটা ছেলেকে পেয়েছেন এই ব্যাচ থেকে। কিন্তু ক্রিকেট বলে তার আরও দরকার। দরকার কৌশিকদের।

রোজ তাই এই বাহিনীর কাছে গিয়ে বসে থাকেন, নিজের খেলা–অনুশীলন শেষ করে গিয়ে বোঝাতে থাকেন, 'তোরা আয়, ক্রিকেট বলে প্র্যাকটিস কর।'

খাওয়ার লোভ, বেড়ানোর লোভ দেখিয়েও কাজ হয় না।

ছেলেরা আছে টেপ টেনিসের হিসাব, খ্যাপ আর লিগ নিয়ে ব্যস্ত। ক্রিকেট বলে সেজেপরে ওসব প্র্যাকটিস করার সময় তাদের নেই। কিছুতেই কাজ হয় না। একদিন না পেরে শরীফ মোহাম্মদ একটা সমঝোতা প্রস্তাব দিলেন, 'আমরা তোদের সঙ্গে টেপ টেনিস খেলব।'

'তাই! আসেন, আসেন।'–খুব রাজি পিচ্চিগুলো।

এবার শরীফ মোহাম্মদ বিনিময়টা চাইলেন, 'বদলে তোদের প্রতিদিন সকালে আর বিকেলে খানিকটা সময় করে ক্রিকেট বলে প্র্যাকটিস করতে হবে। ব্যাট-বল-প্যাড; সব আমি দেব।'

এরপরও কি না বলা যায়!

নিতান্ত বাধ্য হয়ে ক্রিকেট বলের এই বিরক্তিকর খেলায় রাজি হলো কৌশিকরা। শুরু হলো দুষ্টু ছেলেদের জীবনের আরেক অধ্যায়–চামড়ার বলে সেজেপরে ক্রিকেট খেলার অধ্যায়।

চিত্রা-রূপসা-পদ্মা



১.

ক্লাবে ক্লাবে গণ্ডগোল তো নতুন কিছু নয়।

নড়াইলের এই ছেলেগুলোর নিজেদের কোনো ক্লাব ছিল না। কেউ বয়েজ ক্লাবে, কেউ ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে খেলত। এই খেলতে গিয়ে নিজেদের মধ্যেও কখনো কখনো গোলমাল লেগে যেত। এমনও হয়েছে যে নিজেদেরই দুই গ্রুপে রীতিমতো হাতাহাতি হয়েছে, ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে।

সন্ধ্যাবেলায় নদীতে ঝাঁপানোর সময় অবশ্য আবার সব মিটমাট হয়ে যেত।

কিন্তু সেবার বয়েজ ক্লাবের সঙ্গে যে গোলমাল হলো, তা আর কিছুতেই মেটার নয়। ব্যাপারটা একেবারে সম্মানেও লেগে গেল কৌশিক-বাহিনীর। সন্ধ্যাবেলায় সব ক্লাবে খেলতে থাকা বিশাল এই গ্রুপ এক হলো আতিয়ার রহমান সাহেবের তিনতলা বাড়ির সামনের চায়ের দোকানে–এভাবে আর চলতে পারে না; নিজেদের একটা ক্লাব চাই।

'ক্লাব চাই' বললেই তো হলো না। ক্লাবের জন্য জায়গা চাই, ক্লাবের রেজিস্ট্রেশন চাই। জায়গা না হয় নানার বাড়ির কোনো একটা ঘরকে ক্লাবঘর বলে

দেওয়া যাবে। কিন্তু রেজিস্ট্রেশন?
রেজিস্ট্রেশন করতে ফি লাগবে। আবার সেটা করাতে সেই মূল শহরের আরেক মাথায় সবাই মিলে যাওয়ার ভাড়া লাগবে। এর ওপর পকেট খুঁজে কোনোক্রমে দেখা গেল রেজিস্ট্রেশন ফির টাকাটা জোগাড় হচ্ছে। কিন্তু শহরে যাওয়ার ভাড়া নেই। তাহলে উপায়?
পরদিন সকালে উঠে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেল বাহিনী। গার্লস স্কুলের বাস যাচ্ছে শহরের ওদিকে। হাতের ইশারায় থামিয়ে বিচ্ছুবাহিনী চলল শহরে; ক্লাব রেজিস্ট্রেশন করাতে।
জন্ম নিল কৌশিকদের নিজের ক্লাব–শুভেচ্ছা ক্লাব।

২.
আরিচা ফেরিঘাট।
রাতের অন্ধকারে নদীর কিছুই দেখা যায় না। শুধু কালো আর কালো। পাশ থেকে কেউ একজন বলল, 'কৌশিক, এই নদী সাঁতার কেটে পার হতে পারবি?'
কৌশিকের দুনিয়ায় কোনো ব্যাপারেই ডর নেই। ঠোঁট উল্টে বলে, 'পারব না কেন!'
কৌশিকরা ঢাকায় চলেছে। জীবনে এই প্রথম সজ্ঞানে ঢাকা-যাত্রা। বেড়াতে নয়, রীতিমতো খেলতে। খেলাধুলার জন্য এই প্রথম ঢাকার বাইরে পা রাখছে নড়াইলের স্কুলছাত্র মাশরাফি বিন মুর্তজা কৌশিক।
নড়াইল জেলা ক্রীড়া সংস্থার অনেক অপবাদ দেওয়া চলতে পারে, স্কুল ক্রিকেট, বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে অংশ নেওয়ায় ঘাটতি ছিল না কোনো কালে। এর আগেও কয়েক মাস নির্মাণ স্কুল ক্রিকেটে অংশ নিয়েছে নড়াইলের বিভিন্ন স্কুল দল। এবার সঙ্গী হয়েছে অবশ্য পরবর্তীকালের এক ইতিহাস।
এবার সঙ্গী হলো সপ্তম শ্রেণীপড়ুয়া কৌশিক।
ঢাকায় এসে স্কুল ক্রিকেটে খুব বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ অবশ্য হলো না। বড় বড় চোখ করে ঢাকা ঘুরে বেড়ানো আর দলের সঙ্গে মাঠে যাওয়াই সার হলো। শেষ পর্যন্ত অমন খালি হাতে ফিরে আসাটাই হয়তো নিয়তি হতো। কীভাবে যেন দুটো ম্যাচে মাঠে নামার সুযোগ হলো। প্রথম ম্যাচ খেললেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের একটা স্কুলের বিপক্ষে। দ্বিতীয় ম্যাচ স্কলাস্টিকার বিপক্ষে। ব্যাটে-বলে খুব মনে রাখার মতো কোনো পারফরম্যান্স ছিল না।
তবে একটা ব্যাপার মনে না রেখে একদম উপায় নেই–বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম।

৩.
বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামটা টিভিতে দেখেছে কৌশিক।
এখানে আন্তর্জাতিক খেলা হয়; এখানে শচীন-লারারা খেলেছে। এখানে বাংলাদেশের আকরাম ভাই, বুলবুল ভাই খেলেছেন। এই স্টেডিয়াম না চিনে উপায় আছে?
কিন্তু স্টেডিয়ামের কাছে এসে মনটাই খারাপ হয়ে গেল তার। পাশের এক বন্ধুকে ডেকে বলল, 'এত ছোট মাঠ! টিভিতে কত বড় মনে হয় না?'

বন্ধুটি বলল, 'চল আগে ভিতরে ঢুকে দেখি।'
ভেতরে ঢুকেই অবশ্য চোখটা ছানাবড়া হয়ে গেল। আসলেই তো বিশাল; এ তো সমুদ্রের মতো বিশাল স্টেডিয়াম। কত লোকের বসার জায়গা। এর চেয়ে বড় স্টেডিয়াম মনে হয় পৃথিবীতে আর নেই!
যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই বিস্ময়। এ পাশে কেউ ব্যাট করে, ও পাশে কেউ বল করে। আবার মাঝে কয়েকজন দৌড়ঝাঁপ করছে মনে হয়। হঠাৎ এক পাশে নেটে দাঁড়িয়ে ব্যাট করতে থাকা একজন খেলোয়াড়ের দিকে চোখ গেল। ওনাকে কোথায় যেন দেখেছি; কোথায় যেন দেখেছি!
পাশের বন্ধুকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল কৌশিক, 'এই ব্যাটসম্যানরে কোথায় দেখিছি না?'
'হ্যাঁ। আমিও তো মনে করতি পারি না।'
হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মতো মনে হয়ে গেল–ওনার নাম ফারুক; ফারুক আহমেদ। টিভিতে কবে যেন দেখেছে ওরা। বাউন্ডারির পাশে দাঁড়িয়ে চোখ বড় বড় করে ফারুকের ব্যাটিং দেখছে কৌশিকরা। হঠাৎ একটা স্কয়ার কাট করলেন ফারুক। বল ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল; দৌড়ের ওপর নিচু হয়ে এক হাতে বল ধরে ফেলল কৌশিক। একটু বিরক্তি, একটু বিস্ময়ভরে লিকলিকে লম্বা ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইলেন ফারুক আহমেদ।
তিনি জানেন না যে, পরবর্তীকালে তার বছরের পর বছরের নানা ভূমিকার ঘনিষ্ঠ মানুষ হয়ে উঠবে ওই ছেলেটি। তাদের প্রধান নির্বাচক-অধিনায়ক জুটি বাংলাদেশে একসময় ইতিহাস তৈরি করবে।

৪.
সে বছরটা কৌশিকের জীবনের বাঁক বদলাতে থাকা একটা বছর বুঝি।
যে কৌশিক এর আগে নড়াইলের বাইরে কখনোই খেলতে যায়নি; এ বছর দু-দুটি বড় সফরে নাম লিখিয়ে ফেলল। প্রথমে জেলা বয়সভিত্তিক দলের হয়ে জাতীয় বয়সভিত্তিক ক্রিকেট খেলতে ঝিনাইদহ। এরপর আবার নির্মাণ স্কুলের ম্যাচ খেলতে সাতক্ষীরা।
এই দুটো টুর্নামেন্টই খুব ঘটনাবহুল ছিল।
বুঝতে শেখার পর বড় একটা টুর্নামেন্টে খেলতে যাচ্ছে; ব্যাটসম্যান কৌশিকের রাতের ঘুম পুরো নষ্ট হয়ে গেছে। থাকার ব্যবস্থা হয়েছে ঝিনাইদহ স্টেডিয়াম-সংলগ্ন ডরমিটরিতে। রাত একটার দিকে ছেলেগুলোকে দেখতে এসেছেন শরীফ মোহাম্মদ। হতভম্ব হয়ে দেখেন, খাটের ওপর প্যাড পরে, ব্যাট হাতে ঘুমিয়ে আছে একটা ছেলে–কৌশিক।
একবার ভাবলেন ডাক দিয়ে ধমক দিয়ে ঠিকঠাক হয়ে ঘুমাতে বলবেন। তারপর নিজেই চুপচাপ চলে গেলেন। নিজেই নিজেকে বললেন, এই ভালোবাসাই ওর জীবনের পথ বদলে দেবে। ক্রিকেট শুধু রোজকার খেলা নয়; ভালোবাসা। এই ছেলেটা ভালোবাসতে জানে।

খেলায় কী হয়েছিল, ঠিকঠাক সবাই মনে করতে পারে না। কেউ বলে কৌশিক ৪ উইকেট নিয়েছিল, কেউ বলে ষাটের ঘরে কী একটা রান করেছিল। তবে এসব মনে না থাকলেও বাড়ি ফেরার গল্পটা সবার মনে আছে।
রাজু আর কৌশিক আগে আগে ঝিনাইদহ থেকে নড়াইল রওনা দিল। বাসস্ট্যান্ডে এসে দুজন ঠিক করল, বাসের ছাদে যাবে। একে পিচ্চি ছেলে, তার ওপর ছাদে যাবে; ভাড়া নিশ্চয়ই লাগবে না। তাহলে ভাড়ার টাকা দিয়ে কী করা যায়?
দুটো পেপসি কেনা হলো। কাচের বোতল থেকে দুটো পলিথিনে পেপসি ঢেলে উঠল দুজন ছাদে। এবার পলিথিনের নিচের দিকে ছোট একটা ফুটো করে মুখে দিয়ে চলল পেপসি খাওয়া। বাস ছুটছে, চুল উড়ছে এবং ছেলে দুটো হেসে গড়িয়ে পড়তে পড়তে পেপসি খাচ্ছে!
কদিন পরই আবার নির্মাণ স্কুল খেলতে সাতক্ষীরায় যাত্রা। এই যাত্রাটা প্রথম নির্মাণ স্কুলের মতো অতটা নিষ্ফল হলো না। এবার কোনো একটা স্কুল দলের বিপক্ষে খুব অল্প বলে ঝোড়ো একটা সেঞ্চুরি করে দৃষ্টি কেড়ে ফেলল কৌশিক। লোকেরা বলল, এই ছেলে একদিন বড় ব্যাটসম্যান হবে।
লোকে তো কত কী ভাবে!

৫.
বিকেএসপি আসছে মাগুরায়।
জেলায় একেবারে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। আমাদের ছেলেগুলোকে এবার ক্যাম্পে সুযোগ পাওয়াতে হবে। ক্যাম্প হবে মাগুরায়। কিন্তু খুলনা বিভাগের প্রতিটা জেলায় তার আগে ট্যালেন্ট হান্ট হবে। আর সেখান থেকে বাছাই করা ছেলেদের নিয়ে মাগুরায় এক মাসের আবাসিক ক্যাম্প।
নড়াইলের কর্মকর্তারা মোটামুটি নিশ্চিত, কৌশিকদের ব্যাচ থেকে বেশ কয়েকটা ছেলে চান্স পেয়ে যাবে এবারের ক্যাম্পের জন্য। সে জন্য সব ঠিকঠাকও করা হলো।
পরদিন সকালে বিকেএসপির মাগুরার প্রশিক্ষক আশরাফুল ইসলাম বাপ্পী আসবেন। তার থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। বাছাইপ্রক্রিয়ায় জোগাড়যন্ত্র করতে হবে। এলাকার আরও যারা আগ্রহী আছে, তাদের জানানোর জন্য মাইকিং করতে হবে। এসব নিয়ে ব্যস্ততায় আগের বিকেলটা কেটে যায়।
সবই ঠিক ছিল। সকালে মাঠে খুদে ক্রিকেটারদের ভিড়ও লেগে গেল। কিন্তু আসল লোকেরাই তো নেই! কৌশিকদের দলটাই তো নেই। তারা কোথায়!
শরীফ মোহাম্মদের মাথায় বাজ পড়ল।
সবই করা হয়েছে, কৌশিক-রাজু-সাজুদের বলা হয়নি থাকতে। বলাটা জরুরিও ছিল না। ওরা তো সারা দিন এই মাঠেই থাকে। আলাদা করে বলার দরকার কী?
কিন্তু এমন দিনেই লাগল গোলমাল। ওদের দল আবার দূরের কোন এক গ্রামে গেছে টেপ টেনিসের এক ম্যাচ খেলতে। তখনকার দিন; মোবাইলও নেই যে, ডেকে আনবেন। বিভ্রাট টের পেতে পেতে দুপুর হয়ে গেছে। তখন গিয়ে ওদের

কেউ এই বাছাই চলা অবস্থায় ধরে আনবে; সে সম্ভাবনাও নেই।
শরীফ মোহাম্মদ সঙ্গে সঙ্গে একটা উপায় ভেবে ফেললেন।
বাপ্পী স্যারের কাছে গিয়ে বললেন, 'কোচ, আপনি তো কুষ্টিয়া চলে যাবেন?'
'জি।'
'এই বিকেল বেলা এত কষ্ট করে লাভ আছে? ওখানে যাবেন, আবার কোন হোটেলে উঠবেন। ওর চেয়ে এখানে থাকুন। রাতে আমরা গল্পগুজব করব। কাল ভোরের গাড়িতে উঠে পড়বেন। ওখানে ট্রায়াল শুরুর আগে পৌঁছে দেব।'
বাপ্পী স্যার তো আর ভেতরের কিছু জানেন না। তিনি ভাবলেন, প্রস্তাব মন্দ নয়। এই সন্ধ্যাবেলা অচেনা জায়গায় হোটেল খোঁজার চেয়ে নড়াইলই ভালো।
বাপ্পী স্যার রাজি হতেই শুরু হলো শরীফ মোহাম্মদের আরেক তৎপরতা। রাতের অন্ধকারেই কৌশিকদের সবাইকে ডেকে আনলেন। বললেন, সূর্য ওঠার আগে হাজির হতে হবে মাঠে। এবার আবার বাপ্পী স্যারের কাছে বললেন, 'কোচ, একটা অনুরোধ ছিল।'
'বলেন।'
'আমার কয়েকটা ছেলেকে কাল ভোরবেলায় একটু দেখবেন?'
'দেখলাম তো আজ সবাইকে।'
'নাহ। আসলে সবচেয়ে ভালো ছেলেগুলো শহরে ছিল না। ভোররাতে যদি একটু দেখতেন।'
তারপর ইতিহাস। সূর্য ওঠার সেই মাহেন্দ্রক্ষণে আরও কয়েকটা ছেলে পছন্দ করে ফেললেন বাপ্পী স্যার। আর কৌশিকরা চললেন মাগুরায়; বিকেএসপির ক্যাম্পে।
কৌতূহলী পাঠক, একটা কাকতাল খুঁজে পেতে পারেন।
এই বাপ্পী স্যার আবার সাকিব আল হাসানেরও কোচ বটে। মজাটা হলো, মাশরাফি নড়াইলে বাছাই পরীক্ষা নিয়ে ক্যাম্প করেছিলেন সাকিবের শহর মাগুরায়। আর সাকিব মাগুরায় বাছাই পরীক্ষা দিয়ে ক্যাম্প করেছিলেন এসে মাশরাফির শহর নড়াইলে।
পরবর্তীকালে সাকিব বলেছেন, 'আমার নড়াইল ক্যাম্পে যাওয়ার একটা বড় কারণ ছিল মাশরাফি ভাইকে দেখা যাবে।'
আর মাশরাফি স্মৃতিচারণা করে বলেছিলেন, 'নড়াইলে ফয়সাল নামের ছেলেটা যখন ক্যাম্পে এল। আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল বাপ্পী স্যার। বলেছিল–সবাইকে তো পেটাও, এই ছেলেটার বল পেটাও তো। আমি পারিনি সেদিন।'
সাকিবের ডাকনাম ফয়সাল!

৬.
মনটা খুব খারাপ কৌশিকের।
বাড়ি ছেড়ে এক-দুদিন বেড়াতে যাওয়া ঠিক আছে। তাই বলে তিন মাসের জন্য বাড়ি ছেড়ে মাগুরায় গিয়ে থাকতে হবে!
ক্রিকেট যতই ভালো লাগুক, এটা কিছুতেই ভালো লাগছে না। কিন্তু এখন আর

কিছু করারও নেই। বিকেএসপির ক্যাম্পের জন্য নির্বাচিত হয়ে গেছে। না গেলে মোহাম্মদ ভাইরা পেটাবেন। মন খারাপ করে, কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে এক বিষণ্ন বিকেলে তাই কৌশিক চলল মাগুরায়।

থাকার ব্যবস্থাটা নিতান্ত মন্দ নয়।

মাগুরা জেলা স্টেডিয়ামের ভেতরে ছেলেদের থাকার জন্য একটা হোস্টেল মতো আছে। লোহার খাটের ওপর তোশক বিছানো। আবার কিছু ঢাকা বিছানার ব্যবস্থাও আছে। একটু দুর্গন্ধ আছে বটে। তবে তা নিয়ে অভিযোগ নেই কৌশিকের। অভিযোগ যেটুকু, তা শুধু বন্ধুদের ছেড়ে, নানিকে ছেড়ে, মাকে ছেড়ে এই পাশের জেলায় এসে পড়ে থাকা।

পরদিন সকাল থেকে শুরু হয়ে গেল বাপ্পী স্যারের ক্যাম্প।

প্রথমে একটু শরীর গরম করে নেওয়ার জন্য কিছু ড্রিল। তারপরই সরাসরি বোলিংয়ে হাতেখড়ি। নিজের মতো করে পরপর কয়েকটা ডেলিভারি দিল কৌশিক। এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখলেন বাপ্পী। এবার ডাক দিলেন, 'কৌশিক, এদিকে আসো।'

সুবোধ বালক কৌশিক এসে দাঁড়াল স্যারের কাছে। বলটা হাতে ধরিয়ে স্যার বললেন, 'দেখি ইনসুইং গ্রিপটা তোমার।'

কৌশিক ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। গ্রিপ ব্যাপারটা সে জানে। কিন্তু ইনসুইং গ্রিপটা আলাদা করে দেখাবে কী করে। সে জানে, ইনসুইং কী করে করতে হয়; কিন্তু তার কলাকৌশল তো কেউ কখনো বাতলে দেয়নি তাকে। এবার শুরু হলো সেই বাতলে দেওয়া।

পরবর্তী জীবনে কৌশিক থেকে মাশরাফি হয়ে ওঠা সেদিনের এই কিশোর বারবার বলেছে, তার প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিক ক্রিকেট শেখা শুরু মাগুরায় বাপ্পী স্যারের ওই ক্যাম্পে। প্রবল কৃতজ্ঞচিত্তে মাশরাফি বারবারই উল্লেখ করেছেন, একজন ফাস্ট বোলারকে আসলে যেসব ব্যাপারস্যাপার সর্বোচ্চ পর্যায়ে বল করতে হলে জানতে হয়, তা তিনি ওই বাপ্পী স্যারের ক্যাম্প থেকেই শিখেছিলেন।

প্রথম কয়েকটা দিন বন্ধুদের ছেড়ে, এলাকা ছেড়ে থাকায় একটু মন খারাপ ছিল। কিন্তু এই ক্যাম্পের জীবন কয়েকটা দিন যেতেই আরেকটা নতুন জগৎ হয়ে উঠল কৌশিকের জন্য।

এখানে সন্ধ্যার পর একঝাঁক নতুন বন্ধুর সঙ্গে মিলে আড্ডা দেওয়া যায়। এখানে সকাল-বিকেল নানা রকম দুষ্টুমি করা যায়। আর সারা দিন ক্রিকেট নিয়েই থাকা যায়। সবচেয়ে বড় কথা, এখানেই ক্রিকেটের প্রথম মজাটা পাওয়া শুরু করল কৌশিক। এই খেলাটার মধ্যে, এই এতটুকু বলের মধ্যে এত যে জাদু লুকানো আছে, সেটা আবিষ্কার শুরু হলো।

৭.

'কী, শালা! খুব নাকি ক্রিকেট খেলো?'–নানার মুখভরা হাসি।

নাতি মাথা নিচু করে বলে, 'অল্প অল্প...'

'অল্প অল্প কলি তো হবে না। চলো আমার সঙ্গে। দেখি কেমন খেলতে পারো।'
এই নানা হলেন মফিজ নানা।
কৌশিকের মায়ের মামা। মফিজ নানা খুলনার প্রবীণ ও নামকরা সংগঠক। মূলত খুলনা মোহামেডানের দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ সংগঠক। ভাগনির বাড়িতে বেড়াতে এসে শুনলেন দীর্ঘদেহী কিশোর নাতিটা তার বেশ বল করে, ব্যাটও করে দারুণ।
নাতিকে তাই অনেকটা ধরেই নিয়ে গেলেন খুলনায়। অনেকটা ঝুঁকি নিয়েই একটা ম্যাচও খেলতে নামিয়ে দিলেন। কিন্তু নামিয়েই বিপদে পড়ে গেলেন। খুলনার দোকানদারদের কারো কাছে চেস্ট গার্ড নেই। ফলে মাশরাফিকে আর খেলানো হলো না!
রহস্যটা বুঝতে পারেননি?
মোহামেডানের হয়ে সেদিন ৮.৩ ওভার বল করেছিল কৌশিক। তাতে ২৪ রান দিয়ে তুলে নিয়েছিলেন ৩টি উইকেট। গল্পটা এই উইকেটের নয়। গল্পটা হলো ব্যাটসম্যানদের ত্রাসে পরিণত হওয়ার।
মাশরাফির বল খেলতে গিয়ে রীতিমতো ক্যারিবিয়ান পেস খেলার মতো একটা অভিজ্ঞতা হলো প্রতিপক্ষ বোলারদের। এই মাথায় লাগছে; হেলমেট বাঁচাচ্ছে। এই কানের পাশ থেকে যাচ্ছে। এসব তো হলো; কথায় কথায় প্রবল গতিতে ছুটে এসে বল লাগছে বুকে।
কিন্তু খুলনার লিগে তখনো ব্যাটসম্যানদের চেস্ট গার্ড পরার প্রচলন হয়নি; তাই দোকানেও পাওয়া যায় না। ফলে কমপক্ষে তিনজন ব্যাটসম্যানকে আহত হয়ে মাঠ ছাড়তে হলো। আর চেস্ট গার্ড না পাওয়ায় মফিজ নানা বললেন, 'আপাতত তুই বাড়িতেই যা রে, নানা। পরের সিজনে ব্যাটসম্যানরা রেডি হলে তোকে আনব।'
নানা সেদিন আনন্দে আটখানা হয়েছিলেন? নাকি ব্যাটসম্যানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়েছিলেন!

৮.
ওসমান খান কোচ হিসেবে দেশের কিংবদন্তিতুল্য মানুষ ছিলেন।
ব্যাটসম্যান হিসেবে অবশ্য অমন বিরাট কিছু নন। তারপরও একটা আত্মবিশ্বাস ছিল তার। আর সব শট যেমন-তেমন, তার করা স্কয়ার কাটকে বাউন্ডারির আগে আটকানোটা প্রায় অসম্ভবের তালিকায় পড়ে।
সেই আত্মবিশ্বাস থেকেই ছেলেদের একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেরা ফিল্ডার কে কে?'
সামনে এগিয়ে এল কৌশিক, রাজু আর মানস। বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।
এবার ওসমান খান বললেন, 'আমি স্কয়ার কাট করব। তোমরা তিনজন পয়েন্ট, ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট আর গালিতে ফিল্ডিং করবা। পারলে আমার একটা শটও ঠেকায়ে দেখাও।'
পয়েন্ট, ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট, গালি পজেশনগুলো তখনো মুখস্থ হয়নি ছেলেগুলোর। শুধু বুঝল এটা আর যা-ই হোক ঠিক 'গালি'গালাজ নয়; ফলে স্যারের নির্দেশ করা

জায়গায় মোটামুটি কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পড়ল।
এবার শুরু হলো পরীক্ষা। ও প্রান্ত থেকে কেউ একজন স্যারকে আলতো করে বল ছুড়ছে; ওসমান খান সর্বশক্তি দিয়ে স্কয়ার কাট করছেন। এবং জগতের মজার ঘটনা হলো প্রতিটা বলই আটকে যাচ্ছে পয়েন্টে। কারণ, পয়েন্টে জন্টি রোডসের মতো ঝাঁপাচ্ছে তখন কৌশিক।
সেদিন ওসমান খান একটা বলও বাউন্ডারি পার করতে পারেননি!
ঢাকার ক্রিকেটের এই প্রবীণ ও গুণী কোচকে কৌশিক তার বাল্যবেলাতেই পেয়েছিল। মাগুরা থেকে অনূর্ধ্ব-১৬ ক্যাম্প শেষ করে নড়াইল ফেরার কিছুদিনের মধ্যেই নড়াইলেই আয়োজিত হলো অনূর্ধ্ব-১৭ খুলনা বিভাগীয় ক্যাম্প। ক্যাম্পটা ছিল একটু লম্বা সময়ের–ছয় মাস।
মাশরাফি পরবর্তীকালে বারবারই বলেছেন, ওসমান স্যারের সঙ্গে এই ক্যাম্পটা আধুনিক ক্রিকেট নিয়ে তার ধারণা তৈরি করতে ও বেসিক স্কিলে উন্নতি করতে খুব কাজে দিয়েছিল। তবে এই ক্যাম্পের শেষ দিকে ওসমান খানের সঙ্গে একটা ট্র্যাজিক ঘটনাও ঘটে মাশরাফির।
এই ক্যাম্প চলা অবস্থায় খুলনায় শুরু হয় বিভাগীয় অনূর্ধ্ব-১৭ দুটি দল গঠনের প্রক্রিয়া। সেই দুটি দলই খেলবে অনূর্ধ্ব-১৭ জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ। মূলত হাফিজ নানা খুব আগ্রহী হয়ে ওঠেন নাতিটাকে এই খুলনা দলে সুযোগ করে দেওয়ার ব্যাপারে। সে অনুযায়ী খবরও পাঠান মাশরাফিদের বাড়িতে এবং শরীফ মোহাম্মদের কাছে।
কিন্তু মুশকিল হয়, ওসমান খানের সম্মতি পাওয়া যায়নি এই চলমান ক্যাম্প ছেড়ে শিষ্যদের কাউকে খুলনায় পাঠানোর ব্যাপারে।
এখানে দুটো ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে।
একদল বলেন, ওসমান খান আসলে চলমান নড়াইলের ক্যাম্পটা সবাইকে নিয়েই শেষ করতে চেয়েছিলেন। এই বয়সেই ক্যাম্প ছেড়ে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে যাওয়াটা তিনি খুব সমর্থন করতেন না। আবার আরেকটা মত হলো, ওসমান খান সরাসরি বলেছিলেন, নড়াইলে এই বয়সসীমার নিচে যারা আছে, মানে কৌশিকরা কেউ বিভাগীয় দুটি দল গঠন হলেও তাতে খেলার যোগ্যতা রাখে না।
কোন কথাটা আসলে ওসমান খান বলেছিলেন বা মনে করেছিলেন, আজ এত বছর পর আমরা সে বিতর্কে না যাই। তবে এটুকু বলতে পারি প্রবীণ এই কোচের কথা মেনে নিতে পারেননি শরীফ মোহাম্মদ। তিনি গোপনে, নিজের আগ্রহে কৌশিক ও রিমন নামে একটি ব্যাটসম্যানকে নিয়ে রাতে রওনা হয়ে যান খুলনাতে; এই রিমন ঢাকায় প্রিমিয়ার খেলেছেন পরে এবং বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী।
ঝাপসা ঝাপসা চোখে খুলনা পৌঁছাল কৌশিকরা। একদিনের ট্রায়াল; ট্রায়াল পরিচালনা করতে ঢাকা থেকে বিসিবির শ্রীলঙ্কান কোচ ম্যালকম পেরেরা এসেছেন। সেখানে শত শত ছেলে ট্রায়াল দেবে। কয়েক মিনিটই সুযোগ মিলবে নিজেকে প্রমাণের। এই সময়েই নিজেকে 'সেরা' বলে প্রমাণ করতে হবে। কৌশিকদের যে

পরীক্ষার মধ্যে সেদিন ফেলা হয়েছিল, তা এখনো আপত্তিকর বলে স্মরণ করেন শরীফ মোহাম্মদ।

বছর ছয়েক আগেই ক্রিকেট ছেড়ে পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী হয়ে যাওয়া শরীফ মোহাম্মদ বলছিলেন, 'বৃহস্পতিবার টিম সিলেকশনের ট্রায়াল। শুক্রবার রেজাল্ট দেবে। আর রোববার টিম চলে যাবে ঢাকায়। এটা কোনো কথা হলো? আপনি কি ম্যাজিশিয়ান? পাঁচ মিনিটও একটা ছেলেকে দেখার সুযোগ পাবেন না। এতে জাজ করে ফেলবেন! এমন ভয়ানক প্রতিভার কথা আমি কখনো শুনিনি। পুরো ব্যবস্থাটা খুব খারাপ ছিল। তবে ভালো ছিল মাশরাফির কপাল আর সেদিনের বলের পেস।'

হ্যাঁ, মূলত ব্যাটিং অলরাউন্ডার হলেও খুলনা মোহামেডানের অভিজ্ঞতার কারণে মাশরাফি তখনই পেস বোলিংয়ে বাড়তি নজর দেওয়া শুরু করেছেন। নড়াইলেই ক্রিকেট বলে তার ভয়ংকর গতি আলোচ্য বিষয় তখন। এই প্রবল গতির সঙ্গে দিনটাও কৌশিকের হয়ে কথা বলতে হলো।

শরীফ মোহাম্মদ মনে করতে পারেন, মাশরাফি একটা ওভার বল করতে পেরেছিল। তিনজন ব্যাটসম্যানকে দেওয়া হয়েছিল ফেস করতে; কেউ বলের আগে ব্যাট নামাতে পারেনি। ব্যাপারটা হিসাব রাখা হয়নি। তবে শরীফ মোহাম্মদের ধারণা ছয়টি বলের মধ্যে পাঁচটিতেই পরিষ্কার বোল্ড করতে পেরেছিল সে।

গল্পটা বলতেও তার ভালো লাগে, 'তখন একটা ফ্যাশন তৈরি হয়েছিল লোকাল কোচদের মধ্যে। বাচ্চাদের ব্যাট অতিরিক্ত লিফট করে খেলা শেখানো হতো। ওখানে যে কয়টা ছেলে আগে থেকে ব্যাট তুলেছে, কেউ কৌশিকের বলের আগে ব্যাট নামাতে পারেনি।'

এ ঘটনা দেখার পর অবশ্য আর ম্যাজিক লাগে না। কোচ তিনি পেরেরা হন, আর যেই হন; তার লিস্টে মাশরাফির নাম ঢুকে যাবেই।

ঢুকেই গেল। খুলনা টাইগার্স ও খুলনা ব্লুজ নামে দুটি দল গঠিত হলো। কৌশিকের জায়গা হলো খুলনা টাইগার্সে। একটু অপেক্ষা করুন, এই খুলনা টাইগার্সের হয়ে ঢাকায় যাওয়া একই বয়সী আরেক ভবিষ্যৎ তারকার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হবে পরের অধ্যায়ে গিয়ে।

৯.

এই পর্বের গল্প এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত।

আমরা এখনই বলে দিতে পারতাম–চিত্রার পাড় থেকে এসে রূপসা পাড়ে পরীক্ষা দিয়ে কৌশিক চলল পদ্মার কূলে। কিন্তু বাক্যটা এত সরল হতে দিল না তখনকার লোকাল ক্রিকেটের কিছু নোংরামি।

শুক্রবার সকালে শরীফ মোহাম্মদরা জানতে পারলেন, কৌশিক নির্বাচিত হয়েছে খুলনা টাইগার্স দলের জন্য। কিন্তু দুপুর গড়াতে না-গড়াতেই জানানো হলো, কৌশিকের বয়স বেশি; তাই তাকে বাদ দেওয়া হবে।

ডাক্তারের সার্টিফিকেট ছিল। তারপরও এমন বাজ পড়ার মতো সিদ্ধান্ত শুনে শরীফ মোহাম্মদ একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তারপর নিজেকে সামলে ছুটলেন খুলনা

বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার অফিসে, 'কৌশিকের বয়স যে ঠিক আছে, এটা প্রমাণের জন্য আর কী করতে পারি!'
এই নড়াইলের সংগঠকের জেদের সামনে একসময় নরম হতে বাধ্য হলেন কর্মকর্তারা। তারা বললেন, স্কুল ও ডাক্তারের নতুন সার্টিফিকেট হলে চলবে।
ডাক্তারের সার্টিফিকেট জোগাড় করা গেল। হাসপাতালে ছোটাছুটি করে সেটা জোগাড় হয়ে গেল। ততক্ষণে বিকেল গড়িয়ে গেছে।
শুক্রবার দিন, তারওপর সন্ধ্যা হয়ে এসেছে; কোথায় মিলবে স্কুলের সার্টিফিকেট!
শরীফ মোহাম্মদ হাল ছাড়েন না। মোটরসাইকেলে করে নড়াইল ফিরলেন। নড়াইলে তখন কম্পিউটার কম্পোজ করার দোকান একটা মাত্র। সেই দোকানদারকে বাড়ি থেকে ডেকে এনে একটা সার্টিফিকেট কম্পোজ করালেন। তারপর চললেন স্কুলের দপ্তরির বাড়ি। গ্রামের সেই বাড়িতে গিয়ে দপ্তরিকে তুলে এনে স্কুল খোলালেন; সিল মারা হলো সার্টিফিকেটে। ততক্ষণে রাত বাজে একটা।
এই গভীর রাতে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বাড়ি হানা দিলেন ক্লান্ত, বিধ্বস্ত ও রক্তচক্ষু শরীফ মোহাম্মদ। সই হলো।
আবার মোটরসাইকেলে করে খুলনা ছুট।
মোটরসাইকেল ছুটছে, বাতাসে চোখ বুজে আসছে। মাঝে মাঝে নিজেই নিজেকে হেসে বলছেন–যাক ছেলেটা এবার ঢাকায় খেলবে।

১০.

পরদিন রোববার কৌশিকরা বাসে করে রওনা হয়ে যাবে ঢাকায়। জীবনের প্রথম জাতীয় পর্যায়ের একটা টুর্নামেন্টে খেলতে যাবে। জোগাড়যন্ত্র আছে না?
আদর্শ ব্যবস্থা ছিল, সকাল বেলায়ই কৌশিক বাড়ি ফিরে এসে তৈরি হবে।
কিন্তু সে সুযোগ মিলল না। সকাল বেলায় শরীফ মোহাম্মদ বললেন, 'তুই কি বাড়ি যাবি? নাকি বাগেরহাট যাবি?'
'বাগেরহাট কেন!'
'ওই রাজুরা একটা ম্যাচ খেলতে যাবে বাগেরহাট। আমাকে বলছিল, তুই যদি যেতে চাস, তাহলে রূপসা ঘাট থেকে তোকে তুলে নিয়ে যাবে। তারপর বিকেলে বাড়ি গিয়ে রেডি হবি।'
'তাহলে বাগেরহাট যাব।'
ব্যস। কৌশিক সেজেপরে চলে এল রূপসা ঘাট। বাড়ি তো থাকবে। প্রাণের বন্ধুদের সঙ্গে আরেকটা ম্যাচ খেলার সুযোগ কি নষ্ট করা যায়! একবার ঢাকা চলে গেলে আবার কবে ফেরা হয়।
অতএব চল বাগেরহাট।
চিতাবাঘ নাকি শিকার করার আগে এক ধাপ পিছিয়ে তারপর সামনে লাফ দেয়। খুলনা থেকে ঢাকায় রওনা দেওয়ার জন্য মাশরাফি এক ধাপ পিছিয়ে বাগেরহাট চললেন। কারণ তাকে এবার ঢাকার বুকে ঝাঁপ দিতে হবে।

লাল-সবুজের নতুন জগৎ



১.

দল ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পরই ছেলেটা কৌশিকের নাম শুনেছিল।

একটু ঈর্ষাও তৈরি হয়েছিল–আমাদের বয়সী একটা ছেলে এত জোরে বল করছে!

কত জোরে বল করেছে, তা ঠিক খেয়াল করে উঠতে পারেনি সে। কৌশিকের যখন ট্রায়াল হয়েছে, তখন নিজে মনে হয় অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল। মিস করেছে। এখন মনে হচ্ছে, মিস করাটা ঠিক হয়নি। কী এমন হাতি-ঘোড়া বল করে একটু দেখে নেওয়া যেত।

যাক সময় তো চলে যাচ্ছে না।

একই দলের হয়ে ঢাকা যাচ্ছে। দেখা যাবে কী এমন ডেনিস লিলি এসেছে নড়াইল থেকে। হতে পারে কৌশিক জোরে বল করতে পারে, কিন্তু ছেলেটার মতো নিখুঁত বল নিশ্চয়ই করতে পারে না।

মনে মনে এসব হিংসার কথা ঘুরলেও কৌশিককে একবার দেখার আগ্রহটা খুব তৈরি হলো। মাঠে নামার আগে একবার দেখতে হবে তো। কে জিনিসটা।

ভাবতে ভাবতেই যশোরেরই আরেক বন্ধু

দেখিয়ে দিল, ‘ওই যে কৌশিক।’
নাহ। কৌশিক ছেলেটা লম্বা-চওড়া আছে। নিজের লিকলিকে শরীরটার কথা ভেবে ফিক করে একটু হেসে ফেলল। ভাবল, আমাদের বয়সেই এই কৌশিক তো অনেক লম্বা হয়ে গেছে।
এরপর কী হলো?
গল্প-উপন্যাস হলে এর পরের দৃশ্যটা আমরা বানিয়ে লিখে ফেলতে পারতাম। ভাবতে পারতাম, ছেলেটা আস্তে আস্তে লজ্জা ভেঙে কৌশিকের দিকে এগিয়ে গেল। নিজে থেকে হাত বাড়িয়ে বলল, ‘তোমার নাম কৌশিক? আমার নাম রাসেল।’
তা হয়তো হয়নি।
এমনকি দুজনের মধ্যে কোনো মারামারিও হয়নি। যে মারামারি মিটমাট হয়ে যাওয়ার পর ছেলেটা বলবে, ‘আসো আমরা আজ থেকে বন্ধু। আমার নাম রাসেল।’
সিনেমার মতো কিছু হোক আর না-ই হোক, এটা সত্যি যে সেদিনের ঈর্ষাকাতর সেই ফাস্ট বোলারটির নাম সৈয়দ রাসেল। সেই অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগীয় দল, খুলনা টাইগার্সের অভিযান থেকেই কোনো এক উপায়ে পরিচয় হয়েছিল কৌশিক আর রাসেলের।
যারা বাংলাদেশের ক্রিকেটের খোঁজখবর রাখের তারা বুঝতে পারছেন, এ ঘটনাটি আসলে কেবল দেশের দুই ফাস্ট বোলারের পরিচয় নয়। পরবর্তী যুগে বাংলাদেশের অন্যতম সেরা পেস বোলিং জুটির পরিচয়ের শুরু এবং সর্বোপরি শুরু অবিচ্ছেদ্য দুই বন্ধুর পথচলার।

২.
গুলিস্তানের সস্তা একটা হোটেল।
সে হোটেলের নাম আজ আর মনে নেই। একটু মনে আছে যে, পাশেই একটা ঘিঞ্জি গলি। সেই গলির মধ্যে পাশাপাশি কয়েকটা দোকানে খাসির মাংস বিক্রি হতো।
মাংসের গন্ধ, রাস্তার পাশে স্তূপ হয়ে থাকা ময়লার গন্ধ। ঢাকা শহরটা একটা বীভৎস চেহারা নিয়ে হাজির হলো যেন কৌশিকদের সামনে। নড়াইলের সেই শান্ত নদীতে সাঁতার কাটা ছেলেটা, সবুজে সবুজে ভরা শহরে বুকভরে নিঃশ্বাস নেওয়া ছেলেটা এখন বন্দী দুর্গন্ধ আর যানজটে ভরপুর একটা শহরের ঘুপচি একটা হোটেলের ঘরে!
এই শহরে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।
তারপরও কষ্টটা কমানোর বুদ্ধি আবিষ্কার হয়ে গেল। বুদ্ধি আর কী! এখানেও তৈরি হয়ে গেল আরেকটা বন্ধু দল–সবুজ, মুরাদ খান, রাসেল এবং আরও কতজন।
যেহেতু এক বয়সী ১৬-১৭ বছর বয়সের এতগুলো ছেলে এক জায়গায় আছে, দুষ্টুমি

বুদ্ধির অভাব হয় না। অভাব হয় না সময় কাটানোর নিত্যনতুন উপায় বের করার। আমরা কৌশিকের সেই বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পারি, খেলার পর সন্ধ্যাবলা কেমন করে কৌশিকের বুদ্ধিতেই সবাই মিলে একটু হোটেল থেকে বের হয়ে অ্যাডভেঞ্চার করার পরিকল্পনা করেছিল। কেমন করে সে পরিকল্পনা বানচাল হয়েছিল; সে গল্পও জানতে পারি।

এসব পরিকল্পনা বানচাল হলেও বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে মিরপুরে চাচার বাসায় চলে যাওয়ার পরিকল্পনা কখনোই ব্যর্থ হয়নি। মনটা একটু খারাপ হলেই চাচার বাসা, একটু ভালো লাগলেও চাচার বাসা এবং কিছু করতে ইচ্ছে না হলেও চাচার বাসা। গুলিস্তান থেকে মিরপুর; হোটেল থেকে চাচার বাসা পথটা যেন কৌশিকের মুখস্থই হয়ে গেল এই ভ্রমণে এসে।

৩.

ঢাকায় মাশরাফির থাকার জায়গার অভাব ছিল না।

ছোট চাচা তার শিক্ষা বোর্ডের বড় কর্মকর্তা। মায়ের মামা একজন পিজি হাসপাতালের নামকরা ডাক্তার। বড় মামাও ততদিনে এমবিবিএস পাস করে ঢাকায় চলে এসেছেন। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে মাশরাফির সেই দিন থেকে ঠিকানা হয়ে ওঠে মিরপুরে ছোট চাচা, তপন চাচার বাসা।

এই চাচার বাসাটা পরের কয়েকটা বছরে কৌশিকের জীবনে যেন নড়াইলে নানার বাসার বিকল্প হয়ে উঠল। নড়াইলে মামার ভূমিকাটা এখানে নিলেন তপন কাকা। আর মামির ভূমিকাটা নিলেন ছোট চাচি।

ঢাকায় যখন কৌশিক অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগীয় ক্রিকেট খেলতে এল, তখনো যেমন, আজও তেমন; আজও সেই নিজের কাজটা কিছুতেই গুছিয়ে করতে পারে না মাশরাফি। সেদিনও কৌশিকের জামার বোতামটা লাগিয়ে দেওয়া, জামা-কাপড়টা কেচে দেওয়া; সবকিছুতেই তার কাউকে চাই।

এখানে কে করবে এসব। মামা-মামি তো সঙ্গে আসেনি।

মামি হয়ে উঠলেন স্বয়ং তপন চাচা। শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা, দেশের প্রথম শ্রেণীর একজন কর্মকর্তা অফিস সেরে বাসায় ফিরে ভাতিজার কাপড়-জামা নিয়ে বাথরুমে ঢোকেন। অন্তর্বাসটা পর্যন্ত নিজে হাতে পরিষ্কার করে দেন। ছোট্ট ছেলেটির যেন পরদিন খেলার মাঠে যেতে কোনো সমস্যা না হয়।

আজও সেই কথা বলতে গিয়ে গলা ধরে আসে এই বয়সী মাশরাফিও। তিনি নিজেই পেছন ফিরে অবাক হয়ে যান, কী আদরে, কী যত্নে তিল তিল করে তাকে বড় করে তুলেছেন চাচা আর চাচি।

এই দফা হোটেলে থাকতে হলেও কিছুদিন পরেই এসে এই চাচার বাসাতেই স্থায়ীভাবে উঠতে হবে কৌশিককে। আর এখানেই শেকড় গেড়ে আস্তে আস্তে বাংলাদেশের ক্রিকেটের মহিরুহ হয়ে উঠবে মাশরাফি বিন মুর্তজা।

৪.

ধানমন্ডি মাঠে সেদিন খুলনা টাইগার্সের খেলা ঢাকা মেট্রোর বিপক্ষে।

প্রথম ম্যাচেই খুলনা টাইগার্স, বিশেষ করে তার দুই পেসার যে দানবীয় পারফরম্যান্স দেখিয়েছে, তাতে এই ম্যাচেও তাদের জয় একরকম নিশ্চিতই ছিল। আরেকটা জয়ের রোমাঞ্চের জন্য প্রস্তুতি চলছিল।

এর মধ্যেই হঠাৎ করে আয়োজক বিসিবি জানাল, খুলনা টাইগার্সের দুজন খেলোয়াড় খেলতে পারবে না। কারণ, তাদের বয়স বেশি। কোন দুজন?

মাশরাফি বিন মুর্তজা কৌশিক ও সৈয়দ রাসেল!

বাংলাদেশের বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে বয়স নিয়েই সবচেয়ে বেশি ঝামেলা ও কাদা ছোড়াছুড়ি করা হয়। এখানে বয়স লুকানোর প্রবল প্রবণতা যেমন আছে, তেমনই এই বয়সকেই অস্ত্র করে ঘায়েল করা হয় প্রতিপক্ষকে। বিশেষ করে দলটি যদি ঢাকার বাইরে থেকে আসা কম শক্তিশালী কাঠামোর হয়, তবে তাদের সেরা খেলোয়াড়দের বেশি বয়সের নামে বসিয়ে দেওয়াটা নিয়মিত একটা চিত্র।

সেদিন মাশরাফি ও রাসেল স্বীকার হতে চলেছিলেন একই রকম চিত্রের। তবে এই সময় রুখে দাঁড়ালেন একজন মানুষ–জাহিদ রেজা বাবু। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এটা হতে পারে না। এ অন্যায়।'

বাবু এমন কোনো বিখ্যাত মানুষ নন। যশোরের সংগঠক ছিলেন। সেখান থেকে ঢাকায় এসে একটি ক্লাবের প্রধান সংগঠক হয়ে উঠেছেন। তৃণমূল ক্রিকেটে খুব পরিচিত মানুষ, ঢাকার ক্রিকেটের নিয়মিত মুখ। অধুনা তার আরেকটি পরিচয় আছে। ঢাকার শুরুর দিনগুলো থেকে মাঠ সংরক্ষকের ভূমিকায় দক্ষতা অর্জন করা এই বাবু বর্তমানে চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম ও খুলনা আবু নাসের স্টেডিয়ামের প্রধান কিউরেটর।

সেদিন বাচ্চাদের খেলা মাঠে দেখতে গিয়েছিলেন মূলত ক্লাব সংগঠক পরিচয়ে। ঢাকা মেট্রোতে বেশ কিছু সম্ভাবনাময় কিশোর খেলছে। এদের দিকে একটু চোখ রাখাই ছিল উদ্দেশ্য। বসেও ছিলেন ঢাকা মেট্রোর তাঁবুতে। কিন্তু প্রতিপক্ষ খুলনা টাইগার্সের সঙ্গেই যখন অন্যায় হলো, তিনিই প্রথম প্রতিবাদটা করলেন।

ঢাকা মেট্রোর কর্মকর্তারা অবাক–তাদের বাবু এ রকম প্রতিপক্ষের পক্ষে কেন গেল! একজন বলেই ফেললেন, 'যশোরের মানুষ বলে খুলনা বিভাগের পক্ষে কথা বলছে বাবু।'

বাবু প্রতিবাদ করলেন, 'জি না। এ ঘটনা যে দলের বিপক্ষেই হতো, আমি একই কথা বলতাম।'

বাবুর যুক্তিও খুব পরিষ্কার, 'টুর্নামেন্টের আগে প্রতিটা ছেলের বয়স পরীক্ষা হয়েছে। তারা একটা ম্যাচও খেলে ফেলেছে। তখন তো সমস্যা ছিল না। এখন সেই দলের যে দুটো ছেলে সবচেয়ে ভালো করছে, তাদেরই বয়স বেশি বলে দাবি করা হচ্ছে। এটা তো উদ্দেশ্যমূলক ব্যাপার।'

মাঠেই বিপুল হইচই হলো। রীতিমতো খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। খুলনার প্রতাপশালী সংগঠকদের ফোন আসতে শুরু করল। একটা দারুণ অচলাবস্থা। সেবারের অনূর্ধ্ব-১৭ জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ বুঝি ওখানেই শেষ হয়ে যায়!

শেষমেশ বাবুই একটা সমাধান দিলেন, 'আপনারা মুখে বয়স নিয়ে অভিযোগ করলে তো হবে না। অভিযোগ করলে সেটা প্রমাণ করার দায়িত্বও আপনাদের। তারপরও একটা কাজ করা যেতে পারে। খেলা শুরুর আগে এখনই ওদের আবার ডাক্তারি পরীক্ষা করান। এটা মেনে নেওয়া যাবে। তবে ডাক্তারি পরীক্ষা না করিয়ে কিছুতেই বাদ দেওয়া চলবে না।'

এরপর ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য ছোটাছুটি, বয়সসংক্রান্ত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত এবং মাশরাফি-রাসেলের খেলা; এসব বিস্তারিত বলাটা খুব জরুরি নয়। জরুরি কথা হলো–জাহিদ রেজা বাবুর সঙ্গে মাশরাফির সম্পর্ক।

সেই সেদিন মাঠে তৈরি হওয়া অসমবয়সী একটা বন্ধুত্ব আজও টিকে আছে। আজও মাঠের ও প্রান্ত থেকে বিশাল হাঁক শুনে বাবু থমকে যান, 'ও বাবু কাকা!'

৫.

ঢাকায় ওই বিভাগীয় ক্রিকেট খেলে আসার কথা ভুলেই গিয়েছিল কৌশিক।

ওটাকে একটা মজার ভ্রমণ হিসেবে স্মৃতিতে তুলে রেখে আবার এলাকায় মেতে উঠতে চেয়েছিল সেই গাছের মাথায়, নদীর স্রোতে। তেমন করেই জীবন শুরু হতে গিয়েই আবার ঝট করে একটা ধাক্কা এসে লাগল।

মোহাম্মদ ভাই একদিন ডেকে পাঠালেন। আশপাশে কোথায় খেলতে যেতে হবে ভেবে কৌশিক গিয়ে হাজির। মোহাম্মদ ভাই মুখটা গম্ভীর করে বললেন, 'তোকে ঢাকায় যাতি হবে রে কৌশিক।'

'আবার ঢাকায় কী করতি যাব!'

'খেলতি যাবি।'

'খেলে আসলাম না? এবার কী খেলা? আর কে কে যাবে?'

'আর কেউ যাবে না। তোর একার যাতি হবে। তোরে আন্ডার সেভেন্টিন ন্যাশনাল টিমের ট্রায়ালে ডাকিছে।'

ব্যাপারটা বলার সময় শরীফ মোহাম্মদের কণ্ঠে যে রোমাঞ্চ ও উত্তেজনা ছিল, তার ছিটেফোঁটাও নেই কৌশিকের চেহারায়। প্রথমত সে এই 'আন্ডার সেভেন্টিন ন্যাশনাল টিম' ব্যাপারটাই যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু, এটা মানতে রাজি না। আর যদি সেটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু হয়ও; সে জন্য আবার একা একা ঢাকা যাওয়া কিছুতেই চলে না।

মোহাম্মদ ভাই বললেন বটে, কৌশিকের মন টানে না।

শেষমেশ নাহিদ মামা বসে বোঝালেন, 'দেখ বাবা, এটাও এট্টা জাতীয় দল। যদি এই দলে চান্স পাস, দেখবি একদিন মূল জাতীয় দলেও হয়তো খেলবি। দু-চার বছর পর তোরে হয়তো টিভিতেও দেখা যাবে।'

এবার কৌশিকের মনটা একটু নরম হলো, 'মূল জাতীয় দলে খেলা যাবে?'
'যাবে।'
'তারপরও, নড়াইল ছাইড়ে...'
'তাতে কী হবে? আমরা যাব তো তোর খেলা দেখতি। তোর বাবা-মা যাবে এখনই সঙ্গে।'
এই একটা ব্যাপার একটু যা ভরসা দিল। বাবা আর মা-ও এবার চললেন সঙ্গে। পথে বারবার মাকে শর্ত দিল কৌশিক, 'তোমরা চলে আসলে কিন্তু আমিও চলে আসব।'
'ঠিক আছে। আমরা আসব না। তোর যত দিন এই ট্রায়াল আর খেলা চলে, আমরা তপনের বাসায় থাকব।'
তাই হলো।
কৌশিক এদিক বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে ট্রায়াল দেয়। আর মিরপুর থেকে অটোরিকশা করে সেই গুলিস্তান আসেন প্রতিদিন বাবা গোলাম মুর্তজা ও মা হামিদা মুর্তজা। ছেলের পাশে থাকতে হবে যে।

৬.
বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের ট্রায়াল ক্যাম্প চলছে।
মূলত আরও একজন নতুন ফাস্ট বোলারকে দেখতে চাইছেন নির্বাচকেরা। সামনে ঢাকায় বসছে অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়া কাপের আসর। সেখানে তালহা, শরীফের সঙ্গে আরেকটা ফাস্ট বোলার পেলে মন্দ হয় না। বিশেষ করে তারা শুনতে পেরেছেন যে, অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগীয় চ্যাম্পিয়নশিপে নড়াইলের একটি ছেলে নাকি খুব জোরে বল করেছে।
অতএব সেই ছেলেটিকে একটু বাজিয়ে দেখা যাক।
তিন দিনের ক্যাম্প শেষ হওয়ার পর আর নতুন করে ভাবার কোনো প্রয়োজনই দেখলেন না নির্বাচকেরা। সোজা তালিকায় নাম তুলে দিলেন তারা ছেলেটির।'
অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়া কাপে বাংলাদেশ দলে খেলবে নতুন একটি ছেলে। নাম–মাশরাফি বিন মুর্তজা।
২০০১ সালটা ছিল মাশরাফির জীবনে একেবারে লিফটে চড়ে বসার একটা বছর। এ বছরই নড়াইল থেকে ঢাকায় এলেন অনূর্ধ্ব-১৭ জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে। সেই বছরই অনূর্ধ্ব-১৭ জাতীয় দল, অনূর্ধ্ব-১৯ ক্যাম্প, 'এ' দল, অ্যান্ডি রবার্টস হয়ে মাত্র ১১ মাসের ব্যবধানে টেস্ট অভিষেক। দুনিয়ায় আর কোনো ক্রিকেটার জাতীয় পর্যায়ে মুখ দেখানোর পর এত অল্প সময়ে শিখরে উঠে গেছেন কি না, তা নিয়ে গবেষণা চলতে পারে।
অনূর্ধ্ব-১৭ জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে যে ঝড় কৌশিক তুলেছিলেন, তাতে জাতীয় পর্যায়ের কোনো দলে বা ক্যাম্পে ডাক পাওয়াটা খুব একটা অপ্রত্যাশিত ছিল না।

৭.

বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের জন্যই সেটা একটা শোকের সময়।
পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন বাংলাদেশের কিংবদন্তিতুল্য সংগঠক ইকবাল খান। চট্টগ্রামের এই কৃতী মানুষটির প্রয়াণে তার পরিবারই স্বভাবত সবচেয়ে ধাক্কা খেয়েছে। ছোট ভাই আকরাম খান খেলা ফেলে ছুটে গেছেন বাড়িতে। অনূর্ধ্ব-১৭ ক্যাম্পে যোগ না দিয়ে বাড়ি চলে যেতে হয়েছে ইকবাল খানের বড় ছেলে নাফীস ইকবাল খানকে।
তারপরও নিজেকে সামলে, বুকে পাথর চেপে ঢাকা ফিরে এলেন নাফীস।
না এসে উপায়ও নেই। ঠিক দুদিন পর ঢাকায় শুরু হচ্ছে অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়া কাপ। বিশাল এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ দলকে নেতৃত্ব দেবেন নাফীস ইকবাল। কিছুদিন আগেই পাকিস্তানে একটা টুর্নামেন্টে ভালো করে এসেছেন। ফলে দেশের মাটির এই টুর্নামেন্টেও ভালো করার চাপ আছে।
দল মোটামুটি চেনাই। তাই কিশোর নাফীস দল নিয়ে খুব একটা চিন্তিত নন। তবে এর মধ্যে শুনলেন, স্কোয়াডে নতুন একটা ফাস্ট বোলার দেওয়া হয়েছে। কেমন করে কে জানে!
বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে যেদিন অনুশীলনে যোগ দিলেন। প্রথমেই নতুন ছেলেটাকে দেখতে চাইলেন। নেটের পাশে দাঁড়িয়ে পর পর তিনটি বল দেখলেন নাফীস। নিজেই নিজেকে বললেন–এত জোরে বল করে!
সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, পরিণতি যা-ই হোক এই ছেলেকে ম্যাচ খেলাবেন। ভাবনা অনুযায়ী নেপালের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচেই নামিয়েও দিলেন ছেলেটাকে। হাতে তুলে দিলেন চকচকে নতুন বলটা। প্রথম দুটো বল যেন বুলেটের মতো উড়ে উড়ে গেল। নাফীস ইকবাল বুঝতে পারছেন, আজ এই ছেলে ভেলকি দেখাবে।
বড় ম্যাচে ছেলেটার জীবনের তৃতীয় বল–গুড লেন্থে পড়ে ভয়াবহ গতিতে ভেতরে ঢুকল। ব্যাটসম্যান বোঝারও সময় পেলেন না; বোল্ড। শুরু হলো নতুন ছেলেটার উল্লাস।
লাল-সবুজ জার্সি গায়ে শুরু হয়ে গেল কৌশিকের উল্লাস; মাশরাফি বিন মুর্তজার উল্লাস।
নামে তখনো কৌশিক বলেই পরিচিত আজকের মাশরাফি। স্কোরকার্ডেও লেখা রইল কৌশিক। সে নামে কী বা আসে যায়। যাত্রা তো শুরু হলো।

৮.

তালহা জুবায়েরের ঈর্ষায় ভোগার কারণ ছিল।
কিছুদিন আগেই পাকিস্তান সফর করে আসা দলের সেরা বোলার ছিলেন তিনি। অথচ এবার অনূর্ধ্ব-১৭ ক্যাম্প শুরু হতেই দেখেন কোত্থেকে আরেক পিচ্চি চলে এসেছে দলে। সে নাকি তালহার চেয়েও জোরে বল করে!

এটা অবশ্যই তালহাকে ঈর্ষান্বিত করার মতো ব্যাপার। কিন্তু তালহা বিষয়টা মনে করে হেসে ফেললেন, 'ও কি কাউকে এসব ভারী ব্যাপার ভাবার সময় দেয়? পরিচয়ের কয়েক মিনিটের মধ্যে এমন আপন করে নিল, আমার মনে হলো, ওকে একাদশেই দরকার।'

তালহা এটুকু সাক্ষ্য খুব ভালোভাবে দিতে পারলেন যে, অধিনায়কের মতো মাশরাফির গতি নেটে দেখে তিনিই চমকে গিয়েছিলেন। আজকের মাশরাফির সঙ্গে সেই এক্সপ্রেস মাশরাফিকে গুলিয়ে না ফেলার কথাও বললেন তালহা। বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম গতিশীল ফাস্ট বোলার তালহাই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, সে সময় মাশরাফির আশপাশে গতি কারো ছিল না।

তবে তালহা এই টুর্নামেন্টের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে অন্য একটা ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করালেন।

তিনি লক্ষ করেছিলেন, এই টুর্নামেন্টে একজন ফাস্ট বোলার হিসেবে অনেক বেশি বল করছেন মাশরাফি। আজ আমরা পরিসংখ্যান ঘেঁটে দেখতে পাই, ব্যাপারটা শুধু অনেক বেশি নয়–অস্বাভাবিক রকমের বেশি ছিল। মাশরাফি এই টুর্নামেন্টে সব দল মিলিয়ে সবচেয়ে বেশি, ২৮৮টি ডেলিভারি করেছিলেন।

বাংলাদেশ ফাইনাল খেলেছিল বলে বাংলাদেশের কোনো একজন বোলার সর্বোচ্চসংখ্যক বল করবেন, টুর্নামেন্টে এটা হয়তো স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু যেটা চোখে লাগার মতো ব্যাপার সেটা হলো, একজন ফাস্ট বোলারের এত ডেলিভারি বল করা; যেখানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষ পুরো ওভার খেলতে পারেনি।

তালহা বলছিলেন, এটা আসলে মাশরাফিকে অতি ব্যবহারের শুরু বলা যেতে পারে।

দল হিসেবে তখন মাশরাফির প্রতি চাহিদা ছিল, সীমিত ওভারের ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ডেলিভারি করতে হবে; সবই সত্যি। কিন্তু এই ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করে নভেম্বরে এসে টেস্ট খেলা অবধি হাজার হাজার প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের ডেলিভারি করতে হয়েছে মাশরাফিকে।

যে ছেলেটা কয়েক মাস আগেও জিম শব্দটা শোনেনি, যে ছেলেটা ফিজিওথেরাপিস্ট বলে কিছু দুনিয়ায় আছে; তখনো জানে না, সেই ছেলেটা একটার পর একটা টুর্নামেন্ট খেলছে। অনূর্ধ্ব-১৭ থেকে অনূর্ধ্ব-১৯, 'এ' দল, টেস্ট দল, প্রস্তুতি টুর্নামেন্টের দল; যেখানে খেলা হচ্ছে, সেখানেই তাকে পুরো রানআপে সবগুলো ওভার বল করতে হচ্ছে।

এই কয়টা মাস মাশরাফির বাকি জীবনটা চোটজর্জর করায় প্রধান ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করার পেছনে কোনো অযৌক্তিকতা নেই। তালহা পরিষ্কার বলছিলেন, 'তখন আমরা ছোট মানুষ। যে যেখানে বলেছে, সেখানে বল করেছি। নিজেরাও জানতাম না, শরীরের যত্ন কাকে বলে। বলে দেওয়ারও কেউ ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা, এর পরিণতি কী ভয়ানক হতে পারে, তাও আমরা বুঝতে পারিনি।

ম্যাশকে তো ওই সময় ইচ্ছেমতো বল করানো হয়েছে। এর ফল আমরা দুজনই ভোগ করেছি। মাশরাফির মতো বিশ্বসেরা বোলারদের একজনের পুরো সার্ভিস বাংলাদেশ কখনোই পেল না। আর আমি আজ যুক্তরাষ্ট্রে আছি।'

তালহা জুবায়েরের কথাগুলো নিশ্চয়ই সেই নেপাল সরকারের কথার মতো মনে হচ্ছে!

৯.

নেপালের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের তৃতীয় বলেই উইকেট নিয়ে যাত্রা শুরু।

এই পারফরম্যান্সটাকে বলা যায় মাশরাফি বিন মুর্তজার কয়েক মাসের মধ্যেই শুরু হতে যাওয়া বর্ণময় ক্যারিয়ারের দারুণ একটা বিজ্ঞাপন।

পরের ওভারে এসে আবারও উইকেট নিয়েছিলেন নেপালের বিপক্ষে ওই ম্যাচে। শেষমেশ ম্যাচ শেষ করেছিলেন ৯ ওভারে ২ মেডেনসহ ২৪ রান খরচ করে ৩টি উইকেট নিয়ে। একেবারে ফ্লাইং স্টার্ট বলতে যা বোঝায়, তাই আর কী!

টুর্নামেন্টটা ছিল বাংলাদেশের ভবিষ্যতের একঝাঁক তারকার উঠে আসার টুর্নামেন্ট। অধিনায়ক নাফীস ইকবাল, মাশরাফি বিন মুর্তজা তো ছিলেনই। পরবর্তীকালের মহাতারকা মোহাম্মদ আশরাফুল, তালহা জুবায়ের, জহুরুল ইসলাম অমি, মোহাম্মদ শরীফ, জুনায়েদ সিদ্দিকী ও মানজারুল ইসলাম রানা টেস্ট খেলেছেন এই দল থেকে। তার মানে এই টুর্নামেন্টের বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল থেকে গুনে গুনে আটজন টেস্ট খেলোয়াড় বেরিয়েছেন!

টুর্নামেন্টজুড়ে এই ভবিষ্যৎ তারকাদের পারফরম্যান্সও ছিল দেখার মতো। পরের ম্যাচে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে নাফীস ইকবালের ৭৯ বলে ১২৪ রানে ভর করে বাংলাদেশ করেছিল ৩৭৭ রান; ম্যাচ জিতেছিল ৩৪৫ রানে! সিঙ্গাপুরকে ৩২ রানে অলআউট করে দেওয়ার পথে নতুন বলে মাশরাফি ৯ ওভারে ২ উইকেট নিয়েছিলেন। রান দিয়েছিলেন কত জানেন? ৭টি মাত্র!

এই ম্যাচে মোহাম্মদ শরীফের একটা পারফরম্যান্স মনে না করলে অন্যায় হয়ে যায়–২.৩ ওভার বল করে ৩টি উইকেট দিয়েছিলেন। রান কত দিয়েছিলেন, জানেন? জি, শূন্য!

এর পরের ম্যাচটাই ছিল বিকেএসপির ২ নম্বর মাঠে 'ঐতিহাসিক' সেই ম্যাচ।

মাশরাফি এই টুর্নামেন্টে ইতিমধ্যে নিজেকে বোলার হিসেবে প্রমাণ করে ফেলেছেন। আমরা জানতে পারছি, পরবর্তী অনূর্ধ্ব-১৯ দলের জন্য তাকে বিবেচনা করতে শুরু করে দিয়েছেন নির্বাচক কমিটির সদস্যরা। কিন্তু এই পরের ম্যাচটাই এই কিশোরের ভাবমূর্তি বদলে দিল এবং একেবারে বিপরীত এক পরিচয়ে সংবাদপত্রের শিরোনাম হলো ছেলেটি।

খেলাটা ছিল কুয়েতের বিপক্ষে।

সেদিন নাফীস ইকবালের সঙ্গে ইনিংস শুরু করতে নেমেছিলেন আশরাফুল। পরবর্তীকালে নন্দিত ও নিন্দিত এই মহাতারকা সেদিন ৯৯ বলে ১০৩ রান করলেও দলের সংগ্রহ সে রকম বিরাট কিছু ছিল না। ৪১.২ ওভারে মোহাম্মদ শরীফ যখন আউট হলেন দলের রান তখন ২৫৭। ৪৫ ওভারের খেলা; মোট রান কত হতে পারে?

অনুমান করে কূল পাবেন না। ৪৫ ওভারে সেই বাংলাদেশের রান গিয়ে ঠেকল ৩২৭! মানে, ৩.৪ ওভারে, আরও ভালো করে বললে ২২ বলে ৭০ রান যোগ করল বাংলাদেশ। এই ৭০ রানের ৬০-ই এল মাশরাফির ব্যাট থেকে!

হ্যাঁ, বিস্ময়কর এই তাণ্ডব ঘটালেন নড়াইলে ব্যাটসম্যান হিসেবেও খ্যাত কৌশিক। মাত্র ১৭টি বল খেললেন। এর মধ্যে ১০টিকেই মাঠ ছাড়া করলেন। ৬টি ছক্কা ও ৪টি চার; মানে বাউন্ডারি থেকে রান করলেন ৫২ রান!

ভাগ্যিস, বাকি ৭ বলেও বাউন্ডারি হাঁকাননি।

টুর্নামেন্টের প্রথম উইকেটশূন্য ম্যাচ কাটালেন মাশরাফি গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে। কাকতালীয়ভাবে পাকিস্তানের বিপক্ষে সেই ম্যাচ হারল বাংলাদেশ। তবে সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আবার স্বরূপে জ্বলে উঠল। মাশরাফি একটি উইকেট নিয়েছিলেন, শ্রীলঙ্কাকে বাংলাদেশ ৫ উইকেটে হারিয়ে চলে গেল ফাইনালে।

ফাইনালে অনেক আশা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত রানার্সআপই হতে হয়েছিল বাংলাদেশকে।

আগে ব্যাট করে বাংলাদেশ ২২৫ রান করেছিল। এর মধ্যে মাশরাফি ১২ বলে ১৮ রানের একটা ক্যামিও খেলেছিলেন। কিন্তু এই রানটা যথেষ্ট হয়নি।

১০.

অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়া কাপটাকে বলা যায় জাতীয় পর্যায়ে কৌশিকের নিজের নাম প্রতিষ্ঠিত করার টুর্নামেন্ট।

এই প্রতিষ্ঠার সময়টা খুব একটা আলোচনায় আজকের দিনে আর নেই। তবে এখনো সেই টুর্নামেন্টের কথা মনে করতে পারেন অভিজ্ঞ দর্শক ও সাংবাদিকেরা।

বিশেষ করে বিকেএসপির ২ নম্বর মাঠে কুয়েতের বিপক্ষে ১৭ বলে মাশরাফির ৬০ রানের ইনিংসটা কিংবদন্তির অংশ হয়ে গেছে। সেই ম্যাচটি কাভার করতে সেই আমলে ঢাকা থেকে ছুটে গিয়েছিলেন তখনকার জনকণ্ঠ-এর বিশেষ প্রতিনিধি (বর্তমানে সকালের খবরের ডেপুটি স্পোর্টস এডিটর) আরিফুর রহমান বাবু।

তিনি স্মৃতিচারণা করছিলেন, 'তখন তো মাশরাফি নামটা আমরা জানতামই না। দেশে বড় একটা আয়োজন হচ্ছে বলে যাওয়া। ওখানে গিয়ে দেখলাম পাওয়ার ক্রিকেটের এক অদ্ভুত প্রদর্শনী। একটা ছেলে লেট মিডল অর্ডারে নেমে একেবারে ব্যাটিং-তাণ্ডব শুরু করে দিল। পরে সংগঠকদের জিজ্ঞেস করে জানলাম, ছেলেটার

নাম কৌশিক। তখন আমরা অনুমান করেছিলাম, ছেলেটা হয়তো ব্যাটিং অলরাউন্ডার!'

ঠিক একই ধারণা নিয়ে সেদিন বিকেএসপি থেকে ওই ম্যাচ কাভার করে ফিরেছিলেন তখনকার প্রথম আলোর প্রতিবেদক (বর্তমানে কালের কণ্ঠ-এর যুগ্ম বার্তা সম্পাদক) মোস্তফা মামুন। তিনি মজা করেই বলছিলেন, 'আমরা ভেবেছিলাম, বাংলাদেশ বুঝি একজন মারকুটে ব্যাটসম্যান পেতে যাচ্ছে। সেটা সত্যিই মজার একটা ইনিংস ছিল। পরবর্তীকালে সেই কৌশিক ও এই মাশরাফিকে মেলাতে আমাদের একটু কষ্টই হয়েছে। নামও বদলে গেছে, ভূমিকাও বদলে গেছে।'

এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল

অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়া কাপ

গ্রুপ-বি

বাংলাদেশ-নেপাল

ভেন্যু : বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম।

তারিখ : ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০১

নেপাল ৫০ ওভারে ১৭৪/৮ (মাশরাফি ৯-২-২৪-৩, শরীফ ২/২৫, শরিফুল ১/১২, তালহা ১/১৬, মানজারুল ইসলাম রানা ১/২৯)।

বাংলাদেশ ৩১.৫ ওভারে ১৭৬/৩ (সফিউল ৮৩*, আশরাফুল ৪২, জুনায়েদ ২২*)

ফল বাংলাদেশ ৭ উইকেটে জয়ী।

বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর

ভেন্যু : জগন্নাথ হল মাঠ

তারিখ : ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০১

বাংলাদেশ ৪৫ ওভারে ৩৭৭/৭ (নাফিস ইকবাল ১২৪, শরিফুল ৯৭, জুনায়েদ ৩৫)।

সিঙ্গাপুর ১৭.৩ ওভারে ৩২/১০ (মাশরাফি ৭-২-৯-২, তালহা ৪/১৮, শরীফ ৩/০)।

ফল বাংলাদেশ ৩৪৫ রানে জয়ী।

বাংলাদেশ-কুয়েত

ভেন্যু বিকেএসপি-২

তারিখ ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০১

বাংলাদেশ ৪৫ ওভারে ৩২৭/৭ (আশরাফুল ১০৩, মাশরাফি ৬০ [১৭ বল, ১৬ মিনিট, ৪টি চার, ৬টি ছক্কা], নাফিস ৩৪, জুনায়েদ ৩৬)।

কুয়েত ৪০.২ ওভারে ১১১/১০ (মাশরাফি ৬-১-২৩-১, শরিফুল ৪/১২, শরীফ ২/২৮)।
ফল : বাংলাদেশ ২১৬ রানে জয়ী।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান
ভেন্যু : বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম
তারিখ : ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০০১
পাকিস্তান : ৪৫ ওভারে ২৩৪/৮ (সালমান বাট ৩৬, সুলেমান কাদির ৭৪; মাশরাফি ৯-০-৫৫-০, শরীফ ৪/৩৯, সফিউল ৩/৪৩)।
বাংলাদেশ : ৪১.৫ ওভারে ১৫৭/১০
ফল : পাকিস্তান ৭৭ রানে জয়ী।

১ম সেমিফাইনাল
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
ভেন্যু : বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম
তারিখ : ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০০১
শ্রীলঙ্কা ৩৪.৫ ওভারে ১৪০/১০ (মাশরাফি ৮-০-৩০-১, সফিউল ৩/৪২, রানা ২/১৩)
বাংলাদেশ : ৩৭.১ ওভারে ১৪৪/৫ (জহুরুল ইসলাম ৫৫)।
ফল : বাংলাদেশ ৫ উইকেটে জয়ী

ফাইনাল
বাংলাদেশ-ভারত
ভেন্যু : বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম
তারিখ : ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০০১
বাংলাদেশ : ৪৫ ওভারে ২২৫/৬ (আশরাফুল ৮৯, হাসিবুল ৫২, মাশরাফি ১৮ [১২ বল, ১৬ মিনিট, ১টি চার])
ভারত : ৪৩.১ ওভারে ২২৮/৪ (মাশরাফি ৯-০-৫৫-১)।

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ স্কোয়াড

নাফিস ইকবাল (অধিনায়ক), আরিফ হোসেন, হাসিবুল হক, জহুরুল ইসলাম, জুনায়েদ সিদ্দিকী, মানজারুল ইসলাম রানা, মাশরাফি বিন মুর্তজা, মোহাম্মদ আশরাফুল, মোহাম্মদ শরীফ, মোহাম্মদ শরিফুল, মুরাদ খান, সফিউল আলম, তালহা জুবায়ের।



ছবি দেখে ভুলবেন না। মায়ের কোলে শান্ত হয়ে থাকা এই বালকই মাশরাফি বিন মুর্তজা। বাসায় তোলা ছোটবেলার ছবি © মুর্তজা পরিবার



মাশরাফির জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ–নানি খালেদা রহমান বেলা। নানির কোলে ছোট ভাই মুরসালিন বিন মুর্তজা এবং পাশে কৌশিক
C মুর্তজা পরিবার



দুই সন্তানের সাথে মা। পরিবারের সবাই মিলে ছবি তোলা খুব কম হয়। তার মধ্যেই মা হামিদা মুর্তজা বলাকার সাথে দুই ভাই © মুর্তজা পরিবার



পিতা-পুত্র। সকল ব্যথা, সকল যন্ত্রণায় কাঁধে থাকে বাবার হাত। ২০১৫ সালে পবিত্র ঈদের সময় বাবা গোলাম মুর্তজা স্বপনের সঙ্গে একটু গল্পগুজব

C মুর্তজা পরিবার



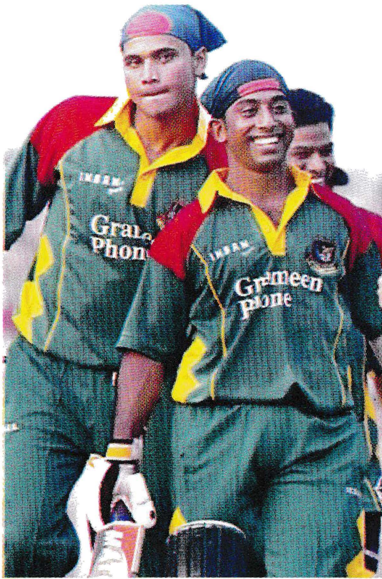
২০০৩ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দেশে সিরিজ শুরু করার আগে দলগত ছবিতে। এই সিরিজটা ছিল মাশরাফির জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ © শা. হ. টেংকু





সেই ভয়ানক চোট
© শা. হ. টেংকু

বেরিয়ে যেতে হচ্ছে মাঠ থেকে
© শা. হ. টেংকু



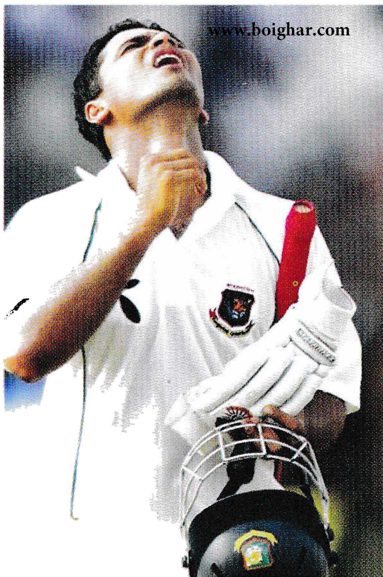
২২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬; শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ঐতিহাসিক জয়ের পর
© ফারজানা গোধূলি



১০ এপ্রিল, ২০০৬; ফতুল্লা। এলবিডব্লু হলেন হেইডেন © শা. হ. টেংকু



২৬ এপ্রিল, ২০০৬। এলোমেলো হয়ে গেল রিকি পন্টিংয়ের স্টাম্প
© শা. হ. টেংকু



ভারতের বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্ট; ২০০৭।
৭৯ রানে আউট মাশরাফি
© ফারজানা গোধূলি



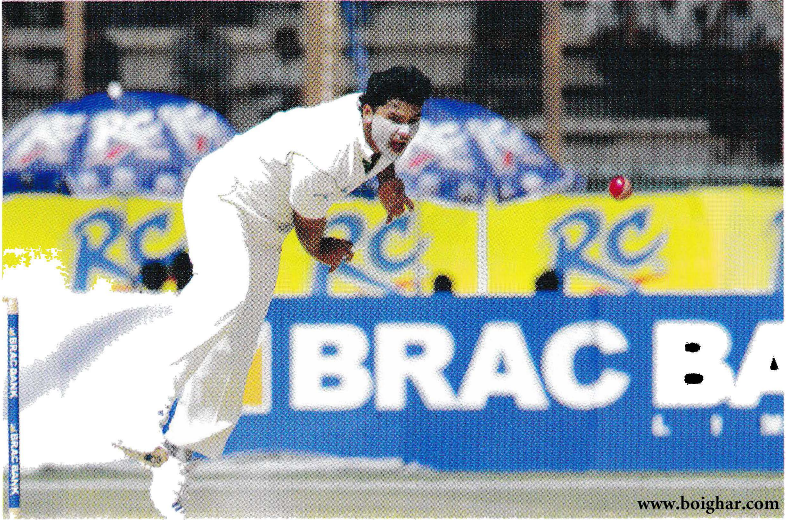
আগস্ট, ২০০৭। সিলেট সেনানিবাসে
কমান্ডো ট্রেনিং © শা. হ. টেংকু



দ্য গ্রিন ক্যাপ। ২০০৭
© শা. হ. টেংকু



শুনতে পাচ্ছ? ২০০৬ সালে বগুড়ায়,
কেনিয়ার বিপক্ষে © শা. হ. টেংকু



২০০৮। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্টে চিরচেনা রূপে
Ⓒ শা. হ. টেংকু



২০০৭ বিশ্বকাপ। অধিনায়ক হাবিবুল বাশারের একটু পরামর্শ
Ⓒ শা. হ. টেংকু



প্রথম টস। ৯ জুলাই, ২০০৯। কিংসটাউনে প্রথমবারের মতো টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে মাঠে নামলেন মাশরাফি © সৌজন্য ছবি



১১ জুলাই, ২০০৯। এক দিন পরই বেরিয়ে আসছেন মাশরাফি। এক দিনেই শেষ হয়ে গেল অধিনায়কত্ব-পর্ব © সৌজন্য ছবি



পায়ে ব্যথা, হৃদয়ে ক্ষত; তারপরও উল্লাস। দলের টেস্ট জয়ে আহত অধিনায়ক নেমে এলেন মাঠে © সৌজন্য ছবি



ঢাকায় ফিরে এসেছেন দল ছেড়ে। অনেকবারের আসার সঙ্গে এবারের বড় পার্থক্য; অধিনায়ক হয়েই যে ফিরে এসেছেন © শা. হ. টেংকু

ক্যারিবীয় পেসদানব



১.

উইকেটের এক প্রান্তে তিনটি স্টাম্প যথারীতি দাঁড়িয়ে আছে। তার থেকে একটু বোলারের দিকে এগিয়ে আরও দুটো লম্বা লাঠি দাঁড় করানো হয়েছে। ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যাবে লাঠি দুটো লেন্থের হিসেবে ঠিক গুড লেন্থ বরাবর বসানো হয়েছে। আর লাইনের হিসেবে অফ স্টাম্প থেকে সামান্য বাইরে বসানো হয়েছে প্রথম লাঠিটা; মাঠে তিনটি স্টাম্পের দূরত্ব ফাঁকা রেখে দাঁড়িয়ে আছে আরেকটা লাঠি।

মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি ভদ্রলোক কোনো কথা না বলে এতক্ষণ এই বাড়তি লাঠি বসানোর কাজ করছিলেন।

এবার ছেলেদের ডাক দিলেন, 'বুঝতে পারছ, এই লাঠি দুটোর কাজ কী?'

ছেলেরা একটু দ্বিধায় পড়ে গেছে। তারা বুঝতে পারছে, এটা বলের সেরা লাইন আর লেন্থ নির্দেশ করছে। কিন্তু কাজটা কী!

প্রবীণ মানুষটি এবার একটা বল তুলে নিলেন হাতে। রানআপ মাপা শুরু

করলেন। পরিষ্কার সোজা রানআপ। বোলিং প্রান্তের মাথায় চলে গেলেন। আলতো করে দৌড়ে এসে বলটা ছুড়লেন। তার চিরচেনা সেই বিষ মেশানো শর্ট-বাউন্সার নয়; ক্লাসিক ফাস্ট বোলারের অফ স্টাম্পের বাইরের ডেলিভারি। ঠিক লাঠি দুটোর মাঝখানে পিচ করে দুই লাঠির মাঝখান থেকে বেরিয়ে গেল।

এবার ছেলেদের দিকে ফিরে বললেন, 'এটা করতে হবে। বারবার করতে হবে। বলটাকে ওই দুটো লাঠির মধ্যে থেকে নিতে হবে। আর বলটা ফেলতে হবে ওই দুটো লাঠি বরাবর। এটাই তোমাদের বেসিক, এটাই ফাস্ট বোলারের প্রথম কাজ।'

এবার দৈবচয়নেই বেছে নিলেন একটা ছেলেকে। বললেন, 'তুমি ছয়টা বল করো, একটু দেখি।'

ছেলেটা ঠিক অমন করেই রানআপ মাপল। প্রবীণ মানুষটির মতোই সোজা দৌড়ে এসে প্রথম ডেলিভারি করল। মানুষটির কৃষ্ণ মুখে একটু আলোর আভা। পরপর ছয়টা বল হয়ে গেল। একটা বল শুধু লাইন ছেড়ে স্টাম্প বরাবর চলে গিয়েছিল। বাকি পাঁচটাই গুরুর দেখানো পথে।

এবার মানুষটি এগিয়ে এলেন। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কী?'

'কৌশিক; মাশরাফি বিন মুর্তজা কৌশিক।'

'ওকে। তুমি শরীরটার যত্ন নিও। বাংলাদেশ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তুমি অনেক বড় ফাস্ট বোলার হবে।'

আজও এই ভবিষ্যদ্বাণী করা লোকটির প্রসঙ্গ উঠলে মানুষের মাথা নুইয়ে আসে, আজও পৃথিবী কাঁপানো সব ব্যাটসম্যান তার নাম শুনলে শিউরে ওঠেন; আজও বলা হয় তিনিই প্রথম চিনতে পেরেছিলেন মাশরাফি বিন মুর্তজাকে।

হ্যাঁ, তিনি অ্যান্ডি রবার্টস; স্যার অ্যান্ডারসন মন্টেগোমারি এভারটন রবার্টস।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের সর্বজয়ী দলের পেস চতুষ্টয়ের অন্যতম ভয়ংকর সদস্য, স্লো আর ফাস্ট বাউন্সে পৃথিবীকে এক দারুণ দ্বিধার মধ্যে ফেলে দেওয়া অ্যান্ডি রবার্টস। দুবার বিশ্বকাপ জেতা দলের সদস্য, দুই শতাধিক টেস্ট উইকেটের মালিক, অ্যান্টিগার সম্রাট অ্যান্ডি রবার্টস।

২.

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সেই আমলে এক অসামান্য সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল–স্যার অ্যান্ডি রবার্টসকে দেশের তরুণ পেসারদের কিছু মৌলিক ব্যাপারস্যাপার দেখিয়ে দেওয়ার জন্য নিয়ে আসা হবে।

রবার্টস ক্রিকেট ছাড়ার পর কোচিং খুব একটা করাচ্ছিলেন না। মূলত তিনি বরং উইকেট রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে বেশি মন দিয়েছিলেন। তারপরও তরুণ ফাস্ট বোলারদের সহায়তার জন্য ডাকা হলে দুনিয়ার যেকোনো প্রান্তেই হাজির হয়ে যেতেন এই মানুষটি।

২০০১ সালের মাঝামাঝি চলে এলেন ঢাকায়। বিকেএসপিতে দুই সপ্তাহের ক্যাম্প

করাবেন তিনি।
মাশরাফি তখন বিকেএসপিতেই। নাফীস ইকবালের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সদস্য হিসেবেই প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই সময়ে রবার্টস দেশে আসায় তার কাছে অনুশীলন করানোর জন্য বাছাই করা জনা দশেক তরুণ পেসারকে আলাদা করে নিল বিসিবি। সেই পেসারদের মধ্যেই ছিলেন মাশরাফি বিন মুর্তজা, তালহা জুবায়েররা।
এই পেসারদের বাকি জীবনের জন্য শুধু অ্যান্ডি রবার্টসের উপস্থিতিটাও যে বিশাল একটা ব্যাপার ছিল, সেটা বলছিলেন এই ক্যাম্পে সমন্বয়কারী কোচ হিসেবে দায়িত্বে থাকা দীপু রায় চৌধুরী, 'রবার্টস তো বিরাট একটা ব্যাপার। আমরাই রবার্টসদের দেখে বেড়ে উঠেছি; সেই কোয়ার্ডেটের একজন। ওনার প্রতিটা কথা অমূল্য ছিল এই কিশোরদের জন্য।'
দীপু রায় চৌধুরীই জানাচ্ছিলেন, খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও ক্যাম্পটা দারুণ উপকার করেছিল এই কিশোর ফাস্ট বোলারদের বেসিক ড্রিলগুলো বোঝার জন্য। সেই সঙ্গে রবার্টস নিজে যেমন পেস ভেরিয়েশন, বাউন্সে পেস ভেরিয়েশনে ভুবন বিখ্যাত ছিলেন; সেই ভেরিয়েশনগুলো নিয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু টিপস দিয়েছিলেন এই কিশোরদের এবং মজার ব্যাপার হলো, পরিণত মাশরাফির মধ্যে কম পেসে সেই বৈচিত্র্যগুলো কাজে লাগানোর একটা প্রবণতা আজও দেখতে পান দীপু রায় চৌধুরী।
এ প্রসঙ্গে সেই ক্যাম্পে থাকা আরেক স্থানীয় কোচ, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের শুরুর সময়ের ফাস্ট বোলিং সৈনিক গোলাম ফারুক সুরুর কথাও শোনা যেতে পারে। সুরু বলছিলেন, ইনজুরিমুক্ত পেস বোলিংয়ের ব্যাপারে সেই সময়েই রবার্টস বেশ কিছু কলাকৌশলের কথা বলেছিলেন।
এটা নিয়ে সুরুর একটা আফসোসও আছে।
তিনি মনে করেন, সেই সময়ে কোচ হিসেবে আধুনিক ইনজুরি ম্যানেজমেন্ট ও সম্ভাব্য ইনজুরি থেকে দূরে থাকার কলাকৌশল নিয়ে তাদের পরিষ্কার ধারণা ছিল না। রবার্টসের এই দুই সপ্তাহের ক্যাম্প থেকে সেটা শিখে নেওয়াও সম্ভব ছিল না। তার খুব আফসোস, তখনই যদি তারা এই কলাকৌশলগুলো রপ্ত করতে পারতেন, মাশরাফির ক্যারিয়ার রেকর্ড অন্য রকম হতো।
একেবারে উদার ভঙ্গিতে সুরু বলছিলেন, 'দেখুন, ২০০১ সালে আমরা আধুনিক ফাস্ট বোলিং কোচিং বা অ্যাথলেট ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না। অনেক পরে আমি যখন অস্ট্রেলিয়ান সেন্টার ফর এক্সেলেন্সে গিয়েছি, দেখেছি ওরা কত স্তরে এসব বিষয় নিয়ে কাজ করে। একটা তরুণ পেসারের স্ট্রেস, বোলিং অ্যাকশন নিয়ে অনেক গবেষণা করতে হয়। সেসব তখন আমার অন্তত জানা ছিল না। আমি মাশরাফিকে কিছুদিন আগেও বলছিলাম, ২০০১ সালে আমি অন্তত এসব জানলে তোমার ক্যারিয়ার এমন হতো না। তুমি রেকর্ডেও বিশ্বসেরা

থাকতে। এই আফসোস আমার জীবনেও যাবে না।'
সেই আফসোস থাকবেই।
তারপরও আমাদের বাস্তবতা জেনেই এগিয়ে যেতে হবে এই গল্প নিয়ে। যে গল্প আমাদের বলবে যে, এই ক্যাম্পে মাশরাফিকে দেখে কতটা বিস্মিত ও হকচকিত হয়েছিলেন অ্যান্ডি রবার্টস।
আমাদের দুজন কোচই সাক্ষ্য দিচ্ছে, সে সময় একজন আন্তর্জাতিক জেনুইন ফাস্ট বোলারের গতিতেই বল করতেন মাশরাফি। এই ভয়াবহ গতির সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করার সহজাত ক্ষমতা দেখে রবার্টস জনে জনে এই ছেলেটার কথা বলছিলেন। বলছিলেন মাশরাফি-তালহা দুজনের কথাই।
রবার্টস দুই সপ্তাহের ক্যাম্প শেষে একটা রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন বিসিবির কাছে। সেই রিপোর্টে পরিষ্কার বলা ছিল, ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের পেস বোলিংয়ের সবচেয়ে বড় কাণ্ডারি হবেন মাশরাফি বিন মুর্তজা।
ক্রিকেট-বিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকইনফোতে সেই সময় শাহরিয়ার খান অ্যান্ডি রবার্টসকে উদ্ধৃত করেছিলেন–আমি নিশ্চিত সে দ্রুতই একজন খাঁটি ফাস্ট বোলার হিসেবে আবির্ভূত হবে; ৯০ মাইল গতিতে বল করবে। একজন খাঁটি ফাস্ট বোলার হিসেবে আমি ওর মধ্যে অসাধারণ এক ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি। এখন যা দরকার, তা হলো ওর নিজের প্রতি নিজের ভালো যত্ন নেওয়া এবং ওকে ঠিকমতো গড়েপিটে বড় করে তোলা। [১]
সে সময়ের পত্রপত্রিকা আমাদের বলে, রবার্টস তার এই মনোভাব বিসিবিকে জানাননি। প্রকাশ্য সংবাদ সম্মেলনেও বারবার বলে গেছেন।

৩.
ক্যাম্পের প্রথম দিনে রবার্টসের সঙ্গে ছেলেদের পরিচয় হলো একটা করে বল দিয়ে।
একটা বাক্স করে লাল বল নিয়ে মাঠে এসেছিলেন রবার্টস। ছেলেরা সব লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আর কিংবদন্তি এই ফাস্ট বোলার একটা একটা করে চকচক করে থাকা বল তুলে দিচ্ছেন ওদের হাতে।
বল বিলি শেষে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। আস্তে আস্তে করে বললেন, 'এই বল দিয়ে কী করবে, তোমরা?'
'ফাস্ট বল করব'–সমস্বরে চিৎকার করে উঠেছিল ছেলেগুলো।
'তা তো অবশ্যই করবে। তবে আমি চাই, এই দুই সপ্তাহ ধরে তোমরা এই বলটা দিয়েই বল করবে। আমি দুই সপ্তাহ পর বলগুলোর চেহারা দেখতে চাইব।'
ক্যাম্প শেষ হয়ে গেল। অ্যান্ডি রবার্টস চলে যাবেন। এই কদিনেই পুত্রতুল্য হয়ে উঠেছে ছেলেগুলো। ডাক দিয়ে বললেন, 'বাবারা, তোমাদের বলগুলো দেখি।'
একটা একটা করে বল বেরিয়ে এল ছেলেদের হাতে।

তালহা বর্ণনা করছেন, 'প্রায় সবগুলো বলের পুরোটাই হালকা সবুজ হয়ে গেছে। মাশরাফির বলটার দুই পাশ প্রায় পরিষ্কার; সিম একেবারে গাঢ় সবুজ। আমার বলেরও সিম মোটামুটি সবুজ।'

রহস্যটা বোঝা গেল না। তালহাই সমাধান করে দিলেন, 'বিকেএসপির যে উইকেটটাতে আমরা বল করতাম, ওটায় ঘাস এমন ছিল যে, বলের যে জায়গা পড়ত, সবুজ রং হয়ে যেত। তাই যারা সিম বেশি ফেলতে পেরেছে, তাদের বলের সিম বেশি সবুজ।'

এবার রবার্টস মাশরাফি ও তালহার বল দুটো হাতে নিয়ে বললেন, 'আমি এই দুই সপ্তাহ ধরে তোমাদের এটাই শিখাতে চেয়েছি। সিমটাকে সবুজ করে ফেলাটাই চ্যালেঞ্জ। আমি বলে গেলাম, এই ছেলে দুটো চ্যালেঞ্জ নিতে পারবে।'

অ্যান্ডি রবার্টসের ক্যাম্পের বর্ণনা দিতে গিয়ে তালহা জুবায়ের রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন।

বারবার বলছিলেন, তাদের অতটুকু জীবনে রবার্টসের ক্যাম্পটা ছিল হাতে একটা বিশ্ব পাওয়ার মতো অনুভূতি। ১৭-১৮ বছর বয়সী কিশোর। এই বয়সে অ্যান্ডি রবার্টসের গ্রেটনেস বোঝার কথা নয়। বিশেষত কৌশিকের তো সে সুযোগই ছিল না তখন।

চিত্রা নদীর কোলে পেশি মজবুত করেছে, স্কুলমাঠে নিজেই নিজেকে ফাস্ট বোলার বানিয়েছে। সে কী করে ক্যারিবীয় সোনালি সময়ের খোঁজখবর রাখবে?

তবে এটুকু দিব্যি বুঝতে পারছিল যে, ইনি অনেক বড় একটা কিছু। বিশেষ করে তালহাই জানাল, 'জানিস কৌশিক, এই লোক নাকি হাতের মধ্যেই ডেলিভারির মুহূর্তে বলের শাইনিং দিক বদলে ফেলতে পারত!'

আরেকটা জিনিস জানা গেল, একই অ্যাকশনে এই ভদ্রলোক একই স্পটে শর্ট ডেলিভারি করতেন দুই রকম গতিতে। প্রথম বলটা শর্ট-বাউন্স করতেন একেবারে কম গতিতে। এরপর হয়তো আরও একটা ও রকম স্লোয়ার-বাউন্সার। তারপর হঠাৎ করে খুব গতিশীল একটা বাউন্সার; একই অ্যাকশন, একই স্পট!

এই একটা তথ্য খুব বিহ্বল করে দিয়েছিল কৌশিকদের–তাহলে তো এই লোক ম্যাজিশিয়ান!

ভদ্রলোকের কাছ থেকে ম্যাজিকটা জেনে নিতে হবে। কয়েকটা দিন অনুশীলন শেষ হলেই তালহা আর কৌশিক গিয়ে ধরত, 'স্যার ওই ট্রিকটা শেখাবেন না?'

স্যার সব সময়ই বিষয়টা এড়িয়ে যান।

একদিন স্লোয়ার-ফাস্টার বাউন্সারটা দেখিয়েও ফেললেন। দুজনকে বেশ করে বুঝিয়ে দিলেন অ্যাকশন একই রেখে কীভাবে পেস ভেরিয়েশন করতে হয় এবং সেটা কীভাবে বাউন্সারে কাজে লাগাতে হয়।

কিন্তু সেই হাতের মধ্যে বল ঘুরিয়ে ফেলাটা আর শেখান না। ক্যাম্পের শেষ এগিয়ে এল। তখনো চলছে এই রহস্য। একদিন তালহাই বলল, 'স্যার মনে হয়

ওটা শেখাবেন না।'

সেদিন ভোরবেলা। তালহা আর মাশরাফিকে ডেকে নিয়ে গেলেন রবার্টস। হাতে বল দিয়ে বললেন, 'দেখো, ক্রিকেটে ম্যাজিক বলে কিছু নেই। প্রতিটা ম্যাজিক মানুষের ভেতরে। আমি যদি ওটা করে থাকি, আমার ভেতরে ছিল। দেখবে, অ্যাম্ব্রোসের ভেতরে আছে। আমি বিশ্বাস করি, তোমাদের ভেতরও ম্যাজিক আছে। আমার শেখাতে হবে না। তোমরা চেষ্টা করো। তোমরা দুনিয়াকে যার যার ভেতরের ম্যাজিকটা দেখিয়ে দাও।'

৪.

অ্যান্ডি রবার্টস চলে যাচ্ছেন।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে একটা সংবাদ সম্মেলন হলো। এই দুই সপ্তাহের ক্যাম্পে বাংলাদেশি ফাস্ট বোলারদের কী দেখলেন বা কী আবিষ্কার করলেন, সেসব বলতেই সংবাদ সম্মেলন। বাংলাদেশে ফাস্ট বোলারদের যত্নে কী কী করা উচিত, যারা আছে তাদের আরও ভালো কীভাবে করা যাবে; এসব নিয়ে অনেক আলোচনা হলো।

সংবাদ সম্মেলনটা হলো স্টেডিয়ামের দোতলায়। সব শেষ করে সাংবাদিকেরা চলে যাচ্ছেন, তারা সিঁড়ির নিচে নেমে এসেছেন। এমন সময় ব্যালকনিতে বেরিয়ে এলেন আবার রবার্টস। ওখান থেকেই হাঁক দিলেন, 'জেন্টলম্যান। তোমরা কি একটু অপেক্ষা করবে? আমার আরেকটা কথা ছিল।'

রবার্ট দাঁড়াতে বলেছেন। সারা বিশ্ব দাঁড়িয়ে যাওয়ার কথা। সাংবাদিকেরাও পরম কৌতূহলে দাঁড়ালেন–কী বাড়তি বলবেন রবার্টস!

রবার্টস নেমে এসে বললেন, 'আমি বলতে চাই, আসলে একটা ছেলেকে ১৮-১৯ বছর বয়সে কী টেস্ট খেলিয়ে দেওয়া উচিত? বিশেষ করে তার যদি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটের কোনো অভিজ্ঞতাই না থাকে? আমি ভেবেছিলাম, এই প্রশ্ন আপনারা করবেন। না করলেও আমি উত্তর দিতে চাই।'

সাংবাদিকেরা আগামাথা কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। তাদের হতভম্ব রেখেই রবার্টস বলে চললেন, 'আমি সাধারণ ক্ষেত্রে এমন ফাস্ট বোলারের টেস্ট খেলানোর পক্ষে নই। তবে বিশেষ কিছু ক্ষেত্র পৃথিবীতে তৈরি হতে পারে। একজন বোলার যদি চরম ব্যতিক্রমী প্রতিভাধর হয় এবং দেশটির বাকিদের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকে; তাকে এমন ক্ষেত্রে কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়া অল্প বয়সে টেস্ট খেলানো যেতে পারে।'

কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে একটু নিঃশ্বাস নিয়ে আবার বললেন, 'তবে খুব, খুব সতর্ক থাকতে হবে সবাইকে। তার শরীরের যত্ন নিতে হবে। অতি ব্যবহার যেন না হয় সে খেয়াল রাখতে হবে। এমন বিশেষ ক্ষেত্রে পুরো ক্রিকেট মহলকেই বিশেষ নজর দিতে হবে।'

এরপরই দুই হাত নাড়া দিয়ে বললেন, 'ওকে জেন্টলম্যান, আমার যা বলার ছিল বলা শেষ।'
এ কেমন বলা! কাকে নিয়ে বললেন, কেন বললেন; কিছুই বোঝা গেল না। শুধু একটা থিওরি নিয়ে যেন যেচে আলাপ করলেন! কেন এই কথাগুলো?
সাংবাদিকেরা কিছু অনুমান করতে পারছিলেন না, তা নয়। কয়েক দিন ধরেই রবার্টস দফায় দফায় একজন বোলারের ব্যাপারেই কথা বলছিলেন। ফলে অনুমান করা যাচ্ছিল, সেই ফাস্ট বোলারেরই ইঙ্গিত দিচ্ছেন আবার রবার্টস।
তারপরও তরুণ এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, 'অ্যান্ডি, তুমি কি কৌশিকের ব্যাপারে কথা বলছ?'
'সেটা বের করা তোমাদের দায়িত্ব। আমি বিসিবিকে লম্বা একটা রিপোর্ট দিয়েছি। কী করতে হবে, বলেছি। আমি জানি, আমি যাওয়ার পরপরই কিছু ঘটনা ঘটবে। তখন আমার এ বিষয়ে মতটা তোমাদের জানার আগ্রহ তৈরি হবে। আমি চাই আমার মত শুধু বিসিবির ফাইলে বন্দী না থাকুক। আমি বাংলাদেশকে জানিয়ে গেলাম। কার ব্যাপারে বলছি, এটা তোমার টের পেয়ে যাবে। সে ইতিহাস তৈরি করতে এসেছে।'
সাংবাদিকেরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বললেন–কৌশিক নিশ্চয়ই।
হ্যাঁ, কৌশিকের কথাই সেদিন বলেছিলেন রবার্টস–ইতিহাস তৈরি করতে এসেছে।

৫.
বুয়েট মাঠের খেলা শেষ।
কেউ হোটেলে ফিরছে, কেউ আত্মীয়-স্বজনের বাসায়। সে রাতে কৌশিক ইন্দিরা রোডে তার এক নিকটাত্মীয়র বাসায় থাকবে। খেলা দেখতে আসা বাবা এই বাসাতেই আছেন। দুটো বন্ধুকে নিয়ে অটোরিকশা চেপে বুয়েট মাঠ থেকে ইন্দিরা রোডে আসছে কৌশিক।
বন্ধু দুজন মানে রাজু আর অসীম।
বন্ধুরা নড়াইল থেকে ঝাঁক ধরে খেলা দেখতে না এলে কৌশিকের খেলা হয় না। মাঠে সে খেলবে, বন্ধুদের গ্যালারিতে থাকা চাই। বন্ধুরাও তেমন। পারলে ট্রাক ভাড়া করে নড়াইল থেকে চলে আসে। সেদিনও এসেছিল অনেকে। কেউ কেউ থেকে গেছে, কেউ কেউ চলে গেছে।
অসীম আর রাজু রাতে কৌশিকের সঙ্গেই থাকবে।
বেশ রাত হয়ে গেছে। ২০০১ সালের ঢাকা শহর অল্পেই ফাঁকা হয়ে যায়। সাঁই সাঁই করে চলছে দুই স্ট্রোকের অটোরিকশা; বিকট শব্দ হচ্ছে। ওই শব্দের মাঝেই কৌশিক বলল, 'দুনিয়ার কী তামাশা, দেখ রাজু।'
'তামাশা মানে!'
'এই কয় দিন আগে আমরা একসঙ্গে বসে আকরাম খান, বুলবুল, সুমন, দুর্জয়;

ওনাদের খেলা দেখছি। আর আজ তাগো বিপক্ষে খেললাম!'
'তা ঠিক। এডা একটা তাজ্জব ব্যাপার।'
'আরে বেটা! শুধু তাজ্জব ব্যাপার? মোহাম্মদ রফিকের সঙ্গে এক দলে বল করলাম। আর আকরাম খান আমার পিঠে হাত রেখে কথা বলে। তুই ভাবতি পারিস।'
নাহ। আসলেই তখন ঠিক ভাবার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।
মাশরাফির তো আসলে ঘোরই কাটিয়ে উঠতে পারার কথা নয়। কয়েক মাসও হয়নি ঢাকায় এসেছিল বিভাগীয় অনূর্ধ্ব-১৭ দলের হয়ে খেলতে। এসেই একটার পর একটা মঞ্চে উঠতে হচ্ছে। অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়া কাপ, অনূর্ধ্ব-১৯ ক্যাম্প, অ্যান্ডি রবার্টসের ক্যাম্প পার করে মাশরাফি তখন বাংলাদেশ 'এ' দলের হয়ে ভারতে যাওয়ার প্রস্তুতি হিচ্ছে।
সেই সময় তার সামনে পড়ে পড়া হিরের মতো একটা সুযোগ এসে গেল বাংলাদেশ জাতীয় দলের বিপক্ষে একটা ম্যাচ খেলার সুযোগ। জাতীয় দল তখন জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজ খেলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। বছরের শেষ দিকে লম্বা সফরে আসছে জিম্বাবুয়ের সোনালি প্রজন্ম। তাদের বিপক্ষে খেলার জন্য স্বল্প সামর্থ্যে নিজেদের প্রস্তুত করে তোলার চেষ্টায় আছে নাঈমুর রহমান দুর্জয়ের দল।
এ অবস্থায় বিসিবি ঠিক করল ভারত সফরের জন্য তৈরি হতে থাকা খালেদ মাহমুদ সুজনের নেতৃত্বাধীন 'এ' দলের বিপক্ষে একটা ম্যাচ খেলানো হবে জাতীয় দলকে। সেই অনুযায়ী ২০০১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর বুয়েট মাঠে অনুষ্ঠিত হলো দুদলের ম্যাচটি।
টসে জিতে আগে ব্যাট করেছিল মাশরাফিদের 'এ' দল। ওপেনার রফিকুল ইসলামের ৬২ ও খুলনার তারকা হাসানুজ্জামান ঝড়ুর ৫২ রানে ভর করে ২৩৯ রান তুলেছিল তারা। মাশরাফি রানই করতে পারেননি। টেস্ট অধিনায়ক দুর্জয়ের অফ স্পিনে চতুর্থ বলেই কোনো রান করে বোল্ড হয়ে গিয়েছিলেন; স্পিনে অমন বিপদে ভবিষ্যতে আর কখনো মাশরাফিকে পড়তে হয়েছে বলে মনে হয় না।
জাতীয় দলের হয়ে সাব্বির খান ৩ উইকেট নিয়েছিলেন; এই সাব্বির খান পরে বাংলাদেশ জাতীয় দলের ম্যানেজার হয়েছেন, বর্তমান বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে মাশরাফিদের সামলানোর বিভাগ 'ক্রিকেট অপারেশনস'-এর ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়া হাসিবুল হোসেন শান্ত ও দুর্জয় দুটি করে উইকেট নিয়েছিলেন।
ম্যাচের সবচেয়ে বড় তারকা ছিলেন অবশ্য সবাইকে ছাপিয়ে বাঁহাতি স্পিনার মোহাম্মদ রফিক। পরবর্তীকালে দেশের কিংবদন্তিতে পরিণত হওয়া এই বাঁহাতি স্পিনারের সামনে পড়ে জাতীয় দলের ব্যাটিং একেবারে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। মাশরাফি নতুন বলে বল করতে এসে ৮ ওভারে ১ মেডেনসহ ২০ রান খরচ করে নিতে পেরেছিলেন কেবল শান্তর উইকেট। তার আগেই অবশ্য রফিক ৩৪ রানে ৫

উইকেট নিয়ে নেতৃত্ব দেন জাতীয় দলকে ১৫২ রানে গুটিয়ে দেওয়ায়।

এই ম্যাচের জয়টা মাশরাফির জন্য সারা জীবনের একটা প্রেরণা হয়ে থাকতে পারে। তবে জয়-পরাজয় নয়, মাশরাফি সেদিন আসলে মাঠ থেকে ফিরেছিলেন কদিন আগেরও দূর আকাশের তারাদের কাছ থেকে দেখার আনন্দ নিয়ে।

সেদিন অটোরিকশা থেকে নামতে নামতে কৌশিক বলেছিলেন, 'দেখিস, আমি একদিন ওনাদের সঙ্গে টেস্ট খেলব।'

নিয়তি তখন পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে হয়তো। কয়েক মাসও বাকি নেই আর মাশরাফির টেস্ট খেলার।

বাংলাদেশ-বাংলাদেশ 'এ'
ভেন্যু : বুয়েট মাঠ
তারিখ : ২৭ সেপ্টেম্বর

বাংলাদেশ 'এ' ৫০ ওভারে ২৩৯ (রফিকুল ৬২, ঝড়ু ৫২, মাশরাফি ০; সাব্বির খান ৩/২৭, নাঈমুর রহমান ২/৫৭, হাসিবুল হোসেন শান্ত ২/৬২)।

বাংলাদেশ : ৪০.২ ওভারে ১৫২ (হান্নান ৩৮; রফিক ৫/৩৫, মাশরাফি ৮-১-২৯-১)

৬

বিমানের ভেতরটা এত বড়!

বিমান বস্তুটা সিনেমায় আগে দেখেছে কৌশিক। কিন্তু এর ভেতর যে আসলে এত লোক বসতে পারে, তা কখনো বুঝতে পারেনি। এখন ভয় হচ্ছে, এই এত বড় বিমান উড়বে কী করে! উড়লেও আকাশে ঝুলে থাকতে পারবে তো!

এসব দুশ্চিন্তা না করে তার উপায় নেই। কৌশিক ভারতে চলেছে। খালেদ মাহমুদ সুজনের 'এ' দলের সঙ্গে ভারতে যাচ্ছে লম্বা সফরে।

বিমানে উঠে প্রথম সমস্যা হলো, মাইকে বলল সিটবেল্ট বাঁধতে; কিন্তু এটা বাঁধে কী করে?

হুহ। আমরা সাতঘাটের পানি ঘোলা করে ফেলা ছেলে। এত সহজে বোকা বানাতে পারবে না। কৌশিক আড়চোখে পাশের জনের দিকে চেয়ে রইল। সে কী কী করে, দেখতে থাকল। আসলে কাজটা কঠিন কিছু না। দুপাশ থেকে বেল্ট টেনে খট করে আটকে দিলেই হলো।

কঠিন ব্যাপার শুধু হলো আকাশে ঝুলে থাকা। বারবার ভয় হচ্ছিল। খানিকটা সময়ের মধ্যে ভয় কেটে গেল। এবার জানালা দিয়ে নিচে দেখা। আহা কী সুন্দর দেখা যায়। আরো অনেক সময় ধরে দেখতে পারলে হতো!

কিন্তু বিমান নেমে পড়ল মুম্বাই।

আহা মুম্বাই। ভিসিআরে অমিতাভের সিনেমা দেখেছে কৌশিক। এই মুম্বাই শহরে থাকে অমিতাভ। শচীন টেন্ডুলকারের বাড়িও নাকি এই শহরে। সেই মুম্বাইতে

এখন কৌশিক।
মনটা তার খুব ভালো থাকার কথা ছিল। কিন্তু মুম্বাই নেমেই মন খারাপ হয়ে গেল। বাড়ির সবাই কেমন আছে। রাজু-সাজু কি এখন নদীতে নামছে?
এক সিনিয়র ভাই বললেন, 'রাস্তার পাশে ওই যে টেলিফোন; ওখান থেকে বাড়ি কথা বলতে পারবি।'
প্রতিদিন ৫০ ডলার করে খাওয়াখরচ, হাতখরচ। কোনোক্রমে খেয়ে কিছু খরচ করে বাকিটা শুধু ফোনেই ব্যয় করা। মামার বাসায় টিঅ্যান্ডটি ফোনে প্রতিদিন যতক্ষণ টাকা আছে কল করতে থাকো, কথা বলতে থাকো। মাঝে মাঝেই আবদার, 'মামা, বাবলুকে একটু ডাইকে দেবা। এট্টা কথা আছে।'

৭.
চন্দ্রকান্ত গুলোবরাও বোর্দে, ওরফে চাঁদু বোর্দে তখন ভারতীয় ক্রিকেটের এক প্রতাপশালী ব্যক্তি।
সেই সময় দ্বিতীয় দফায় ভারতীয় জাতীয় দল নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ভারতের এই সাবেক টেস্ট ক্রিকেটার ও তখনকার দুঁদে প্রশাসক।
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সদর দপ্তর ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামেই বাংলাদেশ 'এ' দলের সঙ্গে মুম্বাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের একটা একদিনের ম্যাচ চলছিল। এখানে নজর রাখাটা প্রধান নির্বাচক হিসেবে জরুরি ছিল না তার জন্য; মুম্বাইয়ের এই দল থেকে কাউকে সেভাবে অনুসরণও করছিলেন না। তারপরও একেবারে অফিসের সামনেই খেলা বলে দেখছিলেন।
দেখতে গিয়ে নজর কাড়ল তার বাংলাদেশ 'এ' দলের একটি ছেলে।
দুরন্ত গতি। এমন গতি উপমহাদেশীয় ফাস্ট বোলারদের কাছে খুব বিরল একটা ব্যাপার। একটু নড়েচড়ে বসলেন বোর্দে। ওয়াংখেড়ের এই বিখ্যাত ফ্ল্যাট উইকেটে ছেলেটা বাধ্য করছে এখানকার ব্যাটসম্যানদের ব্যাকফুটে যেতে! বিস্ময়কর। হঠাৎ করেই দেখলেন একটা শর্ট বল দিল ছেলেটা। ভয়ংকর গতির সেই শর্ট বল সামলাতে না পেরে ব্যাটসম্যান উইকেটে পড়েই গেল।
উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন বোর্দে। একটু চেপে রাখলেন।
বাংলাদেশ 'এ' দলের পরের ম্যাচ পুনেতে। বোর্দের নিজের শহর পুনে। ঘটনাচক্রে সেখানেও চললেন বোর্দে। আবারও সেই ছেলেটার বোলিং দেখছিলেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো। নিজের খেলোয়াড়ি জীবনে দেখা ক্যারিবীয়দের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।
একটু উঠলেন। বাংলাদেশ 'এ' দলের কোচ কে খুঁজে বের করতে হবে। ড্রেসিংরুমের সামনে গিয়েই দেখা মিলল দীপু রায় চৌধুরীর। হাত বাড়িয়ে দিয়ে পরিচিত হলেন। তারপরই জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের ওই ফাস্ট বোলারটার নাম কী?'

দীপু রায় চৌধুরী হাসলেন। তিনি বুঝতে পারছেন, কার কথা জানতে চাইছেন চাঁদু বোর্দে। হেসে বললেন, 'মাশরাফি বিন মুর্তজা।'
'আপনারা তো অনেক বড় একটা সম্পদ পেয়ে গেছেন। বিশ্ব কাঁপাবে এই ছেলে। ইউ আর সো লাকি।'
চাঁদু বোর্দের জহুরি চোখ সেদিন ভুল দেখেনি।
আসলে ছোট্ট হলেও 'এ' দলের হয়ে সেই চার ম্যাচের ভারত সফরে দেশটির ক্রিকেট কোচ, সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় ও প্রশাসকদের অন্তত একধরনের উত্তেজনার মধ্যে ফেলে দিতে পেরেছিলেন মাশরাফি। সেই 'এ' দলের কোচ দীপু রায় চৌধুরী বলছিলেন, 'হি ওয়াজ রিয়েলি ফাস্ট। আজ বলে বোঝানো কঠিন, মাশরাফি সেই সফরে কী জোরে বল করেছে। ওর বলের ওপর নিয়ন্ত্রণ হয়তো এখনকার মতো ছিল না। তবে শুধু গতি দিয়ে পাগল বানিয়ে ফেলেছিল। ইন্ডিয়ার মরা উইকেটে সে ব্যাটসম্যানদের বলে বলে পেস দিয়ে বিট করছে, বাউন্সার দিয়ে কাঁপাচ্ছে বা ব্যাকফুটে খেলাচ্ছে; এটা দেখা বিস্ময়কর একটা অভিজ্ঞতা ছিল। আমি একজন ফাস্ট বোলার হিসেবে বলতে পারি, এটা ভয়ংকর একটা শো ছিল।'
যদিও পরিসংখ্যান ঠিক পুরোপুরি সাক্ষ্য দিতে পারবে না। তারপরও উল্লেখ করা যেতে পারে, এই সফরের চার ম্যাচে ৮ উইকেট পেয়েছিলেন মাশরাফি।
প্রথম ম্যাচটা ছিল ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট একাদশের বিপক্ষে মুম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে। টসে জিতে আগে ব্যাট করেছিল ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট একাদশ। মূলত মাশরাফির তোপের সামনেই ৩৮.৩ ওভারে অলআউট হয়ে যায় তারা ১২৪ রানে। মাশরাফির পরিসংখ্যানটা দেখলেই খানিকটা অনুমান করতে পারবেন ভয়ংকর চেহারাটা। ৭ ওভার বল করে ২ মেডেন নিয়েছিলেন; ব্যয় ছিল মাত্র ১৫ রান। আর এর বিনিময়ে তুলে নিয়েছিলেন ৩টি উইকেট।
আশরাফুলের ৪৬ রানে ভর করে ৬ উইকেটে জিতেছিল বাংলাদেশ 'এ' দল।
দ্বিতীয় ম্যাচ ওই একই ভেন্যুতে; প্রতিপক্ষ একই। এবার আগে ব্যাট করেছিল বাংলাদেশ 'এ' দল। আবারও দারুণ ব্যাটিং করেছিলেন আশরাফুল। ওপেনিংয়ে নেমে তার করা ৬২ রান বড় ভূমিকা রেখেছিল বাংলাদেশের সংগ্রহে। তবে ব্যাটিংয়ে আসল খেলটা দেখান কদিন পর মাশরাফিরই সঙ্গী হিসেবে টেস্ট ময়দানে নামতে যাওয়া অধিনায়ক খালেদ মাহমুদ সুজন। তার ৬০ বলে ৬২ রানের ফলে বাংলাদেশ 'এ' দল অলআউট হওয়ার আগে ২২৮ রান তুলতে পারে। মাশরাফি ১৪ বলে ১টি চার ও ২টি ছক্কায় সাজিয়ে ২৩ রান করেছিলেন।
জবাবে আগুনের গতিতে শুরু করেন মাশরাফি।
প্রথম ওভারের শেষ বলে ফেরত পাঠান প্রতিপক্ষ ওপেনারকে। এরপর আরও একটা উইকেট নেন। সব মিলিয়ে ৬ ওভারে ১ মেডেনসহ ১৩ রান মাত্র খরচ করে ২ উইকেট। বাংলাদেশ 'এ' দল পায় ৭১ রানের জয়।
পরের ম্যাচ মুম্বাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের বিপক্ষে; বিখ্যাত ওয়াংখেড়ে

স্টেডিয়ামে। এ ম্যাচেও মাশরাফির শিকার ২ উইকেট। মেহরাব হোসেন অপির ৭০ রানে ভর করে বাংলাদেশ 'এ' দল ৪ উইকেটের জয় পায়।
সফরের শেষ ম্যাচটি ছিল পুনেতে; সফরে একমাত্র তিন দিনের ম্যাচ। প্রথমে ব্যাট করেছিল মহারাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন একাদশ। মাশরাফি ১৬ ওভার বল করে ৪৩ রানে ১ উইকেট নিয়েছিলেন। মহারাষ্ট্র ১৩৮ ওভারে অলআউট হয়েছিল ৪৫২ রানে। এই ম্যাচটা অবশ্য স্মরণীয় হয়ে আছে মাশরাফির আরেক সতীর্থর কারণে। তুষার ইমরান ডাবল সেঞ্চুরি করেন। সঙ্গে সানোয়ার সেঞ্চুরি করেছিলেন। যদিও এই ম্যাচটির স্ট্যাটাস নিয়ে দীর্ঘদিন সংশয় ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ নয়। তার মানে, নোট করুন, এখন পর্যন্ত মাশরাফি গণ্ডা গণ্ডা ম্যাচ খেললেও প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেললেন না।
আর এই অবধি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ না খেলায় কদিনের মধ্যেই তখন একটা রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে।

[১] Flourishing kids in Bangladesh শাহরিয়ার খান; (ক্রিকইনফো, ১৩ মার্চ, ২০০২)

ক্যাপ নম্বর ১৯



১.

সাল ২০০১; নভেম্বর মাসের ৮ তারিখ। বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে সে এক হিংস্র অধ্যায়। কিছুদিন আগেই হয়ে যাওয়া জাতীয় নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা সারা দেশে আগুন ছড়াচ্ছে। নিরাপত্তা ও জীবন; কোনো কিছুই নিশ্চিত নয়।

বলা ভালো, সারা পৃথিবীই পার করছে উত্তপ্ত এক সময়। স্নায়ুযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে এমন উত্তেজনা আর কখনো তৈরি হয়নি। আমেরিকার টুইন টাওয়ারে হামলার রেশ ধরে সারা পৃথিবী রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। পৃথিবীজুড়ে হুংকার উঠেছে–হয় তুমি আমার পক্ষে, নইলে তুমি সন্ত্রাসী!

সেদিনও হোয়াইট হাউসে জাতির উদ্দেশে বক্তৃতার জন্য হাজির হয়েছেন মার্কিন দেশের রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লু বুশ জুনিয়র। সে বক্তৃতার মূল কথা–যুদ্ধ। কেউ তখন পরাশক্তির পক্ষে যুদ্ধ করছেন, কেউ পরাশক্তির বিপক্ষে। বাংলাদেশের একদল তরুণ সেই দিনটায় যুদ্ধ শুরু করল এক নয়া পরাশক্তির বিপক্ষে!

বাংলাদেশ নামে দেশের রাজধানী ঢাকায়

একদল তরুণ অসম এক যুদ্ধে নামতে চলেছে। বিশ্ব ও দেশে চলমান রাজনৈতিক ব্যাপারস্যাপারের সঙ্গে সেই যুদ্ধের কোনো সম্পর্ক নেই। স্রেফ একটা বল আর ব্যাট হাতে করে যুদ্ধ করতে নামছে তারা তখন উদীয়মান শক্তিধর ক্রিকেট দল জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে।

ঢাকা স্টেডিয়ামে শুরু হলো সেদিন বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে দুই টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচ।

যুদ্ধ, বোমা, আক্রমণ, দখল, মিসাইল–এসব শব্দই তখন সব সংবাদমাধ্যম দখল করে রেখেছে। ক্রিকেটের সেখানে খুব একটা ঠাঁই হয় না। এর মধ্যেও বড় পত্রিকাগুলোর প্রথম পাতায় এই ক্রিকেট ম্যাচের ছোট্ট একটা খবর নজর কাড়ল সবার–বাংলাদেশের হয়ে অভিষেক হয়েছে ১৮ ও ১৯তম টেস্ট ক্রিকেটারের।

১৮তম টেস্ট ক্রিকেটারটির কথা সবাই জানতেনই। এর আগেই ২০টি ওয়ানডে খেলা খালেদ মাহমুদ সুজন বাংলাদেশের ১৮তম ক্রিকেটার হিসেবে টেস্ট খেলা শুরু করলেন সেদিন। কিন্তু উৎসাহী পাঠক একটু অবাক হয়ে দেখলেন, একই দিনে টেস্ট অভিষেক হয়ে গেছে দীর্ঘকায় এক তরুণের।

এই যুদ্ধের দামামা, এই অশান্তির সময়কে ইতিহাসের পাতায় আরও একটা কারণে বাঁধিয়ে রাখতে ২০০১ সালের ৮ নভেম্বর বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসের ১৯ নম্বর টেস্ট ক্রিকেটার হিসেবে মাঠে নেমে পড়লেন মাশরাফি বিন মুর্তজা।

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান মাইনুল হক টেস্ট ক্যাম্প পরিয়ে দিলেন নড়াইল থেকে কয়েক মাস আগেই উঠে আসা কিশোর কৌশিককে। মাথায় সবুজ রঙের টুপিটা পরেই কিশোর কৌশিক এক লাফে হয়ে গেল মাশরাফি বিন মুর্তজা!

সেদিনের সেই ছোট্ট, এক কলামের সংবাদটা দেখে আজ বোঝারও উপায় নেই যে, এ ঘটনার ভেতর দিয়েই বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বর্ণময়, সবচেয়ে জননন্দিত ক্রিকেটার এবং অন্যতম সেরা অধিনায়ক ও ক্রিকেট-চিন্তকের যাত্রার শুরু হতে চলেছে।

২.

মাশরাফির টেস্টযাত্রা যে শুরু হতে চলেছে, তা কয়েক মাস আগেই টের পাওয়া গিয়েছিল।

অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়া কাপে তার বোলিং দেখে কয়েকজন ক্রিকেট আলোচক দাবি তুলে ফেলেছিলেন বাংলাদেশ দলের সঙ্গে ২০০১ সালের এপ্রিল মাসেই জিম্বাবুয়ে সফরে পাঠানো হোক এই কিশোরকে। বিশেষ করে সাবেক অধিনায়ক ও কিছুদিন আগেই সাবেক হওয়া নির্বাচক রকিবুল হাসান একটি পত্রিকাকে বলেছিলেন, দেশের ফাস্ট বোলিংয়ের যা অবস্থা, তাতে অবিলম্বে এই ছেলেটিকে জাতীয় দলে

নেওয়া উচিত। কিন্তু নির্বাচক কমিটি আরেকটু অপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তাকে 'এ' দলের সঙ্গে ভারত সফর করিয়ে এনে তবে টেস্ট আঙিনায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

কার্যত সেই সিদ্ধান্তই বাস্তব হলো।

খালেদ মাহমুদ সুজনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ 'এ' দল ভারতে থাকা অবস্থায়ই সিদ্ধান্ত হয়ে গেল বাংলাদেশ সফরে আসতে থাকা জিম্বাবুয়ের সোনালি প্রজন্মের বিপক্ষে টেস্ট দলে ঢাকা হবে নড়াইলের এই কিশোরকে। এই দল ঘোষণার আগেই সংবাদমাধ্যমগুলো সরব হয়ে উঠেছিল যে, বাংলাদেশে নতুন এক ফাস্ট বোলার আসছে।

ক্রিকেট-বিষয়ক বিশ্বখ্যাত সংবাদমাধ্যম ক্রিকইনফো অত্যন্ত নির্ভুলভাবে অনুমান করেছিল ভারত সফররত 'এ' দল থেকে অন্তত দুজন ক্রিকেটারের টেস্ট অভিষেক হতে যাচ্ছে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। তারা লিখেছিল :

দলে সম্ভাব্য দ্বিতীয় অন্তর্ভুক্তিটি (প্রথম খালেদ মাহমুদ) আর যাকেই হোক, বাংলাদেশ ক্রিকেট-ভক্তদের অবাক করার কথা নয়। কারণ কয়েক মাস ধরে এই ছেলেটি নিয়মিত হেডলাইনে পরিণত হচ্ছে। মাশরাফি বিন মুর্তজার হঠাৎ করে বাংলাদেশের দ্রুততম বোলার হয়ে ওঠাটা এক বিস্ময়কর ঘটনা। তার বল সত্যিই ভয়ংকর গতিশীল; বাংলাদেশের একজন বোলার ব্যাটসম্যানদের ইদানীং বলের লাইন থেকে সরে যেতে বাধ্য করছে ভয়ংকর গতির শর্ট পিচ ডেলিভারিতে!

এই বিস্ময়কর বাচ্চাটির একদিন বিশ্বের ভয়ংকরতম জেনুইন ফাস্ট বোলার হওয়ার সম্ভাবনা আছে–শক্ত দৃঢ় শরীরের কাঠামো, দারুণ গতি, অসামান্য সহ্যক্ষমতা ও দারুণ আক্রমণাত্মক মনোভাব! [১]

এমন ইতিবাচক আলোচনা চলতে থাকার পরও মাশরাফিকে টেস্ট দলে নেওয়ার সিদ্ধান্তে সে সময়ের কর্তারা সবাই একমত নিশ্চয়ই ছিলেন না। এটুকু কিশোরকে টেস্ট আঙিনায় নামিয়ে দেওয়া ঠিক হবে কি না, সে নিয়ে বিতর্ক চলল। সেই বিতর্কেই প্রধান নির্বাচক মাইনুল হক সামনে নিয়ে এলেন অ্যান্ডি রবার্টসের সেই রিপোর্ট। যে রিপোর্টে পরিষ্কার বলা আছে, উপযুক্ত যত্ন ও সতর্কতা সাপেক্ষে মাশরাফিকে টেস্ট খেলানো যেতে পারে এই বয়সেই।

শেষ পর্যন্ত রবার্টসের রেফারেন্স মেনে নিলেন সবাই।

২০০১ সালের ৩ নভেম্বর জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে দুই টেস্টের জন্য ঘোষণা করা হলো টেস্ট দল। হাতে হাতে বিলি করা সেই টেস্ট দলে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের পেস বোলিং সৈনিক হাসিবুল হোসেন শান্তর জায়গা হলো না; তার বদলে এল নতুন এক মুখ, একেবারে আনকোরা ক্রিকেটার মাশরাফি।

ঢাকা টেস্টের বাংলাদেশ দল

নাঈমুর রহমান (অধিনায়ক), খালেদ মাসুদ, জাভেদ ওমর, আল শাহরিয়ার, এনামুল হক, হাবিবুল বাশার, মোহাম্মদ আশরাফুল, আকরাম খান, মঞ্জুরুল ইসলাম, মোহাম্মদ শরীফ, খালেদ মাহমুদ, মাশরাফি বিন মুর্তজা, ফাহিম মুনতাসির।

৩.

বাংলাদেশ 'এ' দল তখন পুনেতে।

মাশরাফির মনটা কাঁদছে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য। কত দিন হয় বাড়ি ছেড়ে এসেছে। আর মন টিকছে না। নদীর জন্য, গাছগুলোর জন্য, বন্ধুদের জন্য, মামার জন্য শুধু কান্না পায়। রাস্তার পাশের ফোন থেকে কথা বলতে বলতে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে।

ফোনে কথা বলে কি আর মন ভরে! রোজ মনে হয়–আজ ফিরে যেতে পারতাম।

অধিনায়ক খালেদ মাহমুদ, তাদের সুজন ভাই একদিন এসে বললেন, 'কৌশিক, বাড়ি যাবি?'

লাফ দিয়ে উঠতে ইচ্ছে হলো। মনে হলো সুজন ভাইকে জড়িয়ে ধরে আদর করে দিই। কিন্তু উত্তেজনাটা চেপে রেখে বলল, 'সুজন ভাই, সে তো দেরি আছে। কবে খেলা শেষ হবে?'

'খেলা শেষ হওয়ার আগেই আয় আমি আর তুই চলে যাই।'

'সত্যি! সত্যি, সুজন ভাই। শুধু আমরা দুজন যাব?'

'নাহ। আশরাফুল আর অপিও যাবে। চল, এই ম্যাচটা শেষ হলেই আমরা চলে যাব।'

আনন্দে মাশরাফির আর রাতের ঘুম হয় না।

বেচারা কিশোর ছেলেটার মনে এই প্রশ্নও তৈরি হয় না যে, কেন তারা এভাবে সফর শেষ না করেই চলে যাবে! ভালো কিছু সম্ভাবনার কথা তো মাথায়ই আসে না। খারাপটাও মাথায় আসে না। একবারও এমন মনে হয় না যে, কোনো শাস্তি-টাস্তি হলো না তো? কেন আমাকে ফেরত পাঠাচ্ছে?

একবার শুধু মনে হয়েছিল, মুম্বাইতে পিঠে একটা টান লেগেছে; মনে হয় বোর্ড সেটার চিকিৎসা করাবে। আর কেন ডেকে পাঠাবে!

আসলে এসব ভাবারই সময় নেই তার। সে তখন নতুন আরেকটা ফোনের সন্ধানে ছুটছে পুনের রাস্তায়। বন্ধুদের ফোন করে জানাতে হবে–আমি আসছি।

৩১ অক্টোবর পুনেতে খেলা শেষ হলো।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে মুম্বাই রওনা হলেন খালেদ মাহমুদ সুজন, মেহরাব হোসেন অপি, মোহাম্মদ আশরাফুল ও মাশরাফি বিন মুর্তজা। পথে সবাই নানা রকম

আলাপ করছে, সে আলাপে খুব একটা মন নেই মাশরাফির। ওরা কী সব ভালো খবরের আলাপ করছে; সে আলাপ কান দিয়েও ঢোকে না।

মুম্বাই থেকে বিমান ধরতে হবে।

বিমানবন্দরে ঢুকে নিয়মকানুন শেষ করে হাতে একটু সময় আছে। সবাই মিলে গল্প করতে বসেছে। সুজন ভাই সিনিয়র মানুষ। খুব মজা করে কথা বলতে পারেন, সবাই মন দিয়ে তার রসিকতা শুনছে। একেকটা রসিকতায় সবাই হেসে উঠছে। হঠাৎ সুজনই বললেন, 'কৌশিক, তুই একবারও জিজ্ঞেস করলি না, আমরা কেন যাচ্ছি!'

'এমনিই মনে হয়।'

এবার সুজন হো হো করে হাসলেন। সময়টা তার জন্যই হাসিতে ফেরার সময়। হাসতে হাসতে বললেন, 'এমনি এমনি চারজন খেলোয়াড় সফর শেষ না করে ফিরে যায়!'

'তাই তো। সুজন ভাই, কেন ফিরছি আমরা?'

'তোর একটা সুখবর আছে। তুই জাতীয় দলে ডাক পাচ্ছিস।'

'ও আচ্ছা'–জাতীয় দলে ডাক পাওয়াটা একেবারে সকালের নাশতার মতো নিয়মিত খবর যেন। কণ্ঠে তেমন কোনো উত্তেজনা নেই, বিরাট আনন্দে ফেটে পড়া নেই।

শুধু প্রশ্ন করল, 'কাগো বিপক্ষে খেলা, সুজন ভাই?'

সামনে যে জিম্বাবুয়ে বাংলাদেশে আসছে, সেই সিরিজে তাকে নিয়ে পত্রপত্রিকায় যে ঝড় চলছে; কোনো খবর নেই। তার কাছে এটা আরেকটা বড় খেলা শুধু, আরেকবার বল করার সুযোগ, চার-ছক্কা মারার সুযোগ।

কথা বলতে বলতেই হঠাৎ মনে হলো, মাকে খবরটা জানানো দরকার। মামাকে, সাজু-রাজু-অসীমদের খবরটা জানানো দরকার। ওরা তো এত দিন ধরে এই স্বপ্নটা দেখেছে। হঠাৎ করেই মাশরাফির মনে হলো, সে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন নিয়ে বেড়ে ওঠেনি। কিন্তু তার পরিবার, তার বন্ধুরা তো এই সুখবরের আশাতেই তাকে ছেড়ে এত কষ্ট করছেন।

যেমন ভাবা, তেমন কাজ। দৌড়ে গিয়ে বিমানবন্দরেই একটা ফোন খুঁজে পেল। সেখান থেকে বাসার টিঅ্যান্ডটি ফোনের নম্বর ঘোরানো। ওপাশে রিং হতেই মামার কণ্ঠ। এপাশ থেকে কৌশিকের চিৎকার, 'মামা, আমি জাতীয় দলে চান্স পেয়ে গেছি। মাকে খবর দাও। এবার আমি টেস্ট খেলব। মামা...'

মামার কণ্ঠ প্রথম খানিকটা সময় শোনা গেল না। তারপর কেমন কেটে কেটে এল কণ্ঠটা। মামার গলা এমন শোনাচ্ছে কেন? মামা কি কাঁদছে!

মনে হয়, অনেক দিন দেখে না বলে কাঁদছে।

কৌশিক একটু নীরব থেকে বলল, 'মামা, আমি ঢাকায় ফিরতিছি আইজ। ফিরেই বাড়ি চলে আসব।'

৪
'স্যরি, মেট। তোমার বাড়ি যাওয়া হবে না। তুমি আমার সঙ্গে যাবে। কাজ আছে।'
ইংরেজিতে কট কট করে এতগুলো কথা বলে ফেলল লোকটা। সুজন ভাইয়েরা বলেছে, এই লোক নাকি জাতীয় দলের ফিজিওথেরাপিস্ট; নাম জন গ্লস্টার। ফিজিওথেরাপিস্ট ব্যাপারটাই এর আগে কখনো শোনেনি মাশরাফি। কী কাজ করে কে জানে!
আশরাফুল জানাল, 'ইনজুরি-টিনজুরি থাকলে তার ট্রিটমেন্ট করে।'
'তো করুক না। যাগো ইনজুরি আছে, তাগো ট্রিটমেন্ট করুক না। আমার সঙ্গে ওর কী! আমি আসলাম বাড়ি যাব বলে।'
মাশরাফি ভারত থেকে ঢাকায় ফিরেছেন নড়াইল যাবেন বলে। জাতীয় দল-টল পরের ব্যাপার; আগে তো বাড়ি যেতে হবে। বিমানে বসেই সুজন ভাইয়ের কাছে শুনেছেন, দুদিন ছুটি পাওয়া যাবে। দুদিন নড়াইল গিয়ে কী কী করবে, সে পরিকল্পনাও করে ফেলেছে মাশরাফি। ঢাকায় নেমেই বাড়িতে ফোনও করেছে যে, সে আসছে।
এখন ফিজিও গ্লস্টার বলে যাওয়া চলবে না।
বলার কারণও আছে। ভারতে 'এ' দলের সফরে পিঠের পাশের পেশিতে চোট লেগেছে মাশরাফির। মাঝে মাঝে ব্যথাটা ফিরে আসছে। মাশরাফি টের না পেলেও ম্যানেজমেন্ট টের পাচ্ছে, এটা খারাপ কিছু হতে পারে। এখন থেকে যত্ন না নিলে ভোগাতে পারে ইনজুরিটা।
কারণ যা-ই হোক, মাশরাফির বাড়ি ফেরা হলো না। প্রায় এক মাস বিদেশ কাটিয়ে আসার পর একটা দিনের জন্য বাড়ি ফেরা হলো না। মাশরাফি নিজে পরবর্তীকালে দফায় দফায় বলেছেন, জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার আনন্দ তিনি টেরই পাননি এই বাড়ি যেতে না পারার শোকে।
হাহাকার করে আশরাফুলকে বলেন–দোস, এর চেয়ে টেস্টে ডাক না পাওয়াই ভালো ছিল!

৫.
'টেস্ট অভিষেক হতে যাচ্ছে আপনার। কেমন লাগছে।'
'এই তো, ভালো।'
'টেস্ট নিয়ে কোনো পরিকল্পনা আছে। কী করতে চান?'
'ভালো বল করতে চাই।'
'টেস্ট ক্রিকেট তো স্বপ্নের মতো ব্যাপার। আপনার স্বপ্নটা কেমন?'

'ভালো বল করতে চাই।'

বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, আজকের বাকপটু, আড্ডাবাজ, ক্রিকেট-দর্শন ছড়িয়ে দিতে থাকা মাশরাফি বিন মুর্তজার কথোপকথন ছিল এমন। পরবর্তীকালে কথার রাজা যে মাশরাফি বাংলাদেশের সাংবাদিকদের সামনে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তার শুরুটা খুবই ম্যাড়মেড়ে ছিল।

তখন সাংবাদিকেরা রায়ও দিয়ে দিয়েছিলেন সারা পৃথিবীর পেসারদের মতোই অন্তর্মুখী এক পেসারের আবির্ভাব ঘটতে চলেছে বাংলাদেশে। টেস্টের আগের দিন অন্তত তার কথাবার্তা শুনে অনেকেই রায় দিয়ে ফেলেছিলেন, এই ছেলেটা মুখচোরা।

হায়! সব সকালের সূর্য দিনের আভাস দেয় না। সেদিন কল্পনাও করা যায়নি, এই মাশরাফি কত কথা জানেন।

আসলে কথা বলতেই তার ভালো লাগছিল না। টেস্ট খেলা নিয়ে সাংবাদিকেরা এত হইচই করছেন কেন, সেটা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তিনি ভালো বল করছেন, টেস্টে ডেকেছে। এখন তাকে ভালো বল করতে হবে। এই তো!

তারপরও অনেক কথা বুকের মধ্যে জমানো ছিল।

কিন্তু এত ক্যামেরা, এত রেকর্ডারের সামনে কি কথা বলা যায়! একটু লজ্জাও করছিল। কোনোক্রমে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে উঠে যেতে পারলেই বাঁচে সে। কিন্তু সাংবাদিকেরা খুব ভয়ানক প্রাণী। কিছুতেই মুখ থেকে কথা না বের করে ছাড়বে না। বারবার সবাই প্রশ্ন করে, 'আপনার লক্ষ্য কী?'

আরে, বাবা। এভাবে লক্ষ্য ঠিক করে কেউ খেলতে নামে!

তারপরও বললেন, 'আমি পেসেই ব্যাটসম্যানদের বিট করার চেষ্টা করব। পেসই আমার মূল শক্তি।' [২]

সাংবাদিকেরা এতেও সন্তুষ্ট নন। আরও ভালো করে, আরও নির্দিষ্ট করে জবাব চাই তাদের। তাদের প্রশ্ন, কয়টা উইকেট নিতে পারবেন, কার কার উইকেট নিতে চান! এগুলো খুবই ফালতু প্রশ্ন। তারপরও কতক্ষণ এড়ানো যায়। এর চেয়ে ভালো বুদ্ধি হলো, কিছু একটা বলে দেওয়া।

ঝামেলা এড়াতে বলে দিলেন–৫ উইকেট নিতে চাই।

ভালো কথা; এবার কার কার উইকেট নিতে চান। উৎপাতের আর শেষ নেই। নামও তো মনে পড়ছে না। মাশরাফি বলে দিলেন, 'ওই যে অ্যান্ডি ফ্লাওয়াররা দুই ভাই আছে না? ওদের উইকেট।' [৩]

যাক, উৎপাত শেষ হয়েছে।

পুরো ব্যাপারটার তামাশা পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আশরাফুল খুব উপভোগ করছিলেন। তিনি জানেন, কী পরিস্থিতিতে পড়েছে মাশরাফি। তিনি সাংবাদিকদের ডেকে হেসে বললেন, *'দেখবেন, কৌশিক প্রথম দুই ঘণ্টাতেই তিন-চার উইকেট নিয়ে নেবে।*

দেখবেন।' [৪]
বাল্যবন্ধুকে চিনতে আশরাফুলের ভুল হয়নি। সময়টা হয়তো একটু এদিক-ওদিক ছিল; তবে উইকেটসংখ্যা একেবারে নিখুঁত।

৬.
নড়াইলে আজ মহোৎসব।
নড়াইল শহর থেকে রোজই সকাল-বিকেল সরাসরি বাস যায় ঢাকাতে। আজ বাড়তি একটা বাস ছেড়ে যাচ্ছে সন্ধ্যাবেলা। এই বাসটা আর দশটা যাত্রী পরিবহনের মতো নয়। এই বাস দখল করে আছে নড়াইলের একঝাঁক কিশোর। সোজা কথায়–শুভেচ্ছা ক্লাবের ছেলেরা!
হ্যাঁ, শুভেচ্ছা ক্লাব বাস ভাড়া করে চলেছে ঢাকায়।
কারণ বোঝা খুব কঠিন কিছু নয়। ক্লাবের অন্যতম সৈনিক, তাদের বন্ধুবর কৌশিক আগামীকাল টেস্ট খেলতে নামবে। বাংলাদেশের জার্সি শরীরে চাপাবে তাদেরই একজন। অনুভূতিটা এ রকম যে, মাশরাফি একা নয়, আসলে পুরো শুভেচ্ছা ক্লাবই বুঝি টেস্ট খেলতে নামবে কাল।
এমন অবস্থায় সকলে মিলে ঢাকায় না চললে হবে!
তারপরও হয়তো কেউ কেউ না-ও যেতে পারত। সকলে মিলে কাজ ফেলে, পরিবার ফেলে পাঁচ দিনের জন্য ঢাকা শহরে চলে যাওয়াটা তো মুখের ব্যাপার নয়। দু-একজন তাই ভাবছিল, এই টেস্টে না যাই; পরে আবার কোনো টেস্টে যাব। কিন্তু উপায় নেই।
খেলার দুদিন আগেই কৌশিকের ফোন এসেছে, 'সাজু, সবাই আসবে তো?'
'মোটামুটি সবাই আসবে। দু-একজন নাও আসতে পারে।'
'সবারই আসতে হবে। একজনও যদি না আসে, তাহলে কিন্তু আমি খেলতি নামব না।'
এরপর আর কেউ বাড়ি বসে থাকতে পারে!
এখনো সেই কথা মনে করে হাসেন অসীম, 'কী পাগল যে ছিল! বলে, তোরা একজনও যদি না আসিস, আমি খেলতি নামব না। চিন্তা করেন অবস্থা। এখনো দেশে খেলা হলে সবাই না পারলেও প্রায় সবাই গ্যালারিতে থাকি। আমরা গ্যালারিতে না থাকলে ওর নাকি খেলতে ভালো লাগে না।'
***
গোলাম মুর্তজার আজ রাতে আর ঘুম হবে না।
ভাইয়ের বাসায় ঘুমানোর চেষ্টাই করছিলেন। আলো বন্ধ করে বিছানায় পিঠও দিয়েছিলেন। কিন্তু ঘুম কোথায় যেন পালিয়ে গেছে। আস্তে আস্তে করে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। হঠাৎ পেছনে

কার পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠলেন–কৌশিকের মা!
'তুমি এত রাতে উঠে এসেছ কেন? ঘুম ভেঙে গেছে!'
'ঘুম ভাঙবে কী করে? আমি তো ঘুমাইইনি।'
'ঘুমাওনি কেন?'
'তোমার যে কারণে ঘুম আসছে না, আমারও তাই।'
ঠিক। একই কারণে ঘুম আসছে না দুজনের। গোলাম মুর্তজা আর হামিদা মুর্তজার ঘুম কেড়ে নিয়েছে একটা স্বপ্ন। রাত পোহালেই ছেলেটা তাদের বাংলাদেশের জার্সি গায়ে খেলতে নামবে।
হামিদা মুর্তজা বলাকা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ছেলেটা বড় হয়ে গেল, তাই না?'
অন্ধকার কাউকে টের পেতে দেয় না, দুজনের চোখেই তখন জল।

৭.
আইসিসির খাতা বলছে, সেটা ছিল ১৫৬৬ নম্বর টেস্ট।
বাকি শত শত টেস্টের সঙ্গে এই টেস্টের কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য নেই বাংলাদেশের গণ্ডা টেস্টের সঙ্গেও। সেই সাদা পোশাক, লাল বল, পাঁচ দিনের খেলা এবং সেই বাংলাদেশের প্রথম দিনেই ধসে পড়া ব্যাটিং, আরেকটি পরাজয়ের জন্য অপেক্ষা। পার্থক্য কেবল এই টেস্টে বৃষ্টির কারণে ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়তে পেরেছিল বাংলাদেশ।
তবে এসব সামান্য পরিসংখ্যান আপনাকে বুঝতে দেবে না, কত তাৎপর্যময় ছিল এই ১৫৬৬ নম্বর টেস্টটি। এই ম্যাচ দিয়েই টেস্ট ক্রিকেটে, প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যাত্রা শুরু হলো বাংলাদেশের পরবর্তী দীর্ঘকালের হিরো, ট্র্যাজিক হিরো মাশরাফি বিন মুর্তজার।
সকালবেলায় মাশরাফিকে টেস্ট ক্যাপ পরিয়ে দিলেন প্রধান নির্বাচক মাইনুল হক। ময়দানে নামতে অবশ্য খুব বেশি দেরি করতে হয়নি এই পেসারকে। টসে জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেওয়া জিম্বাবুয়ে দ্রুতই গুটিয়ে দেয় বাংলাদেশের টপ ও মিডল অর্ডার। বেশ খানিকটা সময় ধরে লড়াই করেও দলীয় ৬ রানেই ফিরে আসেন বাংলাদেশের ওপেনার আল শাহরিয়ার রোকন ও তিন নম্বরে নামা হাবিবুল বাশার। দেখতে দেখতেই ৫৬ রানে ৮ উইকেট নেই স্বাগতিকদের।
সপ্তম ব্যাটসম্যান হিসেবে ২১ বল মোকাবিলা করে ট্রাভিস ফ্রেন্ডের বলে বোল্ড হয়ে ফিরলেন ১৩ রান করা অধিনায়ক নাঈমুর রহমান দুর্জয়। এবার তার নামার পালা। ব্যাটিং ব্যাপারটা তো খুব অপরিচিত নয়। এই সেদিনও অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়া কাপে ঝড় তুলেছেন, ভারতের গিয়েও 'এ' দলের হয়ে টুকটাক রান করে এসেছেন। তারপরও; তারপরও কেমন যেন লাগছে। মেঘলা আকাশের নিচে জিম্বাবুয়ের তিন

বিখ্যাত ফাস্ট বোলার হিথ স্ট্রিক, ট্রাভিস ফ্রেন্ড, হেনরি ওলঙ্গার বিপক্ষে ব্যাট করতে নামতে টেস্ট সেঞ্চুরিয়ানদের বুক কাঁপে; আর তো মাশরাফি!

তবে মাশরাফি বুকটা সে জন্য কাঁপছিল না। তার এক পেটের মধ্যে গুড় গুড় করছিল; কারণ এই প্রথম সারা পৃথিবীর সামনে ক্রিকেট খেলতে নামছে সে। গ্যালারি শুধু নয়, বন্ধুরা শুধু নয়; সারা পৃথিবী এবার তার খেলা দেখবে।

জীবনটা রূপকথা হলে মাশরাফি এই ইনিংসে নেমে হয়তো ৮ নম্বরে ব্যাট করে একটা সেঞ্চুরি-টেঞ্চুরি করে ফেলতেন। হয়তো সিনেমার মতো সব কাণ্ড ঘটত। কিন্তু জীবন সিনেমা নয়। তাই ৪৫ মিনিট ব্যাট করে ২২টা বল খেললেন তিনি; কিন্তু রান হলো মাত্র ৮। এই ইনিংসে কোনো বাউন্ডারির দেখা মিলল না।

বড় নিষ্প্রভ, নিস্তরঙ্গভাবে ৮ রানে জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক ইনিংসটা শেষ হলো মাশরাফির পরবর্তীকালের বোলিং কোচ হিথ স্ট্রিকের বলেই উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিয়ে। বাংলাদেশ ১০৭ রানে অলআউট হয়েছিল।

ম্যাড়মেড়ে একটা অভিষেক বলে দেওয়া যেত। কিন্তু আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম, এই ম্যাচে ব্যাটিং অলরাউন্ডার মাশরাফির অভিষেক হয়নি; অভিষেক হয়েছে নড়াইল এক্সপ্রেস নামের ফাস্ট বোলারের। অতএব সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো।

পরদিনের সংবাদপত্রগুলো সাক্ষ্য দিচ্ছে, ঢাকা টেস্টের প্রথম দিনের শেষ বিকেলে আগুন ঝরিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন মাশরাফি। সেদিন কোনো উইকেট তার নামের পাশে লেখা হয়নি। তবে স্টুয়ার্ট কার্লাইল, গ্রান্ট ফ্লাওয়াররা টের পেয়েছিলেন–জীবনটা ফুলের বিছানা নয়!

জীবনের প্রথম বলটা মাশরাফি ছুড়েছিলেন ডিওন ইব্রাহিমকে।

অন্য প্রান্তে নতুন বল হাতে নেওয়া সিনিয়র খেলোয়াড়, বাঁহাতি পেসার মঞ্জুরুল ইসলাম প্রথম দিন সেই শেষ বিকেলেই তুলে নিয়েছিলেন জিম্বাবুয়ের দুই ওপেনার ডিওন ইব্রাহিম ও ট্রেভর গ্রিপারকে। মাশরাফি বলে বলে ব্যাটসম্যানদের ব্যাকফুটে পাঠিয়েছিলেন, অন্তত দুটো ভয়ংকর শর্ট পিচ বলে কার্লাইলকে খাবি খাইয়েছিলেন। কিন্তু পুরস্কারটা পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছে তাকে পরের দিন পর্যন্ত।

দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু হয়েছে। ৫ ওভার হয়ে গেছে নতুন দিনের খেলা কার্লাইল ও গ্রান্ট ফাওয়ারের জুটিটা জমে উঠছে বলে মনে হচ্ছিল। ঠিক তখনই মাশরাফি প্রথম পুরস্কার পেলেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে, টেস্ট ক্রিকেটে প্রথমবারের মতো স্কোরকার্ডে লেখা হলো সফল মাশরাফির নাম। সদ্য বাড়তে থাকা এই কিশোরের বলে আল শাহরিয়ার রোকনের হাতে ক্যাচ দিলেন সেই ফ্লাওয়ার!

একটা লক্ষ্য পূরণ হলো মাশরাফির।

৬ ওভার পর আরেকটা আঘাতে ফেরালেন কার্লাইলকেও। মঞ্জুর পর মাশরাফি জমিন তৈরি করে দিলেন বাংলাদেশের জন্য; পরপর এনামুল হক মনিও

ফিরিয়েছিলেন অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারকে। কিন্তু এরপর একটার পর একটা জুটি করে হতাশাই উপহার দিয়ে গেছেন বাংলাদেশকে জিম্বাবুয়ের চার লোয়ার মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান উইশার্ট, মেরিলিয়ের, স্ট্রিক ও ফ্রেন্ড!

হতাশা বাড়াতে থাকা স্ট্রিককে ৬৫ রানে ফেরান মাশরাফি। আর মার্ফিকে আউট করে তৈরি করেন ক্যারিয়ারের প্রথম ইনিংসেই ৫ উইকেট নেওয়ার সম্ভাবনা। সে কীর্তি হয়নি। ১০৬ রানে ৪ উইকেট নেওয়ার ভেতর দিয়ে শুরু হলো মাশরাফির টেস্ট জীবন; আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জীবন।

মনে রাখবেন, জীবনের প্রথম ইনিংসেই মাশরাফি ৩২ ওভার বল করে ফেললেন। এটাই এক ইনিংসে মাশরাফির সবচেয়ে বেশি ওভার বোলিং করার রেকর্ড হয়ে আছে। এর বাইরে ৩০ বা তার চেয়ে বেশি ওভার বল করেছেন ক্যারিয়ারে মাত্র চারটি ইনিংসে।

ঘটনাবহুলতার দিক থেকে এরপর চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেস্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়; সেখানেও চারটি উইকেট নিয়েছিলেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে নেওয়া দুটি উইকেটকে বলা যায়, মাশরাফির আজীবনের বিজ্ঞাপন।

মাত্র ১১ রানের লিড নিতে পেরেছিল বাংলাদেশ। তাতেই মাশরাফি নিজের পরিচয় ঘোষণা করে দিলেন। ইনিংসের পঞ্চম ও ষষ্ঠ

বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে

প্রথম টেস্ট

ভেন্যু : বঙ্গবন্ধু জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, ঢাকা

তারিখ : ৮-১২ নভেম্বর, ২০০১

টস : জিম্বাবুয়ে (ফিল্ডিং)

অভিষেক : মাশরাফি বিন মুর্তজা, খালেদ মাহমুদ

বাংলাদেশ : ১ম ইনিংস

ব্যাটসম্যান	**রান**	**মিনিট**	**বল**	**৪**	**৬**
জাভেদ ব স্ট্রিক	৩	৬৯	৫১		০
আল শাহরিয়ার এলবিডব্লু ফ্রেন্ড	৪	৫০	২৯		০
হাবিবুল ক ফ্লাওয়ার ব ফ্রেন্ড		১	১		০
আমিনুল এলবিডব্লু ওলঙ্গা	১২	৭৩	৪০	১	০
আশরাফুল ক উইশার্ট ব ওলঙ্গা		১৬	৬		০
খালেদ মাহমুদ ক গ্রিপার ব ফ্রেন্ড	৬	২২	১৭	১	০
নাঈমুর ব ফ্রেন্ড	১৩	৩২	২১	২	০
খালেদ মাসুদ ক কার্লাইল ব ফ্রেন্ড	৬	২৫	১৭	১	০
মাশরাফি ক ফ্লাওয়ার ব স্ট্রিক	৮	৪৫	২২		০
এনামুল হক অপরাজিত	২৪	১১০	৫৪	৪	০
মঞ্জুরুল ক গ্রিপার ব ওলঙ্গা	৯	৫৭	৪৮	১	০
অতিরিক্ত (বা ৩, লেবা ৩, ও ১, নো ১৫)	২২				
মোট (৪৮.২ ওভারে অলআউট)	১০৭				

উইকেট পতন : ১-৬, ২-৬, ৩-১১, ৪-১৩, ৫-৩০, ৬-৩৮, ৭-৪৯ ৮-৫৬, ৯-৮৪, ১০-১০৭।

বোলিং : স্ট্রিক ১৮-৮-৩০-২, ফ্রেন্ড ১৮-৭-৩১-৫, ওলঙ্গা ৬.২-০-১৮-৩, মার্ফি ৬-১-২২-০।

বলে আক্ষরিক অর্থেই বুলেটের মতো দুই ডেলিভারিতে তুলে নিলেন ডিওন ইব্রাহিম ও স্টুয়ার্ট কার্লাইলের উইকেট। এর মধ্যে ইব্রাহিমের আউটটা আজও অবধি মাশরাফির প্রতীক হয়ে আছে।

ওই বোল্ডের ছবিই ঘরে ঘরে টানানো হয়েছিল–দ্য নড়াইল এক্সপ্রেস।

৮.

ট্রাভিস ফ্রেন্ড মানুষটা বন্ধুভাবাপন্নই বটে। ঢাকা টেস্টের পর হোটেলের লবিতে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন এক সাংবাদিকের সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নয়, এলোমেলো গল্প। হঠাৎ নিজেই বলছিলেন, 'তোমাদের মুর্তজা ছেলেটা; ও কিন্তু জেনুইন ফাস্ট বোলার হবে। গতি দেখেছ?'

হ্যাঁ, ঢাকা টেস্ট শুরু হতেই মাশরাফির গতি নিয়ে মাঠের বাইরে এক ধরনের ঝড় শুরু

জিম্বাবুয়ে : ১ম ইনিংস

ব্যাটসম্যান	রান	মিনিট	বল	৪	৬
ডিওন ইব্রাহিম এলবিডব্লু মঞ্জুরুল	৩	১৩	৬		০
গ্রিপার ক জাভেদ ব মঞ্জুরুল		৩	২		০
কার্লাইল ক মাসুদ ব মাশরাফি	৩৩	১০৭	৬৩	৪	০
গ্রান্ট ফ্লাওয়ার ক শাহরিয়ার ব মাশরাফি	১০	৬৫	৫৮	১	০
অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার ব এনামুল	২৮	৬৪	৩৭	৫	০
উইশার্ট রানআউট	৯৪	১৮৬	১৫৬	১১	২
মেরিলিয়ার এলবিডব্লু এনামুল	৭৩	২০২	১৮০	১০	০
স্ট্রিক ক মাসুম ব মাশরাফি	৬৫	১৮৬	১২৬	৮	০
ফ্রেন্ড ব এনামুল	৮১	২২৩	১৬১	৯	০
মার্ফি ক হাবিবুল ব মাশরাফি	২৫	১০৮	৮৯	৪	০
ওলঙ্গা অপরাজিত	২	২৫	২৪		০
অতিরিক্ত (বা ৪, লেবা ৭, ও ৪, নো ২)	১৭				
মোট (১৫০ ওভারে অলআউট)	৪৩১				

উইকেট পতন : ১-৩, ২-৪, ৩-৩১, ৪-৬০, ৫-৮৯, ৬-২২৬, ৭-২৫৯ ৮-৩৬৭, ৯-৪১৭, ১০-৪৩১।
বোলিং : মঞ্জুরুল ২৬-৫-৭৪-২ (ও-১), মাশরাফি ৩২-৮-১০৬-৪ (ও-১) খালেদ মাহমুদ ১৫-২-৫৯-০ (নো-২, ও-২), এনামুল ৪৩-১৩-৭৪-৩ নাঈমুর ১৮-১-৫৬-০, আশরাফুল ১৫-৩-৪৯-০, আমিনুল ১-০-২-০।

বাংলাদেশ : ২য় ইনিংস

ব্যাটসম্যান	রান	মিনিট	বল	৪	৬
জাভেদ ক ওলঙ্গা ব মেরিলিয়ার	৩৫	১৮২	১১৯	৪	০
শাহরিয়ার ক ফ্লাওয়ার ব ফ্রেন্ড	৫	১৬	১২	১	০
হাবিবুল ক মার্ফি ব ফ্রেন্ড	৬৫	১৭৯	১৪৪	১০	০
আমিনুল অপরাজিত	৬	১৯	৯	১	০
আশরাফুল অপরাজিত		৫	২		০
অতিরিক্ত (বা ৩, লেবা ১, নো ১০)	১৪				
মোট (৪৬.৪ ওভারে, ৩ উইকেটে)	১২৫				

উইকেট পতন : ১-৬, ২-১০৮, ৩-১২০।
বোলিং : স্ট্রিক ১১-৪-২৫-০, ফ্রেন্ড ১১.৪-২-২৬-২, ওলঙ্গা ৫-১-১৭-০ মার্ফি ১২-৪-৩৭-০, মেরিলিয়ের ৭-২-১৬-১।

* চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে কোনো খেলা হয়নি বৃষ্টির কারণে।

হয়ে গিয়েছিল। একধরনের দাবি উঠল যে, মাশরাফি বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে গতিশীল ফাস্ট বোলার।

দাবিটা তুলেছিলেন তখন ধারাভাষ্যে থাকা সাবেক অধিনায়ক রকিবুল হাসান। তিনি দাবি করেছিলেন, তিনি মাশরাফিকে ১৪১ থেকে ১৪৫ কিলোমিটারে বল করতে দেখেছেন। ঢাকায় স্পিড গান না থাকায় এই দাবি প্রমাণ করা কঠিন হলো। তবে গতিটা আসলেই ১৪৫ হলে সেটা রুবেল হোসেনদের আবির্ভাবের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাসের সেরা হওয়ার কথা।

এই প্রসঙ্গে কথা বলতে হয়েছিল তখনকার বাংলাদেশ অধিনায়ক নাঈমুর রহমান দুর্জয়কেও। তিনি সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, 'শান্ত (হাসিবুল হোসেন) শুরুর দিকে খুব দ্রুত ছিল। সেই সময়কার শান্তর সঙ্গেই মাশরাফির তুলনা করা যেতে পারে। তা ছাড়া ইনজুরির আগে শফিউদ্দিন বাবুও খুব জোরে বল করত। তবে সব মিলিয়ে আমি বলব, মাশরাফির আগমন আমাদের ক্রিকেটের জন্য খুব সুসংবাদ। মনে হচ্ছে ও জেনুইন পেসার। এখন লাইন-লেংথ ভালো করতে হবে তাকে।' [৫]

নাঈমুর তুলনাটা বাবু ও শান্তর মধ্যে রাখলেও ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের সবচেয়ে দ্রুতগতির বোলার ছিলেন গোলাম নওশের প্রিন্স। প্রিন্স কিন্তু সে সময় সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, মাশরাফিই ইতিহাসের সবচেয়ে দ্রুতগতির বোলার, *'ও আমার চেয়ে অনেক জোরে বল করে। এতটা জোরে আমিও বল করতাম না।' [৬]*

৯.

ট্রেভর চ্যাপেল সরাসরি বলেছিলেন—এই সিরিজের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি মাশরাফি; সিরিজের শুধু নয়, বাংলাদেশের ক্রিকেটের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এক প্রাপ্তি এই ফাস্ট বোলার।

চ্যাপেলদের ছোট এই ভাইটার তেমন সুনাম বলে কিছু নেই। আন্ডারআর্ম বোলিং করে আন্তর্জাতিকভাবে কুখ্যাত হয়ে আছেন। বাংলাদেশে কোচ হিসেবে প্রধান কোচের চেয়ে বেশি ফিল্ডিং কোচ হয়ে ওঠায় এখনো নিন্দিত হয়ে আছেন। তবে এই একটা কথার জন্য তাকে পাস মার্ক দিয়ে ফেলা যায়।

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্ট ও ওয়ানডে সিরিজ শেষে হিসাব কষতে গিয়ে আসলেই দেখা গেল মাশরাফি সবচেয়ে বড় পাওয়া। দুই টেস্টে ৮ উইকেট নিয়ে মাশরাফি সিরিজের সেরা উইকেটশিকারিদের একজন; বাংলাদেশের পক্ষে একক সর্বোচ্চ।

পরিসংখ্যানের এই কচকচানি ছেড়ে মাশরাফির প্রভাবটা বোঝার চেষ্টা করেছিলেন ট্রেভর চ্যাপেল নিজেই, 'আমি বলব, মাশরাফির ডেব্যুটা বাংলাদেশের জন্য বড় একটা পাওয়া। জানিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশের ক্রিকেটে সে এসেছে দীর্ঘদিনের জন্য। ...সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো তার গতি।' [৭]

যারা আজকের মাশরাফিকে দেখেই অভ্যস্ত, তাদের জন্য এসব আলোচনা একটু নতুনই হওয়ার কথা। তরুণেরা খেয়াল করবেন, সে সময় মাশরাফি-বিষয়ক আলোচনা মানেই গতির আলোচনা!

[১] Valid chances for Khaled Mahmood and Mashrafe; ক্রিকইনফো (২৪ অক্টোবর, ২০০১)

[২] অভিষেকের অপেক্ষায় দুরকম দুজন; প্রথম আলো (৮ নভেম্বর, ২০০১)

[৩] ওই

[৪] ওই

[৫] মাশরাফির বলের গতি কেমন?; প্রথম আলো (১১ নভেম্বর, ২০০১)

[৬] ওই

[৭] মাশরাফিই সবচেয়ে বড় পাওয়া; প্রথম আলো (১৩ নভেম্বর, ২০০১)

কণ্টক বিছানো পথে



১.

৮ ডিসেম্বর, ২০০১।

প্রথম আলোর খেলার পাতায় একটি সংবাদের উপশিরোনাম–মাশরাফির বলে বিপক্ষ ব্যাটসম্যান আহত!

পেস সেনসেশন মাশরাফি যে নিউজিল্যান্ডের পেসসহায়ক উইকেট ষোলো আনা কাজে লাগাতে চলেছেন, তা এই শিরোনামেই পরিষ্কার। ডিস্ট্রিক্ট দলের বিপক্ষে অনুশীলন ম্যাচে টসে জিতে আগে ব্যাট করছিল স্থানীয় দলটি। স্কোর বোর্ডে তখন রান ৬। মাশরাফি প্রবল গতির একটা শর্ট, বাউন্সার ছুড়ে দিলেন। ব্যাটসম্যান গ্র্যান্ট রবিনসন চেয়েছিলেন হুক করতে। বল হেলমেটের ফাঁক দিয়ে গিয়ে সোজা আঘাত করল তার চোখের নিচে।

ঝরঝর করে পড়তে থাকল রক্ত। ওখান থেকে সরাসরি হাসপাতালে পাঠাতে হলো রবিনসনকে। একটু পর খবর এল–অক্ষিকোটরের হাড় ভেঙে গেছে রবিনসনের!

এদিকে পরের ব্যাটসম্যান হার্লি জেমস যখন ব্যাটিংয়ে নামছেন, উইকেটের

মাটিতে তখনো ফোঁটা ফোঁটা রক্ত!

এ যেন ক্যারিবীয় সেই ত্রাস যুগে জোয়েল গার্নারের ঘটানো কোনো এক তাণ্ডবের গল্প। ব্যাটসম্যান আহত হয়ে ফিরে গেছেন, উইকেটে পড়ে আছে রক্তের দাগ। হ্যাঁ, এমন ত্রাস ছড়িয়ে নিউজিল্যান্ড সফর শুরু হয়েছিল মাশরাফির। স্বাভাবিকভাবেই সবার স্বপ্ন ছিল এই সফর তার জাতটাকে আরও চেনাবে, দিকে দিকে ছড়িয়ে দেবে তার নাম।

কিন্তু সফরই মাশরাফির জীবনে সবচেয়ে দুঃসহ এক স্মৃতি হয়ে রইল। পারফরম্যান্সের জন্য নয়, এই সফরে পাওয়া চোটের ধাক্কা সারাটা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে মাশরাফিকে। এই নিউজিল্যান্ড হয়ে উঠবে এক অভিশাপের নাম।

৩.

টেস্ট অভিষেকের ঠিক ১৫ দিনের মাথায় বাংলাদেশের লাল-সবুজ জার্সিও পরে ফেললেন মাশরাফি।

এটা অবধারিতই ছিল। টেস্টে যে ভয়ংকর গতি আর দাপট দেখিয়েছিলেন, যেভাবে তার সম্পর্কে হাইপটাকে অনেকটাই সত্যি বলে প্রমাণ করেছেন; তাতে ওয়ানডে তাকে না খেলানোর কোনো কারণ থাকতে পারে না। অত্যন্ত অনুমিতভাবেই জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের স্কোয়াডে নাম ঘোষণা করা হয় তার। ফলে চট্টগ্রাম থেকে দ্বিতীয় টেস্ট খেলে আর ঢাকা ফেরা হয়নি।

চট্টগ্রামের দ্বিতীয় টেস্টের একটা ঘটনার কথা এই ফাঁকে না বললেই নয়। প্রথম ইনিংসে গ্রিপার, অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার ও উইশার্টের সেঞ্চুরিতে ৭ উইকেটে ৫৪২ রান করেছিল জিম্বাবুয়ে। জবাবে হাবিবুল বাশারের সেঞ্চুরিতে প্রথম ইনিংসে অলআউট হওয়ার আগে ২৫১ রান তুলেছিল বাংলাদেশ। ফলো অনে পড়ে ব্যাট করতে নেমে আবারও হাবিবুলের ৭৬ ও জাভেদের ৮০ রান এবং কয়েকটা ছোট ইনিংসে ভর করে ৩০১ রান করেছিল নাঈমুর রহমানের দল।

ফলে জিম্বাবুয়ের সামনে ১০ রানের লিড দিতে পেরেছিল বাংলাদেশ।

প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক অধিনায়ক নাঈমুর ওই ১১ রানের লক্ষ্যকেই 'ডিফেন্ড' করার একটা চেষ্টা করলেন। সেই চেষ্টায় দুরন্ত এক ঝলক দেখিয়েছিলেন মাশরাফি। প্রথম ওভারের শেষ দুই বলে তুলে নিয়েছিলেন ডিওন ইব্রাহিম ও স্টুয়ার্ট কার্লাইলের উইকেট। এর মধ্যে ইব্রাহিমের স্টাম্প ছিটকে দিয়ে মাশরাফির শূন্যে লাফিয়ে ওঠার দৃশ্যটা রীতিমতো বিজ্ঞাপনী দৃশ্যে পরিণত হয়। এই দৃশ্যই নিশ্চিত করে দেয়, মাশরাফি থাকছেন; টেস্টে-ওয়ানডেতে, সব জায়গাতেই থাকছেন।

ফলে আরও বেশ কয়েকটা দিন নড়াইল না ফিরতে পারার যন্ত্রণা বুকে নিয়ে চলতে হলো।

আন্তর্জাতিক একদিনের ম্যাচের হিসাবে ১৭৭৩ নম্বর ওয়ানডেতে বাংলাদেশের ৫৪

নম্বর ক্রিকেটার হিসেবে যাত্রা শুরু করলেন মাশরাফি বিন মুর্তজা। সে যুগের অধিকাংশ ক্রিকেটারের মতো মাশরাফিরও দুই ফরম্যাটেই অভিষেক হলো দলের ব্যাটিং বিপর্যয়ের সাক্ষী হয়ে।

তবে বিশেষত্ব এই যে, মাশরাফি নিজের কাজটা দারুণভাবেই করতে পারলেন।

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের আগে অভিনব একটা ঘটনা ঘটেছিল। নানাবিধ কারণ মিলিয়ে নাঈমুর রহমান শুধু অধিনায়কত্বই হারালেন না; ওয়ানডে দলেও নিজের জায়গা খুঁজে পাননি। তার বদলে বাংলাদেশের ক্রিকেটে খালেদ মাসুদ পাইলটের অধ্যায় শুরু হলো মাশরাফির অভিষেক ওয়ানডে থেকেই।

জিম্বাবুয়ে টসে জিতে বাংলাদেশকে আগে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিল। যথারীতি টপ অর্ডারে প্রতিরোধ বলে কিছুই নেই। ট্রাভিস ফ্রেন্ড ও গ্যারি ব্রেন্টের দুরন্ত বোলিংয়ে ৫৯ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল বাংলাদেশ তারপর আমাদের ইতিহাসের বহু ম্যাচের মতো হাবিবুল বাশার ও খালেদ মাসুদ পাইলটের একটা প্রতিরোধ। তারপর সব শেষ। এর মাঝে ৯ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ১০টি বলের মোকাবিলায় ১ রান করতে পেরেছিলেন মাশরাফি।

তবে বল হাতে যথারীতি ঝলসানো একটা শুরু করেছিলেন।

ক্যারিয়ারের প্রথম ওয়ানডেতেই প্রথম ওভার বল করতে এসেছিলেন। এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত এটাই বাংলাদেশের রেওয়াজ হয়েছিল। মাশরাফি দলে থাকলে তিনিই ওয়ানডেতে বাংলাদেশের প্রথম ওভারটি বল করবেন।

ওয়ানডেতে নিজের প্রথম ওভারটা ছিল মেডেন ওভার। তবে সাফল্য পেলেন দ্বিতীয় ওভারে এসে। তৃতীয় ওভারে ছত্রখান করে দিলেন গ্র্যান্ট ফাওয়ারের স্টাম্প। এক ওভার পর নিজের বোলিংয়ের সময়ই রানআউট করে ফেরালেন গ্রিপারকে। আর পরের ওভারে ফাহিম মুনতাসির সুমিতের ক্যাচে পরিণত করলেন অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারকে।

একটু কৌতূহলী পাঠক মজাটা ধরে ফেলতে পারার কথা। এবার মনে করে দেখুন, এই সিরিজের আগে অভিষেকের লক্ষ্যটা কী ঠিক করেছিলেন মাশরাফি?

হ্যাঁ, ফ্লাওয়ার ভাতৃদ্বয়ের উইকেট। টেস্ট অভিষেকে এক ভাই ফসকে গিয়েছিলেন। ওয়ানডে অভিষেকে লক্ষ্যটা ষোলো আনা পূরণ করে তবে মাঠ ছাড়লেন।

৪.

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্টের মতো ওয়ানডে সিরিজেও শেষ হয়েছিল মাশরাফির বোলিং-শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে।

দুদল মিলিয়ে এবার আর

বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে

১ম ওয়ানডে

ভেন্যু : চট্টগ্রাম এমএ আজিজ স্টেডিয়াম

তারিখ : ২৩ নভেম্বর

টস : জিম্বাবুয়ে (ফিল্ডিং)

অভিষেক : ফাহিম মুনতাসির সুমিত, তুষার ইমরান

মাশরাফি বিন মুর্তজা

সেরা নন; এবার তিনি তৃতীয় সেরা ছিলেন। তিন ম্যাচে ৪টি উইকেট। মাশরাফির তুলনায় এমন বিরাট কিছু নয়। তবে সেই সিরিজে বাংলাদেশের সেরা বোলার। তার চেয়ে বড় কথা টেস্ট ও ওয়ানডে সিরিজ মিলিয়ে যে আগ্রাসন দেখালেন, তা তৈরি করে দিল মুগ্ধকর এক আলোচনা।

বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন পেসার আগে এসেছে কি না? মাশরাফির এই ভয়ংকর গতি কি ধূমকেতুর মতো কি না; নাকি নক্ষত্রের মতো টিকে থাকতে এসেছেন, এসব আলোচনায় জমজমাট হয়ে উঠল তখন বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন। সে সময়েই নিজের মুগ্ধতার কথা সংবাদমাধ্যমে বলেছিলেন তখনকার সাবেক অধিনায়ক ও পরবর্তীকালে মাশরাফির দলেরই প্রধান নির্বাচক ফারুক আহমেদ। ঘটনাচক্রে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের প্রেসবক্সে বসে মাশরাফির বোলিং

বাংলাদেশ

ব্যাটসম্যান	**রান**	**বল**	**৪**	**৬**
আল শাহরিয়ার ক অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার ব ফ্রেন্ড	১৩	৩৩	২	০
আশরাফুল রানআউট	৭	১৩		০
তুষার ইমরান ব ফ্রেন্ড	৬	৯	১	০
হাবিবুল ব ফ্রেন্ড	৪৪	৯১	২	০
সানোয়ার ক কার্লাইল ব ব্রেন্ট	৫	২৩		০
খালেদ মাহমুদ ক কার্লাইল ব ব্রেন্ট	৪	৯		০
খালেদ মাসুদ রানআউট	৪০	৭৮	২	০
রফিক ক কার্লাইল ব ব্রেন্ট	১৫	১৮	৩	০
মাশরাফি ব আরভিন	১	১০		০
শরীফ ব স্ট্রিক	৪	৮		০
সুমিত অপরাজিত	১	২		
অতিরিক্ত (বা ৬, লেবা ৩, ও ৫, নো ২)	১৬			
মোট (৪৮.৪ ওভারে, অলআউট)	১৫৬			

উইকেট পতন : ১-১৩, ২-২৮, ৩-৩৩, ৪-৫৩, ৫-৫৯, ৬-১০৯ ৭-১৩৪, ৮-১৪৪, ৯-১৫৫, ১০-১৫৬।

বোলিং : স্ট্রিক ৯.৪-০-৩১-১, ফ্রেন্ড ৯-০-২৫-৩, ব্রেন্ট ১০-১-২৯-৩ আরভিন ৯-১-২৮-১, মেরিলিয়ার ৮-০-২৭-০, গ্রান্ট ফ্লাওয়ার ৩-০-৭-০

জিম্বাবুয়ে

ব্যাটসম্যান	**রান**	**বল**	**৪**	**৬**
গ্রান্ট ফ্লাওয়ার ব মাশরাফি		৯		০
গ্রিপার রানআউট (মাশরাফি)	৭	১৭		০
কার্লাইল রানআউট	৪৬	৯৯	৩	০
অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার ক সুমিত ব মাশরাফি	৬	১০	১	
উইশার্ট অপরাজিত	৭৯	৯১	১১	২
মেরিলিয়ার এলবিডব্লু রফিক	১৫	২৩	৩	০
ডিওন ইব্রাহিম অপরাজিত	৬	৫	১	০
অতিরিক্ত (লেবা ১, ও ১)	২			
মোট (৪২.২ ওভারে, ৫ উইকেটে)	১৬১			

উইকেট পতন : ১-১, ২-১৩, ৩-২০, ৪-১২৫, ৫-১৪৮।

বোলিং : মাশরাফি ৮.১-৩-২৬-২, শরীফ ৭-০-৩৯-০, খালেদ মাহমুদ ৬-১-১৭-০, রফিক ১০-৪-২৫-১, সুমিত ৯-০-২৯-০, সানোয়ার ১-০-১৭-০, আশরাফুল ১-০-৭-০।

দেখেছিলেন ফারুক। তিনি বলেছিলেন, জীবনে বাংলাদেশের কোনো ফাস্ট বোলারের খেলা এতটা উপভোগ করবেন, তা এই জিম্বাবুয়ে সিরিজের আগে কখনো কল্পনা করেননি, 'আমাদের একজন তরুণ পেসার গতির জোরে বিপক্ষ দলের ব্যাটসম্যানদের কোণঠাসা করতে পারছে, এ তো খুব সন্তুষ্টির কথা। তার বাউন্সারে টপ ক্লাস ব্যাটসম্যানদের ডাক করতে হচ্ছে।'

মাশরাফির ব্যাপারে সব সময়ই উচ্চকণ্ঠ সাবেক অধিনায়ক রকিবুল হাসান ধারাভাষ্যকার হিসেবে প্রতিটি ম্যাচই মাঠে বসে দেখেছিলেন ওই সিরিজে। তিনি স্মৃতিচারণা করছিলেন, 'বুয়েট মাঠে প্রথম যেদিন দেখেছিলাম, তারপর থেকে জনে জনে ডেকে বলেছি, এটা একটা হীরার টুকরো। জিম্বাবুয়ে সিরিজে সে অসামান্য বল করেছিল। বিশ্বকে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের কোনো ফাস্ট বোলার বুক ফুলিয়ে নিজের পরিচয় জানাতে পেরেছিল।'

মাশরাফির এই উত্থান স্বভাবতই সংবাদমাধ্যমের আলোচ্য বিষয় হয়েছিল। প্রখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক, পরে কালের কণ্ঠের যুগ্ম বার্তা সম্পাদক মোস্তফা মামুন সে সময় লিখেছিলেন :

যাকে-তাকে খেলানোর জন্য সমালোচনায় বিদ্ধ হতে হয় তাদের (নির্বাচকদের) নিয়মিত, কিন্তু মাশরাফির বেলায় তারা সত্যিকারের জহুরি। সোনাটা ঠিকই চিনতে পেরেছিলেন। পেস বোলারদের সবার আগে যা দরকার, সেই পেসটা আছে তার মধ্যে...নড়াইলের এই কিশোরের ধূমকেতু হয়ে আবির্ভাব এ জন্যই এত গুরুত্বপূর্ণ যে, এ মুহূর্তে বাংলাদেশ দলের মান বাড়াতে এমন মাটি ফুঁড়ে আসা কিছু প্রতিভারই সবচেয়ে দরকার। [১]

ফারুক, রকিবুল, মোস্তফা মামুনরা সেদিন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন; নিজেদেরই পাকা জহুরি প্রমাণ করেছিলেন। তবে সেরা কথাটা বলছেন রকিবুল হাসান।

সে সময়ও এই একটা মানুষ বারবার চিৎকার করেছেন; আজও মাশরাফির প্রসঙ্গ উঠলেই বলেন, 'আমি সেদিনও বলেছি, আজও বলছি–মাশরাফিকে নিউজিল্যান্ডে নিয়ে যাওয়াটা ছিল ছেলেটার প্রতি অন্যায়। আর দ্বিতীয় টেস্টটা খেলানোটা রীতিমতো অপরাধ ছিল। আমরা একজন খেলোয়াড়কে নিজেদের হাতে স্রেফ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের গ্রেট হয়ে উঠতে দিইনি। ও অমানবিক শক্তি দিয়ে বারবার ফিরে এসেছে, শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। কিন্তু ওর ইনজুরিপূর্ণ এই জীবনের দায় সেদিনের ম্যানেজমেন্টের, ফিজিওর।'

৫.

পেয়ারাগাছটার ডালটা এত সুন্দর আড়াআড়ি হয়ে এগিয়ে গেছে যে, হঠাৎ দেখলে মানুষের বানানো সাঁকো বলে ভুল হয়। আপাতত অবশ্য সেটাকে কোনো বাড়ির দেয়াল বলে মনে হচ্ছে। কারণ, ডালের ওপরে পাশাপাশি বসে আছে আট-নয়টা

ছেলে; ঠিক দেয়ালের ওপর থেকে বসার ভঙ্গিতে দুই হাত ছেড়ে পা ঝুলিয়ে বসে আছে।

প্রত্যেকের হাতে একটা করে পেয়ারা।

সর্দার চাইপের লম্বা ছেলেটা পেয়ারায় একটা কামড় বসিয়ে টুকরোটা মুখের ভেতরে রেখেই বলল, 'আইজ রাতি এট্টা পিকনিক করলি হয়?'

সবার মুখে পেয়ারা। তাই বেশি কিছু না বলে মুখ বন্ধ রেখেই 'হু হু' করে বিকট আওয়াজ করে সবাই বুঝিয়ে দিল একমত। এর মধ্যেই অসীম মুখের পেয়ারার অবশিষ্টটুকু ফেলে বলল, 'চাইল-ডাইল কী হবে?'

সর্দার ছেলেটা বলে, 'ডাইল আমাগো বাড়িত্তে সরাবো। আর চাইল মানসগো বাড়ি। কী রে, তোগো বাড়ি সরানোর মতো চাইল আছে না?'

চোখ দুটো চকচক করে উঠল মানসের। তাদের বাড়িতে চুরি হবে শুনে মহা আনন্দিত সে, 'কিন্তু বাবা তো আইজকাল রাইত করে ঘুমায়। ধরা পড়বি না তো?'

এবার সর্দার ছেলেটা হাসে, 'ধুর! আমারে ধরবে কেডা? আমি থাকতে ভয় নেই।'

সবাই একমত হয়ে খুব আনন্দে পা দোলাতে থাকে।

এই দৃশ্যটা দেখে বা এমন দৃশ্যের গল্প শুনে কল্পনা করা কঠিন যে, এই সর্দার ছেলেটি একজন টেস্ট ক্রিকেটার। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না পেয়ারার ডালে বসে পা দোলাতে থাকা এই ছেলেটির কদিন আগেই টেস্ট অভিষেক হয়েছে; দুটো টেস্ট আর তিনটে ওয়ানডে খেলে ফিরেছে বাড়িতে।

হ্যাঁ, অবশেষে নড়াইল ফিরেছে কৌশিক।

অনেকটা দিন একটানা বাইরে কেটে গেল। সেই ভারত সফরে যাওয়ার পর থেকে আর বাড়ি ফেরা হয়নি। এর মধ্যে সবার সঙ্গেই দেখা হয়েছে। বন্ধুরা দু-চারজন তো ঢাকাতেই খেলা শুরু করেছে। বাকিরাও বেড়াতে গেছে। বাড়ির সবাই-ই খেলার সময় ঢাকায় ছিল। তারপরও এই বাড়ি ফেরার আনন্দের তুলনা হয় না। কারণ, এই চিত্রা নদী, এই জঙ্গল তো ঢাকায় যায়নি।

ছুটি পেতেই তাই নড়াইলের নদীর কিশোর, বনের কিশোর নদী-বনের টানে ফিরে এসেছে। কিন্তু বেশি দিন সময় নেই হাতে। আবার দুদিন পরই ছুটতে হবে ঢাকায়। শুরু হবে ট্রেনিং ক্যাম্প। এবার লক্ষ্য নিউজিল্যান্ড। না, নিউজিল্যান্ড আসবে না দেশে; মাশরাফিদের যেতে হবে নিউজিল্যান্ডে।

বন্ধুদের বলে, 'দোস, দোয়া করিস। ব্যথায় খুব কষ্ট পাই মাঝে মাঝে। আর প্রথম বিদেশ যাচ্ছি।'

'কেন! কয়দিন আগে না একবার বিদেশ গেলি–ইন্ডিয়া?'

'ধুর, ইন্ডিয়া তো বাড়ির কাছে। এবার যাব সেই পৃথিবীর আরেক মাথায়। কী জানি, কী হয়!'

৬.

মাশরাফিকে নিউজিল্যান্ড পাঠানোয় একটা ভিন্নমত ছিলই।

বাইরে থেকে অনেকেই বলছিলেন, যেহেতু ছেলেটা টানা ক্রিকেট খেলছে এবং পিঠের ও কুঁচকির ইনজুরিতে ভুগছে, ওকে এই সফরটায় না নেওয়াই ভালো। কিন্তু কোচ ট্রেভর চ্যাপেল ও ফিজিও জন গ্লস্টার তাদের হিসাব অনুযায়ীই চলছিলেন; সেই হিসাবটা কী ছিল কে জানে!

মাশরাফি স্বভাবতই এত সব ভাবার মানুষ নন। আজও তিনি 'কী হইলে কী হইবে' ভাবার লোক নন। তাই তিনি বরং সেই অনূর্ধ্ব-১৭ দলের বন্ধু আশরাফুল, শরীফদের সঙ্গে পরিকল্পনা করেন–নিউজিল্যান্ডের মতো ভিনজগতে গিয়ে কী করা যায়!

নিউজিল্যান্ডে এই সফরটার শুরুতে এক বা একাধিক সিনিয়রের কাছ থেকে কিছু বাজে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন মাশরাফি। সেই দলেরই একজন সিনিয়র অত্যন্ত খেদের সঙ্গে বলেছিলেন, 'সে সময়ের দলীয় সংস্কৃতিতে কিছু খারাপ ব্যাপার ছিল। নতুনদের সঙ্গে হোটেলরুমে বাজে ব্যবহার করা হতো। আমরা চেষ্টা করতাম, এগুলো বন্ধ করার। সে সময় জানতে পারিনি। পরে জেনেছি, ওর সঙ্গে কেউ একজন কিছু অন্যায় ব্যবহার করেছিল।'

তবে মাশরাফির কাছ থেকে এ ঘটনার সত্যতা কিছুতেই যাচাই করা যায়নি। তিনি পরিষ্কার বলেছেন–কখনোই তিনি কোনো বাজে অভিজ্ঞতার শিকার হননি সিনিয়রদের কাছ থেকে।

বরং ভালো অভিজ্ঞতাই মনে রাখতে চান তিনি।

সেই সফরে পুরো দলকে অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা উপহার দিয়েছিলেন আশরাফুল। দেশের বাইরে যাওয়া মানেই প্রতিদিনের খরচ পুরোটা টেলিফোন বুথে উড়িয়ে দেওয়া; বাড়িতে রোজ কথা বলা। আশরাফুল হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, হ্যামিল্টনের হোটেলের নিচতলায় যে বুথটা আছে, ওখানে কয়েন ঢুকিয়ে কথা বললে খানিক পর সেই কয়েনটাই আবার বেরিয়ে আসে!

আর যায় কোথায়! নিউজিল্যান্ডের টেলিফোন বিভাগকে ফতুর করে দেওয়ার জোগাড় আর কী!

উল্লেখ করা যেতে পারে আশরাফুলের এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কিছুদিন পর বিশ্বকাপ খেলতে ওখানে যাওয়া অনূর্ধ্ব-১৯ দল ফতুর হতে বসেছিল। কারণ, ততদিনে হোটেলওয়ালারা বুথটা ঠিক করে ফেলেছে!

৭.

মাশরাফি হ্যামিল্টনে শুধু খেললেন না, ভয়াবহ চাপও নিলেন।

দুই দিন বৃষ্টির পর শুরুটা রোমাঞ্চকর বললেও কম বলা হয়। সকালের আর্দ্রতা ও নিউজিল্যান্ডের উইকেট মিলিয়ে পেসারদের স্বর্গে মাশরাফি ও মঞ্জু ঝড় তুলে ফেললেন। ইনিংসের ও নিজের তৃতীয় বলেই লু ভিনসেন্টের ব্যাট হয়ে আসা

নিজের ফিরতি বলে ক্যাচ নিলেন মাশরাফি; মেতে উঠল বাংলাদেশ।
ওপাশ থেকে মঞ্জু নিলেন ম্যাথু সিনক্লেয়ারের উইকেট। মাশরাফির বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিলেন স্টিফেন ফ্লেমিং। নাথান অ্যাস্টালকে ফেরালেন মঞ্জু। সব মিলিয়ে ৫১ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ফেলল নিউজিল্যান্ড। কিন্তু এখান থেকেই মার্ক রিচার্ডসন ও ক্রেইগ ম্যাকমিলান ১৯০ রানের এক জুটি করলেন। আর বিশাল, বিরক্তিকর এই জুটি কেড়ে নিল একেবারে বাংলাদেশি বোলারদের প্রাণশক্তি।
কান্তির বিকেল এগোতে থাকল আর আস্তে আস্তে ব্যথাও বাড়ে। মঞ্জু ও শরীফের কুঁচকিতে ম্যাচের মধ্যেই টান লাগল। একটু সীমিতভাবে ব্যবহার করতে হচ্ছিল দুজনকে। ফলে পিঠের ব্যথা নিয়েও টানা বল করেই যেতে হলো মাশরাফিকে। শেষ পর্যন্ত ম্যাকমিলানকে আউট করলেন মাশরাফিই; ততক্ষণে শরীর যায় যায়।
হাবিবুল বাশারের ফিফটিতে অলআউট হওয়ার আগে ২০৫ রান করেছিল। ম্যাচ তিন দিনে নেমে আসায় নিয়ম অনুযায়ী তারপরও ফলো অন এবং ইনিংস পরাজয়। তবে এর থেকেও বড় ধাক্কা অপেক্ষা করছিল মাশরাফির জন্য।
খেলার পর থেকেই পিঠের ব্যথায় আর নড়তে পারেন না। সঙ্গে কুঁচকির ব্যথাও দারুণ বেড়েছে। ফিজিও গ্লস্টার নানা কসরত করে যাচ্ছেন। কিন্তু কিছুতেই উন্নতি হচ্ছে না। এ অবস্থায় বেসিন পার্কে দ্বিতীয় টেস্ট খেলার প্রশ্নই আসে না।
দলের ম্যানেজার হয়ে যাওয়া সিনহা আফজালুর রহমান অত্যন্ত যৌক্তিকভাবেই দলকে বলেছিলেন, মাশরাফিকে কিছুতেই দ্বিতীয় টেস্ট খেলানো ঠিক হবে না। তিনি মাশরাফির দিক যেমন দেখতে বলেছিলেন, তেমনই দলের কথাও ভাবতে বলেছিলেন। প্রথম আলো ২৫ ডিসেম্বর লিখেছিল, আফজালুর রহমান সিনহা এমনও বলেছেন যে, 'টেস্টে ১০ ওভার বল করার-পর ও (মাশরাফি) ভেঙে পড়লে কী হবে!'
১০ নয়, ৬ ওভার বেশি বল করতে পেরেছিলেন মাশরাফি–১৬ ওভার!

৮.

দেশ থেকেও দ্বিতীয় টেস্টে মাশরাফিকে না খেলানোর অনুরোধ-উপদেশ যাচ্ছিল নিউজিল্যান্ডে।
দুজন মানুষ গোঁ ধরে বসেছিলেন–ট্রেভর চ্যাপেল ও জন গ্লস্টার।
ওয়েলিংটন টেস্টের আগের দিনও মনে হচ্ছিল, মাশরাফিকে না খেলানোর সিদ্ধান্তই নিতে যাচ্ছে ম্যানেজমেন্ট। বেসিন রিজার্ভে অনুশীলনের কোনো উইকেট না থাকায় প্রায় তিন কিলোমিটার দূরের একটা নির্মাণাধীন কমপ্লেক্সে গিয়ে নেট অনুশীলন করতে হয়েছিল বাংলাদেশ দলকে। সেখানে নেটে বলই করেননি মাশরাফি। এই দৃশ্য ও ম্যানেজমেন্টের কথাবার্তা শুনে প্রথম আলোর ক্রীড়া সম্পাদক উৎপল শুভ্র সেদিন ওয়েলিংটন থেকে লিখে পাঠিয়েছিলেন :

...বাংলাদেশ দলের নেটে মাশরাফি বলই করলেন না। দুই কুঁচকিতেই চোট, সেটি গুরুতর না হলেও তার সঙ্গে যোগ হয়েছে পিঠের বা পাশের পেশিতে টান। ...ওয়েলিংটনে হয়তো মাশরাফির জায়গাতে হাসিবুলকেই দেখা যাবে নতুন বল হাতে। [২]

ট্রেভর চ্যাপেল অবশ্য একটুও পাত্তা দিতে চাননি তখন এসব আলোচনায়। বরং মাশরাফি অনুশীলনে নেই কেন, এর উত্তর দিতে গিয়ে ভুতুড়ে এক যুক্তি দেখিয়েছিলেন। ইনডোরে বোলিংয়ের সময় মাশরাফির পা ম্যাটে আটকে যায় বলে তাকে নাকি বোলিং করানো হয়নি। মানে, তিনি চান মাশরাফি ওয়েলিংটন টেস্ট খেলুন।

আর এই চাওয়ায় জন গ্লস্টার নামের ফিজিও কখনো দ্বিমত পোষণ করেছেন বলে শোনা যায়নি।

কোচের আগ্রহ আছে, ফিজিও তরফে কোনো সমস্যা নেই; অধিনায়কও আর যা-ই হোক, দ্বিমত করেছেন বলে শোনা যায়নি; ফলে মাশরাফির ওয়েলিংটন টেস্ট খেলতে আর বাধা রইল না।

আগে ব্যাট করে প্রথম দুই সেশনেই অলআউট হলো বাংলাদেশ। এবার বোলিং শুরু করতে হলো। কিন্তু বোলিংয়ের শুরু থেকেই মাশরাফি প্রচণ্ড ব্যথাতেই ভুগছিলেন। প্রতিটা বলেই টের পাচ্ছিলেন, সমস্যা বাড়ছে। ১১ ওভারের প্রথম স্পেল করে একটা মেডেন নিলেন; ৩৬ রান দিয়ে উইকেটশূন্য। কিন্তু শরীরটা বিদ্রোহ করছিল। তখনো সরিয়ে দেওয়া হয়নি মাশরাফিকে। ইনিংসের ৫২তম ওভারে আবার আক্রমণে নিয়ে আসা হলো তাকে। এবার স্পেলের দ্বিতীয় ওভারে লু ভিনসেন্টকে পেসে পরাজিত করে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিতে বাধ্য করলেন। সবাই উল্লাস করছে; মাশরাফি লাফাতেও পারছেন না।

এই স্পেলে আরও ৪ ওভার বল করে একটু বিশ্রাম পেলেন। ইনিংসের ৮৭তম ওভারে এলেন তৃতীয় ওভারে বল করতে। আর এটাই হলো কাল। শেষমেশ ১৬ ওভার বল করার পর আর পারলেন না। আর পারলেন না মাশরাফি। প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে মাঠ ছাড়লেন। এই শুরু হলো সারাটা ক্যারিয়ার ধরে চলা এক দুষ্টচক্র।

৯.

নড়াইলের আতিয়ার রহমান সাহেবের বাড়ি দেখে বোঝার উপায় নেই, এই বাড়িতে ব্যথা নিয়ে কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আসলে নড়াইলে ফেরার আনন্দের কাছে সব ব্যথাই ম্লান। নিউজিল্যান্ডে টেস্ট সফর শেষ করে ওয়ানডে শুরুর আগেই দেশে ফিরে এসেছেন মাশরাফি। এবারের ফেরাটা বলাই বাহুল্য একটু অন্য রকম। এবার চোটের কাছে পরাস্ত হয়ে ফিরে এসেছেন।

ফলে অন্য যেকোনো সময়ের মতো উন্মাতাল হয়ে ঘোরাফেরা করতে পারছিলেন

না। চলাফেরায় কিছুটা নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হচ্ছিল।
ফিজিওর দেখিয়ে দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী বাড়িতে বসেই প্রতিদিন পুনর্বাসন কর্মসূচির কাজকর্ম চালাতে হচ্ছিল। এই কর্মসূচির মধ্যেই একটা ছিল প্রতিদিন নিয়ম করে দড়ি লাফানো; ওতে পেশিগুলো আরও সবল হয়ে উঠবে। আগের মতো সক্ষম হয়ে উঠবেন মাশরাফি।
কিন্তু নিয়তির খেলা বোঝে কার সাধ্যি!
সেদিন সকালেও নিয়ম করে দড়ি লাফাচ্ছিলেন। হঠাৎ পায়ে পেঁচিয়ে গেল দড়িটা। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেলেন মাশরাফি। কট করে বিকট একটা শব্দ শুনলেন; 'মা' বলে চিৎকার করে উঠলেন। স্থানীয় ডাক্তাররা দেখলেন। তারা বিশেষ কোনো সমস্যা মনে করলেন না।
এই ঘটনা এখানেই শেষ হয়ে গেল। ওই পড়ে যাওয়ার কথা সবাই ভুলেই গিয়েছিলেন। কিন্তু মাশরাফি ভুলতে পারছিলেন না পিঠের ব্যথাটা। ওই ব্যথা নিয়েই সপ্তাহ খানেক বাড়িতে কাটানোর পর ঢাকায় চলে এলেন তিনি। উদ্দেশ্য নিউজিল্যান্ড থেকে পুরো সিরিজ শেষ করে ঢাকায় ফেরা সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনে যোগ দেওয়া।
কিন্তু সারা শরীরে প্রবল ব্যথার কারণে অনুশীলন শুরু করতে পারলেন না।
বাংলাদেশ ম্যানেজমেন্ট বুঝতে পারছিল, তারা কিছু একটা ঝামেলা করে ফেলেছে। তাই ফিজিও, কোচ, অধিনায়কের ওপর মাশরাফির ব্যাপারে সংবাদমাধ্যমে কথা বলায় একধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু এটুকু দিব্যি বোঝা যাচ্ছিল, স্থানীয় চিকিৎসায় এই সমস্যার সমাধান হওয়ার নয়।
অবশেষে ক্রিকেট বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০২ সালের ২৯ জানুয়ারি বেঙ্গালুরুতে রওনা হয়ে গেলেন মাশরাফি বিন মুর্তজা। মাশরাফির সঙ্গী হয়ে বেঙ্গালুরু গেলেন ফিজিও জন গ্লস্টার ও ডেপুটি ডিরেক্টর অব ডেভেলপমেন্ট, সাবেক অধিনায়ক শফিকুল হক হীরা। উদ্দেশ্য বাইরের দেশে আরও ভালো চিকিৎসককে দেখানো; পিঠের ব্যথাটার ভালো সমাধান।
কে জানত, পিঠের ব্যথা নয়, মাশরাফির জন্য অপেক্ষা করছে হাঁটুর ছেঁড়া লিগামেন্ট।

[১] মাশরাফি : ধূমকেতু থেকে ধ্রুবতারা হতে পারবেন তো?; মোস্তফা মামুন (প্রথম আলো, ১০ নভেম্বর, ২০০১)
[২] মাশরাফিকে নিয়ে বাংলাদেশের দুশ্চিন্তা; উৎপল শুভ্র (প্রথম আলো, ২৫ ডিসেম্বর, ২০০১)

লিগামেন্ট; রিমেম্বর দ্য নেম



১.
ডাক্তার বললেন, 'তুমি কি জানো, শরীরে লিগামেন্ট বলে একটা জিনিস থাকে?'
কৌশিক মাথা দোলায়। সর্বজনীন ভাষায়, সে দুলুনির অর্থ পরিষ্কার–না।
'এই জিনিসটা সম্পর্কে জেনে নিয়ো। শরীরে বিভিন্ন জায়গায় দুটো বা তিনটি হাড়ের যে জোড়া আছে, সেটাকে ধরে রাখে রাবারের মতো একটা জিনিস; ওটার নাম লিগামেন্ট। দাঁতেও থাকে, হাতেও থাকে। হাঁটুতেও এই জিনিসটা থাকে। তোমার এই লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে।'
লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেলে কী হয়? কে জানে। তারপরও নামটা আবার জেনে নেওয়া দরকার, 'কী নাম যেন ওটার।'
'লিগামেন্ট, লিগামেন্ট। নামটা মনে রাখো। মনে রাখবে, এটা ছিঁড়লেই তোমার অপারেশন করতে হবে।'
'তার মানে কী, আমার এখন অপারেশন করতে হবে!'
'হ্যাঁ।'
পারলে সেখানেই কান্না করে দেয় কৌশিক। এখন কী হবে!
কাছে বাবা নেই, মা নেই, মামা নেই,

বন্ধুরা কেউ নেই। আর এরা বলে কিনা, অপারেশন করতে হবে। তাও ছুটি মিলবে না। এখনই অপারেশন করতে হবে। এখন কী করবে মাশরাফি! এই বিদেশ বিভুঁইয়ে কোথায় পালাবে।

ছুটে গিয়ে বাড়িতে ফোন করল। মা ফোন ধরেছেন। আর কান্নাটা চেপে রাখা গেল না, 'মা, আমার অপারেশন...'

ওপাশে মাও কাঁদছেন নাকি! বুঝতে পারছে না মাশরাফি। শুধু রুদ্ধকণ্ঠে বলল, 'মা, তুমি চলে আসো। চলে আসো। বাবারে পাঠায়ে দেও। মা, আমি কি বাঁচবানি? মা, আমার অপারেশন।'

আহা রে, ছোট ছেলেটা!

একটা অপারেশনে কী ভয়। ছেলেটা জানেই না। আগামী দেড়টা দশক ধরে ওই দুটো হাঁটুকে ডাক্তাররা কেটে কেটে একাকার করে ফেলবে। ছেলেটা জানেই না এই অপারেশন ব্যাপারটাই হয়ে উঠতে যাচ্ছে তার জীবনের সবচেয়ে নিয়মিত ব্যাপার।

মাশরাফির ইনজুরির ইতিহাস সন্ধান করতে বসলে আমরা বাংলাদেশ 'এ' দলের সেই ভারত সফরে চলে যেতে পারি। সেখানেই পিঠে টান পেয়েছিলেন মাশরাফি। সেই টানের থেকে পুরোপুরি সেরে না উঠেই জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজ। এরপর নিউজিল্যান্ড যাত্রা। সেখানে কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে প্রথম টেস্টে টানা বল করানো মাশরাফিকে। দ্বিতীয় টেস্টে আহত শরীরে আরও চাপ দেওয়া। আর সেখানেই প্রথমবারের মতো মাঠ থেকে ছিটকে যাওয়া।

সেই ছিটকে যাওয়ার ধারাবাহিকতায় পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া চলা অবস্থায়ই প্রথমবারের মতো লিগামেন্ট ছিঁড়ে যায় মাশরাফির। পাওয়া হিসাবমতে সেই শুরু হয়ে এ অবধি দুই হাঁটুতে সাতটি অপারেশন করাতে হয়েছে মাশরাফি বিন মুর্তজাকে। এ ছাড়া শরীরে আছে আরও কাটাকুটির দাগ।

এই চোট তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে জীবনের অমূল্য সব সময়, কেড়ে নিয়েছে টেস্ট খেলার ক্ষমতা এবং কেড়ে নিয়েছে ২০১১ সালের বিশ্বকাপ।

কেউ বলেন, এই সবকিছুই ঠেকানো যেত মাশরাফিকে জোর করে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট দুটো না খেলালে। কেউ আবার বলে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষেই ওয়ানডে সিরিজটা না খেললে শরীর অমন করে ধসে পড়ত না ছেলেটির।

কারণ যা-ই হোক, মাশরাফি তখন সুচিকিৎসার সন্ধানে ভারত সফরে রয়েছেন।

২

দুই দুটো জাতীয় দলে পরপর খেলার কথা তার।

কার্যত নিউজিল্যান্ডেই আবার ফিরে যাওয়ার কথা ছিল সবার আগে। বয়স যেহেতু তখনো ১৯ পার হয়নি। প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল—টেস্ট দল থেকে দুজন ক্রিকেটার, মাশরাফি ও আশরাফুল জানুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ খেলতে যাবেন নিউজিল্যান্ডে।

যদিও দুজন টেস্ট ক্রিকেটারকে যুব বিশ্বকাপে খেলানোয় একধরনের নেতিবাচক

আলোচনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সে সময়ের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের প্রধান কোচ জালাল আহমেদ চৌধুরী সংবাদমাধ্যমে বলেছিলেন, 'আমি তো চাই (মাশরাফি ও আশরাফুলকে)। ...গত দুটি প্রতিযোগিতায় আমরা খেলেছি নন-টেস্ট প্লেয়িং দেশ হিসেবে। এবার আমরা টেস্ট পরিবারের সদস্য। সুতরাং আমাদের দলটি শক্তিশালী হওয়া উচিত। আর সে জন্য ওদের দরকার।' [১]

পরিকল্পনা অনুযায়ী ১১ জানুয়ারি অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সঙ্গে নিউজিল্যান্ডে রওনা হয়ে যাওয়ার কথা ছিল মাশরাফির; ২০, ২২ ও ২৪ তারিখ গ্রুপ পর্বের খেলা।

এরপরই আবার দেশে ফিরে এসে পাকিস্তানের বিপক্ষে পূর্ণাঙ্গ সিরিজ। মানে, মাশরাফির সামনে তখন শুধু খেলা আর খেলা। পিঠের পেশির ইনজুরি এতটা ভোগানোর কথা নয় যে, সবগুলো খেলাই মাশরাফি মিস করবেন।

কিন্তু জানুয়ারির শুরু থেকেই একধরনের অনুমান করা যাচ্ছিল যে, মাশরাফি অন্তত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপটা খেলতে পারছেন না। কারণ, সেরে ওঠার গতি খুবই কম। কিছুতেই শরীরের ব্যথা যাচ্ছে না। অবশেষে ৭ জানুয়ারি পাকিস্তানের বিপক্ষেও মাশরাফিকে ছাড়াই ঘোষণা করা হলো বাংলাদেশের দল। জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার কয়েক মাসের মাথায় তাকে ছাড়াই জাতীয় দল ঘোষণা করা হলো; ইনজুরির কারণে।

সামনে আরো কঠিন সব সময় আসছে। মাশরাফিকে ছাড়া আরও প্রায় একটা বছর চলতে হবে বাংলাদেশ দলের।

৩.

রাহুল দ্রাবিড়ের শহর, ভারতের কম্পিউটার বিপ্লবের শহর বেঙ্গালুরু।

মাশরাফি তখন হয়তো রাহুল দ্রাবিড়ের নাম শুনে থাকবেন; কিন্তু কম্পিউটার বস্তুটার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কথা নয়। হলেই বা কী। কম্পিউটার বা দ্রাবিড় ভাবার ফুরসত আছে তার?

চিকিৎসা করাতে এসেছেন, সে জন্য মুখ কালো করে ঘুরতে হবে; এমন ছেলে মাশরাফি নন। বরং বেড়ানোটা উপভোগই করতে চেয়েছিলেন। ঢাকা-কলকাতা হয়ে বেঙ্গালুরু; বিরাট লম্বা এই ভ্রমণ উপভোগ করারই তো কথা ছিল। কিন্তু বেড়াতে এসে একজন বিদেশি, আরেকজন প্রবীণ মানুষের সঙ্গে আর যা-ই হোক আড্ডাও দেওয়া যায় না। ব্যাপারটা অনেকটা পুলিশের গাড়িতে করে সমুদ্রসৈকতে যাওয়ার মতো–চোখের সামনে ঢেউ দেখবেন, কিন্তু নেমে সাঁতরাতে পারবেন না।

দেশে থাকতেই ফিজিও জন গ্লস্টার একটা সময় নিয়ে নিয়েছিলেন ডক্টর টমাস চ্যান্ডির কাছ থেকে।

ডক্টর চ্যান্ডি দেখে অন্তত বিরাট গুরুতর কিছু হয়েছে বলে মনে করলেন না। স্ক্যান করানো হলো, এমআরআই করানো হলো; সবই পিঠের পেশির। ভেতরে কিছু পেশির টিস্যু ছেঁড়া পাওয়া গেল; এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। তাই সাধারণ কিছু ওষুধ এবং নিয়মিত ব্যায়াম ও অনুশীলনের ব্যবস্থাপত্র দিয়ে এ পর্ব শেষ করলেন চ্যান্ডি।

তিন দিন পর দেশে ফিরে এলেন মাশরাফি, গ্লস্টার ও শফিকুল হক হীরা। সাবেক অধিনায়ক ও সাবেক ম্যানেজার হীরা দেশে ফিরে বললেন, *'খুব বিপজ্জনক কিছু হয়নি তার। তাই ডাক্তার তাকে বিশ্রাম নিতে বলেছেন এবং এর ফাঁকে কিছু এক্সারসাইজ করতে হবে। সেগুলো ফিজিওকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।' [২]*

মাশরাফিরা দেশে ফিরলেন ২ ফেরুয়ারি। জানানো হলো, পরের মাসের ৮ তারিখ ডক্টর চ্যান্ডি আরেকবার দেখবেন তাকে। কতটুকু উন্নতি হলো, পরের ধাপের চিকিৎসার জন্য আরও কিছু লাগবে কি না, সেটা বোঝার জন্য এই দেখা।

এর মধ্যে ১৬ ফেব্রুয়ারি চ্যান্ডি নিজেই অন্য একটা কাজে এলেন বাংলাদেশে। সে দফাতেই মাশরাফির সঙ্গে দেখা হলো তার। বললেন, সব ঠিক আছে; বিশ্রাম ও ব্যায়াম চলবে।

মার্চ মাসের শুরুতে আবার বেঙ্গালুরু রওনা দিলেন মাশরাফি। ফলোআপ করানোই লক্ষ্য।

খেয়াল করবেন, এর মধ্যে মাশরাফির কিন্তু মাঠের বাইরে বসে থাকার তিন মাস পার হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো সবকিছু ঘুরপাক খাচ্ছে ওই পিঠের পেশিকে কেন্দ্র করেই। সেই দড়িলাফ বা হাঁটুর লিগামেন্ট এখনো সামনেই আসেনি।

৪.

বেঙ্গালুরুর এই হাসপাতালটা পরিচিত হয়ে গেছে।

কোন জায়গায় রিসিপশন, কোন জায়গায় এক্স-রে রুম; সব মুখস্থ। দুদফা রোজ দিন এই হাসপাতাল ধরে ঘুরতে থাকলে মুখস্থ না হয়ে উপায় আছে?

এবার অবশ্য খুব বড় কিছু হওয়ার কথা নয়। নিয়মিত পরীক্ষা করাতে এসেছে মাশরাফি। ডাক্তার আগেরবারও যেমন বলেছিলেন, সব কাগজপত্রে চোখ বুলিয়ে বললেন–ঠিকই তো আছে। এভাবে চললে খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা না। যেমন সব এক্সারসাইজ দেখানো আছে, ওগুলোই চালিয়ে যেতে হবে। তাহলে মাস খানেকের মধ্যেই খেলায় ফিরতে পারবে।

সৌজন্য বিনিময় করে বেরিয়ে পড়েছিল মাশরাফিরা। ডাক্তারের রুম থেকে বেরিয়ে মনে হলো, হাঁটুতে যে মাঝে মাঝে একটা ব্যথা হয়, সেটা তো বলা হলো না। যা-ই, এটা নিয়ে একটু আলাপ করে আসি। আবার দরজা ঠেলে ঢুকলেন ডাক্তারের রুমে।

ডাক্তার চোখ তুলে বললেন, 'আর কিছু বলবে মুর্তজা?'

'জি, আমার হাঁটুতে মাঝে মাঝে খুব ব্যথা হয়; এটার কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

'দেখি, কাছে এসো।'

পাশের উঁচু টেবিলটায় শুয়ে পড়তে বললেন ডাক্তার। ছাদের দিকে চেয়ে শুয়ে আছে মাশরাফি। ডাক্তার এসে পা-টা একটু ভাঁজ করে দুপাশে নেড়ে দেখলেন। মুখটা একটু গম্ভীর করে বললেন, 'একটা এমআরআই করিয়ে আনো তো।'

উহ!

আবার সেই বিকট এমআরআই মেশিনের মধ্যে শোয়া; ভয়াবহ শব্দের যন্ত্রণা। একসময় এ পর্বও শেষ হলো। এমআরআইয়ের বিশাল প্লেটটা হাতে নিয়ে আবার সেই চ্যান্ডির রুমে।

ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসি পেল। এমআরআই প্লেট তো না যেন হারিয়ে যাওয়া মিসরীয় কোনো হায়ারোগ্লিফিকসের লেখা পড়ছে। অনেকক্ষণ ধরে চোখ বোলানোর পর ডাক্তার বললেন, 'মুর্তজা, তোমার জন্য খারাপ একটা খবর আছে।'

বুকটা ছলাৎ করে উঠল। খারাপ খবর আবার কী!

ডাক্তার নিজেই বলল, 'তোমার হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে। তুমি কি গত কয়েক মাসে কোথাও পড়ে গিয়েছিলে বা হাঁটুতে খুব আঘাত পেয়েছ?'

সেই দড়িলাফের কথা এক লহমায় মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে কট করে হওয়া সেই বিকট শব্দের কথা। দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে কষ্ট হলো না। দিব্যি বুঝতে পারলেন কোথা থেকে কী হয়েছে।

সে যাক গে; লিগামেন্ট ছেঁড়া নিশ্চয়ই পেশি ছেঁড়ার মতো কিছু হবে। হয়তো আরও কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিতে হবে। ভালোই হবে; আরও কিছু আড্ডা, আরও কিছু গল্প হবে। সেই বেঙ্গালুরুর হাসপাতালে বসে নড়াইলে হারিয়ে যেতে বসেছিল। হঠাৎ ডাক্তারের কথাতেই সম্বিত ফিরল, 'শোনো মুর্তজা। তোমাকে একটা অপারেশন করাতে হবে।'

প্রথমবার ঠিক বুঝতে পারেনি মাশরাফি। জিজ্ঞেস করল, 'কী করতে হবে।'

'তোমার হাঁটুতে অপারেশন করতে হবে। তুমি থেকে যাও কয়েক দিন। এই দফাতেই অপারেশন করতে হবে।'

দুনিয়াটা দুলে উঠল মাশরাফির—মা, আমার অপারেশন...

৫.

কথা বলতে পারছেন না হামিদা মুর্তজা বলাকা।

বিশ্বাস করতে পারছেন না নিজের কানকে। কী শুনলেন তিনি! চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কাঁদতেও পারছেন না। তার ছেলে কোন দূর দেশে বসে কাঁদছে, তার ছেলের পায়ে কোন দূরে দেশে মানুষ ছুরি চালাবে!

ঘরে ঢুকে স্ত্রীর মুখ দেখেই গোলাম মুর্তজা বুঝতে পারলেন, কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, কিছু একটা অশুভ খবর আছে। কিন্তু কার কাছ থেকে শুনবেন খবর? বলাকা তো যেন অজ্ঞান হয়ে আছে।

দফায় দফায় প্রশ্ন করতে থাকলেন, 'কী হয়েছে, আমাকে বলো? কী হয়েছে বলাকা!'

বহুবারের চেষ্টায় বলাকা মুখ খুললেন, 'আমার কৌশিকের অপারেশন হবে। তুমি ইন্ডিয়ায় যাও।'

খানিকটা সময়ের জন্য অবশ হয়ে গেলেন মুর্তজা সাহেবও। দ্রুতই নিজেকে সামলেও নিলেন। তাড়াতাড়ি মাশরাফির নানাবাড়ি হেঁটে চললেন। নাহিদকে ডেকে বের করলেন, 'নাহিদ, এখন কী করি? কোথায় যাই।'

বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন মুর্তজা সাহেব।
তার পাসপোর্ট নেই, ভিসা নেই; কাউকে জানেন না। কীভাবে মুখের কথায় ছেলের কাছে চলে যাবেন!
নাহিদ মামা বুদ্ধি দিলেন, 'আপনি বোর্ডে একটা ফোন করেন। ওরা কোনো কিছু উপায় বের করবে।'
মাহবুব আনামের কথা মনে পড়ে গেল মুর্তজা সাহেবের। এই লোকটা তো ফোন দিয়ে মাঝে মাঝে খোঁজখবর নেন। এই বোর্ড পরিচালককে ফোন দিলেন, 'ভাই, খবর শুনেছেন।'
'হ্যাঁ, ভাই। আপনি ভেঙে পড়বেন না। ওখানে আমাদের লোক আছে। আরও কেউ কেউ যাবে। সব দায়িত্ব আমাদের। টেনশন করবেন না।'
'ভাই, আমি ছেলের কাছে যেতে চাই।'
'আচ্ছা, আপনি ঢাকায় চলে আসেন। আমি ব্যবস্থা করছি। পাসপোর্ট আছে তো?'
'জি না।'
একটু থমকে গেলেন বাংলাদেশের গত আড়াই দশকের তুখোড় এই সংগঠক ও সাবেক মোহামেডান তারকা মাহবুব আনাম। তারপর বললেন, 'চলে আসেন ঢাকায়। একটা কিছু হবে। আপনাকে পাঠানোর ব্যবস্থা করব।'
মাহবুব আনামের এই ত্বরিতগতির বিস্ময়কর কার্যকলাপের ফলে বিমানে চেপে বসলেন গোলাম মুর্তজা। বেঙ্গালুরু যতক্ষণে পৌঁছালেন, ছেলের পায়ে অপারেশন হয়ে গেছে।
মুর্তজা সাহেব জানেন না যে, পরের কয়েকটা বছরে ছেলের অপারেশনের কারণেই তাকে আরও বহুবার বিমানে চাপতে হবে।

৭

অপারেশন মানেই মাশরাফির ধারণা ছিল একটা বিকট ইনজেকশন দিয়ে অজ্ঞান করে ফেলা।
কিন্তু বেঙ্গালুরুতে এই অপারেশন করাতে গিয়ে দুটো শিক্ষা হলো মাশরাফির–প্রথম কথা হলো, অজ্ঞান করতে ইনজেকশন ছাড়াও আরও অনেক ব্যাপারস্যাপার থাকে। দ্বিতীয় এবং সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো, অপারেশন থিয়েটারের বাইরে সিনেমায় যেমন দেখানো হয় তেমন আত্মীয়-স্বজনের পায়চারি করার সুযোগ থাকে না!
অন্য কারো অপারেশন হলে এই নিয়ে একটু রসিকতা করা যেত, তাকে খোঁচাখুঁচিও দেওয়া যেত। কিন্তু ব্যাপারটা নিজের বলে একটু কেমন কেমন যেন লাগছে।
তারপরও অপারেশন টেবিলে যখন শুয়ে পড়তে বলল, তখন একটু সিনেমার মতো মনে হলো বৈকি!
পাশে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক সাহস দেওয়ার জন্য কিসব আজগুবি কথা বলতে লাগল। কোমরের ঠিক ওপরে একগাদা বাড়তি আলো জ্বেলে দিল। তারপর বলল একটু কাত হয়ে শোয়ার জন্য। কোমরে কী একটা ভয়ংকর ইনজেকশন দিল। এত ব্যথা এর আগে জীবনে লাগেনি; বীভৎস যন্ত্রণা ইনজেকশনটায়। নিজেই আবার চিত

হয়ে শুয়ে পড়ল। এবার ডাক্তাররা কোমরের কাছ থেকে একটা পর্দা টানিয়ে দিল। পা-টা নাড়ানোর চেষ্টা করল একবার মাশরাফি। তখনই টের পেল, তার কোমরের নিচ থেকে আসলে অবশ হয়ে গেছে! এবার একটু ভয় লাগল।

তবে ভয়ের মতো আর কিছুই টের পেল না। সে চুপ করে শুয়ে আছে। দেখতে পাচ্ছে ও পাশে ডাক্তাররা নিচু হয়ে কী যেন করছে। কিন্তু বুঝতে পারছে না কিছুই। একসময় এই বিরক্তিকর পর্ব শেষ হলো। পর্দা সরিয়ে ফেলা হলো। মাশরাফি দেখতে পেল তার বাঁ হাঁটুতে বিশাল ব্যান্ডেজ করা। আর আবিষ্কার করল, এই পা নড়াচড়া করার সাধ্য তার নেই। এখন সে কী করবে!

হয়তো মাশরাফি সহ্যই করতে পারত না পুরো ব্যাপারটা। এর মধ্যে একটু প্রাণ ফিরে এল বাবাকে দেখে। তাকে বিছানায় দিয়ে যাওয়ার পরদিন, নাকি তার পরদিন? মনে করতে পারে না ঠিক। তবে একদিন চোখ মেলে দেখল বিছানার পাশে বাবা দাঁড়িয়ে।

যে মানুষটাকে সারা জীবন ভয় পেয়েছে, সারা জীবন তার থেকে একটু দূরে দূরে থেকেছে; আজ বুঝল, এই মানুষটা তার কে। খুব ইচ্ছে করছে, বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে। সাহস হচ্ছে না। বাবাই হঠাৎ ওকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন।

৮.

সাজুরা জানত, আজ কৌশিক বাড়ি ফিরে আসবে।

ইন্ডিয়ায় অপারেশন হয়েছে, স্বপন কাকু গিয়ে কৌশিককে দেশে নিয়ে এসেছে। ঢাকা থেকে একটা গাড়ি করে আজ ওকে বাড়ি নিয়ে আসবে। সাজুরা সবাই জড়ো হয়েছে মাশরাফির নানার বাড়িটার সামনে চায়ের দোকানে। চায়ের দোকানটায় অন্যদিন সবাই জড়ো হলেই হাসি আর তামাশায় মেতে ওঠে; একটু তাসও খেলা হয়। আজ কারো মুখে হাসি নেই। সবাই পথের দিকে চেয়ে আছে।

একটা সাদা গাড়ি এসে থামল বাড়ির সামনে। থামার ভঙ্গি দেখেই ওরা বুঝে ফেলল। দৌড়ে এগোল সবাই। গেট খুলে প্রথমে নাহিদ মামা নেমে এল। এরপর মাশরাফি আস্তে আস্তে ডান পা বাড়িয়ে দিল। তারপর বেরিয়ে আসল দুটো ক্রাচ। ক্রাচে ভর করে বের হলো মাশরাফি!

কারো মুখে একটা শব্দ নেই। শুধু বারান্দায় মামির কান্নার আওয়াজ পাওয়া গেল যেন। বলাকা আন্টি ছুটে এলেন। বোঝাই যাচ্ছে, অনেক কষ্টে কান্না চেপে রেখেছেন। বন্ধুরা ছুটে এল। সাজু চোখ মোটা করে বলল, 'ক্রাচ লাগবে না। তুই আমাগো কাঁধে হাত দে।'

মাশরাফিকে ক্রাচে খুব একটা ভর দিতে হয়নি; বন্ধুদের কাঁধ ছিল।

৯.

আজ সেই নেপাল সরকারের কথা খুব মনে পড়ছে বলাকার।

ছেলেটা রাজপুত্তুর হবে বলেছিলেন নেপাল কাকা। বলেছিলেন, ছেলেটা মানুষের মনে রাজত্ব করবে। সবই সত্যি হলো। এ দুর্ঘটনা, এই ফাঁড়ার কথাও তো নেপাল

কাকা বলেছিলেন।
ছেলেটাকে চোখের সামনে ক্রাচে ভর করে ঘুরতে দেখে আর সহ্য হয় না। মনে হয় নিজের হাঁটুটা খুলে কৌশিকের পায়ে লাগিয়ে দেওয়া যেত! নিজের পায়ের বদলে হলেও ছেলেটা যদি সুস্থ হয়ে উঠত।
তিনি ভাবেন ছেলেটার সুস্থতার কথা। আর লোকে এসে শোনায়, এই ছেলে আর কোনো দিন সুস্থ হবে না। এই তো সেদিন পাশের পাড়ার এক ভাবি বেড়াতে এসেছিলেন। কতশত সহানুভূতির কথা শোনালেন। ওঠার সময় বললেন, 'আপনার ভাই সেদিন বলছিল, কৌশিক আর কোনো দিন খেলতে পারবে না। আর কখনো নিজে হাঁটতে পারবে না।'
কথার উত্তর দিতে ইচ্ছে করে না। বুকটা ভেঙে আসে। তারপরও জিজ্ঞেস করেন, 'ভাই কী করে জানল।'
'পত্রিকায় নাকি দেখেছে।'
শুধু এই ভাবি কেন; সারা নড়াইলই এখন বলাকা আর স্বপনের সামনে এসে এই মাশরাফির ভবিষ্যৎ নিয়ে 'উৎকণ্ঠা' প্রকাশে ব্যস্ত। মাসিদের দরদে টেকা দায়। স্বপন প্রতিদিন বাজার থেকে শুনে আসেন, 'তোমার ছেলের আর খেলা হবে না।'
মাঝে মাঝে খুব চটে উঠতে ইচ্ছে হয়। মনে হয়, লোকদের মুখের ওপর দুকথা শুনিয়ে দেন।
কিন্তু তারা যে বাবা-মা; কিছুই বলতে পারেন না। রাত হলে নির্জনে স্বপন স্ত্রীকে বলেন, 'মন খারাপ করো না।'
'আমি মন খারাপ করি না। লোকে কত কথা বলে।'
'হ্যাঁ, আমাকেও বলে। বলে কৌশিক আর নিজে হাঁটতে পারবে না।'
বলাকা কান্নায় ভেঙে পড়েন, 'আমাদের যা জায়গা জমি আছে, সব বিক্রি দেব। সব। তবু আমার ছেলেকে সুস্থ করে আনব। আমরা রাস্তায় থাকব, ছেলের খেলার দরকার নেই; ও শুধু নিজে চলুক ফিরুক।'
মা শুধু সারা রাত বসে থাকেন জায়নামাজে। নামাজ পড়েন আর ওপরে দুহাত তুলে প্রার্থনা করে–আল্লাহ, ছেলেটাকে সুস্থ করে দাও। ওর খেলা লাগবে না, ও শুধু সুস্থ হয়ে উঠুক। স্বপন গভীর রাতে ঘুম ভেঙে দেখেন, স্ত্রী তার পাশে নেই। আস্তে আস্তে বসার ঘরে এসে দেখেন–জায়নামাজে বসে স্ত্রী তার কাঁদছেন।
***
বন্ধুরা কেউ এতটুকু মনে করতে দেয় না ইনজুরির কথা। এমনকি এই যে খেলা চলছে, তাও দেখার উপায় নেই। খেলা দেখার কথা বললেই ওরা চটে ওঠে, 'চুপ থাক। আমরা আড্ডা দিচ্ছি, তাই দে। যেদিন নিজে খেলবি, সেদিন খেলা; তার আগে না।'
মাশরাফি হাসেন, 'যদি আর খেলতে না পারি?'
'কী আর হবে? একটা দোকান দিবি। ব্যবসা করবি। আমরা সবাই তোর দোকানের সামনে আড্ডা দেব।'

'তোগো জ্বালায় তো তাহলি ব্যবসাও হবে না। এত আড্ডা দিলে সে দোকানে কাস্টমার আসবে নাকি!'–হো হো হাসিতে হারিয়ে যেতে থাকে সব অন্ধকার।

১০.

ডাইনিং টেবিলে বসে ইরফান পাঠানের সঙ্গে গল্প করছিল মাশরাফি।
বিশেষত রিভার্স সুইং ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ হচ্ছিল। সেই অনূর্ধ্ব-১৭ থেকে দুজনের পরিচয়। চেন্নাইতে এসে সেটা বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে। পেস বোলিংয়ের অনেক ব্যাপারেই দুজনের আগ্রহ। কিন্তু রিভার্স সুইং ব্যাপারটায় বিশেষ আগ্রহ; এটা শেখা দরকার।
এমন সময় পাশ থেকে একটা ছেলে একেবারে বিনা দাওয়াতে কথা বলে উঠল, 'তোমাদের বাংলাদেশে কি ফাস্ট বোলিং শেখায়?'
মাশরাফি একটু অবাক হয়ে বলল, 'শেখাবে না কেন? আমাদের ওখানে কোচরা আছেন। বাইরে থেকে কোচরা আসেন।'
'এহ। বাংলাদেশ একটা দেশ; সেখানে আবার কোচ।'
এরপরের ঘটনাটা রহস্যময়।
দুই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথম বর্ণনামতে, মাশরাফি উঠে গিয়ে চেপে ধরতে চেয়েছিলেন ছেলেটিকে। কিন্তু ইরফান ও শ্রীশান্ত সে যাত্রা ঠেকিয়ে দেন। দ্বিতীয় বর্ণনা বলে, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রবল ঘুষিতে ছেলেটিকে চেয়ার থেকে ফেলে দেন মাশরাফি। এরপর প্রথম লাথিটা মেরে ফেলার পর তাকে ঠেকান ইরফান ও শ্রীশান্ত।
মাশরাফি এ ব্যাপারে টুঁ শব্দটি আজ আর করতে রাজি নন। তিনি বারবার বলেন, ও বাংলাদেশ নিয়ে বাজে কথা বলেছিল; আমি কিছু একটা করেছিলাম। সে নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি ওর নাম পর্যন্ত ভুলে গেছি।
নামটা আমরাও ভুলে যাই।
যদিও সে সময়ের একজন পুরো ঘটনা জানা মানুষ জানাচ্ছিলেন, এ ঘটনা বিসিবিকে জানিয়েছিল এমআরএফ পেস ফাউন্ডেশন। বিসিবি থেকে কথা বলে মাশরাফির কাছ থেকে জেনে পরিস্থিতি বোঝানো হয়েছিল এমআরএফকে। এখানে আরেকটি ভাষ্য থেকে জানা যায়, এমআরএফ কর্তৃপক্ষ এ ঘটনায় মাশরাফিকে শাস্তি দেওয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।
কিন্তু পরবর্তীকালে খলনায়কে পরিণত হওয়া শ্রীশান্ত কর্তৃপক্ষের কাছে বলেছিলেন–মাশরাফির সামনে তার দেশ নিয়ে যা বলা হয়েছে, তাতে যেকোনো মানুষেরই এমন করা উচিত। বিসিবির কথোপকথন হোক, শ্রীশান্তের সাক্ষ্য হোক; যে কারণেই হোক, সে যাত্রা এ নিয়ে আর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি এমআরএফ।
ফলে চেন্নাইয়ে ডেনিস লিলির এমআরএফ ফাউন্ডেশনে বিশেষ কোর্স শেষ করেই ফেরেন মাশরাফি বিন মুর্তজা।

১১.

চেন্নাই এমআরএফ পেস ফাউন্ডেশনের সঙ্গে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তখন একটা প্রাথমিক সমঝোতা বা এমওইউ (মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং) ছিল। যে সমঝোতা অনুযায়ী বিসিবি চাইলে প্রতিবছর একাধিক ফাস্ট বোলার ও কোচকে এই নামকরা পেস বোলিং একাডেমিতে ট্রেনিং করাতে পাঠাতে পারত।

গ্লেন ম্যাকগ্রা, জাভাগাল শ্রীনাথ, ব্রেট লি থেকে শুরু ইরফান পাঠান; দুনিয়া কাঁপানো অনেক বোলারই বেরিয়েছেন এই চেন্নাই এমআরএফ থেকে। এমনকি শচীন টেন্ডুলকারও প্রথম জীবনে ফাস্ট বোলার হতে এসেছিলেন এই পেস ফাউন্ডেশনে। অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার ডেনিস লিলির অভিভাবকত্বে ১৯৮৭ সালে যাত্রা শুরু করে ভারতের এই পেস ফাউন্ডেশন। লক্ষ্য ছিল, ভারত ও তার বন্ধু ক্রিকেট খেলুড়ে দেশগুলোর উঠতি, তরুণ ফাস্ট বোলারদের সঠিক একটা কাঠামোর ভেতর থেকে তুলে আনা।

তবে মাশরাফির এই এমআরএফে যাওয়াটা ছিল বিশেষ একটা আয়োজন।

হাঁটুর অপারেশনের পর দীর্ঘ পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া শেষে মাশরাফি তখন একটু একটু করে দৌড়াতে পারছেন। কিন্তু একটা ব্যাপার স্থানীয় কোচরা বুঝতে পারছিলেন–মাশরাফির বেসিক বোলিং অ্যাকশনে কিছু কাজ করতে হবে। নইলে হাঁটুর ইনজুরি না হলেও পিঠের ইনজুরিটা বারবার ফিরে আসবে। সে জন্য এমআরএফে মূলত 'ইনজুরি ফ্রি পেস বোলিং ট্রেনিং' নামে একটা বিশেষ কোর্সে পাঠানো হয় মাশরাফিকে।

বিসিবির সঙ্গে এমআরএফের খেলোয়াড় পাঠানো, কোর্স ব্যবস্থাপনা; এসব ব্যাপার সমন্বয় করতেন বাংলাদেশের একসময়ের নামকরা ফাস্ট বোলার ও কোচ গোলাম ফারুক সুরু। তিনি বলছিলেন, 'মাশরাফিকে পাঠানো হয়েছিল ইনজুরি থেকে সেরে উঠে ও যেন ঝুঁকিমুক্ত অ্যাকশনে বল করতে পারে।'

চেন্নাইতে কোচরা মূলত দেখছিলেন যে ওপেন চেস্ট অ্যাকশনে, যে অ্যাকশনে মাশরাফি বল করেন, তাতে তার কোমর ও পিঠের পেশিতে বেশি টান পড়ছে। এই অ্যাকশনের ল্যান্ডিংয়ের সমস্যার কারণে ও অতিরিক্ত বোলিংয়ের কারণে দুই হাঁটুতেই মারাত্মক চাপ পড়ার ঝুঁকি থাকে। এই কোচরা আশঙ্কা করেন যে, ইতিমধ্যে এই অ্যাকশনে মাশরাফি যে অক্লান্ত পরিমাণে বল করে ফেলেছে, তাতে হাঁটু দুটিই স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে।

এমআরএফের কোচরা অভ্রান্ত ছিলেন।

তবে পুরোনো ব্যাপার নিয়ে আর আফসোস করে লাভ নেই। এখন সব শোধরানোর পালা। সময় দেখতে দেখতে প্রায় ১১ মাস কেটে গেছে। এবার চেন্নাই থেকে ঢাকা ফেরার পালা। আরেকবার লড়াই করার পালা।

[১] মাশরাফি ও আশরাফুলকে চান জালাল আহমেদ; প্রথম আলো (২২ ডিসেম্বর, ২০০১)

[২] মাশরাফি ফিরেছেন; প্রথম আলো (৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০২)

গুরু-শিষ্য যুগলবন্দী



১.
ধানমন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়াম বললে লোকে ঠিক চেনে না। বলতে হয়–আবাহনী মাঠ।
আসলে পুরোটা আবাহনীর মাঠ নয়। আবাহনী ক্লাবের পাশে রীতিমতো তালিকাভুক্ত 'স্টেডিয়াম' এই ধানমন্ডি স্টেডিয়াম। সে স্টেডিয়ামের ছোট্ট এক টুকরো গ্যালারি আজ আবর্জনার দখলে, মাঠ প্রায়ই খেলার উপযুক্ত থাকে না, সকাল-বিকেল ঢাকা শহরের প্রায় সব একাডেমির বাচ্চারা অসমান মাঠে ঝুঁকি নিয়েই অনুশীলন করে।
তারপরও এটা ধানমন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়াম।
এই স্টেডিয়ামে ঢাকার ক্রিকেটের অনেক স্মৃতি। এই স্টেডিয়ামে নান্নু, বুলবুল, আকরাম, লিপুদের নয়ন জুড়ানো সব ইনিংস দেখা গেছে। প্রিন্স, বাদশার আগুন কিংবা রামচাঁদ গোয়ালা বা ওহাদুল গনির জাদুও দেখা গেছে এই স্টেডিয়ামে। তবে এসব কারণে নয়, মাশরাফির এই মাঠটি মনে রাখার কথা একেবারে ভিন্ন এক কারণে–এই মাঠেই

ফিরেছিলেন ১১ মাসের নির্বাসন কাটিয়ে; এই মাঠেই খেলেছিলেন টেস্টের বাইরে ক্যারিয়ারের প্রথম ফার্স্ট ক্লাস ম্যাচ।

২০০২ সালের ১৭ ডিসেম্বর সব জল্পনা-কল্পনা শেষ করে ফিজিওর দেওয়া কিছু নিষেধাজ্ঞা মাথায় নিয়ে প্রায় ১১ মাস পর আবার প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলতে নেমেছিলেন মাশরাফি। নিজ বিভাগ খুলনার হয়ে তিন দিনের ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন রাজশাহীর বিপক্ষে।

চেন্নাই থেকে সামান্য বোলিং অ্যাকশন বদলে ফিরেছিলেন। সেই বদলে ফেলা অ্যাকশনে আস্তে আস্তে বল করতে শুরু করেছিলেন বেশ কয়েক দিন আগেই। নেটে পুরো রানআপে সপ্তাহ খানেক বা তারও বেশি সময় বল করার পর মিলল ফিজিও জন গ্লস্টারের ছাড়পত্র। তিনি জানালেন, এখন ম্যাচ খেলতে পারেন মাশরাফি।

তবে শর্ত দেওয়া হলো দিনে সর্বোচ্চ ১০ ওভার বল করতে পারবেন এবং এক স্পেলে সর্বোচ্চ ৪ ওভার বল করতে পারবেন মাশরাফি। সেই শর্ত মেনেই মাঠে নামলেন।

মাঠে নেমে ১১ মাসের যন্ত্রণা, মাশরাফি ফুরিয়ে গেছেন কি না সে কথার জবাব দিতে ব্যয় করলেন ১১টি বল। নিজের দ্বিতীয় ওভারের পঞ্চম বলেই বোল্ড একসময়ের যুব দলের সতীর্থ রফিকুল ইসলাম। দিব্যি বোঝা গেল এই একটার পর একটা ইনজুরি আর অপারেশন মাশরাফির কাছ থেকে আর যা-ই হোক তার ক্ষমতার এতটুকুও কেড়ে নিতে পারেনি।

মাশরাফির খুলনার সতীর্থরা এখনো মনে করতে পারেন প্রথম ইনিংসে কেমন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে একটা রানআউটও করেছিলেন। আর সোনায় সোহাগা করতে রাজশাহীর ইনিংসের একেবারে শেষলগ্নে তুলে নিলেন ইমরানের উইকেট; ক্যাচটা ধরেছিলেন মানজারুল ইসলাম রানা।

দুই বন্ধুতে যেন উদ্‌যাপন করলেন মাশরাফির ফিরে আসা।

সব মিলিয়ে প্রথম ইনিংসে ১০ ওভার বল করে ৩৭ রান দিয়ে ২ উইকেট। এই ৩৭ রানের মধ্যে ৮ রান এল ওয়াইড ও নো থেকে; কার্যত ব্যাটসম্যানরা তার এই ১০ ওভারে তুলতে পারলেন ২৫ রান। বোঝা যাচ্ছে, এতকাল পর মাঠে ফেরায় বলের নিয়ন্ত্রণটা একটু দুর্বল ছিল।

দ্বিতীয় ইনিংসে এসে সেটাও পুষিয়ে দিলেন। এই ইনিংসে ১৩ ওভার বল করলেন; যার মধ্যে দুটি মেডেন। ৪২ রান দিয়ে নিলেন আরও দুটি উইকেট। ওয়াইড ও নো কমে এল ৪টিতে। সব মিলিয়ে ২৩ ওভার বল করে ৪টি উইকেট। প্রত্যাবর্তন হিসেবে নিতান্ত খারাপ নয়।

আরেকটা ব্যাপার উল্লেখ করা যেতে পারে এই ম্যাচে অনেক দিন পর ব্যাট হাতে চিরচেনা রূপটা দেখিয়েছিলেন। ১১ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ১৭ বলে ৩২ রানের একটা ইনিংস খেলেছিলেন। ইনিংসে ৬টি চার ও একটি ছক্কা।

মনে রাখা দরকার, কোনো প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ না খেলেই সরাসরি টেস্ট অভিষেক হয়েছিল মাশরাফির। যদিও টেকনিক্যালি টেস্ট ম্যাচ নিজেই একটি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ। তারপরও টেস্টের বাইরে প্রথম শ্রেণীর অভিষেক যদি মনে রাখতে হয়, তাহলে এই ম্যাচটিই মাশরাফির সেই অন্য রকমের অভিষেক!
পরপরই মাশরাফি শুরু করে ফেলেন তার ঘরোয়া ক্রিকেটে সীমিত ওভারের ক্যারিয়ার। পরে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া জাতীয় লিগের ওয়ানডে টুর্নামেন্টে একটি ম্যাচ খেলতে পেরেছিলেন খুলনার হয়ে।

২.

ডিসেম্বরের ১৭ তারিখে মাঠে ফিরলেন। কিন্তু এ বছর অক্টোবর মাসেও বোঝা যাচ্ছিল না, কী হতে যাচ্ছে মাশরাফির। বিশেষ করে এমন একটা শঙ্কা ছড়িয়ে পড়েছিল যে পরের বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপে বুঝি খেলা হচ্ছে না মাশরাফির।
সমস্যাটা হয়েছিল ডান পায়ে।
মাশরাফির অপারেশন হয়েছিল বাঁ পায়ে; পেশির টানটাও ছিল বাঁ পাশে। ফলে পুনর্বাসনের পুরোটা সময় তাকে শরীরের ডান পাশে ও ডান পায়ে ভর দিয়ে চলাফেরা করতে হয়েছে। এরই প্রতিক্রিয়ায় একটা সময় দেখা গেল ডান হাঁটু ও পিঠের ডান পাশে প্রবল ব্যথা শুরু

খুলনা-রাজশাহী
ভেন্যু : ধানমন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়াম, ঢাকা
তারিখ : ১৭–১৯ ডিসেম্বর, ২০০২
টস রাজশাহী (ব্যাটিং)
ফল খুলনা ৯ উইকেটে জয়ী।

রাজশাহী : ১ম ইনিংস

ব্যাটসম্যান	**রান**	**বল**	**মিনিট**	**৪**	**৬**
রফিকুল ইসলাম ব মাশরাফি		১১	১৪		০
জহুরুল এলবিডব্লু আল আমিন	২২	৩১	৩৯	৩	০
নুরুজ্জামান এলবিডব্লু হাসানুজ্জামান ঝড়ু	১৯	৫৭	৮৪	১	০
আনিসুর ক সেলিম ব সফিউল	২	৭	১৩		
মুশফিকুর রহমান ক সাজ্জাদুল ব রাজ্জাক	৫৫	১২৪	২৪৪	৭	০
মোস্তাদির ক সেলিম ব হাসানুজ্জামান ঝড়ু	৪	১৮	২৫		০
হাসানুজ্জামান রানআউট	৯	১০	২০	১	
শামীমুল রানআউট (মাশরাফি)	১৮	৫২	৬২	১	০
ইমরান ক মানজারুল রানা ব মাশরাফি	১৪	৩৯	৬৫	১	০
আমিনুল অপরাজিত	১০	১৯	২৭	২	০
শাফাক এলবিডব্লু রাজ্জাক	৩	৯	১২		০
অতিরিক্ত (বা ৭, লেবা ৯, নো ১৪, ও ৮)	৩৮				
মোট (৬০.৫ ওভারে অলআউট)	১৯৪				

বোলিং : মাশরাফি ১০-০-৩৭-২ (ও ২, নো ৬)
আল আমিন ১৩-৩-৩৫-১, সফিউল ১২-৩-২৪-১
ঝড়ু ৮-৩-১৭-২, রাজ্জাক ১১.৫-০-৪৬-২
মানজারুল রানা ৬-০-১৯-০।

হয়েছে। তাৎক্ষণিক চিকিৎসকেরা দেখে বললেন, দুই পায়ে সমান ভর দিয়ে দৌড়ানো শুরু করার পর এটা ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা পরের বছরের ঠিক এই সময়ে এসে জানতে পারব, সমস্যাটা আরও জটিল ছিল।

নভেম্বর মাসের মধ্যে এই সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে পুরো রানআপে বল করতে শুরু করলেন। ডিসেম্বরে তো খেলাতেই ফিরে আসলেন।

খুলনা : ১ম ইনিংস

ব্যাটসম্যান	**রান**	**বল**	**মিনিট**	**৪**	**৬**
সাজ্জাদুল ক শামীমুল ব শাফাক	৭	২০	২০	১	০
সফিউল এলবিডব্লু আমিনুল	১	১১	২৬		০
রাজু ক রফিকুল ব মুশফিকুর রহমান	৯৪	২০৮	২৬৭	১২	০
সালাউদ্দিন এলবিডব্লু শাফাক	৩	২৩	৩৫		০
তুষার ইমরান ব মুশফিকুর রহমান	৩৯	৭৮	৯৬	৯	০
হাসানুজ্জামান ঝড়ু ক আমিনুল ব মোস্তাদির	৯	২০	২৯	২	০
সেলিম এলবিডব্লু মোস্তাদির	১৬	৫৪	৬২	২	০
মানজারুল ক হাসানুজ্জামান ব নুরুজ্জামান	৩৩	৫০	৬৪	৬	১
রাজ্জাক অপরাজিত	৪	২০	৩৪	১	০
আল আমিন এলবিডব্লু মুশফিকুর রহমান	২	৫	৫		০
মাশরাফি ব শাফাক	৩২	১৭	২৩	৬	১
অতিরিক্ত (লেবা ৬, নো ১৩, ও ১)	২০				
মোট (৭৯.৪ ওভারে অলআউট)	২৬০				

বোলিং : আমিনুল ১/৫৬, শাফাক ৩/৬৩, মুশফিকুর রহমান ৩/৩৬, মোস্তাদির ২/৫১, ইমরান ০/৩১, নুরুজ্জামান ১/১৭।

খেলায় ফিরলেন বটে; কিন্তু একটা ব্যাপার একটু ধাক্কা দিল ক্রিকেট দর্শকদের। সেই মাশরাফি অনেকটাই বদলে গেছেন। ধানমন্ডি মাঠে মাশরাফিকে দেখা গেল অনেকটা সাইড আর্ম অ্যাকশনে বোলিং করছেন। চেন্নাই থেকে এমন একটা পরিবর্তন নিয়ে যে আসবেন, সেটা একরকম জানাই ছিল। তারপরও চোখে দেখাটা একটা ধাক্কা বৈকি! সঙ্গে ল্যান্ডিংয়েও বেশ খানিকটা পরিবর্তন। সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো ব্যাপার ছিল, বলের গতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।

মাশরাফির গতি কমে যাওয়া নিয়ে সে সময় পত্রিকাতে খবরও প্রকাশিত হয়েছিল। নতুন অ্যাকশনে কমে যাওয়া এই গতি নিয়ে সে সময় মাশরাফি বলছিলেন, 'নতুন অ্যাকশনে সমস্যার কিছু নেই। দেখবেন, আমি আবার আগের মতো বল করব, উইকেট পাব। ...পেস বাড়ানোটা মানসিক ব্যাপার। আমার মনে হয়, আমি চাইলেই পেস বাড়াতে পারব। ...কেউ প্রমাণ চাইলে এখনই সর্বোচ্চ পেসে বল করে দেখিয়ে দেব।' [১]

তার কোনো দরকার ছিল না। কারণ, কয়েক মাসের মধ্যেই মাশরাফি প্রবল পেসের প্রমাণ বাংলাদেশের এই মরা উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড বা পাকিস্তানকে দেবেন।

৩.

এই সময় মাশরাফি আরেকটা ‘প্রথম’ ব্যাপার ঘটিয়ে ফেললেন–ঢাকার কাব ক্রিকেটে যাত্রা শুরু করলেন।

কাব ক্রিকেটে যাত্রার ব্যাপারটা জানতে অবশ্য আমাদের আবার একটু পিছিয়ে যেতে হবে; পিছিয়ে যেতে হবে কুষ্টিয়ার সংগঠক, তখনকার আজাদ স্পোর্টিংয়ের কর্মকর্তা এবং পরে ক্রিকেট কমিটি অব ঢাকা মেট্রোপলিশের সদস্যসচিব রাকিব হায়দার পাভেলের কাছে।

পাভেল তখন খুব ব্যস্ত আজাদ স্পোর্টিং নিয়ে। একদিন খুলনারই আরেক সংগঠক তাকে ফোন করে বললেন, ‘নড়াইল থেকে তো সেই রকম ফাস্ট বোলার আসছে ঢাকায়। খুলনায় ট্রায়াল দিয়েছে। দেখলে অবাক হয়ে যাবি, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের মতো গতি।’

রাজশাহী : ২য় ইনিংস

ব্যাটসম্যান	**রান**	**বল**	**মিনিট**	**৪**	**৬**
জহুরুল ক হাসানুজ্জামান ঝড়ু ব রাজ্জাক	১৮	৩৮	৫০	৩	০
রফিকুল ক সেলিম ব মানজারুল	১৬	৩৯	৭০	২	০
নুরুজ্জামান ক সাজ্জাদুল ব রাজ্জাক	৪	১৭	১৬		০
হাসানুজ্জামান এলবিডব্লু মানজারুল	২	৯	১৭		০
মুশফিকুর রহমান এলবিডব্লু মানজারুল	৩৫	৬৫	৬৩	৪	০
শামীমুল ক সাজ্জাদুল ব রাজ্জাক	৩	১২	১৪		০
মোস্তাদির ক সেলিম ব আল আমিন	২৭	৮৯	১২৬	৩	০
আনিসুর এলবিডব্লু মাশরাফি	৪৬	১১১	১৩৮	৭	০
ইমরান ব মাশরাফি	৪	২৯	৩৫		০
আমিনুল এলবিডব্লু রাজ্জাক	৭	১৪	২৩		১
শাফাক অপরাজিত	৭	৬	১৪		০
অতিরিক্ত (বা ৫, লেবা ৬, নো ৩, ও ৩)	১৭				
মোট (৭০.৪ ওভারে অলআউট)	১৮৬				

বোলিং : মাশরাফি ১৩-২-৪২-২ (ও ২, নো ২)
আল আমিন ১১-৩-২১-১, সফিউল ৪-০-১৭-০
রাজ্জাক ২৪.৪-১০-৬০-৪, মানজারুল রানা ১৮-৫-৩৫-৩।

খুলনা : দ্বিতীয় ইনিংস

ব্যাটসম্যান	**রান**	**বল**	**মিনিট**	**৪**	**৬**
সাজ্জাদুল ক শাফাক ব আমিনুল	৪৩	৪৭	৬৭	৯	০
সালাউদ্দিন অপরাজিত	৩৯	৭৭	১৩৭	৬	০
রাজু অপরাজিত	৩৪	৪০	৬৯	৬	০
অতিরিক্ত (বা ২, লেবা ১, নো ১, ও ১)	৫				
মোট (২৭.১ ওভারে ১ উইকেটে)	১২১				

বোলিং : শাফাক ০/১৫, মুশফিকুর রহমান ০/৪২,
নুরুজ্জামান ০/২২, আমিনুল ১/১৭, ইমরান ০/১২,
মোস্তাদির ০/৬, আনিসুল ০/৪।

পাভেল কথাটা মাথায় রেখেছিলেন।

অনূর্ধ্ব-১৭ জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা দেখতে গিয়েছিলেন সেই ফাস্ট বোলারকে দেখার জন্যই। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে জাহিদ রেজা বাবুর কথা। বন্ধু বাবুর সাথে গেল ধানমন্ডি মাঠে খেলা দেখতে। বাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন

সেই ছেলেটির বাবা গোলাম মুর্তজার সাথে; উল্লেখ করা যেতে পারে পরে এই গোলাম মুর্তজা স্বপনের সাথে বাবু ও পাভেলের রীতিমতো বন্ধুত্ব হয়ে যায়।
সে ঘটনার আগেই চোখে পড়ে গেল সেই ছেলেটা। কি ব্যাটিং, কি বোলিং; দুটোতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। বাবুকে পাভেল বললেন, 'এই ছেলেটাকে আমার চাই।'
বাবু ও স্বপন হেসে সম্মতি দিলেন। পাভেল তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন। ছেলেটাকে ডাক দিয়ে বললেন, 'তোমার নাম কৌশিক?'
'জি।'
'সামনের সিজন তুমি আজাদে খেলবা।'
পাশ থেকে বাবার সম্মতিসূচক মাথা নাড়া দেখে কৌশিক বলল, 'জি, খেলব।'
পাভেল লাজুক কণ্ঠে গল্প করেন, 'মাত্র আট হাজার টাকায় কৌশিক আমার দলের হয়ে প্রথম বিভাগ খেলেছিল।'
আট হাজার টাকায় যাত্রা শুরু হলো অমূল্য রতনের ঢাকার ক্রিকেট।

৪.

বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের কাছে গল্পের কোনো অভাব নেই।
নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, জ্যামাইকা কিংবা বাড়ির পাশের শ্রীলঙ্কা; সব ক্রিকেটারের কাছে সব দেশের হাসির গল্প আছে, কান্নার গল্প আছে। গল্প শুনতে বসলে দিন শেষ হয়ে যায়, রাতের ঘুম পালায়। কিন্তু একটা ব্যাপারে বাংলাদেশের কোনো ক্রিকেটারের কাছে কোনো গল্প নেই–২০০৩ বিশ্বকাপ।
বাংলাদেশের ক্রিকেটের অন্ধকার এক অধ্যায়।
শুধু ফলাফলের বিচার কখনো কোনো একটা টুর্নামেন্টের শেষ কথা হতে পারে না। হ্যাঁ, ফলাফলের হিসাবেও সেটা ছিল একটা জঘন্য টুর্নামেন্ট। কানাডা-কেনিয়ার মতো অপেশাদার দলের বিপক্ষে হেরেছিল টেস্ট খেলুড়ে বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে অপদস্থ হয়েছিল এক চামিন্ডা ভাসের বিপক্ষে।
কিন্তু এসব ব্যাপার নয়। ২০০৩ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল আক্ষরিক অর্থেই এক অন্ধকার জগতের সংস্পর্শে চলে গিয়েছিল। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের গঠিত তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী সেই পুরো ঘটনার দায়ে ও শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে নেতৃত্ব থেকে বিশ্বকাপের পরই সরিয়ে দেওয়া হয় খালেদ মাসুদ পাইলটকে। যদিও এই কমিশনের রিপোর্ট ও সুপারিশ কখনোই বিসিবি পুরো বাস্তবায়ন করেনি, যার রেশ বাংলাদেশের ক্রিকেট অনেককাল টেনেছে।
এই বই সেই অন্যায় ও উদ্দাম জীবনের বিষয়ে নয়।
তারপরও এটুকু অনুমান করা যায়, কিশোর বয়সেই একটা বিশ্বকাপ খেলতে গিয়ে সেটা স্বপ্নের অভিজ্ঞতার বদলে একটা দুঃস্বপ্ন হয়ে গিয়েছিল মাশরাফির জন্য। এ

ব্যাপারে যথারীতি তার মুখে কুলুপ সাঁটা থাকে। তবে দলের অন্যান্য সূত্র থেকে এটুকু জানা যায় যে, সেই বিশ্বকাপের আগে নামিবিয়ায় প্রস্তুতি সফর থেকে শুরু করে বিশ্বকাপ অবধি এক ঘোরের ভেতরে ছিলেন মাশরাফি।

এই নামিবিয়ায়ই যা যা হয়েছে, তা এখনো বাংলাদেশের ক্রিকেটের কালো এক পর্ব বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। বাংলাদেশ সেখানে স্বাগতিকদের বিপক্ষে তিনটি ম্যাচ খেলেছিল; কোনোক্রমে তিনটি ম্যাচেই জয় পেয়েছিল। মাশরাফির খুব বলার মতো কোনো পারফরম্যান্স ছিল না। ছিল শুধু আতঙ্ক আর অসহনীয় কিছু স্মৃতি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এসে বাংলাদেশের দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ ছিল কাওয়াজুলু-নাটালের বিপক্ষে। এই ম্যাচ দুটো কেবল মাশরাফি মনে রাখতে পারেন এক কারণে, আমলাদের বিপক্ষে প্রথম খেলা বলে। হ্যাঁ, পরবর্তীকালের মহাতারকা হাশিম আমলা ও তার বড় ভাই আহমেদ আমলা খেলেছিলেন এই দলের হয়ে। প্রথম ম্যাচে, প্রথম ওভারেই আহমেদ আমলাকে আউট করেছিলেন মাশরাফি। হাশিম দুই ম্যাচে ৪৮ ও ৭৬ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। বাংলাদেশ দুটিতেই হেরেছিল; মাশরাফি দুই ম্যাচে পেয়েছিলেন ২ উইকেট।

এমন দুঃস্বপ্নের বিশ্বকাপের শেষটা এমন নারকীয়ই হতে পারত কেবল।

সেই ২০০১ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডের পর এই বিশ্বকাপেই প্রথম ওয়ানডে খেলতে নামলেন মাশরাফি। মাসের হিসাবে সাড়ে ১৪ মাস পর আবার ৫০ ওভারের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নামলেন কানাডার বিপক্ষে। বল হাতে ৮ ওভারে ৩৮ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়েছিলেন। তবে এই ম্যাচটাও অবশ্যই বিশ্বকাপের মতোই ভুলে যেতে চাইবেন মাশরাফি। কারণ ব্যাটসম্যানদের নারকীয় ব্যর্থতায় কানাডার বিপক্ষে পরাজয় দিয়ে শুরু হয়েছিল বিশ্বকাপ।

বিশ্বকাপে নিজের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলেছিলেন মাশরাফি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পিটারমরিসবার্গে; ভালোবাসা দিবসে। ম্যাচে প্রথম ওভারে প্রথম তিন বলেই চামিন্ডা ভাসের হ্যাটট্রিক; ৫ বলে নেই ৪ উইকেট!

একজন খেলোয়াড়ের প্রতিটি ইনজুরি দুর্ভাগ্য, প্রতিটি ইনজুরি শোকের ব্যাপার। তবে শ্রীলঙ্কার ম্যাচের পর, বেনোনিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ম্যাচের আগের দিন যে ইনজুরিতে পড়েছিলেন মাশরাফি, তাতে অন্তত নিজেকে একদিক থেকে সৌভাগ্যবান মনে করতে পারেন তিনি। এই বীভৎস বিশ্বকাপের সাক্ষী আর হতে হয়নি তার।

অনুশীলনে বলের ওপর পা পড়ে মচকে গিয়েছিল গোড়ালি। খুব গুরুতর ইনজুরি নয়। তবে কয়েক সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে বলে এই তরুণ ফাস্ট বোলারকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বদলি হিসেবে উড়ে গিয়েছিলেন আকরাম খান।

৫.

কয়েকটা সপ্তাহ বিশ্রামের পরই আবার মাঠে নেমে পড়লেন মাশরাফি।

এর মধ্যে বিধ্বস্ত বাংলাদেশ দল ফিরে এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিশ্বকাপ শেষ করে। অধিনায়ক খালেদ মাসুদ, কোচ মহসিন কামাল চাকরি হারালেন।

নতুন অধিনায়ক হিসেবে দলের দায়িত্ব নিলেন খালেদ মাহমুদ। সেই মুহূর্তে নতুন একজন কোচ পাওয়া গেল না। দুদিন পরই দেশে চলে আসছে দক্ষিণ আফ্রিকা দল। প্রথমবারের মতো টেস্ট সিরিজ খেলতে এল পরাশক্তি দলটি। তারপরও বোর্ড একটা বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত নিল–যতক্ষণ মনের মতো কোচ না পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ তারা পূর্ণকালীন কোচ আর নিয়োগ দেবে না। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে কাজ চালানোর জন্য দায়িত্ব দেওয়া হলো দেশের প্রথম টেস্টের ভারপ্রাপ্ত কোচ, মাশরাফিদের উঠে আসার সময়টার শিক্ষক সারোয়ার ইমরানকে।

ইমরান স্যারের সঙ্গে মাশরাফির সম্পর্ক সেই অনূর্ধ্ব-১৭ বিকেএসপির ক্যাম্প থেকে। এতদিন পর ইনজুরি থেকে সেরে ওঠার এই সময়টায় আবার পুরোনো শিক্ষককে পাশে পেয়ে মাশরাফির যে দারুণ উপকার হয়েছিল, সেটা তিনি আজও বারবার স্বীকার করে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুটো টেস্টই খেলেছিলেন মাশরাফি। চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসেই দলের আরেকটা বিপর্যয় দেখতে হয়েছিল; ব্যাট হাতে ১৮ বলে চারটি চারে সাজানো ২০ রান করেছিলেন। জ্যাক রুডলফ ও বোটা ডিপেনারের দানবীয় দুই ইনিংসের কল্যাণে ইনিংস ব্যবধানে জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। একমাত্র যে ইনিংসে বল করেছিলেন, তাতে ১০৮ রান দিয়ে পেয়েছিলেন হার্শেল গিবসের উইকেট।

দ্বিতীয় টেস্টেও ইনিংসে হেরেছিল বাংলাদেশ। তবে মোহাম্মদ রফিকের দারুণ বোলিংয়ে (৬/৭৭) দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম ইনিংসে অলআউট হয়েছিল ৩৩০ রানে। মাশরাফির বোলিং বিশ্লেষণ ছিল ২০-৩-৫৩-১; প্রত্যাবর্তন টেস্ট সিরিজে খারাপ নয়। কিন্তু বাংলাদেশ পরপর দুটো ইনিংসে ১০২ ও ২১০ রানে অলআউট হয়ে এসব নিয়ে ভাবার সুযোগও নষ্ট করে দিয়েছিল।

৬.

এই সেদিনের কথা।

মাশরাফি আবার জাতীয় দলের অধিনায়ক হয়েছেন। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজের জন্য সমানে প্রস্তুতি নিচ্ছেন দল নিয়ে। চ্যালেঞ্জ বছরজুড়ে চলা ওয়ানডের দুর্বিষহ ধারাবাহিকতাটা বদলানো। নেটে খুব সিরিয়াস হয়ে বল করছিলেন; বাইরে তাকানোর সময় নেই। হঠাৎ একটা কণ্ঠ ভেসে এল কানে–পাগলা!

একটু আনমনা হয়ে গেলেন মাশরাফি। সেই কণ্ঠ!

ঝট করে ফিরে ইনডোর স্টেডিয়ামের গেটে তাকাতেই চোখে পড়ল সেই

চেহারাটা। পরনে একটা টি-শার্ট আর জিন্‌স। কাঁধে একটা ব্যাগ ঝোলানো। মুখে এতটুকু পরিবর্তন নেই। আগের মতোই সেই হাসি। মাশরাফি চিৎকার করে উঠলেন–ডেভ।

হ্যাঁ, ডেভ হোয়াটমোর।

মাশরাফি ও ডেভ হোয়াটমোরের সম্পর্ককে ঠিক কী বলে চিহ্নিত করা যায়, তা ভেবে বের করা কঠিন। কখনো মনে হয় বন্ধু, কখনো মনে হয় পরমাত্মীয়, কখনো মনে হয় গুরু-শিষ্য; আর মাশরাফি বলেন পিতা-পুত্রের সম্পর্ক।

এমন পথেঘাটে হঠাৎ হঠাৎ দেখা হয়ে যায় এখনো। এখনো রাতদুপুরে বেজে ওঠে মাশরাফির ফোন। ওপাশ থেকে শোনা যায় সেই 'পাগলা' সম্বোধন। এই সেই সম্পর্কের হাসি-কান্নার রেশ ঘুরে বেড়ায়। এ সম্পর্কটা শুরু হয়েছিল ২০০৩ সালে।

অবশেষে বাংলাদেশ এক পূর্ণকালীন কোচ নিয়োগ দিল। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম বাঁক ঘোরানো কোচ ডেভ হোয়াটমোর এলেন বাংলাদেশের দায়িত্ব নিয়ে। এককথায় ডেভের পরিচয় দেওয়াটা খুব কঠিন। বাবা-মা অস্ট্রেলিয়ান; সে সূত্রে তিনিও অস্ট্রেলিয়ান। তবে জন্ম ও বড় হয়ে ওঠা তার শ্রীলঙ্কায়।

এরপর আবার ক্রিকেট খেলেছেন অস্ট্রেলিয়ায়, তাদের হয়ে আন্তর্জাতিক ম্যাচও খেলেছেন। কিন্তু পরিচয়প্রাপ্তি আবার সেই শ্রীলঙ্কার হয়ে। ১৯৯৬ সালে অর্জুনা রানাতুঙ্গা, সনাৎ জয়াসুরিয়া, অরবিন্দ ডি সিলভাদের নিয়ে জিতেছিলেন বিশ্বকাপ। বাংলাদেশে আসার আগেই ক্যারিয়ারে একটা বিশ্বকাপ ছিল; তাই নিঃসন্দেহে তিনি হাই প্রোফাইল কোচ।

এমন কোচের ভয়ে সকলের জড়োসড়ো থাকার কথা। কিন্তু মাশরাফির বেলায় উল্টোটা হলো–প্রথম দিন থেকেই যেন ডেভ হোয়াটমোরের সঙ্গে দুষ্টুমি করার একটা নেশা পেয়ে বসল। ডেভের সঙ্গে টুকটাক রসিকতা করে। পাশাপাশি তার চোখে পড়ে রাসেল, রাজ্জাক, রানাদের সঙ্গে কেমন মারামারি করে ছেলেটা। কাউকে দেখলেই ল্যাং মারছে, পেটে একটা খোঁচা দিচ্ছে কিংবা লাফ দিয়ে কাঁধে উঠছে। সাংবাদিকদের সঙ্গেও এমন সব রসিকতা করতে বাধে না তার।

ডেভও দারুণ মজা পেয়ে গেলেন; আজকের যুগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এমন খ্যাপাটে চরিত্র থাকা সম্ভব!

বাকি ছিল ছেলেটার ক্রিকেট দেখা। নেটে একটা দিন দেখেই বুঝে ফেললেন এটা অনেক বড় রত্ন। খ্যাপাটে রত্ন বলেই তার বিশেষ যত্ন দরকার। ইনজুরির ইতিহাসটাও জেনে ফেললেন। বুঝতে পারলেন, এটা সাগর থেকে উঠে আসা একটা মুক্তো। বড় আদর করে রাখতে হবে।

প্রকাশ্যেই তাই বললেন–এটার নাম আজ থেকে পাগলা; ওর জন্য সাতখুন মাফ।

মজাটা হলো, মাশরাফি কখনো এই বিশাল ঘোষণার সুযোগ নেননি। যদিও হোয়াটমোরের বিদায়ের পর একটা স্লোগান তোলার চেষ্টা হয়েছিল যে, তার

জমানায় মাশরাফি বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকতেন। কিন্তু দল ঘনিষ্ঠরা সাক্ষ্য দিলেন–ব্যাপারটা একটু জটিল; ডেভের তরফে সুবিধার লাইসেন্স ছিল, মাশরাফি সে লাইসেন্সের ব্যবহার করে গুলি করতেন না।

৭.

বাংলাদেশের হয়ে ডেভের প্রথম মিশন ছিল পিতৃভূমি অস্ট্রেলিয়ায়।

মাশরাফির সেটা ছিল তাসমানিয়ান এলাকায় দ্বিতীয় সফর। প্রথম সফর তো জীবনেও না ভোলার মতো এক দুঃস্বপ্ন তৈরি করা নিউজিল্যান্ড সফর। তবে তাসমানিয়ান সাগরকূলে এবারের সফরটা কোনো বিরূপ অভিজ্ঞতা অন্তত দিল না।

এই সফরে বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া পৌঁছানোর আগে খুব 'গেল, গেল' রব উঠেছিল। অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশকে নিয়ে ছেলেখেলা করবে, এমন একটা ধারণা স্বাভাবিকভাবেই ছিল। কিছুদিন পরই পানশালায় হাতাহাতি করে প্রাণ হারানো ডেভিড হুকস একটা তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন–বাংলাদেশকে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এক দিনে হারিয়ে দেওয়া সম্ভব।

তখনকার বাংলাদেশের পক্ষে এর সমুচিত জবাব দিয়ে ম্যাচ তো বের করে আনা সম্ভব ছিল না। স্কোরকার্ড বলছে, যথারীতি অসম্মানজনকভাবে সেই ইনিংস পরাজয় দিয়েই শুরু হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া সফর। তবে মাশরাফি কিছুটা হলেও চেনাতে পেরেছিলেন নিজেকে।

ডারউইনে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ম্যাকগ্রা, গিলেস্পি, ব্রেট লি ও ম্যাকগিলের তোপে প্রথম ইনিংসে মাত্র ৯৭ রানে অলআউট বাংলাদেশ। জবাবে অস্ট্রেলিয়া ড্যারেন লেম্যান, স্টিভ ওয়াহর সেঞ্চুরি এবং জাস্টিন ল্যাঙ্গারের ৭১ রানে ভর করে ৪০৭ রান করল ৭ উইকেটে।

স্কোরকার্ড সেভাবে সাক্ষ্য না দিলেও মাশরাফি আগুন ঝরানো বোলিং করেছিলেন পেসসহায়ক উইকেট পেয়ে। ২৩ ওভার বল করে ৭৪ রান খরচ করেছিলেন; এর মধ্যে ৭টি মেডেন ছিল। ম্যাথু হেইডেনকে পরিষ্কার বোল্ড করে বাংলাদেশকে ভালো শুরুও এনে দিয়েছিলেন। এরপর লেহম্যান ও মার্টিন লাভের উইকেটও নেন।

জবাবে আবারও ১৭৮ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। ওয়ার্নের অনুপস্থিতিতে ম্যাকগিল আরও একবার ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন।

বাংলাদেশ বলা চলে নিজেদের কিছুটা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করে দ্বিতীয় টেস্টে। কেয়ার্নসে সর্বকালের অন্যতম সেরা এই বোলিংয়ের বিপক্ষে হান্নান সরকারের ৭৬ ও হাবিবুল, সানোয়ার, পাইলটের তিনটি চল্লিশোর্ধ্ব ইনিংসে ভর করে প্রথম ইনিংসে ২৯৫ রান করেছিল বাংলাদেশ; সেকালে এটা বড় অর্জন ছিল।

জবাবে লেম্যান, স্টিভ ওয়াহ ও লাভের সেঞ্চুরিতে ৪ উইকেটে ৫৫৬ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করে অস্ট্রেলিয়া। মাশরাফি ২৫ ওভার বল করে ৬০ রান খরচ

করেন, মেডেন নেন ৭টি। উইকেট সে ইনিংসে একটিই পেয়েছিলেন–মাত্র ১ রানে ইনিংসের সপ্তম ওভারের শেষ বলে ফিরিয়েছিলেন ল্যাঙ্গারকে।

হান্নান সরকারের জোড়া ফিফটির পরও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬৩ রানে অলআউট হয়েছিল বাংলাদেশ। ম্যাকগিল দুই ইনিংসেই ৫টি করে উইকেট নিয়েছিলেন!

কেয়ার্নসেই ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচ খেলেছিল বাংলাদেশ। ক্যারিয়ারের বয়স তিন বছর হয়ে গেলেও মাত্র ষষ্ঠ ওয়ানডে খেলতে নেমেছিলেন মাশরাফি। আগে ব্যাট করে ১৯ রানে ৪ উইকেট হারানো বাংলাদেশ ১০৫ রানে অলআউট হয়েছিল। ২২.৩ ওভারে মাত্র ২ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অস্ট্রেলিয়া। মাশরাফি গিলক্রিস্টকে ফিরিয়েছিলেন ১৮ রানে।

ডারউইনে তৃতীয় ওয়ানডেতে ১১২ রানে হেরেছিল বাংলাদেশ। মাশরাফি ১০ ওভারে ২ মেডেন নিয়েছিলেন, ব্যয় ছিল ৪১ রান; পেয়েছিলেন ইয়ার্ন হার্ভে ও বেভানের উইকেট।

৮.

বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত টেস্ট ইতিহাসে তখন পর্যন্ত নিশ্চিত করে সেরা সফর ছিল ২০০৩ সালের পাকিস্তান সফর। আকারের দিক থেকে প্রথম তিন টেস্টের সিরিজ। আর পারফরম্যান্সের দিক থেকে তিনটি অত্যন্ত লড়াকু টেস্ট।

ডেভ হোয়াটমোর শুরু থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন–মাশরাফিকে অন্তত শুরুর বেশ কিছুকাল 'রেশনিং' পদ্ধতিতে ক্রিকেট খেলাবেন। যেহেতু তার প্রধান সমস্যা হয়েছে অতিরিক্ত ক্রিকেট খেলা থেকে। ফলে তাকে একটু বিরতি দিয়ে দিয়ে খেলানোটাই সমাধান বলে মনে করেছিলেন তিনি। মনে করাটা অন্যায্য ছিল না।

সেই রেশনিং পদ্ধতির কারণেই পাকিস্তান সফরের আগেই তিনি মাশরাফিকে জানিয়ে দিলেন, দুটি টেস্ট খেলাবেন তিনটির ভেতর। এই সিদ্ধান্তের কারণে পরে হোয়াটমোরের নিজের হাত কামড়াতে হয়েছে শতবার। কিন্তু সিদ্ধান্তে শক্ত ছিলেন।

পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট খেলেছিল করাচিতে।

হাবিবুল বাশারের ৭১ রানে ভর করে ২৮৮ রান তুলেছিল বাংলাদেশ। জবাবে অভিষিক্ত ইয়াসির হামিদের ১৭০ রানে ভর করে ৩৪৬ রান করেছিল পাকিস্তান। মাশরাফি ৬৮ রানে নিয়েছিলেন ৩ উইকেট।

উইজডেন ক্রিকইনফো সেদিনের রিপোর্টে লিখেছিল :

বাংলাদেশের কোনো বোলার সেভাবে হুমকি হয়ে উঠতে পারেনি। ব্যতিক্রম ছিল সকালের সেশনে মাশরাফি মুর্তজা ও তাপস বৈশ্যর দুটি স্পেল। মুর্তজার পেস ও বাউন্স নড়বড়ে করে দিয়েছিল মোহাম্মদ হাফিজকে। তিনি বাধ্য হয়েছিলেন পুল করতে গিয়ে গালিতে জাভেদ ওমরের হাতে ক্যাচ দিতে। [২]

মাশরাফি এরপর ইয়াসির ও সাব্বিরের উইকেট দুটোও তুলে নেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে হাবিবুল বাশারের সেঞ্চুরিতে ভর করে ২৭৪ রান তুলেছিল

বাংলাদেশ। ফলে পাকিস্তানের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় ২১৭ রান। দুর্ভাগ্যজনকভাবে মাশরাফির একটি উইকেটবিহীন ইনিংস কাটল এবং তেমন দাঁত বসাতে পারল না বাংলাদেশ।

দ্বিতীয় টেস্ট ছিল বাংলাদেশের জন্য আরও এক ধাপ এগোনোর টেস্ট। পেশোয়ারে জাভেদ ওমরের সেঞ্চুরি এবং রানমেশিন হাবিবুল বাশারের ৯৭ রান ও আশরাফুলের ৭৭ রানে ভর করে প্রথম ইনিংসে ৩৬১ রান তুলেছিল বাংলাদেশ। মাশরাফি এই ইনিংসেও উইকেট পাননি। কিন্তু রফিকের আরেকটি বীরত্বপূর্ণ পারফরম্যান্স ও পার্টটাইম বোলার অলক কাপালির বাংলাদেশের হয়ে প্রথম হ্যাটট্রিকম্যান হয়ে ওঠার সুবাদে ২৯৫ রানে অলআউট হয় পাকিস্তান। ফলে প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশ ৬৬ রানের লিড পায়।

কিন্তু মুশকিল হলো সেই অভিষেক টেস্টের ভূত ফিরে এল আবার। ফলে দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৬ রানে অলআউট বাংলাদেশ।

এরপরই এল সেই মুলতান টেস্ট। উইজডেন লিখেছিল—মোর দ্যান আ ডেড রাবার। এক উত্তেজনা ও রোমাঞ্চের পসরা, বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম সেরা টেস্ট।

কিন্তু হোয়াটমোর আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন পরপর দুই টেস্ট খেলে ফেলা মাশরাফিকে এই তৃতীয় টেস্ট খেলানো হবে না। ফলে মাশরাফি রইলেন নিষ্ক্রিয় দর্শক। মাঝে মাঝে দ্বাদশ ব্যক্তি হিসেবে মাঠে নেমে দেখলেন এই মহাকাব্য।

অবশ্য শুধু বসে দেখলেন বললে ভুল হবে। কারণ মুলতান মহাকাব্যে মাশরাফিরও কিছু ছোঁয়া তো ছিলই। বদলি ফিল্ডার হিসেবে চিতার মতো ফিল্ডিং করেছিলেন, ৩টি ক্যাচ নিয়েছিলেন।

রফিকের সেই 'ম্যানক্যাডিং' না করা, সেই ইনজামামের মহানায়ক হয়ে ওঠা, সেই রফিক-সুজনের দুরন্ত বোলিং এবং সেই ১ উইকেটের পরাজয়। আজও চোখ বুজলে প্রতিটা দৃশ্য দেখতে পান। আজও বুকের মধ্যে হু হু করে ওঠে। আজও মাশরাফির জীবনের সবচেয়ে বড় আফসোস মুলতান টেস্টের পরাজয় এবং মুলতান টেস্টে না খেলা।

[১] নতুন অ্যাকশনে নতুন মাশরাফি; প্রথম আলো (২০ ডিসেম্বর, ২০০২)

[২] Yasir Hameed's hundred on debut puts Pakistan on top (২১ আগস্ট, ২০০৩; উইজডেন রিপোর্ট)

আবার নির্বাসন



১.

ভরা পূর্ণিমার আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারপাশ।

ঘোরলাগা চোখে নদীর জলের দিকে চাইলে মনে হচ্ছে হাজার হাজার টন গলানো রুপা বয়ে চলেছে দক্ষিণের সাগরপানে। দুষ্টু ছেলের দলকে পর্যন্ত নীরব করে ফেলেছে প্রকৃতির এই ভয়ংকর সৌন্দর্য।

চুপ করে বসে নদীর গান আর বনের ডাক শুনছে ছেলেগুলো।

সময়টা আরও ভয়ানক করে তুলেছে রবির কণ্ঠের গান। উদার গলায় গাইতে গাইতে নিজেই যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। হঠাৎ করে রবির মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল। গান থামিয়ে বলল, 'চল সবাই মিলে সাঁতার কাটি।'

কিছু না ভেবেই কথাটা বলেছিল রবি। এই কথায় কার কী বেদনা, সে মনে করতে পারেনি।

অন্য কোনো একটা দিন হলে এমন প্রস্তাবে সবাই হই হই করে উঠত। কিন্তু প্রস্তাবটা করেই রবি বুঝতে পারল, ভুল হয়ে গেছে। এক লহমায় সবাই আরও

চুপ করে গেল। নদীর শব্দ যেন এক যন্ত্রণার মতো মনে হচ্ছে। সাজু মারতে উঠল রবিকে, 'তোর কি আক্কেলবুদ্ধি নেই!'

কথা ঘোরানোর চেষ্টা করল সবাই। কিন্তু যার জন্য এত কিছু সে ম্লান হেসে বলে, 'যা, তোরা সাঁতার কাট। আমি দেখি। আমি আবার কবে সাঁতরাতে পারব, কে জানে!'

হ্যাঁ, আবার সেই ইনজুরি; আবার নড়াইল-নির্বাসনে মাশরাফি।

মাশরাফি প্রায়ই বলেন, ভালো সময়টাকে খুব ভয় পান। ক্যারিয়ারের সেরা প্রতিটা সময়েই বড় বড় ইনজুরির ধাক্কাগুলো এসেছে। ক্যারিয়ারের শুরুতে আগুন ঝরাচ্ছিলেন; ইনজুরি এক বছরের জন্য ছিটকে দিয়েছে। ২০০৩ সালে নিজের হিসাবেই সবচেয়ে সেরা ফর্মে থাকা দুটো সময়কালের একটা ছিল; আবারও ইনজুরি। ২০০৮-০৯ সালের ভয়ংকর ফর্মের পুরস্কারও ছিল একই।

২০০৩ সালের এই ইনজুরি সম্পর্কে মাশরাফি বলেন, স্কোরকার্ডে তার এই সময়ের সেরা ফর্মটা বোঝা যায় না। কিন্তু ইনজুরিতে পড়ার ঠিক আগের দুটো টেস্টের দিকে তাকালেই বুঝতেও বাকি থাকে না।

২.

শুরুটা করা উচিত পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ দিয়ে।

মুলতান টেস্ট না খেললেও এরপর টানা পাঁচটি ওয়ানডে খেলেছেন মাশরাফি পাকিস্তানের বিপক্ষে। স্কোরকার্ড আসলেই বলছে, বলার মতো কোনো পারফরম্যান্স এই পাঁচ ওয়ানডেতে ছিল না মাশরাফির। বাংলাদেশও পাঁচটি ওয়ানডেতেই হেরেছিল। শেষ ম্যাচে ছাড়া প্রতিরোধই গড়তে পারেনি তারা।

মুলতানে প্রথম ওয়ানডেতে সেই ইয়াসির হামিদের সেঞ্চুরিতেই ৩২৩ রানের বিশাল পুঁজি করেছিল পাকিস্তান। মাশরাফি ৯ ওভারে ৬৩ রান দিয়েও উইকেট পাননি। বাংলাদেশ হেরেছিল ১৩৭ রানে। ফয়সালাবাদে সেঞ্চুরি করেছিলেন মোহাম্মদ ইউসুফ (তখনকার ইউসুফ ইয়োহানা); বাংলাদেশ হেরেছিল ৭৪ রানে। মাশরাফি ৮ ওভারে ৪১ রান দিয়ে ওই ইয়োহানার উইকেটই কেবল নিতে পেরেছিলেন।

লাহোরে উইকেটশূন্য ও রাওয়ালপিন্ডিতে ১ উইকেট নিয়েছিলেন মাশরাফি। মানে ৪ ওয়ানডেতে দুটি মাত্র উইকেট। সবশেষে করাচিতে এসে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো বদলি বোলার হিসেবে বল করলেন। ৯ ওভারে ৬৩ রান খরচ করে ফেলেছিলেন। তবে ইউসুফ ও ইউনুসের দুটো উইকেট নিয়েছিলেন।

পরিসংখ্যান বলছে–পাকিস্তানের বিপক্ষে ৫ ম্যাচ সিরিজে মাশরাফির সংগ্রহ ছিল ৪ উইকেট। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা সাক্ষ্য দিচ্ছেন, অসাধারণ না হলেও এতটা বিস্মরণযোগ্য বোলিং মাশরাফি করেননি। বিশেষ করে রাওয়ালপিন্ডিতে তিনি বেশ

সমীহ-জাগানিয়া বোলিং করেছিলেন বলে সাক্ষ্যও পাওয়া গেল।

৩.

পরদিন বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে শুরু হবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট।

ক্রিকেটের জনক বলে কথিত দলটির বিপক্ষে বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট লড়াই। এই সময়ে তো বাংলাদেশের সবই 'প্রথম অভিজ্ঞতা'। তারপরও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট বলে ইংলিশ মিডিয়া, তথা ক্রিকেট-বিশ্বের চোখ একটু বেশি নিবদ্ধ বাংলাদেশের ওপর। সেটা বাংলাদেশের খেলোয়াড়েরাও টের পাচ্ছেন।

রাতে খাবার টেবিলে কথায় কথায় অধিনায়ক খালেদ মাহমুদ সুজনকে জিজ্ঞেস করলেন মাশরাফি, 'চাচা, এদের বিপক্ষে ভালো করতে পারব না?'

'পারব না কেন? দেখ, আমাদের দলে তো ওদের মতো বিশাল কোনো তারকা নেই। সবাই মিলে পারফরম করতে হবে। তুই পারবি না ফাটাতে?'

মাশরাফি মুখে খাবার নিয়েই চোখ বড় বড় করে 'হ্যাঁ' জানিয়েছিল।

ঢাকা টেস্টে টসে জিতে আগে ব্যাট করতে নেমেছিল বাংলাদেশ। শুরুটা ভালো হলো না। শেষ দিকে মুশফিকুর রহমান, খালেদ মাসুদদের প্রতিরোধে ২০৩ রান করতে পেরেছিল বাংলাদেশ। জবাবে ইংল্যান্ড বিখ্যাত ব্যাটিং লাইনআপ নিয়েও লিড নিতে পারল মাত্র ৯২ রানের। কৃতিত্ব অবশ্যই মাশরাফির 'ফাটিয়ে দেওয়া' বোলিংয়ের। স্কোরকার্ড এবার আর অন্যায় করেনি। সে জানাচ্ছে, ২৩ ওভার বোলিং করে ৪১ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছিল মাশরাফি।

বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংসটা সে তুলনায় বেশ একটু ভালো হলো। হান্নান সরকার ও হাবিবুল বাশারের ফিফটির কল্যাণে অলআউট হওয়ার আগে ২৫৫ রান করতে পারল বাংলাদেশ। মাশরাফি অবশ্য দ্বিতীয় ইনিংসে দুরন্ত বোলিং করেও মিস ফিল্ডিং, ক্যাচ মিসের শিকার হলেন; পেলেন মাত্র ৪৬ রানে ১ উইকেট। ইংল্যান্ড মাত্র ৩ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে গেল।

অবশেষে এল চট্টগ্রাম টেস্ট।

অবশ্যই মাশরাফির ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা টেস্ট। প্রথম ইনিংসেই এখন পর্যন্ত ক্যারিয়ার-সেরা বোলিং করে ফেললেন এদিন। ২৮ ওভার বল করে ১১টিই নিলেন মেডেন। বাকি ওভারগুলোতে খরচ ৬০ রান। আর তুলে নিলেন মাইকেল ভন, নাসের হুসেন, গ্রাহাম থর্প ও রিকি কার্কের উইকেট।

মাশরাফির বোলিং সম্পর্কে উচ্চকণ্ঠ ছিল সেদিন বিশ্ব-মিডিয়া। উইজডেনের টেস্ট বুলেটিনে অ্যান্ড্রু মিলার লিখেছিলেন :

ইংল্যান্ডের মহাপতনের কারিগর ছিলেন বাংলাদেশের দুর্দান্ত, আকর্ষণীয় পেস বোলার মাশরাফি বিন মুর্তজা। বাকিদের সংগতের অভাব বা যেকোনোভাবেই ইংল্যান্ড করে ফেলল ৩২৬ রান। জবাব দিতে নেমে মাত্র ১৫২ রানে অলআউট

বাংলাদেশ। চোখধাঁধানো রানআপ এবং অভিজাত ও ঈষৎ স্লিংগিং অ্যাকশনে সে অসাধারণ গতি, আক্রমণাত্মক মানসিকতা আর অসামান্য নিখুঁত বোলিং করতে পারে। সে দেখিয়েছে পুরোনো বলে কী চমৎকার উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা আছে তার। [১]

ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের ঘটনা। নিজের চতুর্থ ওভারের বল করছিলেন মাশরাফি। মার্ক বুচার আলতো ড্রাইভ করেছিলেন। এক রান হলেও হতে পারত; না-ও হতে পারত। মাশরাফি এক রানও দিতে রাজি নন। ফলো থ্রু থেকে ছিটকে গিয়ে বল ঠেকাতে গেলেন। বল ঠেকে গেল, কিন্তু পড়ে গেলেন মাশরাফি।

আবার সেই ভয়াবহ কট করে শব্দ; 'মা' বলে চিৎকার।

৪.

ঘটনাটা ঘটল লাঞ্চের একটু পর। দ্বিতীয় ইনিংসে চতুর্থ ওভারের বল করছিলেন মাশরাফি।

ফলো থ্রুতে পড়ে গেলেন মাশরাফি। সেই পতনটা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, আরেকবার বল করা তো দূরে থাক, উঠে দাঁড়াতেও পারলেন না মাশরাফি। ধরাধরি করে মাঠ থেকে বের করে নিয়ে আসা হলো তাকে। ওপরে প্রেসবক্স থেকে দৃশ্যটা দেখেই ছুটে নামছিলেন সাংবাদিকেরা। নিচে নামতে নামতে দেখলেন চট্টগ্রামের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে।

চট্টগ্রামে আবার সে সময় বিশেষজ্ঞ কোনো হাঁটুর চিকিৎসক ছিলেন না। ফলে সঠিক মতামত পাওয়া গেল না। স্থানীয় চিকিৎসকেরা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সম্ভাবনার কথা জানালেন–বার্সইটিস হতে পারে; সে ক্ষেত্রে শুধু তিন সপ্তাহের বিশ্রামে ঠিক হয়ে যাবে। মিনিস্কালটিয়ার হতে পারে; সে ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার ও এক মাসের বিশ্রাম। আর হতে পারে লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়া; তেমন হলে অস্ত্রোপচারের পর ছয় মাসের বিশ্রাম।

কে জানত, মাশরাফির জন্য সবচেয়ে খারাপটাই অপেক্ষা করে ছিল।

সে ম্যাচ কাভার করা মোস্তফা মামুন চট্টগ্রাম থেকে লিখেছিলেন :

কাল লিখেছিলাম পূর্ণতার পথে নড়াইল এক্সপ্রেস। ভুল। সাহস, সামর্থ্য, সক্ষমতার সঙ্গে ঝুঁকিও যে এক্সপ্রেসের সহযাত্রী! মাঝেমধ্যে সেই সহযাত্রীরও ইচ্ছে হয় কিছু একটা করার। করে। তখনই নড়াইল এক্সপ্রেস হোঁচট খায়। কালও যেমন খেলো।...

...তিনি যে গ্রিক ট্র্যাজেডির নায়ক। নিজের মধ্যেই বহন করেন ধ্বংসের বীজ। ফাস্ট বোলারের শরীরটাই তাদের সবচেয়ে বড় সম্পত্তি, এর রক্ষণাবেক্ষণে নিজেকেই সবচেয়ে মনোযোগী পাহারাদার হতে হয়। মাশরাফি এখানে আবার খেয়ালি রাজকুমারের মতো উদাস। ইনজুরি তার সঙ্গে চিরস্থায়ী শত্রুতার সিদ্ধান্ত

নিয়ে রেখেছে, ভাগ্যের চিরবৈরিতাও তার প্রতি, সে জন্যই আর দশজনের চেয়ে বেশি সতর্কতাই স্বাভাবিক। ...শিল্পী বাঁচলে শিল্প, আর শিল্পের স্বার্থেই তাই শিল্পীকে একটু স্বার্থপরও হতে হয়। মাশরাফি নিজের ভেতরের বিষে কাবু হলেন আরেকবার। নায়ক কখন ট্র্যাজেডির নায়ক হয়ে গেলেন তার জলজ্যান্ত উদাহরণ। না! নড়াইল এক্সপ্রেস সম্প্রতিই পূর্ণতার গন্তব্যে পৌছাচ্ছেন না। ভাগ্য বিরোধিতা করে, কিন্তু ভাগ্যকে শুধু দোষ দিয়ে লাভ নেই। বিরূপ ভাগ্যকে কাবু করাও তো বীরের দায়িত্ব। বীরত্বের সম্পূর্ণতার দাবি।

তা যে না পারে সে বীর নয়। ট্র্যাজেডির নায়ক।

আর ট্র্যাজেডির নায়কদের সম্বল তো কান্নাই। নিজের জন্য, সবার জন্যও। [২]

ঢাকায় ফেরার পর আবার এমআরআই করে প্রথম অবশ্য মনে হয়েছিল, দুই সপ্তাহ বিশ্রাম নিলেই সুস্থ হয়ে উঠবেন মাশরাফি। বিসিবি জানিয়েছিল, চিকিৎসকেরা লিগামেন্ট ছেঁড়া পাননি। কিন্তু কালক্রমে সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো।

দুই সপ্তাহ, তিন সপ্তাহ কেটে গেলেও কোনো উন্নতি না হওয়ায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হলো, মাশরাফিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে পাঠানো হবে। তবে এবার আর ভারত নয়; এবার অস্ট্রেলিয়া যাবেন মাশরাফি।

৫.

মেলবোর্ন শহরটা আগে দেখা হয়নি।

কয়েক মাস আগেই অস্ট্রেলিয়ায় ঘুরে গেছে মাশরাফি কয়েক মাসের সফরে। দুটো টেস্ট খেলেছে, তিন ওয়ানডের মধ্যেও দুটো খেলেছে। কিন্তু সব খেলাই হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার প্রাণকেন্দ্র থেকে বহুদূরে–ডারউইন আর কেয়ার্নসে।

মেলবোর্ন শহরটা দেখা হয়নি। এই শহরে কত আকর্ষণ। কিন্তু দেখা হয়নি কিছুই। এবার বাবার হাত ধরে সেই মেলবোর্নে এসেছে। বেশ কয়েক দিন এখানেই থাকতে হবে। কিন্তু মেলবোর্ন শহরটা ঘুরে দেখা হবে না।

মাশরাফি বেড়াতে আসেনি; অপারেশন করাতে এসেছে।

অপারেশন করাতে এসেই মাশরাফির সাথে পরিচয় হয়ে গেল পরবর্তীকালে তার মেলবোর্ন অভিভাবক, বড় ভাই হয়ে ওঠা আব্দুল একরাম বাবুর সাথে।

এই একরাম বাবু বা বাবু ভাই সম্পর্কে আগে একটু বলে নেওয়া দরকার।

বাংলাদেশের ক্রিকেটের সাথে বাবুর যোগসূত্র শুরু সানোয়ার হোসেনকে দিয়ে। জাতীয় দলের সাবেক এই তারকা ক্রিকেটার ও বাবু একসাথে পড়তেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। সানোয়ারের সাথে আড্ডা দিতে দিতে পরিচয় হাবিবুল বাশারের সাথে। একটা পর্যায়ে এমন হলো যে, ক্রিকেটের বাইরে সানোয়ার ও হাবিবুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলতে এই বাবুই।

কালক্রমে বাবু অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী হয়ে গেলেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিলেন।

সেই বাবু একদিন ফোন পেলেন সানোয়ারের কাছ থেকে, 'আমাদের একটা ফাস্ট বোলারের ইনজুরি হয়েছে। তাকে বোর্ড মেডিকেল খরচটা দেবে। তুই থাকা-খাওয়ার দায়িত্ব নিলে মেলবোর্নে অপারেশন করানো যায়।'
বাবু একবাক্যে রাজি।
এই ফাস্ট বোলার ছিলেন মোহাম্মদ শরীফ। শরীফের অপারেশন হলো ডেভিড ইয়াং নামে এক প্রখ্যাত অ্যাথলেট-সার্জনের হাতে। সেরেও উঠলেন ভালো। শরীফের দেশে ফিরতে আর সপ্তাহ খানেক বাকি। তখনই আবার দেশ থেকে ফোন, 'আরেকটা ফাস্ট বোলার যাচ্ছে। দেখিস।'
এবার এলেন সেই মাশরাফি।
মাশরাফির জন্য ব্যাপারটা একদিক থেকে একটু স্বস্তির ছিল। ছোটবেলার বন্ধু শরীফ বাবু ভাইয়ের বাসাতেই থাকায় শুরুর ধাক্কাটা সামলে নেওয়া গেল। তারপরও নার্ভাসনেস কাটে না।
সেই নার্ভাস সময়টার কথা মনে করে হাসেন বাবু, 'দুনিয়া তো ওকে দারুণ সাহসী হিসেবে জানে। ভেতরে ভেতরে কিন্তু খুব নরম একটা ছেলে। ওই বয়সী ছেলে যেকোনো অপারেশনের আগে একটু ভয় পাওয়ারই কথা। ও মনে হয় বেশ ভয় পাচ্ছিল।'
ভয় কাটাতেই কাজবাজ বন্ধ করে বাবু মাশরাফির পাশে রইলেন। অপারেশন টেবিল থেকে ক্রাচ, সব জায়গাতেই বাবু আছেন।
সেই থেকে ব্যাপারটা যেন নিয়মেই পরিণত হয়ে গেছে। শরীফ, হাবিবুল, তামিমরা অনেকেই বাবুর বাসায় থেকেছেন, অপারেশন করিয়েছেন। এক মাশরাফিই গেছেন পাঁচবার। এখন মাশরাফি আর বাবুর মুখস্থ হয়ে গেছে, কী করতে হবে। মাশরাফি প্রায়ই বলেন, 'বিদেশ বিভুঁইয়ে বাবু ভাই না থাকলে আজ হয়তো আমার এতগুলো অপারেশন করানোই হতো না। অপারেশনের পর একা উঠে দাঁড়াতে পারতাম না। ডাক্তার বলত, সাইকিং করতে হবে। বাবু ভাই নিজে ম্যাসাজ করে পায়ে শক্তি ফেরাত। আমাকে ধরে রাখত সাইকেল চালানোর সময়। একটা মুহূর্ত ছাড়েনি।'
এসব শুনে লজ্জা পান বাবু। বলেন, 'না, না।'
তবে স্বীকার করেন যে, মাশরাফিকে আর ক্রিকেটার হিসেবে ভাবেন না। নিজেই নিজেকে বলেন, তার এখন দুটি নয়, তিনটি ভাই; তৃতীয়টি মাশরাফি। একটু আর্দ্র কণ্ঠে বলছিলেন, 'মাশরাফি কেমন পাগল একটা ছেলে, না? আমার এখানে আসার কয়েক মিনিট পরই মনে হলো, ওকে আমি কত বছর ধরে চিনি। ক্রিকেটার বা তারকা হিসেবে নয়, ওকে আমি আর আমার স্ত্রী ছোট ভাই হিসেবে দেখি। খুব মায়া টানতে পারে ছেলেটা। দেখেন না, সারা দেশের মানুষ কেমন ওর মায়ায় আটকা পড়ে গেছে।'

৬.

ভদ্রলোকের খাড়া নাক দেখে সিনেমায় দেখা ভিলেন বলে মনে হয়।

আর দশটা অস্ট্রেলিয়ানের মতো মুখের মধ্যে কথা চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করে; ফলে ইংরেজিটাও পরিষ্কার বোঝা যায় না। তবে মুখের আন্তরিক ভঙ্গি দেখে বুঝতে বাকি থাকে না, বড় দরদ নিয়ে অ্যাথলেটদের পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত তিনি।

হ্যাঁ, ডেভিড ইয়াং।

দুনিয়াজুড়েই অ্যাথলেটদের হাঁটু অপারেশনের জন্য বিখ্যাত মানুষ। ব্যক্তিগত জীবনে চ্যারিটি চিকিৎসার জন্য খুবই সুনাম আছে তার। শ্রীলঙ্কায় দুস্থ মানুষদের চিকিৎসার জন্য নিজের অর্থ ব্যয়ে গড়ে তুলেছেন বিশাল ব্যবস্থাপনা। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের বন্ধুতে পরিণত হয়েছেন। এক মাশরাফির অপারেশন করেই বাংলাদেশের ক্রিকেটের আপন হয়ে গেছেন।

এর বাইরে তামিম ইকবাল, শাহাদাত হোসেনরাও নাম লিখিয়েছেন ডেভিড ইয়াংয়ের রোগীর তালিকায়। তবে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের তার সেই শুরু।

মাশরাফিকে অনেকটা সময় নিয়ে দেখলেন। শুরু থেকে তার ইনজুরির গল্পগুলো শুনলেন। এবার মাশরাফি এসেছেন ডান পায়ের হাঁটুর সমস্যা নিয়ে। সেটাতে যে লিগামেন্ট ছিঁড়েছে এবং অপারেশন লাগবে, এটা দেশ থেকেই জেনে এসেছেন মাশরাফি।

কিন্তু তাকে দেখতে গিয়ে ডা. ইয়াং বললেন, 'তোমার বাঁ হাঁটুটাও একটু দেখা দরকার। একবারে এটারও একটা এমআরআই করে ফেলতে হবে।'

এল এমআরআই রিপোর্ট। দুটো রিপোর্ট হাতে নিয়ে বসে আছেন ডক্টর ইয়াং। সামনে বাবু, গোলাম মুর্তজা ও মাশরাফি। আস্তে আস্তে রিপোর্ট দুটো নামিয়ে রেখে ডক্টর ইয়াং বললে, 'বন্ধু, তোমার বাঁ হাঁটুটাও যে খুলতে হবে।'

'মানে!'

'মানে হলো, ডান পায়ের চেয়ে ওটার অবস্থা খারাপ।'

'ওটাতে তো অপারেশন করা হয়েছে।'

'দেখো, আমি কোনো চিকিৎসকের নিন্দা করছি না। তবে ওই অপারেশনটা সঠিক হয়নি। যে কারণে তোমার এই সুস্থ হাঁটুটাও গেল। আসলে ওই ভুলটার প্রভাব তোমাকে সারা জীবন টেনে নিয়ে বেড়াতে হবে। ওটার অপারেশন ঠিকমতো না হওয়াতে এই ডান হাঁটুতে ভয়ানক বাড়তি চাপ পড়েছে।'

মাশরাফির বাবার কণ্ঠে তখন বিশ্বের সব উৎকণ্ঠা, 'এখন কী করতে হবে?'

'দুটো হাঁটুতেই দুটো অপারেশন করতে হবে।'

৭

মেলবোর্ন থেকে দুবাই হয়ে ঢাকা।

বিমান ডানা মেলেছে শূন্যে। মাশরাফির চোখ এই শূন্যের চেয়েও দূরে কোথাও। আস্তে আস্তে করে বাবাকে বলল, 'বাবা, আবার সেই ক্রাচে ঘুরতে হবে।'

'হোক। তুমি তো পানিতে পড়োনি। বাড়িতে থাকবা।'

মাশরাফি জানেন, তিনি বাড়িতে থাকবেন। কিন্তু আবার কত দিন।

এবার গুনে গুনে ১৪ মাসের নির্বাসনে চললেন মাশরাফি।

[১] England find life hard to digest; অ্যান্ড্রু মিলার (উইজডেন; ৩০ অক্টোবর, ২০০৩)

[২] আবারও দুঃস্বপ্নের রাজ্যে মাশরাফি; মোস্তফা মামুন (প্রথম আলো; ২ নভেম্বর, ২০০৩)

উত্থানপর্ব



১.

২০০৪ ও ২০০৫ সালকে বলা যায় বাংলাদেশের ক্রিকেটেরই মোড় ঘুরতে থাকা এক সময়।

এই সময়ে ডেভ হোয়াটমোরের সঙ্গে অধিনায়ক হিসেবে জুটি বাঁধেন হাবিবুল বাশার। আর এই হোয়াটমোর-হাবিবুল জুটিই ২০০৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশকে এক পরিশ্রমসাধ্য সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে ওপরে তুলতে থাকেন। বছরের পর বছর, ম্যাচের পর ম্যাচ জিততে না থাকা বাংলাদেশ দলকে এই বছরই জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হারারেতে জয় এনে দেন এই জুটি।

১০ মার্চ জিম্বাবুয়েকে হারানোর ভেতর দিয়ে টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়ার পর প্রথম জয় পায় বাংলাদেশ। ১৯৯৯ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের ৪৭ ম্যাচ পর এটা ছিল বাংলাদেশের প্রথম জয়।

২০০৪ সালের শেষ দিকে এসে বোঝা যেতে থাকে ডেভ-হাবিবুল জুটির অধীনে বাংলাদেশ দল একটা পরিবারে পরিণত হতে চলেছে। ২০০৩ বিশ্বকাপে যে বিচ্ছিন্নতা, যে অন্যায় সব দানা বেঁধেছিল

তাকে দূর করে দলকে এক সুতোয় গাঁথার কাজ শুরু করেছিলেন অধিনায়ক খালেদ মাহমুদ সুজন। নানা কারণে সেই কাজটাকে একটা সুসংহত রূপ দিতে পারেননি তিনি।

হাবিবুল ও ডেভের রসায়নটা এতটাই মজবুত ছিল যে, তারা এই পরিবারকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। এই দলে একটা পর্যায়ে আমরা দেখতে পাব খেলোয়াড়দের ব্যক্তিজীবনেরও বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হচ্ছে দলের ছাতাতলে। তারা বাইরে কোথাও নিজের একান্ত আলাপ করার চেয়ে দলের কাছে আলাপ করতেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন।

এই ইউনিট হয়ে উঠতে থাকা বাংলাদেশ দলে একটা জিনিস খুব মিসিং ছিল। পরিবারের সবচেয়ে আদরের সদস্যটাকেই পাচ্ছিল না দল। হ্যাঁ, মাশরাফির জন্য অপেক্ষা চলছিল।

অবশেষে 'পাগলা' ছেলেটা দলে ফিরল। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কিংবদন্তি চার ব্যাটসম্যানের সেই ভারতীয় দল এল বাংলাদেশ সফরে। আর এই লিজেন্ডারি দলকেই মাশরাফি বেছে নিলেন প্রত্যাবর্তনের জন্য, নিজেকে চেনানোর জন্য এবং আরেকবার হুংকার দেওয়ার জন্য।

২.

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্টটা যথারীতি যাচ্ছেতাই হয়েছিল।

আগে ব্যাট করে আশরাফুলের ৬০ রানের পরও ১৮৪ রানে অলআউট হয়েছিল বাংলাদেশ। জবাবে সেঞ্চুরিসংখ্যায় সুনীল গাভাস্কারকে ছুঁয়ে ফেলা টেন্ডুলকারের ডাবল সেঞ্চুরিতে ৫২৬ রানে পৌঁছে গেল ভারত। মাশরাফি ১১৪ রান দিয়ে নিয়েছিলেন রাহুল দ্রাবিড় ও অনিল কুম্বলের উইকেট।

দ্বিতীয় ইনিংসে নাফীস ইকবালের ৫৪ ও মানজারুল ইসলাম রানার ৬৯ রানের পরও ২০২ রানে অলআউট হয়েছিল বাংলাদেশ। স্কোরকার্ড দেখুন, মনে হবে কী একপেশে এক ম্যাচ।

এ জন্যই স্কোরকার্ড ভদ্রলোকেরা বলে গাধা!

চোখের সামনে সেই ম্যাচ দেখার স্মৃতি থেকেও পরিষ্কার বলা যায়, প্রত্যাবর্তন ইনিংসে আগুন না ঝরালেও অফ কাটার ও ইনসুইংয়ে পাগল করে দিয়েছিলেন মাশরাফি। অফ স্টাম্পের বাইরে নিখুঁত বোলিংয়ে বীরেন্দর শেবাগ, রাহুল দ্রাবিড়, শচীন টেন্ডুলকার, ভিভিএস লক্ষ্মণ, সৌরভ গাঙ্গুলীদের পরীক্ষাও নিয়েছিলেন।

এর পুরস্কারও হাজির ছিল মাশরাফির জন্য। কিন্তু ক্রিকইনফোর ভাষায় বাংলাদেশি ফিল্ডারদের 'মাখন লাগানো' হাতের তালু কোনো সুযোগ নিতে দেয়নি। মাশরাফির বলে টেন্ডুলকার দুবার, লক্ষ্মণ, সৌরভ ও দিনেশ কার্তিক একবার করে জীবন পেয়েছিলেন! টেন্ডুলকারের ক্যাচ ফেলেছিলেন স্লিপে হাবিবুল বাশার ও মিড অফে রাজিন সালেহ।

ক্রিকইনফো বড় আফসোস করে সেদিন লিখেছিল

মাশরাফি মুর্তজা ভারতীয় টপ অর্ডারকে পুরো নাড়িয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু জঘন্য ফিল্ডিং তাদের (বাংলাদেশের) মনোবল আস্তে আস্তে শেষ করে দেয়। ...মুর্তজা অফ স্টাম্পের বাইরে সরু একটা চ্যানেলে টানা বল করে গেছে। বুদ্ধিদীপ্ত কাট করিয়ে ব্যাটসম্যানদের বাধ্য করেছেন ঝুঁকিপূর্ণশট খেলতে তাড়াহুড়ো করার জন্য। নিজের মেধা দিয়ে বীরেন্দর শেবাগকে রীতিমতো বিপদে ফেলেছেন তিনি। আর রাহুল দ্রাবিড়ের মতো ব্যাটসম্যানের চরম পরীক্ষা নিয়েছেন। [১]

ফিল্ডারদের কারণে মাশরাফির এই আফসোস আজকের গল্প নয়। সেই শুরু থেকে শুরু হয়ে এই অনন্ত আফসোস চলেছেই।

মাশরাফির প্রত্যাবর্তনের এই হতাশা, বাজে ফিল্ডিং ও মাশরাফির ম্যাকগ্রা হয়ে ওঠাটা এতটাই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বিশ্লেষকদের যে উইজডেনের এই ম্যাচ বুলেটিনে একটা বড় অংশজুড়ে ছিল মাশরাফির প্রসঙ্গ। বাংলাদেশ কীভাবে প্রতি ম্যাচে নবিশের মতো ক্যাচ ফেলছে, সে পরিসংখ্যান উপস্থাপন করে এস রাজেশ উইজডেনে লিখেছিলেন :

বাংলাদেশ ব্যাটিং দল হিসেবে ধুঁকছিল, বোলিংও এমন মারাত্মক কিছু ছিল না। তবে এই দুই বিভাগে তাদের স্কিলের দুর্বলতা ক্ষমা করা যেতে পারে, কিন্তু মাঠে যে পিচ্ছিল ফিল্ডিং তারা করেছে, তার কোনো অজুহাত হতে পারে না।...পুরো ব্যাপারটা সবচেয়ে হতাশাজনক ছিল মাশরাফি মুর্তজার জন্য। যে নিজে পরে এক বা একাধিকবার সতীর্থদের দেখিয়েছে, কীভাবে ভালো ক্যাচ ধরতে হয়। অসাধারণ এক প্রচেষ্টায় নিয়েছে দিনেশ কার্তিকের ক্যাচ। [২]

এস রাজেশের মাশরাফি-মুগ্ধতা এই ম্যাচে বলার মতো ছিল। বিশিষ্ট এই ক্রিকেট পরিসংখ্যানবিদ দেখছিলেন স্কোরকার্ড বলবে না মাশরাফির বোলিংয়ের কথা। তাই তিনি লিখছিলেন :

২০০১-০২ মৌসুমে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে মুর্তজার অভিষেক হয়েছিল, সেটা বাংলাদেশের প্রথম ড্র টেস্টও ছিল, কিন্তু ইনজুরির কারণে গত তিন বছরে সে মাত্র ১২টি ম্যাচ খেলতে পেরেছে, কখনোই একটানা চারটার বেশি টেস্ট খেলতে পারেনি। বাংলাদেশ কী মিস করছিল, তা বোঝাতে আজ সে একটি মাত্র ওভারের বেশি সময় নেয়নি–প্রথম ওভারেই বীরেন্দর শেবাগকে দুবার 'এজ' করেছে এবং গৌতম গম্ভীরকে নান্দনিক এক ডেলিভারিতে পরাস্ত করেছে; অফ স্টাম্পে পড়ে বাইরে চলে যাওয়া বলে।

তার পেস ১৩৫ কিলোমিটারের আশপাশে–খারাপ নয়। তবে দুরন্ত ব্যাপার হলো তার নিয়ন্ত্রণ এবং সুইং এবং যে সিম মুভমেন্ট সে পাচ্ছিল। অফ স্টাম্পের স্রেফ বাইরে বল ফেলে ধারাবাহিকভাবে দুদিকেই বল মুভ করানো, এই ধারাবাহিকতাকে একমাত্র ম্যাকগ্রীয় ব্যাপার বলা চলে। রাহুল দ্রাবিড় তার বলে ছিল পুরোপুরি অসহায়, অন্যদিকে টেন্ডুলকার তার বিপক্ষে টানা ২০টি ডট বল খেলতে বাধ্য

হয়েছিল। দুর্ভাগ্য এই যে, স্লিপে তাকে সহায়তা করার জন্য কোনো মার্ক টেলর বা মার্ক ওয়াহ ছিল না। [৩]

এরপর সম্ভবত আর আমাদের বলার কোনো দরকার নেই যে, মাশরাফির প্রত্যাবর্তনটা কেমন হয়েছিল!

দ্বিতীয় টেস্টেও ফলাফলটা একই হলেও উইজডেন সাক্ষ্য দিচ্ছে মাশরাফি দুরন্ত বোলিংই করেছিলেন। প্রথম ইনিংসে ভারত ৫৪০ রান করলেও মাশরাফি ২৬ ওভারে মাত্র ৬০ রান দিয়ে তুলে নিয়েছিলেন শেবাগ, দ্রাবিড় ও টেন্ডুলকারের উইকেট!

এই টেস্টটা মোহাম্মদ আশরাফুল হয়তো মনে রাখবেন তার ১৫৮ রানের অপরাজিত ইনিংসের জন্য।

৩.

প্রাচীন প্রবাদে বলা হয়, সকালের সূর্য দিনের আভাস দিয়ে থাকে।

কথাটা অন্তত ২০০৪ সালের বক্সিং ডের জন্য সত্যি ছিল না। বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে সকালের সূচনাটা মোটেও বাংলাদেশের জন্য একটা শুভদিনের ইঙ্গিত দেয়নি।

জহির খান ও অজিত আগারকারের জোড়া আঘাতে বাংলাদেশের স্কোরবোর্ডে ২৬ রান উঠতেই নেই দুই ওপেনার; এর মধ্যে মেকশিফট ওপেনার মোহাম্মদ রফিক কোনো রান না করেই আউট। দলীয় ৩৭ রানে ফিরে এলেন অধিনায়ক হাবিবুল বাশারও। কার্যত প্রথম প্রতিরোধ ও প্রতি-আক্রমণ শুরু করেন আফতাব আহমেদ। অধুনা কোচ হয়ে যাওয়া এই মারকুটে ব্যাটসম্যান ৯৮ বলে ৫টি চার ও ১টি ছক্কায় সাজানো ৬৭ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। খালেদ মাসুদ পাইলট ২০ রান যোগ করে কিছুটা ভরসা দিয়েছিলেন। কিন্তু কাজের কাজ হচ্ছিল না।

আফতাব আহমেদ যখন সপ্তম ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হলেন, বাংলাদেশের স্কোর তখনো ৭ উইকেটে ১৬৮; ওভার পার হয়ে গেছে ৩৮.৪। এই সময় উইকেটে গেলেন মাশরাফি বিন মুর্তজা।

সেই কুয়েতের বিপক্ষে ঝড়তোলা মাশরাফি, নড়াইল স্কুলমাঠে ঝড়তোলা মাশরাফি। খালেদ মাহমুদ ও তাপস বৈশ্যকে নিয়ে সতর্ক, কিন্তু মারমুখী দুটো জুটি গড়লেন। নিজে ৩৯টি বল খেললেন; ৩টি চার ও ১টি ছক্কাও মারলেন। শেষ পর্যন্ত ৩১ রানে অপরাজিত থেকে মাশরাফি যখন মাঠ ছাড়ছেন, বাংলাদেশের স্কোরবোর্ডে তখন ২২৯ রান যোগ হয়ে গেছে।

তখনো আজকের টি-টোয়েন্টি যুগ শুরু হয়নি। ফলে ২২৯ নিতান্ত খারাপ স্কোর নয়। এমন স্কোর নিয়ে অন্তত লড়াই করা চলে।

লড়াই নয়; তার চেয়ে বেশি কিছু করতে সেদিন মাঠে নেমেছিল বাংলাদেশ।

ম্যাচের ও নিজের তৃতীয় বলেই ঘোষণাটা দিলেন মাশরাফি। অফ স্টাম্পের বাইরে থেকে ভয়ানকভাবে ভেতরে ঢোকা বলে পরিষ্কার বোল্ড বীরেন্দর শেবাগ। সেই যে

উৎসবের শুরু হলো আর থামাথামি নেই। মাশরাফি আবার শেষ দিকে আঘাত হেনে নিয়েছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনির উইকেট। শেষ পর্যন্ত তিনি ৯ ওভার বল করে ২টিই মেডেন নিয়েছিলেন। বাকি ৭ ওভারে ৩৬ রান দিয়ে ২ উইকেট। রফিক, মাশরাফি, তাপস ও খালেদ মাহমুদ ২টি করে উইকেট নিলেন। দুটি রানআউট করলেন রাজিন ও আফতাব।

খালেদ মাহমুদের শেষ ওভারের পঞ্চম বলে মুরালি কার্তিককে রানআউট করার ভেতর দিয়ে বাংলাদেশ পেল ঐতিহাসিক এক জয়। দেশের মাটিতে প্রথম ওয়ানডে জয়।

এটাকে অবশ্য শুধু একটা জয় বা মাশরাফির একটা ম্যাচসেরা কীর্তিতে আটকানো যাবে না। ম্যাচটা ছিল বাংলাদেশের শততম ওয়ানডে। আর এই ম্যাচকেই মাশরাফি বেছে নিলেন নিজের প্রথম ম্যাচসেরা হওয়ার মঞ্চ হিসেবে। সেই সাথে বীরেন্দর শেবাগের সাথে পরের লম্বা সময় ধরে চলা দ্বৈরথের সূচনাও হলো এখান থেকে।

অবশ্য তখনো ঠিক আভাস পাওয়া যাচ্ছিল না, পরের বছর এই দেশের মাটিতেই আরও ঢের জয়ের ফুল ফোটাবে বাংলাদেশ দল।

৪.

২৭ ডিসেম্বর, ২০০৪।

দেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক জনকণ্ঠের পাতাজুড়ে, মানে আট কলামে বিশাল হেডিং–ভারত পরাজিত, শাবাশ বাংলাদেশ।

বিশেষ প্রতিনিধি আরিফুর রহমান বাবু সেই প্রতিবেদনে লিখছেন স্বপ্ন নয়, সত্যি। ওই প্রতিবেদনেই মাশরাফির ম্যাচসেরা হওয়া নিয়ে অধিনায়ক হাবিবুল বাশারের মজার কথাটা দেখে নেওয়া যেতে পারে :

দুজনের মধ্যে (আফতাব ও মাশরাফি) কে ম্যাচসেরা হবেন, তা নিয়ে ভালোই লড়াই হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অ্যাডজুডিকেটর বেছে নিয়েছেন মাশরাফি মর্তুজাকে। ৩৬ রানে ২ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ব্যাট হাতে তার অপরাজিত ৩১ রান দলকে ২২৯ রানে নিয়ে যায়। ...তাদের দুজনের অবদান বর্ণনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের অধিনায়ক হাবিবুল বাশার বললেন, 'আফতাব দারুণ ইনিংস খেলেছে। আর আমি মনে করতাম, (মাশরাফির মাথায় বুদ্ধি কম হেসে)। কিন্তু আজ ও দারুণ দায়িত্বশীল ব্যাটিং করেছে। আর ওকে ফিরে পেয়ে এন্তার দল খেলছে সেরা বোলিং অ্যাটাক নিয়ে।' [৪]

ভারতের বিপক্ষে আজকের দিনে আমরা বলেকয়ে সিরিজ জিতলেও সে সময়টা এমন ছিল না। ফলে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে জয়ের পর শেষ ম্যাচে ভালো ফলাফলটাই ছিল লক্ষ্য। এ কথা বলাটা অন্যায় হবে না যে, সে লক্ষ্য অন্তত অর্জন করেছিল বাংলাদেশ।

শেবাগ, টেন্ডুলকার, গাঙ্গুলী, দ্রাবিড়, যুবরাজের কয়েকটা বিস্ফোরক ইনিংসে ভর করে শেষ ওয়ানডেতে আগে ব্যাট করা ভারত ৫ উইকেটে ৩৪৮ রান তুলেছিল। মাশরাফি ১০ ওভারে ঠিক ৬০ রান ব্যয় করে উইকেটশূন্য ছিলেন। রাজিন সালেহ ৮২ রান করে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ১১৪ বলে খেলা সে ইনিংস পথে রাখতে পারেনি দলকে। তবে এই ম্যাচেও বাংলাদেশের স্কোরটা ভদ্রস্থ হলো সেই মাশরাফির কল্যাণে।

বলা ভালো, এই ম্যাচেই সেই ব্যাটসম্যান মাশরাফির আসল রূপটা দেখানো গেল। মাত্র ২০ বলের ইনিংসে ৩টি চার ও ৩টি ছক্কায় ৩৯ রান করে ফেলেছিলেন।

৬.

বছর শেষ হওয়ার আগেই বাংলাদেশের ক্রিকেট মহলে ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ চাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেল–জিম্বাবুয়ে আসছে। এই জিম্বাবুয়ের আসা নিয়ে চাঞ্চল্যটা বুঝতে গেলে এ দলটির হঠাৎ পতনটা মনে রাখতে হবে। ২০০৩ বিশ্বকাপে রাষ্ট্রের বর্ণবাদী আচরণের প্রতিবাদ করে ও তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় দলটির সোনালি প্রজন্মের প্রায় সব ক্রিকেটারই দেশ ও ক্রিকেট ছেড়ে দিলেন। একটা অসাধারণ উদীয়মান দল দুই বছরের ব্যবধানে মিডিওকোর একটা দলে পরিণত হলো। উল্লেখ করা যেতে পারে, পরের কয়েকটা বছরে সেই জিম্বাবুয়ে আরো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

অবশ্য ২০০৫ সালের

বাংলাদেশ-ভারত
দ্বিতীয় ওয়ানডে
ভেন্যু : বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম
তারিখ : ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪
টস : বাংলাদেশ (ব্যাটিং)
ম্যান অব দ্য ম্যাচ : মাশরাফি বিন মুর্তজা

বাংলাদেশ

ব্যাটসম্যান	**রান**	**বল**	**৪**	**৬**
নাফীস ইকবাল ক ধোনি ব আগারকার	৯	২২	১	০
রফিক এলবিডব্লু জহির		৭		
হাবিবুল ব আগারকার	১৭	২১	৩	
আশরাফুল ক ও ব কার্তিক	২৮	৪১	১	২
আফতাব ব কার্তিক	৬৭	৯৮	৫	১
রাজিন রানআউট		১০		
মাসুদ ক যোগিন্দর ব শ্রীরাম	২০	২৪	২	
মাহমুদ রানআউট	১৭	৩৮	২	
মাশরাফি অপরাজিত	৩১	৩৯	৩	১
তাপস ব জহির	১৭	১৩	২	
নাজমুল অপরাজিত	৩	২		
অতিরিক্ত (লেবা ৪, ও ৬, নো ১০)	২০			
মোট (৫০ ওভারে, ৯ উইকেটে)	২২৯			

বোলিং : আগারকার ২/৩১, জহির ২/৫৩, যোগিন্দর ০/৫১, কার্তিক ২/৪৩, শ্রীরাম ১/৩৭, মঙ্গিয়া ০/১০।

ভারত

ব্যাটসম্যান	রান	বল	৪	৬
শেবাগ ব মাশরাফি		৩		০
সৌরভ ক মাশরাফি ব মাহমুদ	২২	৪২	৩	
যুবরাজ ক রাজিন ব তাপস	৪	৮	১	
শ্রীরাম স্টা. মাসুম ব রফিক	৫৭	৯১	৭	০
কাইফ রানআউট	৪৯	৫৬	৫	০
মঙ্গিয়া এলবিডব্লু তাপস	১২	১৮		০
ধোনি ক হাবিবুল ব মাশরাফি	১২	১১	২	
আগারকার ক আফতাব ব রফিক	৯	১৫	১	০
যোগিন্দর অপরাজিত	২৯	২২	৪	০
জহির ক মাশরাফি ব মাহমুদ	১০	১৪	১	
কার্তিক রানআউট	৩	৬		
অতিরিক্ত (লেবা ৪, ও ৩)	৭			
মোট (৪৭.৫ ওভারে অলআউট)	২১৪			

বোলিং : মাশরাফি ৯-২-৩৬-২, তাপস ১০-২-৩৫-২
নাজমুল ৭-০-২৬-০, মাহমুদ ৯.৫-০-৪০-২
রফিক ১০-০-৫৭-২, আফতাব ২-০-১৬-০।

জানুয়ারি মাসে যে জিম্বাবুয়ে বাংলাদেশে এল তাকে 'মাঝারি' শক্তির দল বলতে হবে। জিম্বাবুয়ের এই শক্তি সাহসই বাংলাদেশের ক্রিকেটে চাঞ্চল্য তৈরি করল–এতকাল ধরে অধরা টেস্ট জয়টা এবার পেতে হবে।

পরে সেই দলের ক্রিকেটাররা সাক্ষ্য দিয়েছেন, এই 'জিততে হবে' বা 'পেতে হবে' কথাগুলো এই সিরিজটাকে সাধারণের চেয়ে কঠিনে পরিণত করেছিল।

মাঠের পারফরম্যান্সে অবশ্য সেটা বোঝা গেল না।

চট্টগ্রাম থেকে শুরু হওয়া সিরিজের প্রথম টেস্টে প্রথম দিনে ব্যাট করতে নেমেছিল বাংলাদেশ। 'দশে মিলে করি কাজ'-এর দারুণ এক উদাহরণ হয়ে রইল এই সিরিজ। প্রথম ৯ ব্যাটসম্যানের মধ্যে কেবল লোকাল বয় আফতাব ডাবল ফিগারে পৌঁছাতে পারলেন না। এ ছাড়া জাভেদ ৩৩, নাফীস ৫৬, হাবিবুল ৯৪, আশরাফুল ১৯, রাজিন ৮৯, পাইলট ৪৯ ও রফিক ৬৯ রান করলেন। খেয়াল করেছেন, নয় নম্বর ব্যাটসম্যান মাশরাফির কথা বলিনি?

হ্যাঁ, বাংলাদেশের স্কোরটা ৪৮৮ রানের পাহাড়ে চড়ানোতে মাশরাফিরও দারুণ একটা অবদান ছিল। ২ রানের জন্য টেস্ট ফিফটিটা মিস করলেন। তবে ৪৪ বলে ৮টি চার ও ১টি ছক্কায় সাজানো ৪৮ রানের ইনিংসটা বিনোদনের কারণে হলেও মনে না রেখে উপায় নেই।

এই ইনিংসকে পর্বতে পরিণত করার কাজটা করলেন মাশরাফি আর রফিক। রফিক যথারীতি তখন আগুনে ফর্মে। তিনি নিয়েছিলেন ৫ উইকেট। আর মাশরাফি ৩১ ওভার বল করে ১২টি মেডেন নিলেন; ৫৯ রান ব্যয়ে তুলে নিলেন ৩ উইকেট।

দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশ করেছিল ২০৪ রান; হাবিবুলের ফিফটি ছিল, মাশরাফি ১৯ রান করেছিলেন ১৫ বলে।

এই টেস্ট জয়ের জন্য জিম্বাবুয়ের সামনে লক্ষ্য দাঁড়াল ৩৮১ রান। এটাকে অবিশ্বাস্য করে তুললেন বোলাররা। মাশরাফি ও তাপস ২টি করে উইকেট নিলেন। তবে আসল ভেলকিটা দেখালেন ৪৫ রানে ৬ উইকেট নেওয়া এনামুল হক জুনিয়র।

এই বাঁহাতি স্পিনারের জাদুতে বাংলাদেশ ২২৬ রানে জয় পেল। বাংলাদেশ পেল নিজেদের ইতিহাসের প্রথম টেস্ট জয়। এবার অপেক্ষা আরেক ধাপ সামনে এগোনোর।

এবারের চ্যালেঞ্জটা হলো, ঢাকা টেস্টটা জিততে হবে বা ড্র করতে হবে। তা করতে পারলেই টেস্ট জয়ের পরপরই ইতিহাসের প্রথম সিরিজ জয়টাও হয়ে যাবে। চ্যালেঞ্জ হিসেবে এটা একটা ম্যাচ জয়ের চেয়ে কম শক্ত ব্যাপার নয়।

ঢাকায় প্রথম ইনিংসে এনামুল বাংলাদেশের রেকর্ড ৯৫ রানে ৭ উইকেট নেওয়ার পরও জিম্বাবুয়ে করল ২৯৮ রান। মাশরাফি ৬৯ রানে নিয়েছিলেন ১ উইকেট।

জবাবে আবার ধসে পড়েছিল বাংলাদেশের ব্যাটিং। শেষবেলায় রফিকের ৫৬ ও মাশরাফির ২৬ মুখরক্ষা করল। মাশরাফি একেবারে স্বভাববিরুদ্ধ ৮১ বলের মোকাবিলায় মাত্র ২টি চার মেরে ২৬ রান করেছিলেন। বাংলাদেশ অলআউট হওয়ার আগে ২১১ রান করতে পেরেছিল।

দ্বিতীয় ইনিংসে টাইবুর ১৫৩ রানে ভর করে জিম্বাবুয়ে তুলেছিল ২৮৬ রান। মাশরাফি এই ইনিংসে ভয়াবহ শুরু করেছিলেন। ইনিংসের সপ্তম ও নবম ওভারে, মানে নিজের পরপর দুই ওভারে ফিরিয়েছিলেন মাৎসিকেনেরি ও ডিওন ইব্রাহিমকে। পরে আরও এক উইকেট নিয়েছিলেন। মিডল ও লোয়ার অর্ডারে আঘাত করে এনাম আবার ইনিংসে ৫ উইকেট নেন। তারপরও বাংলাদেশের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় ৩৭৪ রান।

সে সময় বাংলাদেশের পক্ষে এই প্রায় বিশ্ব রেকর্ড করে জয়ের কল্পনা করা কঠিন ছিল। ফলে চ্যালেঞ্জটা দাঁড়ায় দেড় দিন ধরে ব্যাট করে যেতে হবে। আর এই চ্যালেঞ্জ নিয়ে জাভেদ ওমর ও নাফীস ইকবাল অসামান্য এক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ৮২.৬ ওভার ব্যাটিং করে এই উদ্বোধনী জুটি অনেকটাই নিশ্চিত করে দেন ম্যাচের ভাগ্য। এরপর রাজিন সালেহকে নিয়ে সেই ড্রয়ের পথে চলেন তামিম ইকবালের বড় ভাই নাফীস ইকাল। টেস্ট সেঞ্চুরিয়ান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন মাশরাফির এই সাবেক অধিনায়ক।

ঢাকা টেস্ট ড্র করার ফলে বাংলাদেশ টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়ার পাঁচ বছরের মাথায় এসে প্রথম টেস্ট ও টেস্ট সিরিজ জয়ের স্বাদ পেল বাংলাদেশ।

৭.

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজটা বাংলাদেশের শুরু হলো উল্টো স্বাদ নিয়ে। প্রথম দুই ওয়ানডেতেই হেরে ৫ ম্যাচ সিরিজ খোয়ানোর মতো একটা পরিস্থিতি তৈরি হলো।

বাকি তিন ম্যাচের একটিতে হারলেও সিরিজ হার এবং নিজেরা জিততে চাইলে প্রতিটা ম্যাচ জিততে হবে, এমন সমীকরণ নিয়ে চট্টগ্রামে শুরু হলো তৃতীয় ওয়ানডে।

পিঠে সামান্য ব্যথা ছিল বলে প্রথম ওয়ানডেতে খেলানো হয়নি মাশরাফিকে। প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও খেলানো হবে না তাকে। কিন্তু প্রথম ওয়ানডেতে হারের পর টিম ম্যানেজমেন্ট আর সে সাহস পায়নি। জিততেই হবে এমন সিরিজে মাশরাফিকে বাইরে বসিয়ে রাখাটা কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। ক্রিকইনফো বলছে, মাশরাফির মাঠে ফেরাটা ছিল টিমের জন্য একটা 'মোরাল বুস্ট'।

চট্টগ্রামে আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ২৪৪ রান তুলেছিল বাংলাদেশ। রাজিনের ৭৭ রানের পাশাপাশি আমরা উল্লেখ করব মাশরাফির ২১ বলে একটি চার একটি ছয়ে মাশরাফির ২১ রানের কথা। বল হাতে ৮.৫ ওভার বল করে ৩৮ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়েছিলেন মাশরাফি। তবে বাংলাদেশ ম্যাচ জিতেছিল মানজারুল ইসলাম রানার ৩৪ রানে ৪ উইকেটে ভর করে। তিনিই ম্যাচসেরা হয়েছিলেন।

চতুর্থ ওয়ানডেতে বাংলাদেশ আগে ব্যাট করে নাফীস ইকবালের ৫৪ রানে ভর করে ২৪৭ রান করেছিল। জিম্বাবুয়ে অলআউট হয়েছিল ১৮৯ রানে। আবারও রানা ৩৬ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন।

শেষ ম্যাচ।

টান টান উত্তেজনা। অলিখিত ফাইনালে পরিণত হয়েছিল এই ম্যাচ। ০-২ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে ২-২ সমতা ফিরিয়ে ফাইনালে জিম্বাবুয়ের মুখোমুখি বাংলাদেশ।

আগে ব্যাট করা জিম্বাবুয়ে অলআউট হয়েছিল ১৯৮ রানে। মাশরাফি ৪২ রানে নিয়েছিলেন ১ উইকেট। প্রবল প্রতাপে বাংলাদেশ জিতেছিল ৮ উইকেটের ব্যবধানে। ইনিংস শুরু করতে নামা রফিক ৭২ রান ও তিন নম্বরে নামা আফতাব অপরাজিত ৮১ রান করে দলকে ভেড়ান জয়ের বন্দরে।

এই সিরিজের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য নিশ্চয়ই বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রথম ওয়ানডে সিরিজ জয়। তবে সেই সঙ্গে এই সিরিজটা মাশরাফির কাছে একটু বিশেষ ব্যাপার বলেই এত বিস্তারিত বলার চেষ্টা। এই সিরিজটাই ছিল তার প্রিয়তম বন্ধু রানার নিজেকে চেনানো এক সিরিজ।

৮.

ফারুক আহমেদ তখন প্রধান নির্বাচক।

হঠাৎ করেই তার কমিটি সিদ্ধান্ত নিল এবারের ইংল্যান্ড সফরে দলের সঙ্গে বাড়তি একজন উইকেটকিপার যাবে। তাও আবার কে? এখনো কৈশোর পার না-করা মুশফিকুর রহিম নামে এক পিচ্চি।

খালেদ মাসুদ পাইলট দলে থাকতে মুশফিককে দলে নেওয়া নিয়ে কম জল ঘোলা

হয়নি। তবে কালক্রমে মুশফিক এই সিদ্ধান্তের যথার্থতা প্রমাণ করেছেন। হয়ে উঠেছেন মাশরাফিদের প্রিয় ছোট ভাই, জাতীয় দলের অধিনায়ক।

এই সফরটা মাশরাফির জন্য বিশেষ কোনো তাৎপর্যময় সফর ছিল না। তবে ছোটবেলা থেকে শোনা 'বিলেত' ঘোরা হলো বৈকি। লর্ডসে মুশফিকের অভিষেক ছাড়া মাশরাফি তো দূরে থাক, বাংলাদেশের কারোর স্মৃতিতেই কিছু থাকার কথা নয়। একমাত্র যে ইনিংসটায় বল করার সুযোগ পেয়েছিলেন তাতে ১০৭ রানে ২ উইকেট নিয়েছিলেন; অ্যান্ড্রু স্ট্রাউস ও মাইকেল ভন। এরপর চেস্টার লি স্ট্রিটে একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি–ইংল্যান্ডের ম্যাচে সাকল্যে ৩ উইকেটের পতন; তার মধ্যে ভন ও স্ট্রাউস মাশরাফির শিকার। বলার মতো একমাত্র ব্যাপার, চেস্টার লি স্ট্রিটে আফতাবের ৮২, হাবিবুলের ৬৩ ও জাভেদ ওমরের ৭১ রানে দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশের ৩১৬ রান তোলা।

৯.

ম্যাচের শেষ ওভার।

জয়ের জন্য চাই ৭ রান। বল করতে আসছেন জেসন গিলেস্পি। স্ট্রাইকিং প্রান্তে আছেন আফতাব আহমেদ। প্রথম বলটাই লং অনের ওপর দিয়ে ছক্কা! পরের বলে সিঙ্গেল নিয়ে উদ্যাম দৌড় দিলেন আফতাব আহমেদ।

কার্ডিফ থেকে বাংলাদেশ মেতে উঠল এক অবিস্মরণীয় আনন্দে। বিশ্বের সেরা দল, সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে জয়ের আনন্দ!

ইংল্যান্ডে এমন ম্যাড়মেড়ে, হতাশাজনক ও বিস্মরণযোগ্য টেস্ট সফরের পর বাংলাদেশের একটা টনিকের খুব দরকার ছিল। ন্যাটওয়েস্ট ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে জয়টাকে সেই টনিক বলা চলে।

সে আমলে বাংলাদেশের বিবেচনায় এটা ভয়ানক এক অঘটনও বটে।

বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডকে নিয়ে তিনজাতি টুর্নামেন্ট ন্যাটওয়েস্ট সিরিজের শুরুটা খুব একটা ভালো হয়নি বাংলাদেশের। প্রথম ম্যাচে হেরেছিল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১০ উইকেটে। কিন্তু গড়পড়তা বাকি ম্যাচগুলো ভালোই কাটল।

দ্বিতীয় ম্যাচেই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এল বাংলাদেশের সেই জয়।

যদিও এই ম্যাচের নায়ক হিসেবে রেকর্ড বইয়ে মূলত আশরাফুলের নামই লেখা থাকে। পাশে হাবিবুল, তাপস, এমনকি তুষার ইমরানের নামও লেখা থাকবে। কিন্তু মাশরাফির নাম আপনি খুঁজে পাবেন না।

অথচ স্মৃতি প্রতারণা না করলে পেছন ফিরে দেখতে পাবেন ম্যাচটা বাংলাদেশ শুরু করেছিল মাশরাফির প্রবল প্রতাপ দিয়ে। ম্যাচের দ্বিতীয় বলেই মাশরাফির দারুণ ছোট্ট ইনসুইংয়ে পরিষ্কার এলবিডব্লু অ্যাডাম গিলক্রিস্ট। সব মিলিয়ে মাশরাফি ১০ ওভারে ২টি মেডেন নিয়েছিলেন; ৩৩ রান খরচ করে একটি উইকেট ছিল। ক্রিকেইনফো যথার্থই মাশরাফির এই বোলিংকে 'বিস্ফোরক সূচনা' বলেছিল। সঙ্গী

তাপস নিয়েছিলেন ৬৯ রানে ৩ উইকেট।

এই সফরটার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে পরবর্তীকালে মাশরাফি বারবার বলেছেন, সারা জীবনের যে উইকেট টেকিং বোলারের চরিত্র, সেটা এই সিরিজে খানিকটা বদলে ফেলেছিলেন। অনেকটাই রান আটকানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। বোলিং বিশ্লেষণ সে কথার সত্যতা প্রমাণ করে।

অস্ট্রেলিয়াকে ২৪৯ রানে আটকে ৫ উইকেটের জয়টা নিশ্চয়ই বড় একটা ঘোষণা ছিল। পরের ম্যাচেই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আশরাফুলের ৫২ বলে ৯৪ ছিল আরেকটা ঘোষণা।

অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ফিরতি ম্যাচে বাংলাদেশ হেরেছিল ১০ উইকেটে। আশরাফুলের ৫৮ ও শাহরিয়ার নাফীসের ৪৭ রান ছাড়া বলার কিছু ছিল না।

পরের ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জাভেদ ওমর ওপেন করতে নেমে ১৫০ বলে ৮১ রান ও শেষবেলায় পাইলটের ৪৩ বলে ৪২ রানে ২০৮ রান তুলেছিল বাংলাদেশ। ৫ উইকেট হারিয়েই লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। মাশরাফি ৯ ওভারে ৪৮ রান দিয়ে উইকেটশূন্য ছিলেন।

শেষ ম্যাচে শাহরিয়ার নাফীসের ৭৫ ও পাইলটের ৭১ রানে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২৫০ রান তুলেছিল হাবিবুল বাশারের দল। মাশরাফি আবারও বিস্ফোরক সূচনা করেছিলেন। ব্যক্তিগত ১ রান ও দলীয় ১৫ রানে হেইডেন ক্যাচ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন উইকেটের পেছনে। পরে পন্টিংয়ের উইকেটও নেন মাশরাফি। তারপরও বাংলাদেশ ম্যাচ হেরেছিল ৬ উইকেটে।

সব মিলিয়ে সাদা চোখে এই বিশাল ইংল্যান্ড সফরটাকে মাশরাফির জীবনে তেমন দাগ কেটে যাওয়া কিছু মনে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু অ্যান্ড্রু মিলার তার সিরিজ রিভিউয়ে লিখেছিলেন, সফরের সবচেয়ে বড় 'আনসাং হিরো' ছিলেন মাশরাফি :

হ্যাঁ, বাংলাদেশের ব্যাটিংটা নজর কেড়েছে, কিন্তু বোলাররাই আসলে ছিল নেপথ্য নায়ক। ২০০৩-০৪ মৌসুমে চট্টগ্রাম টেস্টে ইনজুরিতে পড়ার আগ পর্যন্ত ৬০ রানে ৪ উইকেট নেওয়া মাশরাফি মুর্তজা তাড়া করে বেড়াচ্ছিলেন ইংল্যান্ডকে। কিন্তু হাঁটুর সেই ইনজুরির পরের একটা বছর তাকে খেলার বাইরে রেখেছিল।

এখন পুরো ফিটনেস ফিরে পাওয়ার পর মাশরাফিই হয়ে দাঁড়িয়েছে সব ফরম্যাটে বাংলাদেশের প্রধান পার্থক্য। টেস্টে ইংল্যান্ডের যে ছয়টা উইকেট পড়েছে তার চারটিই সে নিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে নিজের দ্বিতীয় ডেলিভারিতেই আঘাত হেনেছে। কার্ডিফে তার ১০ ওভারে ৩৩ রানে ১ উইকেটের ফিগার আশরাফুলের জীবনের সমান দীর্ঘ সেঞ্চুরির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়; সমান গুরুত্বপূর্ণ। [৫]

তাহলে আমরা আর সাক্ষী না ডাকি।

১০.

২০০৫ সালে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটল, তিন বছর পর আবার ঘরোয়া

প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলতে নেমেছিল এ বছরের শুরুর দিকে। ফেব্রুয়ারিতে খুলনার হয়ে বরিশাল, ঢাকা ও সিলেটের বিপক্ষে তিনটি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলেন মাশরাফি। প্রথম ম্যাচেই বরিশালের বিপক্ষে ইনিংসে ৩টি করে ৬ উইকেট নেন। পরের ম্যাচে ৫ উইকেট। তবে আসল ভেলকিটা মাশরাফি জমিয়ে রেখেছিলেন তৃতীয় ম্যাচে সিলেটের জন্য।

এ ম্যাচে বের হয়ে আসেন পরিপূর্ণ এক ব্যাটসম্যান মাশরাফি। প্রথম ইনিংসে সিলেট ব্যাট করে ৪২১ রান করেছিল। এই বিশাল রানের বিপক্ষে ব্যাট করতে চার নম্বরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মাশরাফিকে। ৯৯ বলে ৯টি চার ও ২টি ছক্কায় ৭০ রান করে বোঝান, দায়িত্বটা তিনি পালন করতে প্রস্তুত। তবে আরও অপেক্ষায় ছিল কিছু দ্বিতীয় ইনিংসের জন্য।

ফলো অনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে খুলনা। আবারও চার নম্বরে ব্যাট করতে নামেন এবং ক্যারিয়ারের প্রথম ফার্স্ট ক্লাস সেঞ্চুরির দেখা পেয়ে যান। দল ৯ উইকেটে ২৭৯ পর্যন্ত যেতে পেরেছিল। এর মধ্যে মাশরাফি একাই করেন ১৩২ রান! ১৪০ বলের এই ইনিংসে ১৩টি চার ও ৫টি ছক্কা।

সাধে কি আর হাবিবুল বাশার ব্যাটসম্যান মাশরাফির জন্য হা-হুতাশ করেন!

এ বছর অধুনালুপ্ত জাতীয় লিগ ওয়ানডেতেও ম্যাচ খেলেন চারটি। প্রথম ম্যাচেই ব্যাট হাতে ৩০ রান এবং বল হাতে ৮ ওভারে ১০ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা। দ্বিতীয় ম্যাচেও সেটা হতে পারতেন। ব্যাট হাতে ছিল ৩১ রান; বল হাতে ১০ ওভার, ২ মেডেন, ২৫ রান, ৪টি উইকেট!

তৃতীয় ম্যাচে আবারও ম্যাচসেরা!

এবার বল হাতে ৩৪ রানে ২ উইকেট। পাশাপাশি প্রথম লিস্ট এ ফিফটি—৭১ বলে ৬০ রান। শেষ ম্যাচে ১৫ রানে ২ উইকেট ও ১৭ নটআউট।

একটু হিসাব করে ফেলা যাক। চার ম্যাচে ১৩৫ রান এবং ১১ উইকেট। কী বলেন, তাহলে?

[১] Tendulkar mauls Bangladesh; সিদ্ধার্থ বৈদ্যনাথন (ক্রিকইনফো; ১১ ডিসেম্বর, ২০০৪)

[২] Setting the tone in the field; এস রাজেশ (উইজডেন ভারডিক্ট; ১১ ডিসেম্বর, ২০০৪)

[৩] ওই

[৪] ভারত পরাজিত, শাবাশ বাংলাদেশ; আরিফুর রহমান বাবু (জনকণ্ঠ; ২৭ ডিসেম্বর, ২২০৪)

[৫] A tour of two halves; অ্যান্ড্রু মিলার (ক্রিকইনফো; ১ জুলাই, ২০০৫)

ওই তো শিখর



১.

বন্দরনায়েকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর; কলম্বো।

দুবাই হয়ে ঢাকাগামী ফ্লাইটের অপেক্ষায় লাউঞ্জে বসে আছে একটি ছেলে। সঙ্গে বড় লাগেজ এরই মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পার করে বিমানে চড়ে বসেছে। ছেলেটির কাঁধে ছোট্ট একটা ব্যাগ। আনমনে সামনে চেয়ে আছে।

সামনে একটা টেলিভিশন চলছে; সেদিকে চোখ নেই তার। কোনো এক অদৃশ্য কিছুর দিকে চেয়ে আছে যেন। টেলিভিশনে হঠাৎ বিজ্ঞাপন ভেসে উঠল—একদিন পর শুরু কলম্বো টেস্ট; মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা।

বুকের মধ্যে হু হু করে উঠল ছেলেটির। সেই ম্যাচে তারও তো থাকার কথা ছিল!

এ কথা বলে দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না যে, ছেলেটি মাশরাফি বিন মুর্তজা। চার বছরের ক্যারিয়ারে এই নিয়ে ষষ্ঠবারের মতো জাতীয় দলকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে কোনো একটা সিরিজ শেষ না করেই!

এবার মাশরাফি ফিরছেন শ্রীলঙ্কা থেকে।

শ্রীলঙ্কায় পূর্ণাঙ্গ টেস্ট সিরিজ খেলতে গিয়েছিল বাংলাদেশ। সফরে একটি মাত্র ওভার বল করতে পেরেছিলেন মাশরাফি। এক দিনের অনুশীলন ম্যাচে। এরপর থেকে পিঠে প্রবল ব্যথায় ওয়ানডে সিরিজটা বাইরে বসেই দেখতে হয়েছে। কিছুতেই ব্যথা কমছে না দেখে হাড়ের স্ক্যান করানো হয়েছিল তাকে। ধরা পড়ে যে, কোনো ফাটল হাড়ে নেই। তবে পিঠের নিচের দিকের টানা খেলা ও ধকলজনিত প্রভাব পড়েছে হাড়ে। ফিজিও পল ক্লস সংবাদমাধ্যমে বলেন, *'ইনজুরিটা আগে আগেই ধরা পড়েছে। এই পর্যায়ে পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ায় ছয় থেকে বারো সপ্তাহ পর্যন্ত লাগতে পারে। এ ধরনের ফ্র্যাকচারের চারটি স্তর আছে, তার প্রথম স্তর হলো এই ধকলের প্রতিক্রিয়া। ফলে আমরা আশা করছি, মাশরাফি যথাসময়ের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠবে।' [১]*

মাশরাফির জন্য এটা অনেক বড় না হলেও বেশ একটা ধাক্কা ছিল। ইনজুরি তত দিনে গা-সওয়া ব্যাপার হয়ে গেছে। ইনজুরি হবে, মাশরাফি দেশে ফিরবেন এবং নড়াইলে কিছু আড্ডা, কিছু রোমাঞ্চ হবে; এটাই এখন নিয়ম হয়ে গেছে। কিন্তু ক্রিকেট মাঠে সময়টা বড় ভালো যাচ্ছিল, তাই একটু আফসোস হওয়াটা অন্যায় নয়।

তবে সেদিন দেশে ফেরার আগে সংবাদমাধ্যমে বলেছিলেন, হাড়ে যে ফাটল ধরা পড়েনি, এতেই খুশি তিনি, *'এই নিয়ে ছয়বার কোনো সিরিজের মাঝপথে আমাকে দলের সঙ্গ ছাড়তে হচ্ছে। তারপরও আমি খুশি যে, কোনো ফ্লাকচার নেই। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম, অনেক বড় কিছু হয়েছে। এখন একটু স্বস্তি পাচ্ছি। ফ্র্যাকচার হলে ফিরে আসতে অনেক সময় লাগত। এই সিরিজটা মিস করব। তবে এটা জেনে ভালো লাগছে যে, লম্বা সময় ক্রিকেট মিস করতে হবে না।' [২]*

আসলেই এবার লম্বা সময় ধরে ক্রিকেট থেকে দূরে থাকতে হয়নি মাশরাফিকে। ২০০৬ সালের শুরুতেই, ফেব্রুয়ারির ২০ তারিখ ফিরে এসেছিলেন মাঠে। শুধু ফিরে এসেছিলেন, তা-ই নয়, ক্যারিয়ারের সেরা দুটি সময়ের একটি শুরু করেছিলেন এবার ফিরে।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু করা এই বছরটাকে পরিসংখ্যানের হিসাবে মাশরাফির জীবনের সফল বছর বলা চলে। টেস্ট ও ওয়ানডে মিলিয়ে এ বছর খেলেছিলেন ৩০টি ম্যাচ। এর চেয়ে বেশি ৩৩ ও ৩৫টি করে ম্যাচ খেলেছেন যথাক্রমে ২০০৭ ও ২০০৮ সালে। কিন্তু সাফল্যের বিচারে ২০০৬ সালকে কেউ ছাপিয়ে যেতে পারেনি।

এ বছর ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেরা ২৩.৫৪ গড়ে ৫৩টি আন্তর্জাতিক উইকেট নিয়েছিলেন। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেরা গড় শুনে যাদের ভ্রু কুঁচকে গেছে, তাদের জন্য জানানো মাশরাফির ক্যারিয়ারের সেরা গড় ছিল ২০০৯ সালে; সে গল্প

যথাসময়ে হবে।

২০০৬ সালের কথা বলি। সে বছর প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে এক ক্যালেন্ডার ইয়ারে পঞ্চাশোর্ধ্ব আন্তর্জাতিক উইকেট নিয়েছিলেন এবং ওয়ানডেতে বছরের সেরা বাংলাদেশি বোলার হয়েছিলেন। এবং মহাউল্লেখযোগ্যভাবে এই বছরে বিশ্বের সর্বোচ্চ ওয়ানডে উইকেটশিকারি ছিলেন মাশরাফি বিন মুর্তজা।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আসুন; আমরা প্রবেশ করি মাশরাফির শিখরে ওঠার বছরটিতে।

২.

২০১৩-১৪ সালে একটা সময় মনে হচ্ছিল, শ্রীলঙ্কা দলের ক্রিকেটাররা বাড়িঘর কিনে বাংলাদেশে স্থায়ী হয়ে যাবেন। টানা বিভিন্ন উপলক্ষে বাংলাদেশ সফর শেষই হচ্ছিল না তাদের।

বাংলাদেশের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সফর লেনদেন হওয়া শ্রীলঙ্কার এই সম্পর্কটা শুরু হয় ২০০৫-০৬ সালে। ২০০৫ সালের শেষ দিকে শ্রীলঙ্কা সফরের শুরুতে ইনজুরির কারণে দেশে ফিরে আসা মাশরাফি সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরতে ফিরতে শ্রীলঙ্কাই চলে এল বাংলাদেশে।

মাস তিনেকের মধ্যে পুরো সুস্থ হয়ে মাঠেও ফিরে আসেন মাশরাফি বিন মুর্তজা। যদিও টেস্ট সিরিজের আগে পুরোপুরি ফিট হয়ে ওঠা হয়নি মাশরাফির। তবে ওয়ানডেতে পুরো শক্তির মাশরাফিকেই পায় বাংলাদেশ।

বগুড়ায় খুবই ম্যাড়মেড়েভাবে শুরু হয়েছিল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজটা। প্রথম ম্যাচে ৫ উইকেটে হেরেছিল বাংলাদেশ। পেরেরা, মারুফদের বোলিংয়ে ১১৮ রানে অলআউট হয়েছিল স্বাগতিকেরা। মাশরাফি শুরুতেই জয়াসুরিয়াকে ফেরালেও ৫ উইকেট হারিয়েই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় তারা।

তবে এই ম্যাচটা স্মরণীয় অন্য কারণে। এই ম্যাচ দিয়েই শুরু হয় মাঠের বাইরের ঘনিষ্ঠ দুই বন্ধু মাশরাফি-রাসেলের নতুন বলের জুটি। কার্যত পরবর্তীকালের প্রিয় বন্ধুত্রয়ী মাশরাফি-রাজ্জাক-রাসেলের আন্তর্জাতিক ম্যাচে একত্র হওয়া এই প্রথম।

প্রথম ম্যাচের হতাশা কাটিয়ে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচেই আবার জায়ান্ট কিলারের ভূমিকায় ফিরে আসে ডেভ হোয়াটমোরের বাংলাদেশ।

সনাৎ জয়াসুরিয়ার শেষ বয়সের ৯৬ রানের পরও শ্রীলঙ্কা ২১২ রানে অলআউট হয়েছিল। মাশরাফি ১০ ওভারে ২ মেডেন নিয়ে এবং ৩১ রান মাত্র ব্যয় করে একটি উইকেট নিয়েছিলেন। আশরাফুলের ফিফটিসহ কয়েকটা কার্যকর ইনিংসে ৩ ওভার ও ৪ উইকেট অক্ষত রেখে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ।

সিরিজের শেষ ম্যাচ।

মাশরাফির জন্য মুদ্রার দুই পিঠ দেখে ফেলা এক ম্যাচ। খেলা শুরু হতে না-হতেই নায়ক মাশরাফি। শ্রীলঙ্কার স্কোর বোর্ডে ১৭ রান উঠতেই দুই ওপেনার উপুল

থারাঙ্গা ও জয়াসুরিয়া প্যাভিলিয়নে। নিজের প্রথম ওভারের পঞ্চম বলে বিনা রানে ফেরত পাঠিয়েছিলেন মাশরাফি থারাঙ্গাকে। কিন্তু এরপর সাঙ্গাকারা, জয়াবর্ধনে ও লোকুয়ারাচ্চির তাণ্ডবে ৩০৯ রান তুলে ফেলল শ্রীলঙ্কা।

মাশরাফি প্রথম ৫ ওভারে ২টি মেডেন নিলেন, ৫টি মাত্র রান দিয়ে ২ উইকেটের মালিক। ইনিংস শেষে ১০ ওভারে ব্যয় তার ৭১ রান। মানে পরের ৫ ওভারে ৬৬ রান, উইকেট নেই!

বাংলাদেশ আশরাফুলের ফিফটির পরও ম্যাচ হেরেছিল ৭৮ রানে।

৩.

বাংলাদেশ দল এ যাবৎকালে সবচেয়ে পরিকল্পিতভাবে যে টুর্নামেন্টটি খেলেছে, তার নাম ২০০৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ।

এই বিশ্বকাপ সামনে রেখে ২০০৬ সাল থেকে দেশে ও দেশের বাইরে একটার পর একটা ওয়ানডে সিরিজ খেলছিল বাংলাদেশ। যদিও প্রতিপক্ষ ছিল কেনিয়া, জিম্বাবুয়ে, স্কটল্যান্ডের মতো দেশ। সঙ্গে এই সময়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পূর্ণাঙ্গ সিরিজ ও চ্যাম্পিয়নস ট্রফিও খেলেছে হাবিবুলের দল। তবে দৃশ্যত দুর্বল দল হলেও বাকি সিরিজগুলোতে টানা জয় বাংলাদেশকে দারুণ একটা জয়ের অভ্যেসে নিয়ে আসে।

মাশরাফিও ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো ২০০৬ থেকে শুরু করে ২০০৯ অবধি টানা ক্রিকেট খেলতে থাকেন। এই সময় একমাত্র তিনি তাকে নিয়ে আন্তর্জাতিক যে ধারণা ছিল, তার প্রতি সুবিচার করতে পারার মতো পরিমাণে ক্রিকেট খেলতে পেরেছেন।

এই পুরো ব্যাপারটার সূচনা বলা চলে দেশের মাটিতে কেনিয়ার আগমন থেকে। যদিও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে একটা সফল সিরিজকেও সূচনা বলা যাবে; তবে সাফল্যের কারণেই আমরা কেনিয়াকে গুরুত্ব দেব।

কেনিয়ার বিপক্ষে ২০০৬ সালের মার্চে ৪ ম্যাচ সিরিজ খেলে বাংলাদেশ। এখানে একটা ব্যাপার প্রমাণের ছিল যে, আসলেই বাংলাদেশ নব্বই দশকজুড়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এই দলটির চেয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে।

প্রথম ম্যাচে ১৩১ রানের বিশাল জয় দিয়ে সেই প্রমাণের শুরু। এই ম্যাচকে মাশরাফি স্মরণীয় করে রেখেছেন দানবীয় এক ইনিংসের কারণে। ১৬ বলে ৫টি চার ও ভয়ানক ৩টি ছক্কায় সাজানো ৪১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে দলকে পার করে দেন ৩০০ রান। জবাবে কেনিয়া ১৭০ রানে অলআউট হলেও মাশরাফি উইকেটশূন্য ছিলেন।

পরের ম্যাচে মাশরাফি ৯.৫ ওভার বল করে ২৬ রানে নেন ২ উইকেট। কেনিয়া অলআউট হয় ১৬১ রানে। বাংলাদেশ ৯ উইকেটে ম্যাচ জেতে। বোঝাই যায়, কেনিয়ার মতো দলকে নিয়ে ছেলেখেলা করতে শিখে গেছে বাংলাদেশ।

তৃতীয় ম্যাচে অবশ্য বেশ লড়াই করতে পেরেছিল কেনিয়া। বাংলাদেশকে ২৩১ রানে অলআউট করেও ২০ রানের পরাজয় দেখতে হয়েছিল সফরকারীদের। মাশরাফির প্রবল কৃতিত্ব মনে রাখতে হবে। ৯.২ ওভার বল করে ২টি মেডেন নিয়েছিলেন; ৩৮ রানে নেন ৩ উইকেট। মূল নায়ক ৪৭ রানে ৫ উইকেট নেওয়া রফিক।

আর চতুর্থ ম্যাচে কেনিয়াকে পুরোনো যোদ্ধা স্টিভ টিকোলোর ৮১ রানের পরও ২৩২ রানে অলআউট করে বাংলাদেশ। মাশরাফি ১০ ওভারে ১ মেডেন নেন; ৩৮ রানে নেন ২ উইকেট। বাংলাদেশ রাজিন সালেহর সেঞ্চুরিতে ৭ উইকেটে জয় পায়।

৪.

শাহাদাত হোসেন রাজীবের শর্ট বল। রিকি পন্টিং পুল করলেন; ক্যাচ উঠল ফাইন লেগে। সেই বাউন্ডারি থেকে দৌড় শুরু করেছেন মাশরাফি। ছুটছেন, ছুটছেন, ছুটছেন। হাত বাড়িয়ে শূন্যে ছুড়ে দিলেন শরীর। তারপরও একটু দূরত্ব রয়েই গেল। বল হাতে এল না। মাটিতে পড়ল সেই হাফ চান্স; দেশজুড়ে একটা শব্দই শোনা গেল যেন—আহ!

হ্যাঁ, ফতুল্লা টেস্টের ক্লাসিক ফুটেজ হতে পারে এই দৃশ্যটা।

এখন পর্যন্ত নিশ্চয়ই বাংলাদেশের ইতিহাসের সেরা কয়েকটা টেস্ট পারফরম্যান্সের তালিকা করলেন অস্ট্রেলিয়ার সর্বজয়ী সেই দলের বিপক্ষে ফতুল্লা টেস্টের পারফরম্যান্সকে ওপরের দিকে রাখতে হবে। এখন পর্যন্ত সেই ম্যাচের কথা স্মরণ করে অ্যাডাম গিলক্রিস্ট বলেন, '*ইতিহাস বলবে না, খেলাটা কত কঠিন ছিল। আমার ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা সেঞ্চুরিটা করেছিলাম আমি। এই সেঞ্চুরিটা সারা জীবন একটা খেয়াল না করা বাক্সে বন্দী হয়ে থাকবে, কারণ এই জয়টা আমরা পেয়েছিলাম বাংলাদেশের মাটিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে।' [৩]*

সময়টা ছিল বাংলাদেশকে এক দিনে হারানোর পরিকল্পনা করার সময়। যদিও বাংলাদেশ এর মধ্যে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ জিতে ফেলেছে, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রতিরোধটাই তখনো স্বপ্নের মতো। সেখানে বাংলাদেশ সফরে আসা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম টেস্টে উল্টো জয়ের মতো অবস্থায় থাকাটা কল্পনাতীত একটা ব্যাপার ছিল।

ব্রেট লি, জেসন গিলেস্পি, শেন ওয়ার্ন, স্টুয়ার্ট ম্যাকগিল; এই বোলিং লাইনআপ দেখলে অনেক ব্যাটসম্যানই পরদিন খেলতে রাজি হবে না। সেখানে এই বোলিংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশ ৫ উইকেটে ৩৫৫ রান তুলে প্রথম দিন শেষ করেছিল। একপর্যায়ে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ২ উইকেটে ২৬৫!

শেষ পর্যন্ত শাহরিয়ার নাফীসের কিংবদন্তি হয়ে যাওয়া ১৩৮ এবং হাবিবুল ও

রাজিনের ফিফটিতে ৪২৭ রান করেছিল বাংলাদেশ। ম্যাকগিল ৮ উইকেট নিয়েছিলেন। তার চেয়ে বড় খবর হলো, শেন ওয়ার্ন জীবনে প্রথমবার শতাধিক রান ব্যয় করে উইকেটহীন ছিলেন!

জবাব দিতে নেমে মাশরাফির বুলেটের মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া। ম্যাচের তৃতীয় ওভারেই ম্যাথু হেইডেন ফেরত। ৯৩ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে ফেলা অস্ট্রেলিয়া শেষ পর্যন্ত ২৬৯ রান করতে পারল গিলক্রিস্টের ক্যারিয়ার-সেরা সেঞ্চুরির কল্যাণে।

তবে দ্বিতীয় ইনিংসে অভ্যেসমতোই ধসে পড়েছিল বাংলাদেশ। তারপরও অস্ট্রেলিয়ার সামনে জয়ের লক্ষ্য দাঁড়াল ৩০৭। ভালো শুরু করা অস্ট্রেলিয়া ১ উইকেটে ১৭৩ রান তুলে ফেলার পর একটা বিপর্যয়ে পড়েছিল। ৬ উইকেট হারিয়ে ফেলে তারা ২৩১ রানে। উইকেটের একপাশে চলে এসেছেন তখন ব্রেট লি। অন্য প্রান্তে তখন পন্টিংয়ের সেই ক্যাচ।

অবশ্য ম্যাচ শেষে মাশরাফির এই 'মিস'কে কোনোভাবেই ক্যাচ মিস বলতে রাজি হননি সেদিন হাবিবুল বাশার, 'হ্যাঁ, সে ওটা ধরতে পারলে তো পরিস্থিতি, ফলাফল ভিন্ন হতো। তবে আমাকে বলতেই হবে সে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে, এর চেয়ে বেশি করা সম্ভব ছিল না। মনে রাখবেন, সে একজন হৃদয় উজাড় করা ক্রিকেটার। এই ফলাফলে সে নিজেও অত্যন্ত হতাশ।' [৪]

এই হতাশার পরও ফতুল্লা টেস্ট নিশ্চয়ই ভুলবেন না মাশরাফিরা।

ফতুল্লা টেস্টের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে না পারলেও চট্টগ্রামে বোলিংয়ের শুরুটা অন্তত রফিকের কল্যাণে ভালোই হয়েছিল। তবে এই টেস্টটা জেসন গিলেস্পি স্মরণীয় করে রেখেছেন নাইট ওয়াচম্যান হিসেবে নেমে ডাবল সেঞ্চুরি করে এবং ডাবল সেঞ্চুরি করেও টেস্ট ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাওয়ায়!

৫.

আরও একটা বিস্মরণযোগ্য সিরিজ। এমন সিরিজ বাংলাদেশ অনেক অনেক খেলেছে। কিন্তু ২০০৬ সালের ধারাবাহিকতার সঙ্গে একটু বেমানান ছিল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজটা। প্রতিটা ম্যাচ যাচ্ছে তাই ভাবেই হেরেছিল বাংলাদেশ।

যথাক্রমে ৪ উইকেট, ৬৭ রান ও ৯ উইকেটে হেরেছিল বাংলাদেশ। মাশরাফি দ্বিতীয় ম্যাচের শুরুতেই পরপর তিন ওভারে পর্যায়ক্রমে গিলক্রিস্ট, ক্যাটিচ ও পন্টিংয়ের উইকেট নিয়ে একটা ভিন্ন কিছুর আভাস দিচ্ছিলেন। বিনা উইকেটে ৫৫ থেকে ১০ রানের ব্যবধানে মাশরাফির তোপে ৩ উইকেটে ৬৫ রানে পরিণত হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। লাভের লাভ হয়নি। সাইমন্ডসের সেঞ্চুরি কপাল পুড়িয়েছিল। ৩ ম্যাচে মাশরাফির সংগ্রহ ছিল ৪ উইকেট।

৬.
ফারুক আহমেদ আরেকটা 'ঝামেলা' পাকালেন।
দলে দুই দুজন বাঁহাতি স্পিনার আছেন–মোহাম্মদ রফিক ও আবদুর রাজ্জাক। এর মধ্যে রফিকের ব্যাটে কিছু রান আছে। আর নিতান্তই যদি বাঁহাতি স্পিনার, তথা অলরাউন্ডার লাগে তো বাইরে মানজারুল ইসলাম রানা আছেন। কিন্তু ফারুক দলে একটা কিশোর অলরাউন্ডার নিয়ে নিলেন; সে আবার বাঁহাতি স্পিনার। তার নাম সাকিব আল হাসান।
সাকিবকে স্কোয়াডে নিয়ে জিম্বাবুয়ে-কেনিয়া জোড়া সফরে গেল বাংলাদেশ। প্রথম চার ওয়ানডেতে স্বভাবতই তার খেলার সুযোগ হয়নি।
জিম্বাবুয়েতে অনুশীলন ম্যাচ থেকেই মাশরাফি বুঝিয়ে দিলেন, সময়টা তার। প্রথমবারের মতো জিম্বাবুয়ে সফরে যাওয়া মাশরাফি জিম্বাবুয়ে বোর্ড একাদশের বিপক্ষে ২৯ রানে ৫ উইকেট নিয়ে ৫ উইকেটে দলকে জেতালেন অনুশীলন ম্যাচে।
মূল সিরিজের শুরুটা দলের ভালো হলো না। মাশরাফি ৪১ রানে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন বটে; বাংলাদেশ হেরেছিল ২ উইকেটে।
দ্বিতীয় ম্যাচে অবশ্য বাংলাদেশ পরাক্রম নিয়েই ফিরে আসে; ৬২ রানে জিতে সিরিজে সমতা ফেরায়। মাশরাফি ৩১ রানে নেন ১ উইকেট।
চতুর্থ ম্যাচে জিম্বাবুয়ে ৭ উইকেটের বড় জয় নিয়ে সিরিজ নিশ্চিত করে ফেলে ৩-১ ব্যবধানে। মাশরাফি ২৮ বলে ২৩ রানের ইনিংস খেলেছিলেন এবং বল হাতে উইকেটশূন্য ছিলেন। এই ম্যাচের আরেকটা স্মরণীয় দিক ছিল–হাবিবুল বাশারের ইনজুরিতে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক করা হয় খালেদ মাসুদ পাইলটকে। সেই ২০০৩ কমিশনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করে পাইলটকে এই সিরিজের বাকি দুই ম্যাচ ও কেনিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজে অধিনায়কত্ব দেওয়া হয়।
সিরিজ পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় শেষ ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হয়। আর এই ম্যাচে অভিষেক হয়ে যায় সাকিব আল হাসানের।
জিম্বাবুয়ে থেকে সিরিজ শেষ করে সরাসরি বাংলাদেশ চলে যায় কেনিয়ায়। আর এখানেই মাশরাফি ক্যারিয়ারের অন্যতম স্মরণীয় তিনটি ম্যাচ খেলেন। টানা তিন ম্যাচে ম্যান অব দ্য ম্যাচ ও ম্যান অব দ্য সিরিজ হন মাশরাফি।
প্রথম ম্যাচে কেনিয়ার প্রথম তিন ব্যাটসম্যানকে ফেরায় যথাক্রমে ১, ০ ও ৫ রানে। ৬ উইকেটে জেতা ম্যাচে ম্যাচসেরা খুঁজে পেতে কষ্ট করতে হয়নি।
তবে নাটকীয় ছিল দ্বিতীয় ম্যাচটা।
রাসেল ও মাশরাফির তোপে ৪৫ রানে ৬ উইকেট হারানো কেনিয়াকে ১৮৪ রানে নিয়ে গিয়েছিলেন আট নম্বরে নামা টমাস ওডোয়ো। মাশরাফি ৫৩ রানে নিয়েছিলেন ৩ উইকেট। জবাব দিতে নেমে বাংলাদেশও বিপর্যয়ে পড়ে; ১২০ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল তারা। উইকেটে এলেন মাশরাফি। একটু পর ফিরলেন শেষ স্বীকৃত ব্যাটসম্যান খালেদ মাসুদও। বন্ধু রাজ্জাককে নিয়ে দৃশ্যত

অসম্ভব জয়ের বন্দরে ভেড়ালেন মাশরাফি দলকে। শেষ পর্যন্ত ৫৩ বলে ৪৩ রানের অসামান্য এক ইনিংস খেলে অপরাজিত রইলেন।

আর শেষ ম্যাচটা ছিল 'দ্য মাশরাফি শো'। প্রথম দুটো উইকেট নিয়েছিলেন রাসেল ও রফিক। এরপর মাশরাফির একেবারেই একক এক শো। টানা ছয় ছয়টি উইকেট তুলে নিলেন। শেষ পর্যন্ত ১০ ওভারে ২৬ রান দিয়ে ৬ উইকেট। দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের সেরা বোলিং ফিগার হয়ে ছিল এই পারফরম্যান্স।

বাংলাদেশ-কেনিয়া
দ্বিতীয় ওয়ানডে
তারিখ : ১৩ আগস্ট, ২০০৬
ভেন্যু : জিমখানা ক্লাব গ্রাউন্ড, নাইরোবি
টস : কেনিয়া (ব্যাটিং)
ফল : বাংলাদেশ ২ উইকেটে জয়ী
ম্যান অব দ্য ম্যাচ : মাশরাফি বিন মুর্তজা

কেনিয়া

ব্যাটসম্যান	**রান**	**বল**	**৪**	**৬**
ওটিয়ানো এলবিডব্লু রাসেল	৫	১৭	১	
ওউমা ক নাফীস ব রাসেল	২৬	৩১	৩	
কামান্ডে ক মাসুদ ব রাসেল	৩	১৯		
টিকোলো এলবিডব্লু রাসেল		৫		
হিতেশ এলবিডব্লু মাশরাফি	১	৫		
ওবুইয়া ক রাজিন ব রাসেল	১	৬		
তন্ময় এলবিডব্লু রাজ্জাক	১৭	৩৩	১	
ওডোয়ো ক মাসুদ ব সাকিব	৮৪	৯৭	৭	৪
ওদিয়াম্বো এলবিডব্লু রাজ্জাক	১৮	২৬	১	১
ওনগোন্ডো ক আশরাফুল ব মাশরাফি	১৩	৩৮		
আবাবু অপরাজিত		৫		
অতিরিক্ত (লেবা ৫, ও ৮, নো ৩)	১৬			
মোট (৪৬.৩ ওভারে অলআউট)	১৮৪			

বোলিং : সৈয়দ রাসেল ১০-২-২২-৪, ফরহাদ ৫-০-২৩-০ মাশরাফি ৯-০-৫৩-৩, রাজ্জাক ৯-১-২১-২, রফিক ৭-১-৩৪-০, সাকিব ৬.৩-১-২৬-১।

৭.

২০১৫ সালে বাংলাদেশ ওয়ানডে দল অসামান্য এক সময় পার করায় হঠাৎ দারুণ আলোচ্য ব্যাপার হয়ে উঠেছিল চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নামে এক আসর। এর আগে কখনোই এই আসরের মূল টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ পায়নি বাংলাদেশ। কারণ টুর্নামেন্টের শর্ত হলো, আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের সেরা আট দল খেলবে এখানে। এ বছর নিজেদের পারফরম্যান্স নিয়ে বাংলাদেশ সেরা আট নয়, সেরা সাতেই ঢুকে পড়ে। তবে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির নিয়ম সব সময় এ রকম ছিল না। আইসিসির ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি নিয়ম বদলেছে এই টুর্নামেন্ট।

একসময় নিয়ম ছিল আট দলের এই টুর্নামেন্টে প্রথম ছয় দল সরাসরি খেলত। বাকি দুদল বাছাই গ্রুপের খেলা পার করে আসত। ২০০৬ সালে বাংলাদেশ

গিয়েছিল সেই বাছাই গ্রুপের খেলা খেলতে। মাশরাফির জন্য সে যাত্রাটা ছিল খুব পরিচিত এলাকায় ফিরে যাওয়ার মতো।

ক্যারিয়ারের শুরুতে দফায় দফায় চিকিৎসা ও খেলার জন্য ভারতে গিয়েছেন। এরপর থেকে অবশ্য চিকিৎসার ঠিকানা বদলে গেছে; এখন তার গতায়াত মেলবোর্নে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে তাই বহু বছর পর আবার ফিরে গেলেন সেই ভারতে।

বাংলাদেশ

ব্যাটসম্যান	**রান**	**বল**	**৪**	**৬**
রাজিন ক ওবুইয়া ব ওনগোন্ডো	৩	১৯		
শাহরিয়ার ক ওবুইয়া ব ওদিয়াম্বো	১৮	৩৪	২	০
আফতাব ক টিকোলো ব ওদিয়াম্বো	৩৮	৬৮	৪	১
সাকিব ক ওটিয়ানো ব ওদোয়ো	১৩	১১	২	
আশরাফুল ক ওটিয়ানো ব ওডোয়ো	৬	১০	১	
ফরহাদ ক তন্ময় ব ওডোয়ো	১৫	১৮	৩	
মাসুদ ক হিতেশ ব আবাবু	১৩	৪৫	১	
রফিক এলবিডব্লু ওডোয়ো		৭		
মাশরাফি অপরাজিত	৪৩	৫৩	৬	
রাজ্জাক অপরাজিত	১৭	২৩	১	১
অতিরিক্ত (লেবা ১, বা ১, ও ৮, নো ১২)	১৪			
মোট (৪৬ ওভারে, ৮ উইকেটে)	১৮৫			

বোলিং : ওডোয়ো ৪/৩৬, ওনগোন্ডো ১/১৯, ওদিয়াম্বো ২/৫২ আবাবু ১/৪৩, টিকোলো ০/১৮, কামান্ডে ০/১০, ওবুইয়া ০/৫।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আগে শুধু ইনজুরির স্মৃতি ফিরে আসেনি; ইনজুরিও ফিরে এসেছিল–ভুতুড়ে এক ইনজুরি।

বাড়ির সিঁড়িতে পা ফসকে গিয়ে মচকে গিয়েছিল গোড়ালি। ফলে একটু অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল মাশরাফির চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলা। এই ইনজুরির কারণে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির প্রস্তুতি হিসেবে দেশে নিজেরা নিজেরা যে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছিল বাংলাদেশ, তার প্রথমটি মিসও করেছিলেন তিনি।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই ইনজুরির ধকল কাটিয়ে ধরেছিলেন চণ্ডীগড়ের বিমান।

বাংলাদেশের প্রথম পর্বে খেলা ছিল শ্রীলঙ্কা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। শেষ ম্যাচে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে শাহরিয়ার নাফীসের সেঞ্চুরিতে জয় পেলেও বাকি দুই ম্যাচে ভরাডুবিই হয়েছিল।

শ্রীলঙ্কা আগে ব্যাট করে ৩০২ রানে করেছিল। মাশরাফি একটি উইকেট নিয়েছিলেন। সেদিনের মাশরাফির হাইলাইটস হতে পারে বরং তার ফিল্ডিং। ব্যাট হাতে সাকিবের ৬৭ রানের পরও বাংলাদেশ ৯ উইকেটে ২৬৫ রানের চেয়ে বেশি দূর যেতে পারেনি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আগে ব্যাট করা বাংলাদেশ করতে পেরেছিল সাকল্যে ১৬১ রান। ক্রিস গেইলের সেঞ্চুরিতে কোনো উইকেট না হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ক্যারিবীয়রা।

শেষ ম্যাচে বাংলাদেশ ১০১ রানে হারিয়েছিল জিম্বাবুয়েকে। নাফীসের ১২৩ রানে ভর করে বাংলাদেশ করেছিল ৬ উইকেটে ২৩১ রান। জবাবে ১৩০ রানে অলআউট হয়ে যায় জিম্বাবুয়ে। মাশরাফি ছিলেন সেদিন কৃপণ এক বোলার। ৭ ওভার বল করে ২টি মেডেন ছিল; ১৬টি মাত্র রান ব্যয় করে এক উইকেট নিয়েছিলেন।

বাংলাদেশ-কেনিয়া
তৃতীয় ওয়ানডে
তারিখ : ১৫ আগস্ট, ২০০৬
ভেন্যু : জিমখানা ক্লাব গ্রাউন্ড, নাইরোবি
টস : বাংলাদেশ (ফিল্ডিং)
ফল : বাংলাদেশ ৬ উইকেটে জয়ী
ম্যান অব দ্য ম্যাচ : মাশরাফি বিন মুর্তজা
ম্যান অব দ্য সিরিজ : মাশরাফি বিন মুর্তজা

কেনিয়া

ব্যাটসম্যান	**রান**	**বল**	**৪**	**৬**
ওটিয়ানো এলবিডব্লু রাসেল		১		
ওউমা ব রফিক	১৪	৪৩	১	
মালহার এলবিডব্লু মাশরাফি	১৫	৫৪		
টিকোলো ক রাজ্জাক ব মাশরাফি	১৪	১৭	২	
তন্ময় ব মাশরাফি	১২	১৪	২	
ওডোয়ো ক মাসুদ ব মাশরাফি	২৯	৫৯	১	১
ওবুইয়া এলবিডব্লু মাশরাফি	৮	১২	১	
ব্রিজাল ক ফরহাদ ব মাশরাফি	১	৮		
ওদিয়াম্বো এলবিডব্লু রাজ্জাক		২		
ওনগোন্ডো ব রাসেল	১৪	৩৪		১
আবাবু অপরাজিত		৪		
অতিরিক্ত (লেবা ২, ও ৯)	১১			
মোট (৪১.২ ওভারে অলআউট)	১১৮			

বোলিং : সৈয়দ রাসেল ৮.২-১-১৮-২, ফরহাদ ৩-১-৮-০ রফিক ৬-০-১৬-১, মাশরাফি ১০-০-২৬-০, রাজ্জাক ৬-০-২০-১ সাকিব ৮-০-২৮-০।

৮.

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি যেখানে শেষ হয়েছিল, সেখান থেকেই দেশে ফিরে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজ শুরু করল বাংলাদেশ।

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সর্বশেষ দুই সিরিজে এক ধরনের সমতা ছিল। বাংলাদেশ ২০০৫ সালে দেশের মাটিতে জেতার পর ২০০৬ সালেই জিম্বাবুয়েতে গিয়ে হেরে ফিরতে হয়েছিল। এবার দেশের মাটিতে কয়েক মাসের ব্যবধানে আবার জিম্বাবুয়ে। প্রতিশোধ নেওয়ার পালা।

প্রতিশোধই শুধু নিল না বাংলাদেশ, ৫টি ম্যাচে জিম্বাবুয়েকে নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করে নিজেদের ইতিহাসের প্রথম হোয়াইটওয়াশের দেখা পেয়ে গেল বাংলাদেশ। বলে রাখা দরকার আতহার আলী খানের 'বাংলাওয়াশ' শব্দের তখনো আবিষ্কার হয়নি, তাই সেটা স্রেফ হোয়াইটওয়াশই ছিল।

পাঁচটি ম্যাচে যথাক্রমে ৯ উইকেট, ৬ উইকেট, ২৬ রান, ৮ উইকেট ও ৩

উইকেটের জয় পেয়েছিল বাংলাদেশ। মাশরাফি পঞ্চম ম্যাচে ৩টি, চতুর্থ ম্যাচে ৩টি, তৃতীয় ম্যাচে ৩টি ও দ্বিতীয় ম্যাচে ২টি; মোট ১১ উইকেট নিয়েছিলেন ৫ ম্যাচের সিরিজে।

বাংলাদেশ

ব্যাটসম্যান	**রান**	**বল**	**৪**	**৬**
শাহরিয়ার ক ওটিয়ানো ব ওদোয়ো	১৮	২২	৪	০
আশরাফুল ক টিকোলো ক ওনগোন্ডো	১৫	২৩	২	
আফতাব ক টিকোলো ব ওনগোন্ডো	৫	৮	১	
তুষার রানআউট	২	১৩		
সাকিব অপরাজিত	২৫	৫৩	৪	
ফরহাদ অপরাজিত	৪১	৪৮	৭	১
অতিরিক্ত (লেবা ৪, ও ৫, নো ৫)	১৪			
মোট (২৭ ওভারে, ৪ উইকেটে)	১২০			

বোলিং : ওডোয়ো ৮-০-২০-১, ওনগোন্ডো ১০-৪-৩৭-২
ওদিয়াম্বো ৬-১-২৭-০, আবাবু ৩-০-৩২-০।

এই সিরিজে বাংলাদেশের ক্রিকেটে অভিনব একটা ঘটনা ঘটেছিল। দুনিয়ায় নতুন চালু হওয়া টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে যাত্রা শুরু করে ফেলেছিল বাংলাদেশ। ২০০৬ সালের ২৮ নভেম্বর খুলনায় বাংলাদেশ খেলেছিল নিজেদের ইতিহাসের প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। তখনকার ট্র্যাডিশন অনুযায়ী সিরীয় ক্রিকেটার হিসেবে অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সে ম্যাচে খেলেননি; অধিনায়কত্ব করেছেন শাহরিয়ার নাফীস।

আর দেশের ইতিহাসের প্রথম সেই টি-টোয়েন্টির ম্যাচসেরা ছিলেন মাশরাফি বিন মুর্তজা। তবে মজাটা হলো মাশরাফি ম্যাচসেরা হয়েছিলেন ব্যাটিংয়ের জন্য।

আগে ব্যাট করতে নেমে নাফীস, আফতাব ও সাকিবের ছোট ছোট কয়েকটা ইনিংসের পরও বাংলাদেশের স্কোরটা ভালো হতে পারত না। মাশরাফি ২৬ বলে ২টি চার ও ২টি ছক্কায় ৩৬ রান করে সেটা করে দিলেন। জবাব দিতে নেমে রাজ্জাকের দুরন্ত বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি জিম্বাবুয়ে। রাজ্জাক ৪ ওভারে ১৭ রান দিয়ে ৩টি উইকেট নিয়েছিলেন; একটি মেডেনও ছিল। মাশরাফি ৪ ওভারে ২৯ রান দিয়ে প্রথম আঘাতটা হেনেছিলেন।

৯.

জিম্বাবুয়ে দেশ ছাড়তে না-ছাড়তেই চলে এল স্কটল্যান্ড।

স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের এই সিরিজের ফলাফল লোকে আগেই অনুমান করে নিয়েছিল। অপেক্ষা ছিল খেলোয়াড়দের মাঠে সেটা করে দেখানো। মাশরাফি অবশ্য খেললেন এই সিরিজে একটা মাত্র ম্যাচ। (কেন? বিশ্রাম?) সে ম্যাচে মাশরাফি ৪৯ রানে ২ উইকেট নিলেন; বাংলাদেশ জিতল ৬ উইকেটে।

এই ম্যাচের ভেতর দিয়ে মাশরাফির ২০০৬ সালের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেষ হলো। আমরা অবশ্য আরেকটু এগোব। ২০০৭ সালেও ঢুকে পড়ব। বিশ্বকাপ

সামনে রেখে বাংলাদেশ আবারও জিম্বাবুয়ে যাচ্ছে। জিম্বাবুয়ের সঙ্গে একেবারে নিয়মিত যাতায়াতের সম্পর্ক হয়ে গেছে।

আর মাত্র কয়েক মাস পরই ওয়েস্ট ইন্ডিজে বিশ্বকাপ। এমন সময়ে আরেকটা সফরে জিম্বাবুয়ে যাওয়া নিয়ে সমালোচনা ছিল। সবচেয়ে বেশি সমালোচনা ছিল গত কয়েক মাসে ২০ জনেরও বেশি ওপেনারকে একাদশে চেষ্টা করার পর তামিম ইকবালকেও স্কোয়াডে আবার যোগ করে দেওয়ায়।

তামিমের পরিচয় বলতে লোকে তখন জানে, নাফীস ইকবালের ভাই এই গাঁট্টাগোঁট্টা ছেলেটা। আর আকরাম খানের ভাতিজা। কে জানত, পরের এক দশকে এসব পরিচয় ভুলে গিয়ে মানুষ একটা পরিচয়ই মনে রাখবে–তামিম ইকবাল, দ্য গেম চেঞ্জার!

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে এই সিরিজে জয় দিয়েই শুরু করতে পেরেছিল বাংলাদেশ। সাকিব আল হাসানের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে এসেছিল ৪৫ রানের জয়। তবে নায়ক খুঁজতে চাইলে ৩১ রানে ৪ উইকেট নেওয়া মাশরাফিকেও পিছিয়ে রাখতে পারেন না।

বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে
উদ্বোধনী টি-টোয়েন্টি
ভেন্যু : খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়াম
তারিখ : ২৮ নভেম্বর, ২০০৬
টস : জিম্বাবুয়ে (ফিল্ডিং)
ফল : বাংলাদেশ ৪৩ রানে জয়ী

বাংলাদেশ

ব্যাটসম্যান	**রান**	**বল**	**৪**	**৬**
নাজমুস সাদাদ ক চিগুম্বুরা ব ব্রেন্ট	৪	৩		
নাফীস ব চিগুম্বুরা	২৫	১৭	৩	১
আফতাব ক ও ব উৎসেয়া	২৮	১৯	৪	১
সাকিব ক মাসাকাদজা ব দাবেংওয়া	২৬	২৮	২	
নাদিফ ক ব্রেন্ট ব উৎসেয়া	১০	৭	১	
ফরহাদ ক ব্রেন্ট ব উৎসেয়া	৭	৫	১	
মুশফিক ক দাবেংওয়া ব উইলিয়ামস	২	৫		
মাশরাফি ব চিবাবা	৩৬	২৬	২	২
রফিক ক চিবাবা ব ব্রেন্ট	১৩	৫	৩	
রাজ্জাক ব আয়ারল্যান্ড		২		
শাহাদাত অপরাজিত	৩	৪		০
অতিরিক্ত (লেবা ৩, ও ৭, নো ২)	১২			
মোট (১৯.৫ ওভারে অলআউট)	১৬৬			

বোলিং : ব্রেন্ট ২/৪০, আয়ারল্যান্ড ১/৩৩, চিগুম্বুরা ১/২২ উৎসেয়া ৩/২৫, উইলিয়ামস ১/২৮, দাবেংওয়া ১/১ চিবাবা ১/১৪।

দ্বিতীয় ম্যাচে জিম্বাবুয়ে আবার ফিরে এল; জিতল ৮ উইকেটে। মাশরাফি ৭ ওভার বল করে ১টি মেডেন নিলেন, ১৭টি মাত্র রান দিলেন; কাজের কাজ হলো না।

জিম্বাবুয়ে				
ব্যাটসম্যান	**রান**	**বল**	**৪**	**৬**
টেলর ব মাশরাফি	৫	৪	১	
মাৎসিকেনেরি ক নাফীস ব শাহাদাত	১৫	১৩	৩	
চিগুম্বুরা ব শাহাদাত	৪	৬	১	
মাসাকাদজা ব রাজ্জাক	৩৫	২৪	৪	১
উইলিয়ামস ক ফরহাদ ব সাকিব	৩৮	৩৯	২	২
দাবেংওয়া ব রাজ্জাক	৭	১৩		
এনকালা স্টা. মুশফিক ব রফিক	১	৫৩		
ব্রেন্ট ব রাজ্জাক	২	৫		
উৎসেয়া অপরাজিত	৭	৮		
চিবাবা রানআউট	২	২		
আয়ারল্যান্ড অপরাজিত	২	৩		
অতিরিক্ত (লেবা ২, ও ৩)	৫			
মোট (২০ ওভারে, ৯ উইকেটে)	১২৩			

বোলিং : মাশরাফি ৪-০-২৯-১, শাহাদাত ৪-০-২২-২
রফিক ৪-০-২২-১, সাকিব ৪-০-৩১-১, রাজ্জাক ৪-১-১৭-৩।

তৃতীয় ওয়ানডেতে আরেকটা ইতিহাস হলো। এই ম্যাচে অভিষেক হলো তামিম ইকবালের; করলেন মাত্র ৫ রান। বাংলাদেশ ১৪ রানে জিতল ম্যাচ। মাশরাফি ৩২ রান দিয়ে নিয়েছিলেন ১টি উইকেট।

চতুর্থ ওয়ানডেটা ছিল আবার মাশরাফির ম্যাচ। বল হাতে রানটা একটু বেশি, ৫২ রান খরচ করে হলেও ৩ উইকেট নিয়েছিলেন। ব্যাট হাতে স্কোরকার্ড বলছে সামান্য ১১ রান করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো আফতাবের ৯২ রান বা মুশফিকুর রহিমের ৫৭ রানের মতোই তাৎপর্যময় ছিল মাশরাফির ইনিংসটা। কারণ বাংলাদেশ যে মাত্র ১ উইকেটের জয় পেয়েছিল!

বাংলাদেশ ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ জয়, মাশরাফি ম্যান অব দ্য সিরিজ। তরুণ তারকা সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম ও তামিম ইকবাল রান পাচ্ছেন। রানের বন্যায় আছেন শাহরিয়ার নাফীস।

বিশ্বকাপের আগে আগে আর কী চাই!

১০.

২০০৬ সালে মারাত্মক আন্তর্জাতিক ব্যস্ততার জন্য ঘরোয়া ক্রিকেটে সেভাবে সময়ই দিতে পারেননি মাশরাফি। জাতীয় লিগে একটি ওয়ানডে ও একটি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলেছিলেন। রাজশাহীর বিপক্ষে তিন দিনের ম্যাচে একটি ইনিংসে বল করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাতে ২৭ রান দিয়ে নিয়েছিলেন ৪ উইকেট। ঢাকা মেট্রোর বিপক্ষে এক দিনের ম্যাচে উইকেট ছিল একটি। তবে পাঁচ নম্বরে ব্যাট করে ৪২ রানের ইনিংস খেলেছিলেন।

[১] Mortaza sent home; দ্য ডেইলি স্টার (ক্রিকইনফো; ৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৫)
[২] ওই
[৩] Australia's tour of Bangladesh announced; ক্রিকেট ডটকমডট এইউ (২ আগস্ট, ২০১৫)
[৪] 'It was a moral victory for us'   Bashar; ক্রিকইনফো রিপোর্ট (১৪ এপ্রিল, ২০০৬)

এবং বিবাহ



১.

কৌশিক তখন জাতীয় দলের সঙ্গে কেনিয়ায়।

হঠাৎ ঝন ঝন করে বসার ঘরে ফোনটা বেজে উঠল। ল্যান্ডফোনে কলের আওয়াজ শুনেই নাহিদ অনুমান করলেন, এটা কৌশিকের ফোন। ছুটে গিয়ে ফোন তুলতেই কোনো ভদ্রতার ধার না ধেরে বলল, 'মামা, আমি বিয়ে করব।'

নাহিদ মামা একটু থতমত খেয়ে গেলেন। ভাগনে দুনিয়ার সবকিছুতেই তার সঙ্গে পরামর্শ করে, গল্প করে। কিন্তু বিয়ে-প্রেম-সংসারের বিষয়ে তো তাদের সেভাবে কখনো কথা হয়নি। আজকালও তাদের এসব কথা বলতে কেমন সংকোচ লাগে।

জড়তা কাটিয়ে পাল্টা বললেন, 'সে তো ভালো কথা। দেশে আয়। মেয়ে দেখি। ভালো মেয়ে দেখে বিয়ে দিতে হবে তো।'

মাশরাফির কণ্ঠে যেন ভূত ভর করেছে। জেদের ভরে বলে চলেছে, 'মেয়ে ঠিক করা আছে। তুমি মামির সঙ্গে আলাপ করো। সে সব বলবে নে।'

'কোথায় মেয়ে! কার মেয়ে! দেখতে ভালো তো?'

'অত আমি বলতি পারব না। তুমি মামিরে জিজ্ঞেস করো।'
'আচ্ছা। জিজ্ঞেস করব নে। তুই দেশে আয়। আমি মেয়ে দেখি।'
'অত টাইম নেই। বিশ্বকাপ সামনে। আমি বিয়ে করে তবে বিশ্বকাপে যাব। তুমি তাড়াতাড়ি জোগাড়যন্ত্র করবা সব।'
'কী বলিস বাবা! এত তাড়াতাড়ি হয় নাকি?'
'হবে। তুমি চাইলে হবে। আরেকটা কাজ আছে...' –এবার কৌশিকের কণ্ঠটা কেমন যেন আরও ভীতু ভীতু শোনাল।
'কী?'
'বাবাকে রাজি করাতে হবে। আর মেয়েদের বাড়ি রাজি করাতে হবে। এটা তোমার কাজ।'
'মানে কী! মানে কী!'–নাহিদ সাহেব কথা শেষ করারও সুযোগ পেলেন না। ওপাশ থেকে লাইন কেটে গেছে।
নাহিদ সাহেব মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে এসে সোফায় বসে পড়লেন। এক গ্লাস পানি ঢক করে খেয়ে ফেললেন। ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না, কী করতে হবে। আগে কৌশিকের মামিকে ডাকা দরকার, 'কুহু। কুহু।'
কৌশিকের মামি সেই ভেতরের রান্নাঘরে। শুনতে পাচ্ছে না। নাহিদ মামা নিজেই এগিয়ে গেলেন, 'কুহু, কৌশিক বিয়ে করতে চায়।'
কৌশিকের মামি হাসেন, 'ভালো কথা তো। ছেলে বড় হয়েছে। বিয়ে দিবা না?'
নাহিদ মামা আরও অসহায় হয়ে পড়েন, 'সে তো দেব। কিন্তু ও নাকি মেয়ে ঠিক করে ফেলেছে। তুমি জানো নাকি কিছু? দেখেছ মেয়েকে?'
'মেয়েকে তো তুমিও দেখেছ।'
'কী বলো! আমি কোত্থেকে দেখব?'
কুহু মামি আরও রহস্যময় হাসি হাসেন, 'রোজ দিন তোমার সামনে থেকে যাতায়াত করে। তুমি ভাগনের পছন্দ বুঝতে পারলে না?'
'রহস্য করো না। কোন মেয়ে বলো।'
'আরে আমাদের সুমী। তুমি দেখো নাই।'
'বলো কী! সে তো পিচ্চি মেয়ে।'
'মেয়ে পিচ্চি নেই। তোমার কৌশিকের সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ত। এখন দেখো কীভাবে বিয়ে দেবে।'
তাই তো! তাই তো!
নাহিদ মামার প্রায় কেশহীন মাথায় চুল থাকলেও আজ মনে হয় সেগুলো পড়ে যেত। এ এক বিরাট দুশ্চিন্তা। এমনিতে দুলাভাইয়ের সঙ্গে সিরাজুল হক সাহেবের পরিবারের সম্পর্ক খারাপ না। আর ভদ্রলোক তো কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। তার পরিবার নড়াইলের অভিজাত একটা পরিবার। এ পরিবারে বিয়েতে রাজি না হওয়ার কারণ নেই।
কিন্তু সমস্যা হলো, এটা যে প্রেম!

প্রেম শুনলেই তো দুই পরিবার বেঁকে বসবে। প্রেমের বিয়েতে কেউ কি রাজি হয় নাকি!
সবচেয়ে বড় কথা, এই প্রেম হলো কবে? চোখের সামনে ছেলেমেয়ে দুটো ঘুরে বেড়ায়, নাহিদ মামা তো কখনো টের পাননি। কবে হলো প্রেম?
এবার আর বসে থাকা যায় না। জায়গায় বসে হাঁক দিলেন, 'দুখু, দুখু।'
'জি।'
'ওই পাড়ার রাজু আর অসীমকে ডেকে নিয়ে আয় তো। আগে বুঝি, পানি কত দূর গড়িয়েছে।'

২.
পানি আসলে অনেক দূর গড়িয়েছে। অনেক আগে থেকেই গড়াচ্ছে।
কবে কখন থেকে এই পানি গড়ানো শুরু হয়েছে, সে কথা অবশ্য মাশরাফি বা সুমনা হক সুমী কেউই বলতে পারেন না। এটা সিনেমা হলে ঘটনাগুলো মিলিয়ে আমরা একটা দৃশ্যকল্প তৈরি করে নিতে পারতাম।
কৌশিকের নানাবাড়ির সামনে থেকেই সদর রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে বই কোলে নিয়ে প্রতিদিন বিকেলে প্রাইভেট পড়তে যায় সুমী। কৌশিকরা তখন রাস্তার পাশে মামার দোকানের সামনে বসে রাজা উজির মারে। সেই সময়ই প্রেম হয়ে যেতে পারত। কিন্তু কৌশিকরা তখন এলাকার অ্যাংরি হিরো; মেয়েদের দিকে ফিরে তাকানোর সময় কই!
সুমীদেরও তখন ছেলেদের দিকে ফিরে তাকানোর সময় নেই।
বিশেষ করে কৌশিকদের দিকে প্রেমভরা নয়নে তাকানোর তো কোনো কারণই নেই। তখন সময়টা হলো এলাকার বড় ভাই, স্কুলের সিনিয়র, এমনকি গৃহশিক্ষকের প্রেমে পড়ার। অন্তত সুমীর বান্ধবীরা তাই পড়ছিল ঝটপট করে। সেখানে সুমী তো মন চাইলেও একই ক্লাসে পড়া কৌশিকের প্রেমে পড়তে পারে না।
যদিও প্রাইভেট পড়তে যাওয়ার সময় হো হো করে হাসতে থাকা কৌশিককে দেখে মাঝে মাঝে প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করে। ক্লাসে তো প্রায়ই যায় না। স্কুলে গিয়েই সুমী একবার ছেলেদের বেঞ্চের ওদিকে তাকায়। দেখে, কৌশিক নেই; কোথায় নাকি খেলতে গেছে। ফলে বাড়ির পাশের ছেলে, একই ক্লাসের ছেলে হওয়ার পরও দেখা মেলাই ভার সাহেবের।
তারপরও যখন স্কুলে আসে; যেভাবে বাঁদরামি করে, মেয়েদের টিপ্পনী কাটে, যেভাবে সবাইকে নিয়ে স্যারদের পেছনে লাগে; তাদের মনে হয় মাঝে মাঝে–দস্যু ছেলেটা খারাপ না। কিন্তু সমস্যা হলো, সমবয়সী ছেলের প্রেমে পড়া ঠিক না!
তাই মনে সবই ইচ্ছে হয়; কিন্তু প্রেমে আর পড়ে না সুমী।
সুমী প্রেমে না পড়লে কী হয়; মাশরাফি প্রেমে পড়ে। যার তার প্রেমে পড়ে। প্রায়ই প্রেমে পড়ে। প্রেমে পড়ে গিয়ে ইনজুরি হওয়ার কোনো ব্যবস্থা থাকলে তার ইনজুরির তালিকা আরও দীর্ঘ হতো; ভাগ্যিস এই পড়ায় হাত-পা ভাঙে না। তাই স্কুলে, রাস্তায় যে মেয়েকে দেখে, তারই প্রেমে পড়ে যায়।

প্রেমে পড়া মানে অবশ্য ভালোবাসা নয়।

সে বয়সে বাউন্ডুলে ছেলেদের যা হয় আর কী। সুন্দর চেহারা দেখলেই ভালো লাগে। মাশরাফি অবশ্য দাবি করেন, তিনি ক্লাস নাইন বা টেনে পড়া অবস্থায় খুব সিরিয়াস একটা প্রেমে পড়েছিলেন। উচ্চমাধ্যমিক প্রথম বর্ষ শুরু করা অবধি নাকি সে প্রেম চলমানও ছিল।

ধরা যাক নাম তার অনামিকা; এতকাল পর 'মাশরাফির সাবেক প্রেমিকা' বলে কাউকে পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা অন্যায় হবে বলেই এই বিকল্প না খুঁজলাম। সেই প্রেমে হাবুডুবু খেতে খেতে মাশরাফি অনামিকাকে বিয়ে করে ফেলবেন বলেও ঠিক করে ফেলেছিলেন।

কিন্তু সে প্রেম টিকল না। যাকে বলে 'ব্রেকআপ'; কী এক কারণে তাই হয়ে গেল। মাশরাফির দাবি, ওই প্রেমটা চালিয়ে গেলেও বিয়ে করা কঠিন হতো। বাসা থেকে কিছুতেই মানত না। তাই ওই ব্রেকআপটা দরকার ছিল।

সদ্য প্রেম ভেঙে যাওয়ায় মাশরাফি তখন দেবদাসের মতো করে ঘুরে বেড়ান।

সময়টা সম্ভবত নিউজিল্যান্ড থেকে ইনজুরি নিয়ে ফেরার পরের প্রায় এক বছর বিরতির সময়। ওই সময়ের আগে আগে পুরোনো প্রেমটা ভেঙে গেছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে বৈরাগীর মতো ঘুরে বেড়ান মাশরাফি। মাঝে মাঝে ক্রাচে ভর দিয়ে কলেজে যান; পরীক্ষা দিতে হবে বলে বাড়ির চাপ আছে। বাড়ির চাপ না থাকলে পরীক্ষাও দিত না; অর্থহীন মনে হয় সবকিছু।

প্রাণবন্ত ছেলেটা আর মেয়েদের দিকে ফিরেও তাকায় না। মাথা নিচু করে কলেজে আসে, চুপচাপ চলে যায়। বিকেল হলে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয়। দেখে সুমীর মন খারাপ লাগে। কিছু বলতে পারে না–কৌশিক তো স্রেফ ক্লাসমেট; তাকে আর কী বলা যায়!

এদিকে মাশরাফির সামনে তখন নতুন আরেক সমস্যা। পরীক্ষা দেবে; প্রস্তুতি বলে কিছুই নেই। নোটপত্র লাগবে, সাজেশন লাগবে। কোথায় পাওয়া যায়।

একদিন ক্লাসে পাশের বাড়ির সুমীর সঙ্গে কথা হলো। সে বলল, তার কাছে সংক্ষিপ্ত সাজেশন আর নোট আছে। চাইলে নিতে পারে মাশরাফি।

সেদিনই কলেজ থেকে সুমীর সঙ্গে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরল। সেদিন বিকেলে আবার কী একটা ব্যস্ততা আছে। তাই নোট নিতে ওদের বাড়িতে ঢোকা হলো না। বলল, 'সুমী, তোদের নম্বরটা দে। আমি পরে ফোন দিয়ে আসব।'

ফোন নম্বরটা লিখে দিচ্ছে সুমী। তখনই হঠাৎ সুমীর মুখের দিকে তাকাল মাশরাফি। বুকটা ছড়াৎ করে উঠল। এতদিনের বন্ধু সুমী; ওর মুখটা এভাবে তাকিয়ে তো কখনো দেখেইনি। মুখটায় এত মায়া, মাশরাফির জন্য যেন কত ভালোবাসা জমে আছে!

একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইল মাশরাফি। দৃষ্টিটা কীভাবে যেন টের পেয়ে গেল সুমী। লাজুক চোখে ফিরে তাকাল সে।

এটাই কি সেই প্রেম!



২০০৭ বিশ্বকাপে ভারত-বধের পথে



২০০৪। ভারতের বিপক্ষে সেই ব্যাটিং
© শা. হ. টেংকু



২০০৭। বিশ্বকাপে সেই একই ব্যাটিং
© শা. হ. টেংকু



নতুন দায়িত্ব—আশরাফুলের সহ-অধিনায়ক। ১৮ জানুয়ারি, ২০০৮; সংবাদ সম্মেলন C শা. হ. টেংকু



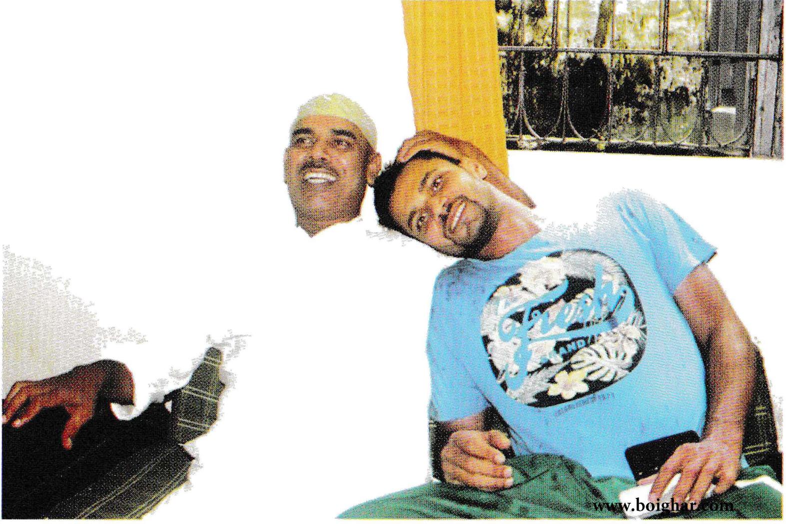
এবার নিজেই চেয়ারে। প্রথম অধিনায়কত্ব। ওয়েস্ট ইন্ডিজ রওনা দেওয়ার আগে সংবাদ সম্মেলন; ২০০৯ C শা. হ. টেংকু



অধিনায়ক হওয়ার পরই। নিজেদের মধ্যে অনুশীলন ম্যাচ খেলার আগে টসটাও 'অনুশীলন' করে নিচ্ছেন সহ-অধিনায়ক সাকিবের সঙ্গে © শা. হ. টেংকু



বুকে হাত কোচের। জেমি সিডন্স খুব আশ্বাস দিলেন নতুন অধিনায়ককে © শা. হ. টেংকু



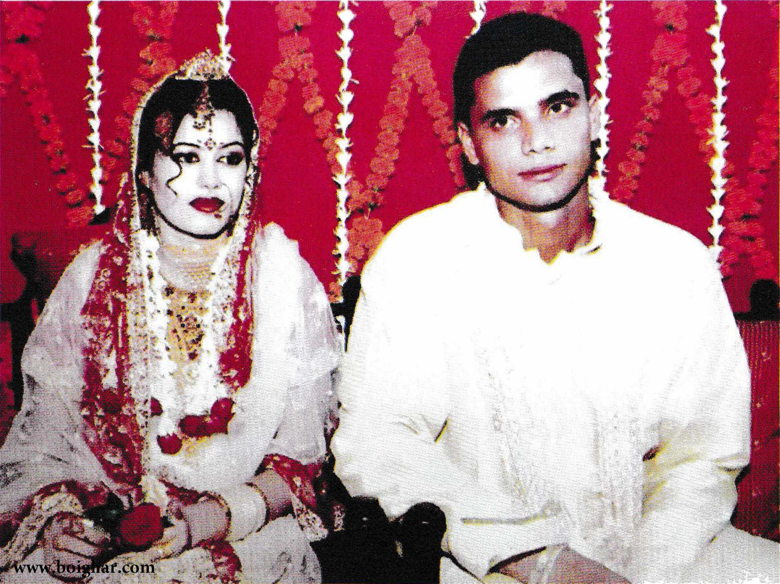
বন্ধু, অভিভাবক, গাইড ও মামা। সেই ছোটবেলা থেকে মাশরাফির বড় ভরসা ছোট মামা নাহিদুর রহমান। ছোট মামার কাঁধ এখনো পরম আশ্রয় তাঁর
Ⓒ অনুপম হোসেন পূর্ণম



দুই ভাই। মুরসালিনের দাবি, তিনি মাশরাফির 'সমর্থক নম্বর ওয়ান'। সেই ভক্ত-ছোট ভাইয়ের সঙ্গে মাশরাফি
Ⓒ মুর্তজা পরিবার

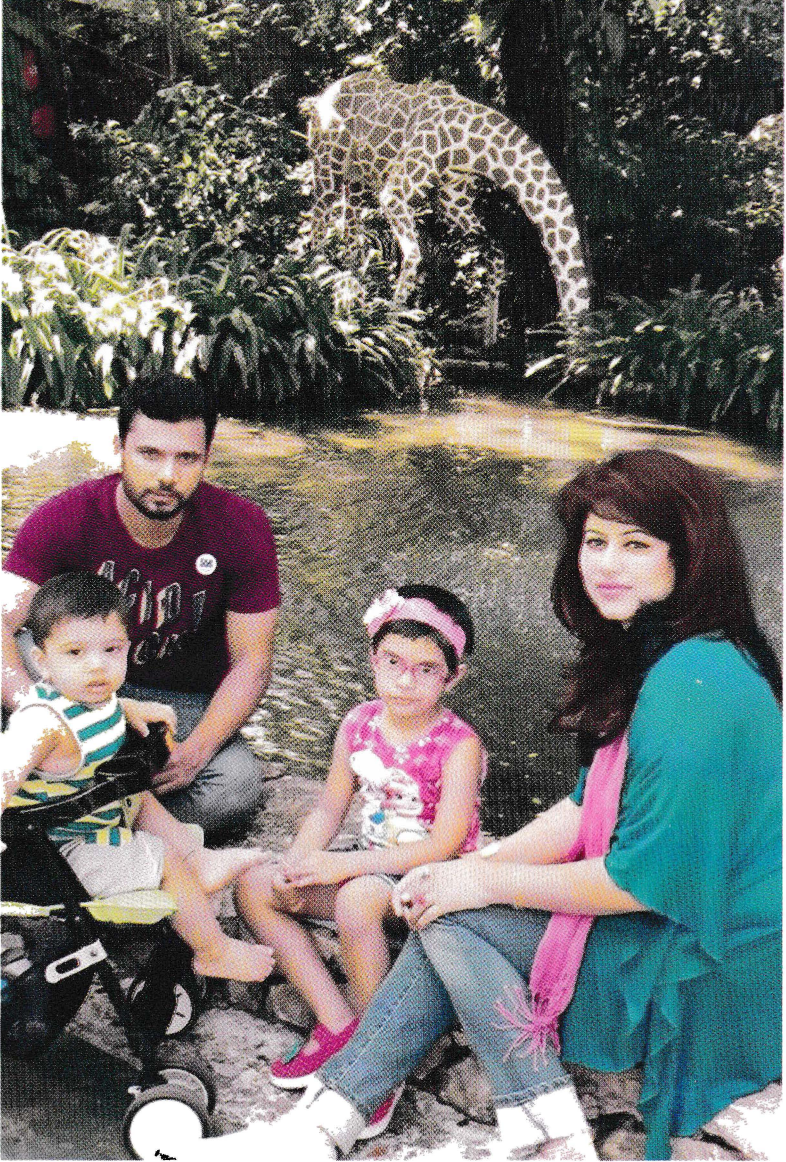


আলোর বাড়ি। এই বাড়িতেই ঠিক মাশরাফির বড় হওয়া নয়। বেড়ে উঠেছেন এখান থেকে পাঁচ মিনিট দূরের মামাবাড়িতে। তবে সাদামাটা ছবির মতো এই বাড়িটাই ঠিকানা © লেখক



সেই দিন। লম্বা প্রেম পার করে দু-দুজনার হওয়ার দিন। ২০০৬ সালে একটু লজ্জা, একটু ভয় নিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন মাশরাফি ও সুমনা হক

© মুর্তজা পরিবার



চোখের পলকে সময় পার। সেদিনের মাশরাফি-সুমী দম্পতি এখন নতুন এক ভুবনের বাসিন্দা। সেই ভুবনে রাজত্ব করে কন্যা হুমায়রা ও পুত্র সাহেল। থাইল্যান্ডে বেড়ানোর এক ফাঁকে Ⓒ মুর্তজা পরিবার



সেই মাশরাফিই এই মাশরাফি © শামসুল হক টেংকু

৩.
'আজ কি কলেজে যাবি, সুমী?'
'যাব। তুই আসবি?'
'হ্যাঁ। তাহলে আসার সময় নোটটা নিয়ে আসিস।'
'শোন। নোটের ব্যাপারে কী হয়েছে; ওই যে আমাদের ক্লাসে একটা মেয়ে আছে না লম্বা মতো। সে তো আবার প্রেম করে যশোরের একটা ছেলের সঙ্গে। সেই ছেলে এসেছিল সেদিন...'
নোটের প্রয়োজন যেন একটা উপলক্ষমাত্র। ফোনে এমন কত অর্থহীন কথা হয়। কত অর্থহীন চোখে চেয়ে থাকা। হঠাৎ করে কলেজ ব্যাপারটাকে খুব আকর্ষণীয় মনে হতে থাকে মাশরাফির। রোজই তার নোট আনতে যাওয়া চাই; নোট আনা হয় না। অনেক কিছুই হয়।
এই পর্যায়ে এসে আমরা একটা দোটানায় পড়ে গেলাম। আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না যে, সেই প্রেমের প্রস্তাবটা কে দিয়েছিল। প্রথম বেলায় নড়াইল গিয়ে জানা গেল, সুমীই বুঝি কাউকে দিয়ে এই মহাজাগতিক খবরটা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সুমী-মাশরাফি একসঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে কথাটা শুনলেন। শুনেই মাশরাফি 'রে রে' করে উঠলেন, 'নাহ। আমি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম। আমাদের এক বন্ধু ছিল; কমন ফ্রেন্ড। ওকে দিয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন।'
মাশরাফি জানতেন, এক প্রস্তাবেই কাজ হবে না। মেয়ে 'ভাব নেওয়ার' চেষ্টা করবে। তাই তিনিও নাকি খুব ভাব নিয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। সেই ভাবটা কী, তা জানা গেল না। দুজনের হাসি দেখে অনুমান করা যায় শুধু, ভাবটা বিশেষ কিছু ছিল।
থাক না; কিছু কথা গোপনই থাক।
এসব কথা গোপন থাকলেও দুটো মন যে মিলে যাচ্ছে, সে খবর কি আর গোপন থাকে!
আর কেউ টের না পাক, নড়াইলের বিখ্যাত বন্ধুবাহিনী কয়েক দিনের মধ্যেই ধরে ফেলে, কিছু একটা কোথাও হচ্ছে। ইদানীং মাশরাফি কেমন উড়ু উড়ু করে। নদীর চেয়ে রাস্তা তাকে বেশি টানে, বাগানের চেয়ে কলেজ তাকে বেশি ডাকে। ব্যাপারটা কী?
একদিন বন্ধুরা ধরল খুব–কী ব্যাপার রে, কৌশিক! ইদানীং সুমীর সঙ্গে খুব গুজ গুজ করিস।
'কিছু না, কিছু না' বলেও পার পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত সবাইকে একটু রেখে ঢেকে বলে দিতেই হলো। তবে একেবারে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল, কিছুতেই এই খবর যেন ফাঁস না হয়। অন্তত নিজের পায়ের তলে মাটিটা একটু শক্ত না করে কাউকে কিছু জানাতে চায় না মাশরাফি।
আড্ডা চলুক, চোখে চোখে কথা চলুক; কিন্তু ব্যাপারটার বিস্ফোরণ ঘটাতে একটু সময় চাই।

৪.
২০০৫ সালেরই এপ্রিল মাসের শেষ দিকের ঘটনা।
পরের মাসে মাশরাফি জাতীয় দলের সঙ্গে ইংল্যান্ডে যাবে। আগামী সপ্তাহেই ঢাকা যেতে হবে। ঘরোয়া ক্রিকেটের খেলা আছে। জাতীয় দলের ক্যাম্প আছে। এর ফাঁকে অল্প কয়েকটা দিনের জন্য নড়াইল এসেছে মাশরাফি।
আসার সময় সঙ্গে করে এক গাদা জার্সি নিয়ে এসেছে। শুভেচ্ছা ক্লাবের ছোটদের জন্য, নতুন নতুন যারা দলে আসছে, তাদের জন্য ৪০-৪৫টি জার্সি। সারাটা বিকেল ধরে সেই জার্সি বিলানো হলো। আস্তে আস্তে ভিড় ভেঙে গেল। রাত হয়ে গেছে, বন্ধুরাও সব উঠছে।
রাজুকে এক পাশে ডাক দিল মাশরাফি। ফিসফিস করে বলল, ‘চুন্নু আর অসীমকে বল থেকে যেতে। তোদের তিনজনের সঙ্গে একটু আলাপ আছে।’
তিন বন্ধু উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে। রাত গভীর হয়ে গেছে।
চুন্নু জিজ্ঞেস করল, ‘কী হইছে কৌশিক?’
‘একটা ঝামেলা হইছে।’
‘কী ঝামেলা?’
‘আমার বিয়ে করতি হবে।’
‘সে তো ভালো কথা। বাড়িতে কথা বল। সুমীদের বাসায় প্রস্তাব পাঠা। বিয়ে হোক।’
‘নাহ। সে সময় নাই। বাড়ি থেকে কী করে, কে জানে। আমাদের নিজেদেরই বিয়ে করতে হবে।’
তিনজনের মাথায় যেন বাজ পড়ল। তিনজনই বোঝানোর চেষ্টা করল, এটা ঠিক হবে না। কিন্তু কৌশিক কিছুতেই রাজি নয়। পরদিন পহেলা মে। মাশরাফির চাই সেদিনই বিয়ে করতে হবে।
এমনকি কাজিও নাকি সে ভেবে ফেলেছে। এলাকার বড় ভাই, মিঠু ভাই এখন কাজি। তাকে ডাকলেই চলবে। কিছুতেই একমত না রাজুরা। শেষ পর্যন্ত মাশরাফির জেদের কাছে হার মানল তিন বন্ধু। ডেকে আনা হলো পরদিন মিঠু ভাইকে।
তারপর...। নাহ। এটাও গোপন ব্যাপার।
২০০৫ সালের ১ মে নড়াইলে কিছু একটা ঘটেছিল। যেটা আমরা জানতে পারিনি। অনেক চেষ্টা করেও উদ্ধার করা যায়নি হারিয়ে যাওয়া সেই নথি।

৫.
গোলাম মুর্তজা রাজি নন।
তার এক কথা, ‘মেয়ে ভালো। পরিবার ভালো। সবই বুঝলাম। কিন্তু প্রেম করে বিয়ে করবে কেন?’
এই হয়। এই মুর্তজা সাহেব নিজে দারুণ এক প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু বাবা হিসেবে ছেলের ব্যাপারে সেটা মেনে নিতে একটু যেন আপত্তি। তার চেয়েও

বেশি আপত্তি মেয়ের পরিবারের।
মেয়ের পরিবারের যত না আপত্তি, তার চেয়ে বেশি তাদের আত্মীয়স্বজনের।
সুমীর বাবা মারা গেছেন সেই ছোটবেলায়। মা হোসনে আরা বেগমের পরিশ্রম আর অভিভাবকত্বেই মানুষ হয়েছেন সুমী। আর্থিক কষ্ট না থাকলেও বাবাকে না পাওয়ার কষ্ট ছিল ছোটবেলায়। মেয়েদের অবশ্য সেই কষ্ট টের পেতে দেননি মা।
আত্মীয়স্বজন এসে মাকে বোঝায়, 'ছেলে ক্রিকেট খেলে। কোথায় কী করে, তার কোনো ঠিক আছে! এমন ছেলের হাতে মেয়ে দেওয়া ঠিক হবে না।'
সুমী বোঝানোর চেষ্টা করে। নিজের বিশ্বাসের কথাটা বলার চেষ্টা করে। কিন্তু কাজ হয় না।
পুরো ব্যাপারটা এক করতে জীবন বের হয়ে যাচ্ছে নাহিদ মামার। মাশরাফি তো এক ফোন করেই খালাস। এখন দুই বাড়িকে রাজি করাতে প্রাণ যায়। তিনি ছোটাছুটি করছেন। কথায় বলে, লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না। নাহিদ মামা একাই মনে হয় কোটি কথা ব্যয় করে ফেলেছেন।
এদিকে কৌশিক দেশে চলে এসেছে।
সে শুরু করল জেদাজিদি। দুই পরিবার রাজি না হলে সে নাকি নিজেই বিয়ে করে ফেলবে। কখনো না খেয়ে থাকে, কখনো কথা বলে না; আবার কখনো নিজের হাত কেটে ফেলার হুমকি দেয়।
এমন চলতেই থাকত হয়তো। শেষ পর্যন্ত নাহিদ মামা দুই পরিবারেই চরম ঘোষণা দিয়ে দিলেন, 'আপনারা আপসে রাজি হলে ভালো কথা। নইলে আমি ওদের বিয়ে দিয়ে দেব। পারলে আপনারা দুই পরিবার ঠেকাতে আসবেন।'
এই হুমকির পর আর কথার দরকার হলো না। সিনেমার শেষ দৃশ্যের মতো হাসি হাসি মুখে সবাই রাজি হয়ে গেলেন। বাড়ির সামনে বিশাল সাউন্ড বক্স বসে গেল, চরম হট্টগোলের মধ্যে বেজে উঠল সানাই।

৬.
২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস।
নড়াইলের মুর্তজা সাহেবের বাড়ি আজ আলোর বাড়ি। দম ফেলার সুযোগ নেই হামিদা মুর্তজা বলাকার। কত আত্মীয়স্বজন আসছে, ছেলের বন্ধুরা আসছে ঢাকা থেকে। সবার যত্ন করতে হবে। সবাই ঠিকঠাকমতো খাবার পাচ্ছে কি না, খোঁজ নিতে হবে।
দম ফেলার সুযোগ নেই মুরসালিন বিন মুর্তজা সিজারেরও। মাশরাফির ছোট ভাইটাও বড় হয়ে উঠেছে। ভাইয়ার বিয়েতে তার অনেক কাজ। ভাইয়ার কয়েকটা বন্ধু এর মধ্যেই চলে এসেছে। তারও কিছু বন্ধুবান্ধব আসবে।
ছোটাছুটি চলছে নাহিদ মামার বাড়িতে। ঢাকা থেকে আসা সব লোকজন এখানে এসে উঠছে। তাদের দেখভাল করা। এদিকে মাশরাফির জাতীয় দলের সতীর্থরা আসবে; তাদের যত্নের ব্যাপার আছে।
এত হইচইয়ের মধ্যে যার বিয়ে সেই কৌশিক নিজে ব্যস্ত তার বন্ধুদের নিয়ে।

আরও কোনো একটা দুষ্টুমির পরিকল্পনা করছে এখনো। হঠাৎ করেই ভেতর থেকে ডাক এল, 'শেরওয়ানি-পাঞ্জাবি পরে এখন রওনা দিতে হবে বিয়ের জন্য।'
এবার মাশরাফির সত্যিই কেমন যেন লাগছে। মনে হচ্ছে, প্রথম টেস্টের প্রথম ডেলিভারিটা করার জন্য ক্যাপ্টেন হাতে বলটা তুলে দিয়েছে। জীবনে কখনো ভয় শব্দটার সঙ্গে পরিচয় হয়নি। তবে এই নার্ভাসনেস ঠিক ক্রিকেট মাঠে নামার সময় টের পায়। আজ আরেকবার পেল।
অপরূপা সাজে সেজে বসে থাকা সুমীর দিকে চেয়ে বুকটা ধক করে উঠল। এক লহমার জন্য মনে হলো, আমি কি সত্যিই পারব ওর দায়িত্ব নিতে?

৭.

ঢাকা থেকে একটা মাইক্রোবাস নিয়ে নড়াইল রওনা হয়েছেন ডেভ হোয়াটমোর। সঙ্গী তার বিসিবির মিডিয়া ম্যানেজার রাবিদ ইমাম ও আরো কয়েকজন ঘনিষ্ঠ মানুষ। মাইক্রোবাস খানিক দূর এগিয়েই একবার বিকল হলো। ফলে সময়ের চেয়ে পেছনে পড়ে গেছেন তারা। রাবিদ ইমামের ফোনে ফোন এল। ওপাশ থেকে মাশরাফির চিৎকার, 'রাবিদ ভাই, কই তোমরা?'
জায়গা শুনে বললেন, 'দ্রুত আসো। আমরা নদীতে।'
মাশরাফি-রানা-রাসেল তখন চিত্রা নদী মাতাল করে বেড়াচ্ছেন।
মাইক্রোবাস নড়াইল শহরে পৌঁছে গেছে। মাশরাফির নির্দেশিত রাস্তা অনুযায়ী এগোতে এগোতে একটু দ্বিধা তৈরি হলো—এখন ডাইনে, নাকি বাঁয়ে?
কিছু ভেবে ওঠার আগেই উল্টো দিক থেকে আসতে থাকা একটা মোটরসাইকেল ঝট করে মাইক্রোবাসের সামনে এসেই ঘুরে ব্রেক কষে ফেলল। মাইক্রোর ড্রাইভার কোনোক্রমে ব্রেক কষে প্রাণ বাঁচাল। মোটরসাইকেলচালক পেছন ফিরতেই চেহারাটা দেখা গেল—মাশরাফি বিন মুর্তজা স্বয়ং। এবার সে পাহারা দিয়ে মাইক্রোবাসকে নিয়ে চলল চিত্রা রিসোর্টে।
মায়ের নানাবাড়ির কাছেই, নিজেদের বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিটের দূরত্বে নদীর কূলে তৈরি হয়েছে এক নতুন রিসোর্ট—চিত্রা রিসোর্ট।
নিকটজন মালিক ঠিক করেছেন, মাশরাফির বিয়ের রিসিপশন দিয়েই শুরু হবে এই রিসোর্টের যাত্রা। এই রিসোর্টে হয়ে যাওয়া মাশরাফির বউভাতের সেই অনুষ্ঠান আজও নড়াইলে গল্পের বিষয় হয়ে আছে। আলোর রোশনাই, হাজার মানুষের উৎসব; সবকিছুই বাঁধিয়ে রাখার মতো ব্যাপার ছিল।
পুরো অনুষ্ঠান মাথায় করে রেখেছিল রানা, রাসেল, রাজ্জাকরা। রানার সেই দুষ্টুমির কথা আজও মাশরাফির বন্ধুরা মনে করতে পারেন। মানস কুন্ডু বলছিল, 'রানা তো আগেও এসেছে। ও যে কী মজার ছেলে ছিল! আমাদের এখানে এলে সবাই মনে করত, ছোটবেলা থেকেই বুঝি আমাদের বন্ধু। সেবার এসে রাসেল আর রানা মোটরসাইকেল নিয়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছে পুরোটা সময়।'
মাশরাফির বউভাতের দিনের ঘটনা ঢাকা থেকে যাওয়া সাংবাদিক, খেলোয়াড় সবার মনেই দারুণভাবে জীবন্ত হয়ে আছে। কালের কণ্ঠের সিনিয়র রিপোর্টার

মাসুদ পারভেজ যেমন স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলছিলেন, 'বিয়েবাড়িতে মাশরাফির চলাফেরা দেখে বোঝারই উপায় ছিল না, আজ ওরই বউভাত। এই দিনে বর হিসেবে তার তো সেজেগুজে বসে থাকার কথা ছিল। কিন্তু সে দেখি এলাকার আর দশটা ছেলের মতো লোকজনের খাওয়া তদারকি করছে, কেউ কম পেল কি না, কেউ না খেয়ে চলে গেল কি না; এসব নিয়ে মহাব্যস্ত সে। মনে হচ্ছে, তার নয়; তার বাড়ির অন্য কারো বিয়ে।'
বিকেল গড়াতে না-গড়াতে একটু ভিড় পাতলা হয়ে গেল। গুরু ডেভকে এবার নদীটা ঘুরিয়ে দেখানোর পালা। রাবিদ ইমামসহ সকলকেই নিয়ে চলল নদীর দিকে। হঠাৎই পাগলা ডেভকে বলল, 'ওঠো, তোমাকে মোটরসাইকেলে করে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।'
প্রচণ্ড বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন হাবিবুল বাশার, 'একদম না, ডেভ। সে ১৪০ কিলোমিটারের ওপরে মোটরসাইকেল চালায়। ভয়ানক অভিজ্ঞতা হবে। আমি ওর বাইকের পেছনে উঠে জানি। তুমি এই ভুল করো না।'
ডেভ বিশ্বাস করলেন না বুঝি। উঠলেন মাশরাফির বাইকের পেছনে।
মিনিট দশেক পরই দুজন এসে পৌঁছালেন। সবই ঠিক আছে। কিন্তু ডেভের সাদা মুখটা আরেকটু যেন সাদা হয়ে গেছে, চোখ দুটো টকটকে লাল। মনে হচ্ছে, ছেড়ে দিলেই পড়ে যাবেন। হাবিবুল এগিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন ছিল রাইড?'
'ইটস ওকে। পাগলা ইজ কোয়াইট স্লো ড্রাইভার, কোয়াইট...ও মাই গড! ও মাই গড!'

৮.
সেসব পাগলামি, সেসব সুখের দিনের ১০ বছর পার হয়ে গেছে।
পাশাপাশি বসে হাসতে থাকা মাশরাফি-সুমীকে দেখে অবশ্য এতটা সময় পার হয়ে যাওয়ার কথা অনুমানও করা যায় না। এখনো তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে একই রকম হাসেন। লোকে বলে, সব সফল মানুষের পেছনে একজন নারীর হাত আছে। মাশরাফি বা সুমী এমন কথা কেউ বলেন না। তবে মাশরাফির এই ক্রিকেট জীবনটাকে নিশ্চিত নির্ভাবনায় রাখতে সুমীর অবদানটাই যে সবচেয়ে বেশি, সেটা দফায় দফায় মনে করিয়ে দেন মাশরাফি। গৃহস্থ জীবনের হাজারও জটিলতা মাশরাফিকে স্পর্শ করতে পারে না ঘরে এ মানুষটি থাকার জন্য।
উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েও শেষ পর্যন্ত নিজের পেশাগত জীবনের সঙ্গে আপস করেছেন কেবল মাশরাফির জীবনটা ছন্দে রাখার জন্য। সুমী অবশ্য এটাকে নিজের কোনো কৃতিত্ব ভাবতে রাজি নন। তার ভাষায়, 'আমি এটাতে ত্যাগ ভাবি না। দুজন কাজ ভাগাভাগি করে নিয়েছি। কৌশিক সংসারের কাজটা বাইরে থেকে করে। আমি ঘরে থেকে করি। এভাবে ভাবলে সব সহজ হয়ে যায়।'
এমনিতে মোটেও ক্রিকেটপ্রেমী মানুষ নন সুমী। বাংলাদেশের আর দশটা মেয়ের মতো বাংলাদেশের খেলা থাকলে জয়-পরাজয়ের খোঁজ নেন। তবে মাশরাফির খেলা থাকলে দেখার চেষ্টা করেন। নিজের ক্রিকেটপ্রেমটা সম্পর্কে সুমীর দারুণ

ব্যাখ্যা আছে, 'আমার স্বামী হকি খেললে আমি হয়তো সেটাই দেখতাম। এখন ক্রিকেট খেলে, তাই দেখি। আমি আসলে এটাকে মাশরাফির কাজ হিসেবে দেখি।' মাশরাফির এই কাজ সুমীকে অবশ্য যতটা আনন্দ দেয়, শঙ্কা-আতঙ্ক তার চেয়ে কম দেয় না।

বিয়ে যখন করেছেন, তার আগেই মাশরাফি কয়েক দফা ইনজুরি কাটিয়ে উঠেছেন। এরপর দিন গেছে আর এই ইনজুরি নিয়ে শঙ্কা বেড়েছে। এখন এমনও গুজব বাজারে শুনতে পান যে, মাশরাফির হয়তো একসময় এই এতসব ইনজুরির ধাক্কায় পঙ্গু জীবন যাপন করতে হবে।

সেই জীবনে আর্থিক অনিশ্চয়তা তৈরি হবে হয়তো; আরও অনেক কিছু হতে পারে। তবে সুমী শুধু ভাবেন মানুষটার কথা, 'আর্থিকভাবে আমাদের কী হলো না হলো, সে নিয়ে আমি ভাবি না। আমি কৌশিকের কাছ থেকে একটা ব্যাপার শিখেছি যে–সিম্পল লিভিং, হাই থিংকিং। ফলে টাকার দুশ্চিন্তা আমার এতটুকু নেই। টাকার খোঁজও নেই না। আমার চিন্তা হয় ওকে নিয়ে। ওর কষ্ট বাড়লে আমরা শুধু বাইরে থেকে ওকে সান্ত্বনা দিতে পারব। শরীরের ব্যথা তো কমাতে পারব না। কৌশিক ব্যথায় কাতরাচ্ছে, এই জিনিস আমি সহ্য করতে পারি না।'

মাঝে মাঝে মনে হয়, মাশরাফিকে বলেন যে, খেলাধুলা সব ছেড়ে দিতে। তারপর নিজেই নিজেকে সামলান, 'ব্যাপারটা যদি শুধু ওর একটা চাকরি হতো, অনেক আগে আমি বলতাম–আর দরকার নেই। আমি জানি, ও যোগ্য মানুষ। ও সংসার যেভাবে হোক চালাতে পারবে। চুরি-ডাকাতি ছাড়া যা করে আমাদের সংসার চালাবে, তাতেই আমি খুশি। মুদির দোকান দিলেও আমি খুব খুশি। তাই অনেক সময় ইচ্ছে হয়, ছেড়ে দিতে বলি। কিন্তু ক্রিকেট তো ওর কাছে শুধু চাকরি না; ওর জীবন হচ্ছে ক্রিকেট। তাই যতক্ষণ পারে খেলুক। আমার শুধু ওর ব্যথা আর সহ্য হয় না।'

পাশে বসে থাকা মাশরাফি মাথা নিচু করে শোনেন।

একটু ম্লান হাসেন। আস্তে আস্তে বলেন, 'আসলেই ও আমার কষ্ট সহ্য করতে পারে না।'

মাশরাফি অকুণ্ঠচিত্তে বারবার স্বীকৃতি দেন, তার এই বাউন্ডুলে জীবনটাকে একটু গোছালো করে তোলাটা সুমীর জীবনের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার ছিল। এমনকি হঠাৎই বলে ওঠেন, 'আমার জীবন চিন্তা কয়েক বছর আগেও খুব এলোমেলো ছিল। আমি হয়তো অনেক কিছুই বুঝতাম না। বিশেষত পরিবারের প্রতি কী দায়িত্ব, সেটা সব সময় বুঝে উঠতে পারিনি। সুমী সে নিয়ে অধৈর্য হয়নি। পাশে থেকেছে। আমি ওকে দেখেই শিখেছি–শেষ পর্যন্ত পরিবারের চেয়ে বড় সম্বল নেই। আমি একটু একটু করে আরও পরিবারমুখী হয়ে উঠছি।'

এভাবেই গড়ে ওঠে প্রেম থেকে পরিবার।

সাগরপাড়ের দৈত্যবধ



১.

অ্যান্টিগার জলি বিচ রিসোর্ট।

একেবারে সাগরের ভেতর থেকে যেন উঠে এসেছে হোটেলটা। বড় বড় হোটেলের নিজস্ব বিশাল সুইমিংপুল থাকে। দেখে মনে হয় এই রিসোর্টের সে পুলের দরকার নেই। প্রকৃতি নিজে হাতে ক্যারিবিয়ান সাগরকে হোটেলের 'পুল' বানিয়ে দিয়েছে। বাড়ির উঠোনে নামার মতো হোটেল থেকে লোকজন সাগরে নেমে পড়ছে।

এমন আয়োজন দেখে ক্রিকেটারদের আহ্লাদে আটখানা হয়ে ওঠার কথা ছিল। কিন্তু সে সুযোগই দিলেন না ডেভ হোয়াটমোর। সাগর দেখে নেচে ওঠার আগেই হুংকার দিলেন, 'আগামীকাল থেকে দুবেলা ট্রেনিং'।

যুক্তিও নিতান্ত মন্দ নয়–গত কয়েক মাস বাংলাদেশ টানা ক্রিকেট খেলেছে। সে অর্থে ফিটনেস নিয়ে একদম কাজ হয়নি। বিশ্বকাপের মাস দেড়েক আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজে পৌঁছে সময়টা খেলার পাশাপাশি ট্রেনিংয়েও কাজে লাগাতে চায় বাংলাদেশ। কারণ এই বিশ্বকাপটা

বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জের বিশ্বকাপ, নিজেদের চেনানোর বিশ্বকাপ।

২০০৭ সালের এক শুভ দিনে ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার আগে মাশরাফি বলছিলেন, 'আমরা যে বড় দল হয়ে উঠেছি, সেটা প্রমাণ করার সুযোগ এবার।'

যদিও বাস্তবতা বলে, সেই প্রমাণটা করতে আরও প্রায় সাত বছর সময় লেগে গিয়েছিল বাংলাদেশের। ২০০৭ বিশ্বকাপে শুরু হওয়া সেই ধারাবাহিকতা নানা কারণেই বাংলাদেশ ধরে রাখতে পারেনি। তবে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ২০০৭ বিশ্বকাপেই বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজেদের উপস্থিতির যৌক্তিকতা প্রমাণ করে ফিরতে পেরেছিল।

বাংলাদেশের কাছে সেটি প্রমাণের বিশ্বকাপ; আর মাশরাফি আজও অবসরে যখন ফিরে তাকান, তিনি বলেন, ওটা ছিল রানার জন্য বিশ্বকাপ!

২.

২০০৭ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দল রওনা হওয়ার আগেই দেশে ছোটখাটো একটা ঝড় উঠে গেল।

দীর্ঘদিন ধরে উইকেটের পেছনে বাংলাদেশের প্রতীকে পরিণত হওয়া খালেদ মাসুদ পাইলটের জায়গা হলো না দলে। তার বদলে ১৫ জনের দলে বিশেষজ্ঞ উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান হিসেবে থাকলেন ১৮ বছর বয়সী মুশফিকুর রহিম। এ ছাড়া দলে অন্তত বলার মতো কোনো চটকদার কোনো ব্যাপার ছিল না।

ছিল তারুণ্যে ভরপুর একটা দল। মুশফিক তো ছিলেনই, সাকিব-তামিমও দলে যোগ করেছিলেন এই তারুণ্য। সাকিব দলে থাকায় একটা চমৎকার ব্যাপার ঘটেছিল। একই সঙ্গে বাংলাদেশ তিনজন পেসার ও তিনজন বাঁহাতি স্পিনার একাদশে রাখতে পারছিল।

বাংলাদেশের বিশ্বকাপ দল

হাবিবুল বাশার (অধিনায়ক), শাহরিয়ার নাফীস, তামিম ইকবাল, আফতাব আহমেদ, সাকিব আল হাসান, মোহাম্মদ আশরাফুল, মুশফিকুর রহিম (উইকেটরক্ষক), মোহাম্মদ রফিক, আবদুর রাজ্জাক, মাশরাফি বিন মুর্তজা, শাহাদাত হোসেন, তাপস বৈশ্য, সৈয়দ রাসেল, রাজিন সালেহ ও জাভেদ ওমর।

৩.

বাংলাদেশের বিশ্বকাপ সফর কার্যত শুরু হয় ফেব্রুয়ারিতে অ্যান্টিগায় পৌঁছানোর ভেতর থেকে। এখানে 'আইসিসি ট্রাই সিরিজ' নামে কানাডা ও বারমুডার বিপক্ষে একটি ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলে বাংলাদেশ। যদিও ছোট ছোট দুটি দলের বিপক্ষে খেলা, কিন্তু ম্যাচ দুটো বাংলাদেশের জয়ের ধারাবাহিকতায় থাকার জন্য খুব জরুরি একটা ব্যাপার ছিল।

কিন্তু এখানে বাংলাদেশের জন্য দুশ্চিন্তা হয়ে ওঠেন মাশরাফি।

অ্যান্টিগায় পৌঁছানোর পর থেকে পায়ের চোটে ভুগছিলেন মাশরাফি। অল্প একটু

চোট; কিন্তু ব্যথাটা ভোগাচ্ছিল। এই চোটের কারণে বারমুডার বিপক্ষে ম্যাচটায় বিশ্রামেও রাখা হয়েছিল মাশরাফিকে। এরপরই কানাডার বিপক্ষে ম্যাচ। মনে রাখুন, এই কানাডার বিপক্ষে পরাজয় দিয়ে শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের ২০০৩ বিশ্বকাপ।
কানাডা ম্যাচের আগে আগে পায়ের পাতার ব্যথাটা কমে গেলেও পিঠের ব্যথাটা আবার ফিরে এসেছিল। ফলে মাশরাফির সুস্থতাটা নিয়ে নতুন করে একটু সংশয় তৈরি হয়েছিল। সে সময় সংবাদমাধ্যমে অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সেই দুশ্চিন্তার কথা প্রকাশও করেছিলেন।
তবে দুশ্চিন্তা মিলিয়ে দিয়ে মাশরাফি কানাডার বিপক্ষে অ্যান্টিগা রিক্রিয়েশন গ্রাউন্ডে নেমে পড়েন। বাংলাদেশ আগে ব্যাট করে বড় স্কোর করেও জয় পায় মাত্র ১৩ রানের। সাকিব আল হাসানের ১৫২ বলে ১৩৪ রানের বিশাল স্কোর, হাবিবুল ও আশরাফুলের ফিফটিতে ২৭৮ রান করে বাংলাদেশ। জবাবে ৭ উইকেটে ২৬৫ রান তুলেছিল কানাডা। মাশরাফি ৯ ওভারে ১ মেডেন নিয়েছিলেন; ৪২ রান খরচ করে উইকেটশূন্য ছিলেন।

৪.
২০০৭ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ প্রথম হেডলাইনে পরিণত হয় অবশ্য একটা অস্বীকৃত ম্যাচে। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বারবাডোজের থ্রি ডব্লু স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের অনুশীলন ম্যাচটা ওয়ানডে স্ট্যাটাস পায়নি। অথচ এই ম্যাচেই প্রবল প্রতাপান্বিত নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২ উইকেটের জয় পায় বাংলাদেশ।
এই ম্যাচে জেমস ফ্রাঙ্কলিনকে মারা মাশরাফির ছক্কা সেদিন সংবাদমাধ্যমের আলোচ্য ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। জয়ের ভিতটা গড়ে দিয়েছিলেন তামিম ও জাভেদ ওমর ৪৬ ও ৪৫ রানের ইনিংস খেলে। তবে মাশরাফি ব্যাট হাতে শেষ দিকে ঝড় তুলে ১৪ বলে একটি চার ও তিন-তিনটি ছক্কায় সাজানো ৩০ রানের অপরাজিত ইনিংসে খেলেই বাংলাদেশকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেন।
এর আগে আসল কাজটাও বল হাতে করে দিয়েছিলেন মাশরাফিই। ৪৪ রান দিয়ে নেন ৪ উইকেট। মাশরাফি ও রাসেলের তোপে পড়ে নিউজিল্যান্ড একপর্যায়ে ৩৪ রানে হারিয়ে ফেলে ৪ উইকেট। শেষ পর্যন্ত ব্রেন্ডন ম্যাককালামকে সঙ্গে নিয়ে দলকে ২২৬ রানে পৌঁছে দেন মূলত ৮৮ রান করা জ্যাকব ওরাম।

৫.
'হাইপ' ব্যাপারটা সাধারণত বাস্তবে রূপ নেয় না বলেই এ নিয়ে নানা রকম প্রবাদ আছে। সবচেয়ে সুন্দর বাংলায় বলা হয়–যত গর্জে, তত বর্ষে না।
কিন্তু এই হাইপ ব্যাপারটা কীভাবে সত্যি হয়ে উঠতে পারে, তার একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো, ২০০৭ বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচটি। ভারত তখন তারকাখচিত দল বললেও কম বলা হয়, কিংবদন্তিখচিত দল। এমন দলের বিপক্ষে তরুণ ও নবিশ বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জই ছুড়ে দেওয়ার কথা নয়।

কিন্তু বিশ্বকাপে দুদলের এই প্রথম ম্যাচ নিয়ে একধরনের তীব্র হাইপ তৈরি হলো। মূলত ভারতীয় মিডিয়ায় একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল তামিম ও মাশরাফিকে নিয়ে। মাশরাফির ক্ষেত্রে যুক্তিটা ছিল–মাশরাফি ভারতকে পেলেই ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। আর তামিমকে নিয়ে এক অজানা ভীতি। দেশটির শীর্ষ প্রায় সব সংবাদমাধ্যমই এই আতঙ্ক ম্যাচের আগের দিনে গণহারে প্রকাশ করেছিল।

ক্রিকইনফো ম্যাচের আগের দিন পাঁচটি কারণ ছেপেছিল, যেসব কারণে বাংলাদেশ হারিয়ে দিতে পারে ভারতকে। এর মধ্যে একটা কারণ ছিল 'নতুন বলের বৈচিত্র্য'। এই শিরোনামে সিদ্ধার্থ বৈদ্যনাথন লিখেছিলেন

মাশরাফির পিছলে কাটারের সঙ্গে উপযুক্ত সংগত করতে পারে শাহাদাতের অস্বস্তিকর বাউন্স। ভারত নিশ্চয়ই

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড
অনুশীলন ম্যাচ (আনঅফিশিয়াল)
তারিখ : ৬ মার্চ, ২০০৭
ভেন্যু : থ্রি ডব্লু ওভাল
টস : নিউজিল্যান্ড (ব্যাটিং)

নিউজিল্যান্ড

ব্যাটসম্যান	**রান**	**বল**	**৪**	**৬**
ভিনসেন্ট ব মাশরাফি	৪	৩	১	
ফ্লেমিং ক রাজ্জাক ব রাসেল		৮		
টেলর ক মুশফিক ব মাশরাফি	১১	১৯	২	
স্টাইরিস ক আশরাফুল ব রাজ্জাক	২৬	৪৯	৩	
ফুলটন এলবিডব্লু মাশরাফি	৫	১৮		
ওরাম ক রাসেল ব রাজ্জাক	৮৮	১০৭	১	
ম্যাকমিলান ক ও ব রাজ্জাক	৫	১৫		
ম্যাককালাম রানআউট (মাশরাফি)	৪৬	৫৪		
ভেট্টোরি ক জাভেদ ব রাজ্জাক	৮	৯		
ফ্রাঙ্কলিন নটআউট	১২	১৪		
বন্ড ব মাশরাফি	৪	৪		
অতিরিক্ত (লেবা ৮, নো ৬, ও ৩)	১৭			
মোট (৪৭.২ ওভারে অলআউট)	২২৬			

বোলিং : মাশরাফি ৯.২-২-৪৪-৪, রাসেল ৮-১-৩১-১
শাহাদাত ১-০-১২-০, রাজ্জাক ১০-১-২৬-৪
সাকিব ১০-০-৪৯-০, তাপস ৫-০-৪২-০, রাজিন ৩-০-১৪-০।

বাংলাদেশ

ব্যাটসম্যান	**রান**	**বল**	**৪**	**৬**
জাভেদ ব ভেট্টোরি	৪৫	৮৬	৫	
তামিম স্টা. ম্যাককালাম ব ভেট্টোরি	৪৬	৪৮	৬	১
আফতাব এলবিডব্লু ভেট্টোরি		২		
সাকিব ক ম্যাককালাম ব প্যাটেল	১৯	৩৮	২	
হাবিবুল রানআউট	২০	৩৩	১	১
আশরাফুল এলবিডব্লু ফ্রাঙ্কলিন	২৯	৩৭	২	
মুশফিক ক স্টাইরিস ব বন্ড	১৯	২৪	২	
রাজিন ক ভিনসেন্ট ব ফ্রাঙ্কলিন	৭	১২		
মাশরাফি নটআউট	৩০	১৪	১	৩

ব্যাটসম্যান	রান	বল	৪	৬
রাজ্জাক নটআউট	৪	৮		
অতিরিক্ত (নো ৭, ও ৪)	১১			
মোট (৪৯ ওভারে, ৮ উইকেটে)	২৩০			

বোলিং : ফ্রাঙ্কলিন ২/৫৪, বন্ড ১/৫৯, ম্যাসন ০/১৫
প্যাটেল ১/৪০, ভেট্টোরি ৩/৩৮, ওরাম ০/১৪, স্টাইরিস ০/১০।

২০০৪ সালে তাদের বিপক্ষে মাশরাফির ভূমিকার কথা ভুলে যায়নি। সেদিন বীরেন্দর শেবাগ ও মহেন্দ্র সিং ধোনিকে আউট করে বাংলাদেশকে সে সহায়তা করেছিল ভারতের বিপক্ষে প্রথম (এখন পর্যন্ত একমাত্র) উৎসবের উপলক্ষ এনে দিতে। মাশরাফি সে ম্যাচে ব্যাট হাতেও কার্যকর হয়ে উঠতে পারে। ভারতের বিপক্ষে দুটি ম্যাচ এবং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচ সাক্ষ্য দেয় সে একজন কার্যকর অলরাউন্ডার হিসেবেও বিপজ্জনক বটে। [১]

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের এই আতঙ্ক এতটাই আলোচ্য ছিল, তা নিয়ে আবার বাংলাদেশে রিভিউ ছাপা হয়েছিল। নিউজিল্যান্ডকে প্রস্তুতি ম্যাচে হারানোর পরদিনই ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের আতঙ্ক নিয়ে প্রথম আলোতে লিখেছিলেন পবিত্র কুন্ডু :

ইএসপিএনের স্পোর্টস সেন্টারে প্রায় দুই মিনিট দেখানো হলো হাবিবুলের দলের নিউজিল্যান্ড-বধের আদ্যন্ত। ডিডি স্পোর্টসে এই 'বীরত্বগাথা' সাড়ম্বরে প্রচার করে বাংলাদেশকে সংহারের টোটকাও দিয়ে দেওয়া হলো। আর ও দেশের সংবাদপত্রগুলো কী করছে? বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বড় দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার শিরোনামটা শুনুন, 'গা গরমের ম্যাচে বিশ্বকাপ গরম'। ওপরে একটা শোল্ডার, 'ফ্লেমিংদের চমকে দিয়ে ভারতের জন্য ১১ বাঙালির হুঁশিয়ারি।' [২]

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে আমরা ম্যাচের আগের দিনই দেখতে পাচ্ছি, মাশরাফিকে নিয়ে একটা চাপা উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। এর আগে একমাত্র ভারত-বধের নায়ক মাশরাফিরই আবার মূল নায়ক হয়ে উঠতে পারেন, এমন একটা সম্ভাবনার কথা লিখছিলেন দৈনিক জনকণ্ঠে আসিফ ইকবাল :

ত্রিনিদাদের পোর্ট অব স্পেনে আজ বাংলাদেশ যখন ভারতের বিপক্ষে খেলতে নামবে, তখন শচীন টেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ গাঙ্গুলী, যুবরাজ সিংদের মতো একঝাঁক তারকার সঙ্গে বাংলাদেশের এক ক্রিকেটারের নাম আলোচিত বা সমানভাবে উচ্চারিত হবে। সেই আত্মপ্রত্যয়ী ক্রিকেটারের নাম মাশরাফি বিন মুর্তজা। [৩]

৬.

পরদিন ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ।

ফুরফুরে মেজাজে সবাই হোটেল রুমে ঢুকবে। ঠিক তখনই অধিনায়ক হাবিবুল বাশারের কাছে একটা ফোন এল দেশ থেকে। বোর্ডের এক কর্মকর্তা ফোন করেছেন। ম্যাচের আগে শুভেচ্ছা হয়তো।

বোর্ড কর্মকর্তার ফোন বলে বাকিদের কাছ থেকে একটু সরে গিয়ে ফোনটা রিসিভ

করলেন। ওপাশ থেকে কোনো সৌজন্য সম্ভাষণ নেই, কোনো কুশল বিনিময় নেই; শুধু একটা বাক্য শুনলেন হাবিবুল–রানা মারা গেছে।

আর কিছু শুনতে পারলেন না; আর কিছু শোনার মতো অবস্থা নেই।

কয়েকটা সেকেন্ড জ্ঞানহীনের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন হাবিবুল বাশার। কিছুতেই কিছু ভাবতে পারছেন না। কী করবেন, কাকে বলবেন; চেপে রাখবেন, নাকি সবাইকে বলবেন!

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন যেন দেরি হয়ে গেছে। কয়েকজন খেলোয়াড় উঠে এসেছে। মুখ দেখে বুঝতে পারছে কিছু একটা বড়সড় ঝামেলা হয়ে গেছে। সবাই ঝাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছে, 'সুমন ভাই, কী হয়েছে?'

একটু সামলে নিলেন সুমন। চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখলেন মাশরাফি কই। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে কী যেন রসিকতা করছে। পাগলাটা সবকিছু খেয়ালও করে না। বাকিদের যেমন তেমন, এ অবস্থায় ম্যাশকে কীভাবে খবর দেবেন।

ততক্ষণে বাকি খেলোয়াড়েরা অধৈর্য হয়ে উঠেছে–কী হয়েছে!

আর সামলাতে পারলেন না হাবিবুল। কান্নায় ভেঙে পড়লেন, 'রানা মারা গেছে।'

কয়েক মুহূর্তের একটা পাষাণ নিস্তব্ধতা নেমে এল। তারপরই সমন্বিত একটা চিৎকার, 'কী বলেন, সুমন ভাই! কী বলেন?'

'হ্যাঁ। চুকনগরে যাচ্ছিল। মোটরসাইকেল অ্যাকসিডেন্ট করে...'

রাসেল, রাজ্জাক চিৎকার করে কাঁদছে। হোটেলের ভদ্রতা, সৌজন্য আর কারো মাথায় নেই। সিনিয়ররা সবাই হাউমাউ করে কাঁদছে। ছোটরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না, কী করা উচিত। রানা ভাইকে তারাও চিনত, তারাও ভালোবাসত। কিন্তু বড়দের যে ভাই মারা গেল।

সুমন নিজেকে সামলে নিলেন। আবার চোখ বোলালেন, ম্যাশ কই!

নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। সাড়ে ছয় ফুট ছেলেটা চোখ দুটো টকটকে লাল করে দাঁড়িয়ে আছে। রাসেল-রাজ্জাকদের মতো কাঁদছে না। কাঁদতে পারছে না মনে হয়। হাবিবুল ডাক দিলেন, 'ম্যাশ, আমার সঙ্গে আয়।'

হাতের ইশারায় 'না' করল মাশরাফি।

আস্তে আস্তে একা হেঁটে লিফটের দিকে চলে গেল। সবাই তখন একটু ভয়ই পেয়ে গেছে। সবার কাছে রানা একজন সতীর্থ, এই দুদিন আগেও জাতীয় দল মাতানো খেলোয়াড়। মাশরাফির তো ছোটবেলার বন্ধু; জাতীয় দলের সবাইও বলে–দুই ভাই। মাশরাফি কিছু ঘটিয়ে ফেলবে না তো!

রাসেলের কাছে রুমের বাড়তি চাবি আছে। সে ছুটল চাবি নিয়ে ওপরে। দরজা খুলে দেখল রুম অন্ধকার। মাশরাফি বিছানায় পড়ে আছে। চোখ দুটো ফোলা। রাসেলকে আলো জ্বালাতে দেখেই হাউমাউ করে উঠল, 'রাসেল রে, অন্ধকার না হলি ঘুমাতি পারত না রানা!'

দুই বন্ধু পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে ভাই হারানোর শোকে। রাসেল সেই

অবস্থায়ই টের পেল মাশরাফির শরীরে প্রচণ্ড জ্বর।

৭.

সকাল বেলায় টিম বাসে ওঠার সময়ই টের পাওয়া গেল মাশরাফির শরীরের অবস্থা ভালো না। আগের দিন টিম মিটিংয়ে বলেছিলেন, 'ইন্ডিয়ারে ধরে দেবানে'। সেই মাশরাফি নিজেই তো আজ জীবনের খেলার কাছে যেন ধরা পড়ে গেছেন!
শরীরে হাত দিয়েই উত্তাপটা টের পাওয়া যাচ্ছে। ডাক্তার দেখলেন জ্বর ১০৩ ডিগ্রির ওপরে। পাগল ছেলে; তাকে কারো কিছু বলার সাহসও নেই। তারপরও হাবিবুল জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ম্যাশ, খেলতে পারবি?'
'না পারলেও খেলতি হবে, সুমন ভাই। রানার জন্য খেলতি হবে।'
লোকে বলে সেদিন ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচটা অসম লড়াই ছিল। ভারতের মতো 'বড় দলের' বিপক্ষে বাংলাদেশের মতো 'মিনোস'দের খেলা। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সেদিন অসম লড়াইটা ছিল ভারতের পক্ষে। অতিলৌকিক ক্ষমতা এসে ভর করা বাংলাদেশের বিপক্ষে মাঠে নামতে হয়েছিল সাধারণ একটা ক্রিকেট দলকে!
ভারত আসলে সেদিন কোনো জাগতিক ক্রিকেট দলের বিপক্ষে ক্রিকেট খেলেনি। খেলেছে ১১ জন রানার বিপক্ষে।
রানার কী ক্ষমতা, সেটা টের পাওয়াতে মাশরাফি সময় নিয়েছিলেন মাত্র ৭টি বল। নিজের দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলেই ছত্রখান করে দিয়েছিলেন বীরেন্দর শেবাগের স্টাম্প। একটু পরই তীব্র গতিতে পরাস্ত করে ফেরত পাঠালেন রবিন উথাপ্পাকে।
মাশরাফির এই প্রবল দুই আঘাতের পর দুই বাঁহাতি স্পিনার রফিক ও রাজ্জাকের তিনটি করে আঘাত। সঙ্গে সৈয়দ রাসেল ও সাকিবের নিয়ন্ত্রিত, কৃপণ বোলিং। ভারতীয় বিখ্যাত ব্যাটিং লাইনআপের শ্বাস বন্ধ করে দিল বাংলাদেশের উজ্জীবিত বোলিং।
মাশরাফি দিন শেষে ৯.৩ ওভার বল করে ২টি মেডেন নিলেন; ৩৮ রান খরচে নিলেন ৪ উইকেট। দ্বিতীয় স্পেলে এসেই অজিত আগারকারের উইকেট। আর আনুষ্ঠানিকভাবে ইনিংস শেষও করে দিলেন মুনাফ প্যাটেলকে আউট করে। ম্যাচসেরা হওয়ার জন্য এই পরিসংখ্যানই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু চোখের সামনে যারা সেদিনের মাশরাফিকে মাঠে দেখেছেন, তারাই জানেন কী আগুন বের হচ্ছিল মাশরাফির সর্বাঙ্গ থেকে।
ক্রিকইনফো এই সময়টা ধরে রাখতে লিখেছিল :
মুর্তজাই ছিলেন বাংলাদেশের এই পারফরম্যান্সের কেন্দ্রবিন্দু। একেবারে শুরু থেকে উইকেটে থেকে বিবেচনাযোগ্য মুভমেন্ট আদায় করে নিচ্ছিলেন। ১৩০ কিলোমিটারের আশপাশে বল করে স্কিড করাচ্ছিলেন। নিজের দ্বিতীয় ওভারেই অফ স্টাম্পের বাইরে বল ফেলে ভেতরে ঢোকালেন; বীরেন্দর শেবাগকে প্লেড অন হতে বাধ্য করলেন। এর পরই উদ্ধত উথাপ্পাকে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। দ্বিতীয় স্পেলে এসেই প্রথম বলে অজিত আগারকারকে উইকেটকিপারের হাতে ক্যাচ

দিতে বাধ্য করেছেন এবং মুনাফ প্যাটেলকে ফিরিয়ে ইনিংস শেষ করেছেন নিজের চূড়ান্ত ওভারে। [৪]

ম্যাচে মাশরাফির পারফরম্যান্সের গুণকীর্তনে মেতেছিল দেশের সংবাদমাধ্যমগুলোও। ত্রিনিদাদ থেকে উৎপল শুভ্র লিখে পাঠিয়েছিলেন :

নিজের ৪ আর ম্যাচের ৭ ওভারের মধ্যেই তুলে নিয়েছেন ২ উইকেট। এক শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জয়টি বাদ দিলে বাংলাদেশের জয়ের পূর্বশর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে শুরুতে মাশরাফির উইকেট পাওয়া। ২০০৪ সালে ভারতের বিপক্ষে জয়ের ম্যাচটিতে তৃতীয় বলেই আউট করেছিলেন বীরেন্দর শেবাগকে। কার্ডিফে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে দ্বিতীয় বলে অ্যাডাম গিলক্রিস্টকে। দুই হাঁটুতে তার চারটি অস্ত্রোপচার হয়েছে, অ্যাঙ্কেল-পিঠ ইনজুরির তালিকা শুনে বিদেশি সাংবাদিকেরা রীতিমতো বিস্মিত—এই ছেলে ফিরে এল কীভাবে!

মাশরাফি শুধু ফিরেই আসেননি। তাঁর হাতে শুধু বাংলাদেশের বোলিংয়ের পতাকাটাই নয়, বোলিং-ব্যাটিং-ফিল্ডিং-অফুরন্ত প্রাণশক্তি মিলিয়ে তিনিই বোধ হয় এই বাংলাদেশের 'এমভিপি'। মোস্ট ভ্যালুয়েলবল প্লেয়ার। [৫]

ম্যাচে মাশরাফির কৃতিত্বটা বুঝতে একটু পরিসংখ্যানেরও সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এই দিন সব মিলিয়ে বল করেছিলেন ৬৩টি; এর মধ্যে ৫৫টিই ছিল গুড লেন্থ ডেলিভারি। যারা টিকতে পারেননি, তাদের কথা তো বলে লাভ নেই। যে সৌরভ ছিলেন ভারতের সর্বোচ্চ স্কোরার তিনি মাশরাফির খেলেছিলেন ২২টি বল; তাতে কত স্কোর করেছিলেন জানেন?

৩ রান মাত্র!

এই ম্যাচে মাশরাফির পারফরম্যান্স নিয়ে একটা কাব্যিক বর্ণনা না শুনলেই নয়। তখনকার বিডিনিউজ টোয়েন্টি ফোরের ক্রীড়া সম্পাদক মোস্তফা মামুন অতিথি কলাম লিখছিলেন দৈনিক সমকালে। তিনি ভারত-বধের পর লিখছেন :

বব মার্লে নন। কিংবা হালের ত্রিনিদাদের সুকা মিউজিক কিং মার্শাল মনাউটরোও নন। তিনি মাশরাফি বিন মুর্তজা।

তিনজনের নামেই 'ম' আছে। প্রথম দুজনের বিষয় অভিন্ন—মিউজিক। কিন্তু মাশরাফি সঙ্গীত থেকে বহুদূরের বিষয়—ক্রিকেট। মাশরাফি কাল সকালের ৭ ওভারের এক ঝোড়ো স্পেলে সব দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়ে নিজেকে নিয়ে গেলেন ওদের স্তরে। ক্যারিবিয়ান উঁচু লয়ের মিউজিকের সঙ্গে তাল মেলানো এমন চুরমার করে দেওয়া বোলিং যে বব মার্লে বেঁচে থাকলে কে জানে তার সঙ্গে তাল মেলানো একটা রাগসংগীত হয়তো গেয়েই ফেলতেন। নড়াইল এক্সপ্রেসের এই তোপে বাংলাদেশের সকালটা এগোল সুপারসনিক গতিতে। আর তাতে ভারতের ব্যাটিংয়ের অবস্থা মেইল ট্রেনের চেয়েও খারাপ। বাংলা থেকে বিহার পর্যন্ত যেতে যেতেই বারবার লাইনচ্যুত। [৬]

তবে ওই যে বলেছি, লড়াইটা আসলে ভারতের ছিল ১১ রানার বিপক্ষে। ফলে

'কেহ নাহি কারে ছাড়ে' অবস্থা। ব্যাটিংয়ে তামিম, সাকিব এবং বিশেষত মুশফিকের ফিফটির কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। এই তিন তরুণের ব্যাটই বাংলাদেশকে পৌঁছে দিল নাটকীয় জয়ের গন্তব্যে।

৮.

বিশ্বকাপে দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ১৯৮ রানে পরাজয়টা আবার একটু সংকটে ফেলে দিয়েছিল বাংলাদেশকে। পরের ম্যাচে বারমুডার সঙ্গে জিততেই হতো। এমনিতে বারমুডা তেমন কোনো প্রতিপক্ষ নয়। প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছিল সেদিন বৃষ্টি।

দফায় দফায় বৃষ্টির বাধার পর নাটকীয়ভাবে, ডাকওয়ার্থ-লুইস মেথডে ৭ উইকেটে জিতেছিল বাংলাদেশ। শুরুটা যথারীতি মাশরাফিই করে দিয়েছিলেন। নিজের ও ম্যাচের প্রথম ওভারের শেষ বলে ও পঞ্চম ওভারের প্রথম বলে ২ উইকেট তুলে নেন। ২১ ওভারের ম্যাচে ৪ ওভার বল করে ৮ রান ব্যয় করে ২ উইকেট। রান তাড়া করতে গিয়ে দ্রুত ২ উইকেট হারালেও বাংলাদেশকে বৃষ্টির সঙ্গে লড়ে পৌঁছাতে হয়েছিল লক্ষ্যে। আর এই জয় বাংলাদেশকে পৌঁছে দেয় ইতিহাস সৃষ্টি করা সুপার এইটে; যেখানে আরও ইতিহাস

আইসিসি বিশ্বকাপ
গ্রুপ-বি, ম্যাচ-৮
বাংলাদেশ-ভারত
তারিখ : ১৭ মার্চ, ২০০৭
ভেন্যু : কুইন্স পার্ক ওভাল, পোর্ট অব স্পেন, ত্রিনিদাদ
টস : ভারত (ব্যাটিং)
ফল : বাংলাদেশ ৫ উইকেটে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ : মাশরাফি বিন মুর্তজা

ভারত

ব্যাটসম্যান	রান	বল	৪	৬
সৌরভ ক রাজ্জাক ব রফিক	৬৬	১২৯	৪	
শেবাগ ব মাশরাফি	২	৬		
উথাপ্পা ক আফতাব ক মাশরাফি	৯	১৭	১	০
টেন্ডুলকার ক মুশফিক ব রাজ্জাক	৭	২৬	১	
দ্রাবিড় এলবিডব্লু রফিক	১৪	২৮		
ধোনি ক আফতাব ব রফিক		৩		
হরভজন ব রাজ্জাক		৩		
আগারকার ক মুশফিক ব মাশরাফি		২		
জহির খান অপরাজিত	১৫	১৭	২	০
প্যাটেল ক রাজ্জাক ব মাশরাফি	১৫	১৫	২	০
অতিরিক্ত (লেবা ৫, ও ৩, নো ৮)	১৬			
মোট (৪৯.৩ ওভারে অলআউট)	১৯১			

বোলিং : মাশরাফি ৯.৩-২-৩৮-৪, রাসেল ১০-২-৩১-০
রাজ্জাক ১০-২-৩৮-৩, সাকিব ১০-০-৪৪-০
রফিক ১০-২-৩৫-৩।

বাংলাদেশ				
ব্যাটসম্যান	রান	বল	৪	৬
তামিম ক ধোনি ব প্যাটেল	৫১	৫৩	৭	২
নাফীস এলবিডব্লু জহির	২	৮		
মুশফিক অপরাজিত	৫৬	১০৭	৩	২
আফতাব এলবিডব্লু প্যাটেল	৮	১০	১	
সাকিব স্টা. ধোনি ব শেবাগ	৫৩	৮৬	৫	১
হাবিবুল স্টা. ধোনি ব শেবাগ	১	৮		
আশরাফুল অপরাজিত	৮	২৩	১	
অতিরিক্ত (লেবা ১, ও ৪, নো ৮)	১৩			
মোট (৪৮.৩ ওভারে ৫ উইকেটে)	১৯২			

বোলিং : জহির ৯-২-৪১-১, আগারকার ১০-০-৪১-০
প্যাটেল ৮.৩-১-৩৯-২, হরভজন ১০-১-৩০-০
টেন্ডুলকার ৩-০-৮-০, যুবরাজ ৩-০-১৫-০, শেবাগ ৫-০-১৭-২।

অপেক্ষা করছিল বাংলাদেশের জন্য।

৯.

ক্রিকেটে একটা ব্যাপার প্রচলিত আছে–ওয়েলকামিং বাউন্সার। বাংলাদেশকে পরপর দুটো বাউন্সারে সুপার এইটে স্বাগত জানাল দুই তাসমানিয়ান প্রতিবেশী–অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। শুরু হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১০ উইকেটে হেরে। পরের ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৯ উইকেটের হার। মাশরাফি দুই ম্যাচেই উইকেটশূন্য।

এই সময় মনে হচ্ছিল, সুপার এইটে এসে একটা ভুল করে ফেলেছে বাংলাদেশ; অধিকারের বাইরের জগতে পা দিয়ে ফেলেছে। এ ধারণাটা খণ্ডানো খুব জরুরি ছিল; খুব জরুরি।

আর সেই ভুলটা ভাঙানোর জন্য বাংলাদেশ বেছে নিল তখনকার বিশ্বসেরা, আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর দল দক্ষিণ আফ্রিকাকেই। গায়নার প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামে তৈরি হলো আরেক ইতিহাস। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৬৭ রানে হারাল বাংলাদেশ।

মূলত আশরাফুলের ৮৭ রান ও আফতাবের ঝোড়ো ৩৫ রানে ভর করে ২৫১ রান তুলেছিল বাংলাদেশ। তবে কিছুতেই ভুলে যাবেন না মাশরাফির ১৬ বলে ৩টি চার ও একটি ছক্কায় সাজানো ২৫ রানের ইনিংসের কথা। রাজ্জাক, সাকিব, রাসেলদের বোলিংয়ের সামনে এই ২৫১ রান পর্বতসমান হয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য। মাশরাফি অবশ্য বল হাতে বাজে একটা ম্যাচ কাটিয়েছিলেন; ৯ ওভারে ৪৫ রান দিয়ে উইকেটশূন্য ছিলেন।

সুপার এইটে বাংলাদেশের পরের চারটি ম্যাচ ছিল ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। মাশরাফি আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ৩৮ রানে ২টি ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩৯ রানে ১টি উইকেট নিয়েছিলেন। বাংলাদেশ ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ম্যাচের কোনো না কোনো সময়ে জয়ের স্বপ্ন দেখার মতো অবস্থায় ছিল। সেটাকে বাস্তবে পরিণত করতে না পারার হতাশা ছিল। সবচেয়ে বড় হতাশা ছিল আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে পরাজয়টা।

বিশ্বকাপের শেষটা হতাশা দিয়ে হলেও ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা-বধের কারণে নিশ্চয়ই সারা জীবনের স্মরণীয় একটা ব্যাপার হয়ে থাকবে এই বিশ্বকাপ।

১০.

বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গেলেও তার পালক পড়েছিল অনেক দিন ধরে।

২০০৭ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পারফরম্যান্সের 'শক' বেশ কিছুদিন তাড়া করে বেড়িয়েছে ক্রিকেট আলোচকদের। সারা পৃথিবী একমত হয়েছিল, বাংলাদেশ এখন আর পুঁচকে দল বা 'মিনোস' নয়। নামটা বদলানোর সুপারিশও ছিল।

এই বিশ্বকাপের মূল্যায়ন করতে গিয়ে, ফিরে দেখতে গিয়ে বাঘা বাঘা বিশেষজ্ঞ প্রধান আলোচ্য করে তুলেছিলেন মাশরাফিকে। ক্রিকইনফোর তখনকার যুক্তরাজ্য সম্পাদক অ্যান্ড্রু মিলার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের আগে বিশ্বকাপ ও মাশরাফিকে মিলিয়ে লিখেছিলেন :

সব মিলিয়ে আজকের শোডাউনে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অ্যান্টিগায় বাংলাদেশের এই ইউনিটের প্রাণ হয়ে থাকবেন মাশরাফি মুর্তজা। মুর্তজা তার ২৩ বছরের জীবনে যে শাস্তি ও সাজা পেয়েছেন, তা অনেক পেসার সারা জীবনে সহ্য করতে পারে না। দুই হাঁটুর অপারেশন যেন তার জন্য যথেষ্ট হচ্ছিল না, তাই পিঠের ও গোড়ালির ইনজুরি সইতে হয়েছে তাকে, সইতে হয়েছে দলের অবমাননাকর সব পারফরম্যান্স। তবে এই সব অভিজ্ঞতা মনে হয় তাকে আরও শক্ত, আরও কঠিন এবং অনেক অনেক অনেক শ্রেয়তর করে তুলেছে। [৭]

বিশ্বকাপ শেষে মাশরাফিসহ আরও অনেকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বাংলাদেশের উত্থান সম্পর্কে লিখেছিলেন 'পান্ডিটস ফ্রম পাকিস্তান' বইয়ের সুখ্যাত লেখক রাহুল ভট্টাচার্য। তিনি 'প্রোজেক্ট টাইগার' নামে লেখায় বলতে চাইছিলেন, মাশরাফির ভেতর যে উচ্ছ্বাস, সতেজ একটা ব্যাপার আছে, সেটাই হলো বাংলাদেশের প্রতীক।

একটা মজার ঘটনার কথা বলেছেন ভট্টাচার্য। মাশরাফির প্রথম বিদেশ সফর, 'এ' দলের হয়ে ভারত সফরে মাশরাফিদের সাহস দিতে এসেছিলেন রাজ সিং দুঙ্গারপুর। বাংলাদেশিরা যাতে স্থানীয় দলগুলোকে ভয় না পায়, তাই তিনি বলেছিলেন, 'হারো, সমস্যা নেই। ভালো খেলে হেরো তোমরা।'

দুঙ্গারপুর ধরেই নিয়েছিলেন মাশরাফিরা হারবেন। এরপর টানা ভারতীয় দলগুলোকে হারিয়ে বাংলাদেশ 'এ' দল যখন দেশে ফিরছে দুঙ্গারপুরকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না!

এবার ২০০৭ বিশ্বকাপে আসুন। অনিল কুম্বলে ভারত-বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের আগের দিন মাশরাফিকে নাকি বলেছিলেন, তাদের খুব চাপ। কারণ এখানে বিশ্বকাপ শেষ করে বাংলাদেশ সফরে যাওয়ার ফাঁকে বেশি সময় পাওয়া যাবে না। কারণ, ভারত তো নিদেনপক্ষে সুপার এইট শেষ করে বাড়ি ফিরবে। অন্যদিকে বাংলাদেশের আরাম; কারণ, বাংলাদেশ প্রথম পর্ব শেষ করেই দেশে ফিরে যাবে!

অনিল কুম্বলের সঙ্গে কি মাশরাফির আর দেখা হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজে?

১১.

২০০৭ সালের মহাকাব্য শেষ করার আগে বছর শুরুর ঘরোয়া ক্রিকেটের পারফরম্যান্সটা বলে নেওয়া উচিত।

এ বছর মাশরাফি যোগ দেন আবাহনীতে।

আবাহনীর হয়ে ৪টি ম্যাচ খেলেছিলেন প্রিমিয়ারে। চার ম্যাচে ৬ উইকেট নিয়েছিলেন। যে এক ম্যাচে ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছিলেন, ইয়াং পেগাসাসের বিপক্ষে সে ম্যাচে ৪৪ রান করেছিলেন।

অক্টোবরে এসে জাতীয় লিগে এ বছর ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ, টানা পাঁচটি ম্যাচ খেলেছিলেন খুলনার হয়ে। ২০০৭ মৌসুমের জাতীয় ক্রিকেট লিগে খেলাটা মাশরাফির জন্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ঢাকার বিপক্ষে মিরপুরের মরা উইকেটেও ঝড় তুলেছিলেন মাশরাফি বল হাতে। শ্রীলঙ্কায় বাজে একটা সফর ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ম্যাড়মেড়ে পারফরম্যান্সের পর ক্যারিয়ারের সেরা স্রোতে থাকা মাশরাফির জন্য এটা খুব জরুরি ছিল। প্রথম ইনিংসে ৩৬ রানে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন। কিন্তু যারা বোলিং দেখেছেন, তারা বলছেন দ্বিতীয় ইনিংসের মাশরাফি অনেক বেশি ভয়ংকর ছিলেন। বিশেষ করে শেষ দিনে রিভার্স সুইং দিয়ে পুরোনো বলে পাগল করে ফেলেছিলেন ঢাকার ব্যাটসম্যানদের।

পাশাপাশি জাতীয় লিগের ওয়ানডেতে খেলেছিলেন ৩টি ম্যাচ। প্রথম দুই ম্যাচেই ম্যাচসেরা হয়েছিলেন। প্রথম ম্যাচে ৩ উইকেট ও ৩৫ রান এবং দ্বিতীয় ম্যাচে এসে ক্যারিয়ারের প্রথম লিস্ট-এ ৫ উইকেট। আর শেষ ম্যাচে ২ উইকেট। মানে ৩ ম্যাচে ১০ উইকেট!

[১] Minnow menace; সিদ্ধার্থ বৈদ্যনাথন (ক্রিকইনফো; ১৬ মার্চ, ২০০৭)
[২] নিউজিল্যান্ড জয়ের পর ও-দেশে; পবিত্র কুন্ডু (প্রথম আলো; ৯ মার্চ, ২০০৭)
[৩] অলরাউন্ডার মাশরাফি জ্বলে উঠবেন আজ!; আসিফ ইকবাল (জনকণ্ঠ; ১৭ মার্চ, ২০০৭)
[৪] Brilliant Bangladesh stun India; সিদ্ধার্থ বৈদ্যনাথন (ক্রিকইনফো; ১৭ মার্চ, ২০০৭)
[৫] মাশরাফি-রাজ্জাক-রফিক...কাকে ছেড়ে কার কথা বলি; উৎপল শুভ্র (প্রথম আলো; ১৮ মার্চ, ২০০৭)
[৬] মিউজিক কিংয়ের নাম মাশরাফি; মোস্তফা মামুন (সমকাল; ১৮ মার্চ, ২০০৭)
[৭] The Narail Express; অ্যান্ড্রু মিলার (ক্রিকইনফো; ৩১ মার্চ, ২০০৭)

আহা বন্ধু! কোথা বন্ধু!



১.

এক ফোঁটা আলো থাকলেও ছেলেটার ঘুম আসত না।

ঘরে আলো জ্বললে তো চলবেই না। বাইরে থেকে আলো এসে চোখে লাগলেও আর ঘুম আসে না। দরজার নিচে কাপড় গুঁজে দিয়ে বাইরে থেকে আসা আলোর পথ বন্ধ করে তারপর ঘুমায়। পাঁচ তারকা হোটেলের মিঠে আলোতেও তার ঘুম হয় না।

অন্ধকার চাই; গাঢ় অন্ধকার।

মাশরাফির স্বভাব আবার ঠিক উল্টো। সে আবার অন্ধকার হলে একদম ঘুমাতে পারে না। ঘুমানোর সময় রুমে খটখটে দিনের আলোর মতো আলো চাই; নইলে ভয় করে। ঘুম আসে না।

এমন বিপরীতধর্মী দুজন মানুষের আবার বছরের পর বছর একই রুমে থাকতে হয়। তাহলে কীভাবে চলবে? ছেলেটাই বুদ্ধি আবিষ্কার করল। মুখ কালো করে মাশরাফিকে বলল, 'আগে তুই ঘুমাবি। তোর ঘুম এসে গেলে তারপর আমি সব আলো নিভিয়ে তারপর ঘুমাব।'

মাশরাফি বিছানায় যায়। আগে ঘুমায়।

তারপর ছেলেটা সব আলো বন্ধ করে ঘুম পাড়ে। বছরের পর বছর, দিনের পর দিন এমন চলে। কখনো কখনো দুষ্টুমি করতে ইচ্ছে হয়। ঘুম এলেও ঘুমায় না মাশরাফি। ইচ্ছে করে জেগে থাকে। ওদিকে ছেলেটা ঢুলতে থাকে; কিন্তু ঘুমাতে পারে না।

বারবার মাশরাফির কাছে এসে বলে, 'দোস, এখন এট্টু ঘুমা। তুই ঘুমালে আমি ঘুমাব।'

মাশরাফি ফিক করে হেসে দেয়।

মাশরাফির হাসি দেখে ছেলেটাও না পেরে ম্লান হাসতে থাকে। দুজনের হাসিতে একসময় ঘর আরো আলোকিত হয়ে ওঠে।

এখনো রাত গভীর হয়। এখনো মাশরাফির রুমে আলো জ্বলতে থাকে। কোনো কোনো দিন সত্যিই মাশরাফির ঘুম আসে না। মাঝরাত পার হয়ে যায়। কখন যেন একটু চোখের পাতা ধরে আসে। তখনই মাশরাফি একটা কণ্ঠ শুনতে পায়, 'দোস, এখন একটু ঘুমা। তুই ঘুমালে আমি ঘুমাব।'

চট করে ঘুম পালিয়ে যায়। বিছানায় উঠে বসে মাশরাফি। হাতের ফোনটা ফেলে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেয়, ইনহেলারের জন্য হাত বাড়ায়—রানার গলা না!

একা একা চিৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে, 'রানা, ভাই আমার।'

২.

মাশরাফি অনেক কথা বলেন। একটু বেশিও বলেন।

ছোট প্রশ্ন করলে বড় উত্তর দেন, মধুর উত্তর দেন। আরেকবার শুনতে ইচ্ছে করার মতো আবেগ জড়ানো গলায় উত্তর দেন। কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে তার ক্লান্তি নেই।

কিন্তু কয়েক বছর ধরে রানার প্রসঙ্গে খুব একটা কথা বলতে চান না মাশরাফি। হঠাৎ হঠাৎ প্রসঙ্গটা উঠে পড়ে। ১৬ মার্চ চলে এলে তরুণতর কোনো সাংবাদিক মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন—মাশরাফি ভাই, জানেন তো।

মাশরাফি কাষ্ঠ হাসি হাসেন, 'ভাই, সবকিছু মনে করিয়ে দিতে হয় না।'

হ্যাঁ, আমরাও চাই না, বারবার মাশরাফিকে সেই রানার স্মৃতিতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। আমরাও চাই না, এই দুই সহোদরের বিচ্ছেদ ঘটানো মৃত্যুর কথা করিয়ে দিতে। সবচেয়ে ভালো হতো, এই অধ্যায়টা আদৌ লিখতে না পারলে। কিন্তু মাশরাফির জীবনে এ এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়।

৩.

রানার সঙ্গে মাশরাফির পরিচয় হয়েছিল খুলনায়।

যত দূর স্মরণ করতে পারে মাশরাফি, তাতে অনূর্ধ্ব-১৭ খুলনা পর্যায়ের কোনো এক ম্যাচ খেলতে খুলনায় এসে পরিচয় হয়েছিল দুজনের। আজকের শেখ আবু নাসের স্টেডিয়ামের ঠিক গায়ে লাগানো রানাদের বাড়ি। তাদের জায়গা থেকেই

স্টেডিয়ামের সীমানা শুরু হয়েছে বলা চলে।

ঢাকায় খেলা শুরু করার পর দুজনের ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়েছে। সঙ্গে কিছুদিনের মধ্যে যোগ হয়েছে সৈয়দ রাসেল আর মুরাদ খান। বাঁহাতি স্পিনার মুরাদ খান জাতীয় পর্যায়ে খুব ভালো করতে পারেননি, জাতীয় দলে ঢুকতে পারেনি। তাই তার সঙ্গে বন্ধুত্বটা টিকে থাকলেও সেভাবে সারা পৃথিবী দাপিয়ে বেড়ানো হয়নি। তার বদলে কিছুকাল পরে এই চক্রে যুক্ত হন আরেক বাঁহাতি স্পিনার আবদুর রাজ্জাক।

মোটামুটি মাশরাফি-রাজ্জাক-রানা-রাসেলের একটা দারুণ চক্র গড়ে ওঠে সেই খুলনা থেকে শুরু করে ঢাকাতেও। সেই কিশোর বয়সে রানা আর মাশরাফি যা যা করে বেড়াতেন বড় হয়ে চারজন মিলেও তেমন করেই দুষ্টুমি আর বাঁদরামি করে বেড়ান।

মাশরাফিদের পুরো চক্রটারই আড্ডায় মেতে ওঠার একটা বড় ঠিকানা ছিল রানাদের বাসা। স্টেডিয়ামের পাশেই হওয়াতে খেলা শেষ করে ওদের বাসায় আড্ডা, ওই মুজগুন্নিতেই হইচই করা। এভাবেই বেশ কাটছিল দিন।

রানা নিজে যেমন দুষ্টুমির রাজা ছিল, রানার সঙ্গেও জাতীয় দলের সবাই খুব দুষ্টুমি করত। আশরাফুলরা কত খেপাত! জাভেদ ভাই, ইমরুল; সবাই খেপাত।

মাশরাফি দু-একবার খেপানোর চেষ্টা করেছেন। দলে মাশরাফির চেয়ে বেশি দুষ্টুমি আর কে করতে পারে! তিনি সবাইকে খোঁচা দিয়ে বেড়ান; রানা তো খোঁচা খাবেই।

কিন্তু রানাকে আর খোঁচাতেন না মাশরাফি। কোনো দিন রানা কিছু বলেনি। কিন্তু মাশরাফি টের পেয়েছিলেন, তিনি কিছু বললে রানা কষ্ট পায়। বাকিরা করলে সেটা রসিকতা; কিন্তু ভাই কেন বাকিদের সঙ্গে যোগ দিয়ে রসিকতা করবে! এই অভিমানের জায়গাটা বুঝতে পেরে রানাকে কখনো অন্যদের সঙ্গে ভিড়ে খোঁচাননি মাশরাফি।

ভাইয়ে ভাইয়ে সবকিছু চলে না।

এর মধ্যে রানা জাতীয় দলে একটু অনিয়মিত হয়ে পড়ল। ২০০৫ সালেও জাতীয় দলের প্রাণ ছিল, ২০০৬ সালেও খেলেছে নিয়মিত। কিন্তু সাকিব আল হাসানের মঞ্চে আবির্ভাব হওয়ায় একজন বাঁহাতি স্পিনার, অলরাউন্ডার হিসেবে রানা প্রতিযোগিতায় একটু পিছিয়ে যান। তাই রানার সঙ্গে চোখের দেখা একটু কমতে থাকে।

রানার খুব স্বপ্ন ছিল, বিশ্বকাপ খেলতে যাবে। শেষ পর্যন্ত আরও একজন বাঁহাতি স্পিনার হিসেবে দলে ঢোকা হয়নি তার। মনটা খুব খারাপ ছিল। মাশরাফিকে ফোন করে বলেছিল, 'দোস, আমি আর চান্স পাব না?'

'পাবি। অবশ্যই পাবি। একটু প্র্যাকটিসে মন দে।'

৩.

ওয়েস্ট ইন্ডিজ যেতে হবে। মাশরাফিদের হাতে এতটুকু সময় নেই।
বিশ্বকাপে রওনা দেওয়ার চার দিন আগে একবার নড়াইল গিয়েছিলেন। রানাকে ফোন করলেন নড়াইল বসেই, 'কই তুই?'
'আমি খুলনায়।'
'আচ্ছা, থাক। আমি আসতিছি।'
পরিকল্পনা করলেন, খুলনায় গিয়ে রানার সঙ্গে খানিকটা সময় আড্ডা দিয়ে ওই পথে যশোর বিমানবন্দর চলে যাবেন। রানাদের বাড়ি বসে লম্বা আড্ডা দিয়ে ফেললেন। সেখানেও খুব খাওয়া-দাওয়া হলো। আর সময় নেই। বিমানের সময় হয়ে যাচ্ছে। মাশরাফি উঠলেন। রানা বলল, 'চল আমিও যাই। তুই যাওয়ার সময় আমারে জিয়া হলের সামনে নামায়ে দিয়ে যাইস।'

রানার ইদানীং একটা সমস্যা ছিল, অনুশীলন কম করছিল। হয়তো জাতীয় দলে ডাক না পাওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েছিল। গাড়িতে বসে অনেকক্ষণ ধরে মাশরাফি বোঝালেন–জাতীয় দলে ফিরতে গেলে আরও কড়া লড়াই করে ফিরতে হবে।
রানা উত্তর দেয় না শুধু হাসে; মাশরাফির ভাষায় 'বত্রিশ পাটি দাঁত বের করা হাসি।'
জিয়া হলের সামনে রানাকে নামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কই যাবি?'
'স্টেডিয়ামে গিয়ে একটু আড্ডা দেব।'
'স্টেডিয়ামে যাবি, আড্ডা দিবি কেন! নেট কর।'
'করবানি কাইলকে।'
মাশরাফির খুব রাগ হলো, 'তুই যা আড্ডাই দে। প্র্যাকটিস লাগবে না। আর কোনো দিন জাতীয় দলে খেলতে হবে না। ফাউল এট্টা।'
রানা হাসে, 'দেহিস আমি আবার তোর সঙ্গে খেলব।'
মাশরাফি চটে গেছেন, 'তুমি আমার ** খেলবা। বসে আড্ডা দেও।'
দরজা লাগালেন মাশরাফি। খুব রাগ হচ্ছে রানার ওপর। আরেকবার তাকালেন জানালা দিয়ে। বাইরে রানা হাসছে; বত্রিশ পাটি বের করা হাসি।
মাশরাফির মাথায় রানার শেষ ছবি ওই বত্রিশ পাটি দাঁত বের করা।

৪.

১৬ মার্চ।
বাংলাদেশের ক্রিকেট সমর্থকদের হৃদয় থেকে এই দিনটা মুছে যাওয়ার নয়।
এই দিনেই বাংলাদেশের ক্রিকেট তার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শোকের মুখোমুখি হয়েছিল এই দেশটির ক্রিকেট পরিবারের অবিচ্ছেদ্য এক অংশ, জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের প্রাণপ্রিয় বন্ধু মানজারুল ইসলাম রানা এক সড়ক দুর্ঘটনায় পৃথিবী ছেড়ে দিয়েছিলেন ২০০৭ সালের এই দিনে।

'রানার জন্য ম্যাচ' বলে আইসিসির স্বীকৃত কোনো ব্যাপার তো নেই। তবে রানার মৃত্যুবার্ষিকীর আশপাশে কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ থাকলে সেটাকে এভাবেই চিহ্নিত করতে পছন্দ করে বাংলাদেশ। আর একটা বিস্ময়কর তথ্য হলো, সেই ২০০৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ কখনোই রানার জন্য ম্যাচে পরাজয় নিয়ে মাঠ ছাড়েনি!

এই ব্যাখ্যাতীত ঘটনার শুরু হয়েছিল ২০০৭ সালে।

সেবারের ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ছিল ১৭ মার্চ। ভারতের বিপক্ষে সেই ম্যাচ নিয়ে তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে বাংলাদেশ; সব জায়গায় উত্তেজনা। ঠিক সেই সময় খুলনা থেকে আসা বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম শোকাবহ সংবাদে কেঁপে উঠল বিশ্ব–বাংলাদেশের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার মানজারুল ইসলাম রানা আর নেই। আরেক ক্রিকেটার সাজ্জাদুল হাসান সেতুর সঙ্গে একই মোটরসাইকেলের দুর্ঘটনায় ক্রিকেটের এই চেনা দুনিয়া ছেড়ে চলে যান রানা।

রানা শুধু জাতীয় দলের একজন ক্রিকেটার ছিলেন, এটা বললে কিছু বোঝা যাবে না। তার ৬ টেস্ট ও ২৫ ওয়ানডের পরিসংখ্যান দিয়েও কিছু বোঝা যাবে না তার সম্পর্কে। রানা ছিলেন আসলে তখনকার জাতীয় দলটার প্রাণ। ৬ টেস্টে ২৫৭ রান ও ৫ উইকেট এবং ২৫ ওয়ানডেতে ৩৩১ রান ও ২৩ উইকেট নেওয়া রানা অনায়াসে সেই বিশ্বকাপের দলেও থাকতে পারতেন। সেটা হয়নি হয়তো নানা কারণে। কিন্তু মাশরাফিরা যখন শুনলেন দেশে রেখে আসা সেই বন্ধুই মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় তাদের ছেড়ে চলে গেছেন, আরেক অর্থেই তাদের দুনিয়া টলে উঠেছিল।

তারপর তো ইতিহাস। সেই ভারতকে বন্ধু রানার জন্য ঠিকই 'ধরে দিয়েছিলেন' মাশরাফিরা।

বিস্ময়করভাবে এরপর প্রায় প্রতিবছরই রানার মৃত্যুর এই দিনটার আশপাশে বাংলাদেশ কোনো দলের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছে এবং জিতেছে! আর প্রায় প্রতিবারই আবার সেই ম্যাচের নায়ক হয়েছেন কোনো না কোনোভাবে রানার ভাইতুল্য সেই বন্ধু মাশরাফি।

রানার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর দুদিন পর, ১৮ মার্চ এই ঢাকায় বাংলাদেশ হারিয়েছিল আয়ারল্যান্ডকে; মাশরাফি ২২ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন। ২০০৯ ও ২০১০ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশের খেলা ছিল না। ২০১১ সালের ১১ মার্চ ইংল্যান্ড ও ১৪ মার্চ নেদারল্যান্ডসকে হারায় বাংলাদেশ। আর ২০১২ সালে ঠিক রানার মৃত্যুবার্ষিকীর দিন, এই ১৬ মার্চ ঢাকায় ছিল এশিয়া কাপে বাংলাদেশের ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ। আবার ম্যাচের আগের রাতে মাশরাফি সতীর্থদের বলেছিলেন, 'চল, রানার জন্য খেলি।'

সেবারও ফলটা নিশ্চয়ই মনে আছে!

এর বাইরে ২০১৪ সালে রানার মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ হারিয়েছিল আফগানিস্তানকে।

রানা-মাশরাফি-রাসেলরা মুখের চেয়ে হাতে বেশি কথা বলত। কী যে মারামারি করত! দেখা হলেই একজন আরেকজনের সঙ্গে একপশলা মারপিট করত। হঠাৎ দেখলে ভয় হতো, কেউ ব্যথা না পায়!

আর ছিল মোটরসাইকেলের পাগলামি। সব ছেলে, এই চক্রের সব ছেলে মোটরসাইকেলের পাগল ছিল।

ওরা সবাই একসঙ্গে মোটরসাইকেল প্রায় ছেড়েই দিল। ওই ২০০৭ সালের ঘটনার পর থেকে মাশরাফিরা আর মোটরসাইকেল দাবড়ে বেড়ায় না। কেউ কেউ প্রয়োজনে চালায়, পাগলামিটা আর নেই। মাশরাফিদের জীবন থেকে অনেক কিছু হারিয়ে গেছে ২০০৭ সালের ১৬ মার্চ দিনটায়। পাগলামি, দুষ্টুমি, মারামারি...অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে। শুধু একটা ব্যাপার হারায়নি–রানার জন্য লড়ার জেদটা হারায়নি।

সংযুক্তি

খুলনায় গেলেই মাশরাফি এখনো রানার বাড়িতে ফিরে ফিরে যান। পরিবারের মানুষগুলো মাশরাফিকে দেখলে আরেকটু বেঁচে থাকার ভালোবাসা পায় যেন। ২০০৯ সালে মাশরাফির সঙ্গে এমন এক সফরে যাওয়ার স্মৃতিচারণা ছাপা হয়েছিল প্রথম আলোয়।

এই স্মৃতিচারণা অনেকটাই ঘোরলাগা কথাবার্তায় পরিপূর্ণ। যারা রানা-মাশরাফি নিয়ে বেশি আগ্রহী, তাদের জন্য রইল সেই লেখাটা।

রানার বাড়িফেরা



'এই যে। এই ঘরটাতে আমরা থাকতাম, এই ঘরে সবাই বসে আড্ডা দিতাম। এদিকে দেখ, এই আলনাটা তখন ছিল না। ওই কোণে থাকত ক্রিকেটের কফিন...।'

চকচকে চোখে ঘরটার এ কোনা থেকে ও কোনায় ছুটে চলেছে ছেলেটা। দুই চোখে অসীম আগ্রহ নিয়ে নীরবে ছেলেটার বর্ণনা শুনছেন তাঁর স্ত্রী। এর মধ্যে মা এলেন। চেয়ে দেখলেন ছেলেকে, ছেলের বউকে। ডাক দিলেন, 'বাবা, খেতে আসবি না? বউমাকে নিয়ে খেতে আয়।' রানার মায়ের পেছন পেছন এগোতে থাকেন তাঁর ছেলে আর বউ। একটু দূরে ওদের নীরবে অনুসরণ করেন রানার বাবা।

গুমোট বাড়িটাতে অনেক দিন পর আবার যেন একটু খোলা হাওয়া ফিরে এসেছে। টিউবলাইটের মরা আলো কালকের চেয়ে একটু উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। ভেজা চোখ মুছতে মুছতে তিনি চেয়ে দেখেন, রানার মায়ের দুই হাত ধরে খাবারের ঘরের দিকে হেঁটে চলেছেন তাঁর ছেলে আর

বউ। মায়ের কাঁধের ওপর মাথাটা এলিয়ে দিয়ে হাঁটছে অত বড় ছেলেটা।
***

সাহিত্যে, কল্পনায় জাদুবাস্তবতা বলে একটা ব্যাপার আছে। সেখানে হয়তো একদিন চুপিসারে মায়ের কোলে ফিরিয়ে আনা যেত মানজারুল ইসলাম রানাকে। কিন্তু এই দুনিয়াটা সত্যিই বড় নির্দয়। জাদুগুলো এখানে আর বাস্তব হয়ে ফিরে আসে না। তাই নিজেদের বাড়িতে আর ফিরে আসেন না মানজারুল ইসলাম রানা। নিকষ অন্ধকার আর শূন্যতায় ভরে থাকে তাঁর ঘরটা। এর মাঝে একটু আলো নিয়ে মাঝেমধ্যে ফিরে আসেন রানার বাবা-মায়ের কাছে নিজেকে ছেলে হিসেবেই দাঁড় করানো মাশরাফি। আবদারে, আহ্লাদে, মা-বাবার প্রতি কর্তব্যে ভুলিয়ে দিতে চান বাল্যবন্ধু রানার শূন্যতাকে। তাই কি হয়! তার পরও একটু চেষ্টা করে যাওয়া।
***

মাশরাফি বিন মুর্তজা আর তাঁর স্ত্রী সুমী খুলনায় এলে রানার বাড়িতে বেড়াতে যাবেন, এটা তাঁদের পরিচিত জগতে নতুন কোনো খবর নয়। খুলনায় এলে তারপর যেতে হবে, মাশরাফির বেলায় এ কথা সাজে না। রানার বাসায় আসেন নিজের বাড়িতে আসার আগ্রহ নিয়ে। যে আগ্রহে ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে ফিরেই বলেছিলেন, 'আগে রানার বাড়ি যাব।' সেই ছোটবেলায় তৈরি হওয়া অভ্যেস।
প্রস্তাবটা দিতেই তাই রাজি হয়ে গেলেন, 'আমি তো প্রায়ই যাই। এই তো কালও গেলাম, আজও যাব। চলুন না হয় সঙ্গে।' খেলা শেষ করে হোটেলে গিয়ে স্ত্রীকে মোটরসাইকেলের পেছনে বসিয়ে মাশরাফি হাজির মুজগুন্নিপাড়ায়। এলাকার লোকজন অবশ্য বলে, কাজীপাড়া।
কাজীপাড়ার কাজী মানজারুলদের বাড়িতে মাশরাফি কতটা নিয়মিত মুখ, তা ঢুকতেই টের পাওয়া গেল। ছোট্ট একটা গলিপথ ধরে এগোতে হচ্ছে। দুই পাশে আরও কতগুলো বাড়ি। মোটরসাইকেলের শব্দ পেয়ে ছুটে এল দুই শিশু, 'কে? মাশরাফি ভাই?' মাশরাফি একটু পেছনে আসছে বলতেই দুজনের মধ্যে ছোট ছেলেটি বলল, 'আমরা জানি মাশরাফি ভাই আসবে। কাল-বলে গেছে।' একটু কৌতূহল হলো, মাশরাফি এদের বলে যায়? এবার অবাক সেই ছেলেটি, 'আমাদের বলবে না কেন? মাশরাফি ভাই তো রানা ভাইয়ের ভাই।'

এই এক মজা, এক বিস্ময়। এলাকার লোকজন এত দিনে কেমন যেন বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছে মাশরাফি আসলে রানারই ভাই। মুজগুন্নিপাড়ায় ঢুকতেই ছোট্ট কয়েকটা চায়ের দোকান। এক দোকানদারের নাম আবার রানা। তাঁর ধারণা, মাশরাফি হলো 'সাদা রানা', 'আমাগো রানা তো এট্টু কালা ছিল। কৌশিকের গায়ের রং ফরসা। এ ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নাই আমাগো কাছে। রানার মতোই আমাগো কাকা-কাকা করে ডাকে।' একজন রানা খুঁজে পাওয়ার কী প্রাণান্ত

চেষ্টা!
***

একই দৃশ্য রানার বাসাতেও। এই যে এত বড় তারকা মাশরাফি, দেশ-বিদেশে যাকে একপলক দেখার জন্য ভিড় জমে যায়, রানার বাড়িতে তাঁর আর আলাদা কোনো সত্তা নেই। এখানে রানার স্থান পূরণ করে যাওয়াই তাঁর কাজ। এসেই তাই বউকে নিয়ে সোজা রান্নাঘরে। মায়ের কোলের কাছে দাঁড়িয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, 'কী রান্ধো রাতে? গরুর মাংস! ভালোই হইছে।' রান্নাঘরে মায়ের কাছে বউকে রেখে চলে আসে সে বসার ঘরে। রানার বাবা তখন দুই বহিরাগত সাংবাদিককে সামলাতে ব্যস্ত। মাশরাফির সেদিকে চোখ নেই, 'ও কাকা, শরীরের কী অবস্থা।' তারপর কতশত প্রশ্ন। এর মধ্যে মা আর মাশরাফির স্ত্রী ঢোকেন। একসময় কথা ফুরিয়ে যায়। প্রায়ই যেখানে দেখা হয় সেখানে আর নতুন কথা কোত্থেকে তৈরি হবে! কথা মানে তো সেই রানা। সেই যন্ত্রণার কথা।
শর্তটা মাশরাফিই দিয়ে দিয়েছিল, 'শোনেন দাদা, ও বাড়িতে যাবেন ভালো কথা। কিন্তু রানার কথা তুলে তুলে খোঁচানো যাবে না কিন্তু।' দিবারাত্রি সাংবাদিকদের সামলাতে সামলাতে মাশরাফির এটুকু অভিজ্ঞতা অন্তত হয়েছে, সাংবাদিকেরা কষ্ট বোঝেন না! তাঁরা শুধুই খোঁচাতে জানেন। তবে এখানে আর প্রতিজ্ঞা ভাঙার দরকার হলো না। রানার কথা উঠেই গেল। আসলে রানার কথা না উঠে পারে কীভাবে?

রানার মায়ের এক পাশে বসে মাশরাফি আরেক পাশে মাশরাফির স্ত্রী। মাশরাফির চুলে হাত বোলাতে বোলাতে রানার মা বলছেন, 'বাবা, তুমি মোটরসাইকেল নিয়ে আইছ? এট্টু সাবধানে চালাইয়ো।' ব্যস, উঠে গেল রানার কথা।

মাশরাফিই শুরু করলেন, 'আমি সেলিমের কাছে শুনেছি। কী দুর্বিষহ সেই দৃশ্য! ওরা বারবার নিষেধ করছিল...।' এরপর কি আর থেমে থাকে! চোখের জল আর সেই স্মৃতি বয়ে যায় অবিরাম। মাশরাফির চোখ দুটো লাল টক টক করছে, 'রানাকে আমিও কতবার বলেছি, তুই ভাই জোরে গাড়ি চালাস না। শুনল না কোনো কথা।' একটা বুকচেরা দীর্ঘশ্বাস বের হয় রানার অসুস্থ বাবার, 'নিয়তি। নিয়তিই টেনে নিয়ে গেছে ওকে।' রানার মা কোনো কথা বলেন না। নীরবে কেঁদে চলেন। বিমূঢ় হয়ে মা-বাবা আর ছেলের মুখে স্মৃতিচারণা শুনে চলেছেন সুমনা।

রানার স্মৃতি সুমীর ভান্ডারে তুলনামূলক একটু কম। কিন্তু যা আছে সেটাও খুব তরতাজা আর উচ্ছল, 'এই তো সেদিন ওর (মাশরাফির) সঙ্গে প্রথম এলাম এই বাড়িতে। কী যে মজা করল রানা ভাই! আমাদের বিয়েতে তো একাই প্রায় মাতিয়ে রাখল।' মাতিয়ে রাখার ব্যাপারে রানার কোনো জুড়ি ছিল এমন দাবি কেউ করতে পারে না। সুমী তাই সেই উচ্ছল রানাকে ভুলতেই পারেন না, 'প্রথম যেদিন দেখা

হলো সেদিনই কত রসিকতা করল।'

মাশরাফির স্ত্রীর পক্ষে রানার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি খুঁজে বের করা কঠিন না। কিন্তু মাশরাফি যে মনেই করতে পারেন না, কবে প্রথম রানার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, 'আসলেই মনে করতে পারি না। আমরা তো সেই এতটুকু বয়স থেকে একসঙ্গে মিশি। আমার প্রথম ক্রিকেট বলে খেলা এই মাঠে...।' পেছনে হাত তুলে রানার বাড়ির পাশের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামটাকে দেখিয়ে দেন, 'সে সময় থেকেই পরিচয়। তার পর থেকে আমার খুলনায় খেলতে আসা মানেই ওর বাসায় থাকা। তখন অবশ্য এই বাসাটা ছিল না।' তখন রানারা যে বাসায় থাকতেন, সে বাসাটা প্রবেশপথেই দেখিয়ে দিয়েছেন মাশরাফিরা।

এবার কথায় যোগ দিলেন রানার মা, 'কী যে করত ওরা। শুধু রানা আর কৌশিক তো না। এই সেলিম, শাওন, সেতু আরও কতজন। রাত-দিন হইচই।' তারপর? তারপর সব হইচই মিলিয়ে একটা অসহনীয় নীরবতা। গুমোট একটা হাওয়া ঘিরে রেখেছে রানার বাসাটাকে। রানার মা চোখ মুছতে মুছতে সরে গেলেন। বললেন, 'তোমাদের খাবার গোছাই।' আসলে এই যন্ত্রণা থেকে একটু বাঁচতে চাইলেন!

মাশরাফি আর তাঁর স্ত্রী এবার চললেন রানার ঘরে। ঘরে ঢুকতেই হেলমেটটা চোখে পড়ল। একাকী পড়ে আছে শোকেসের ওপরে। হাতে ধরে গন্ধ শুঁকলেন মাশরাফি, 'দেখলাম, আগের মতো ঘামের গন্ধটা আছে কি না।' জোর করে হাসার একটা ভঙ্গি করলেন। হলো না। চোখ বেয়ে যে জল পড়ছে!

***

খাবার টেবিলে আয়োজনে অন্যান্য খাবারের মধ্যে গরুর মাংসও আছে। রানার প্রিয় খাবার। এই খাবারের জন্যই ছিল সেদিনের ছোটা। মাশরাফি একবারে কয়েক টুকরো প্লেটে তুলে নিলেন। তাঁর স্ত্রী আবার সেগুলো কেড়ে নিলেন, মাশরাফির গরুর মাংস খাওয়া নিষেধ। রানার মায়ের কাছে স্ত্রীর এমন অন্যায় আচরণের অভিযোগ তুলছেন মাশরাফি। মা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছেন। একটু একটু করে কেটে যাচ্ছে গুমোট আবহাওয়া। মাশরাফি একটা করেও কৌতুক বলছেন, হাসিতে ফেটে পড়ছেন সবাই। রানার বাসার হাওয়াটা একটু পাতলা হয়ে আসছে।

রানার মায়ের হাসতে হাসতে চোখে পানি চলে এসেছে, 'এমনি করে খাবার টেবিলে বসত। বলত, মা খাইয়ে দাও। আরও কত সব গল্প খেতে বসে।' আবার রানা চলে এল। রানাকে আটকে রাখার সাধ্য কার!

অলরাউন্ডারের সন্ধানে



১.

মাশরাফির সন্ধানে কখনো নড়াইল গেলে বিপাকে পড়বেন।

এই ফাস্ট বোলার মাশরাফিকে কিছুতেই খুঁজে পাবেন না। গাছে চড়া মাশরাফিকে পাবেন, নদী সাঁতরানো মাশরাফিকে পাবেন; এমনকি নদীর পাড়ে মুখে হাত দিয়ে বসে থাকা ভাবুক মাশরাফিকেও পেতে পারেন। ক্রিকেটার মাশরাফিকে খুব খোঁজাখুঁজি করলে লোক অনেক স্মৃতি হাতড়ে বলবে–ব্যাটসম্যান মাশরাফি!

কিন্তু পেসার মাশরাফিকে কিছুতেই পাবেন না।

তার বন্ধুরা এখনো মাশরাফির বোলিং নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করেন। অনেকেই সমস্বরে দাবি করলেন, তারা প্রায় সবাই মাশরাফির চেয়ে জোরে আর ভালো বল করতে পারেন। সাজু যেমন বলছিলেন, 'মাশরাফির চেয়ে তো আমিও জোরে বল করতাম। তবে হ্যাঁ, ও ছিল আমাদের সেরা ব্যাটসম্যান। টানা তিন নাকি চার বছর সবচেয়ে বেশি রান করেছিল।'

মাশরাফি যখন ঢাকায় আসলেন, অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়া কাপেও আমরা ব্যাটসম্যান

মাশরাফির খোঁজ পেয়েছিলাম। কিন্তু এরপর আস্তে আস্তে সেই ব্যাটসম্যান মাশরাফির বিলুপ্তি ঘটতে থাকে। ছোটখাটো ইনিংস মাঝে মাঝে পেয়েছি আমরা; কিন্তু ফিফটি পার করা ইনিংসও আর তার কাছ থেকে পাওয়া যায়নি।

সে অর্থে ২০০৭ সালটা অবশ্যই মাশরাফির এই 'অলরাউন্ডার' পরিচয় সামনে আসার বছর। বিশ্বকাপ খেলে ফেরার পরপরই ভারতের বিপক্ষে ক্যারিয়ারের প্রথম টেস্ট ফিফটি পান, পরের টেস্টে আবারও ফিফটি। শুধু এই ফিফটি দিয়ে বিচার করা যাবে না। এই পুরো বছরটাই ছিল ব্যাট হাতে মাশরাফির কিছু কিছু প্রভাব রেখে যাওয়ার বছর।

বলা হয়, এ বছর ভারত যখন বাংলাদেশ সফর শেষ করে চলে যাচ্ছে, তখন নাকি রাহুল দ্রাবিড় বলেছিলেন–মাশরাফির মতো একজন অলরাউন্ডার থাকলে বর্তে যেতেন তারা।

যদিও নানা কারণে পরবর্তী সময়ে মাশরাফির ব্যাটিং আরও বিলুপ্ত হয়েছে। তারপরও এ এক অন্য রকম উত্থানের গল্প।

২.

২০০৭ বিশ্বকাপের পর বাংলাদেশ খুব একটা সময় পেল না মাঠে নেমে পড়ার জন্য।

সময়টা বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য আরেকটা উত্তাল সময়। অধিনায়ক হাবিবুল বাশার বিশ্বকাপে রান পেলেন না বলে তার গর্দান চাওয়ার একটা জনদাবি তৈরি হলো। আমাদের জাতীয় ক্রিকেট দল ম্যানেজমেন্ট, মূলত বিসিবি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই সাধারণের ধারণার সঙ্গে একমত হয়ে গিয়ে হাবিবুলকে বিদায় দেওয়ার আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলছিল।

যদিও হাবিবুল টের পাচ্ছিলেন ওয়ানডে ক্রিকেটে হয়তো তার খুব বেশি কিছু করার নেই। আবার এটা তার মনের কথা না-ও হতে পারে। তবে পরিস্থিতির কারণে তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজে বসে বলে আসতে বাধ্য হলেন যে, টেস্টটা আরও খেলে যেতে চান এবং টেস্ট অধিনায়কত্বও করতে চান। তবে ওয়ানডে ক্যারিয়ারটা লম্বা করবেন কি না, সে বিবেচনা করবেন দেশে ফিরে।

এসব বিবেচনা করারও খুব একটা সময় পেলেন না তিনি। এর মধ্যেই চলে এল ভারত।

ভারতের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে ফিরলেন মাশরাফি। বল হাতে মোটেও বলার মতো কিছু ছিল না। গৌতম গম্ভীরের ১০১ রানে ভর করে আগে ব্যাট করা ভারত তুলে ফেলল ২৮৪ রান। মাশরাফি ১০ ওভারে ৫৭ রান ব্যয় করে পেলেন কেবল রমেশ পাওয়ারের উইকেটটা।

তবে মাশরাফির ফিগারটা নিঃসন্দেহে এর চেয়ে ভালো হতে পারত। ক্রিকইনফো

সাক্ষ্য দিচ্ছে, মাশরাফির বলে এক মহেন্দ্র সিং ধোনিরই দু-দুটো ক্যাচ পড়েছিল স্লিপে।

এই রান তাড়া করতে গিয়ে ব্যাটসম্যানদের যেমন করা উচিত, আফতাব ছাড়া কেউই তা করতে পারলেন না। ফলে ৯২ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলা বাংলাদেশ লড়াই থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছিল বলা চলে। সেই ম্যাচেই মাশরাফি গ্যালারি মাতালেন।

২২ বলে ৪২ রানের এক ইনিংস খেললেন। এই বল আর রানসংখ্যা দিয়ে ঠিক ইনিংসটার মজা বোঝা যাবে না। এর মধ্যে দিনেশ মঙ্গিয়াকে এক ওভারে পরপর চার ছক্কা মেরে দিলেন। মঙ্গিয়ার সেই ওভার থেকে বাংলাদেশের রেকর্ড ২৬ রান তুলেছিলেন মাশরাফি।

২.

মে মাসে শীত না থাকলেও জেঁকে বৃষ্টি আসার কথা নয়। কিন্তু সে বছর মে মাসজুড়েই যেন বৃষ্টির বড় তাণ্ডব। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি এসে ক্রিকেটকে দূরে ঠেলে দেওয়ার এক প্রাণান্ত চেষ্টা। বৃষ্টিও অবশ্য চট্টগ্রামে মাশরাফির দৌরাত্ম্য থামাতে পারেনি।

চট্টগ্রাম টেস্ট শুরুই হলো মাশরাফির জয়গান দিয়ে। ম্যাচের প্রথম বলেই ওয়াসিম জাফরকে বোল্ড করে উদ্বোধন করে দিলেন ম্যাচ। এরপর একটু জমে ওঠা কার্তিক-দ্রাবিড় জুটি ভাঙলেন আবার কার্তিককে ক্যাচ দিতে বাধ্য করে। টেন্ডুলকার ও সৌরভ সেঞ্চুরি করে ভারতের পুঁজি বড় করতে চেষ্টা করছিলেন। ঠিক সেঞ্চুরি করার পরই গাঙ্গুলী শিকার হলেন মাশরাফির। এরপর ধোনিকে ফিরিয়ে ইনিংসে আবারও ৪ উইকেট।

এই পুরো ব্যাপারটায় অবশ্য তিন দিন পার হয়ে গেল। প্রথম দিন ৭৭ ওভার, দ্বিতীয় দিন ২০ ওভার খেলা হলো এবং তৃতীয় দিন পুরোটাই ভেসে গেল বৃষ্টিতে। তারপরও ভারতের ৩৮৭ রানের জবাবে ইনিংস পরাজয় চোখ রাঙাচ্ছিল বাংলাদেশকে। চতুর্থ দিনে ব্যাট করতে নামা বাংলাদেশ ৫৮ রানে ৪ ও ১৪৯ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল। তারপরও বাংলাদেশ ২২৮ রান করল। কী করে?

কারণ মাশরাফি-শাহাদাত নবম উইকেটে অসামান্য এক প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। অষ্টম উইকেটে এই দুই পেসার যোগ করলেন ৭৭ রান। মূল নায়ক অবশ্যই মাশরাফি ১৩৬ মিনিট ধরে ব্যাট করলেন। ৯১টি বল মোকাবিলা করে খেললেন ৭৯ রানের এক ইনিংস। এই ইনিংসে ৭টি চার ও ৩টি ছক্কা। একটা সময় মনে হচ্ছিল, মাশরাফি বুঝি টেস্ট সেঞ্চুরিটাও পেয়ে যাবেন। কিন্তু ওদিকে ৩১ রান করা সঙ্গী শাহাদাত আউট হওয়ার পরপরই বিক্রম সিংয়ের বলে বোল্ড হয়ে ফিরলেন

মাশরাফি। তার সেঞ্চুরির স্বপ্নটা শেষ হলেও বৃষ্টি আর মাশরাফির এই ব্যাটিং মিলিয়ে বেঁচে গেল টেস্ট। দ্বিতীয় ইনিংসে দুদলই ম্যাচ বের করার একটা চেষ্টা করেছিল। কাজের কাজ হয়নি।

দ্বিতীয় টেস্টে দলীয় অর্থে আবারও জঘন্য একটা পারফরম্যান্স ছিল। ইনিংস ও ২৩৯ রানে হেরেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু ব্যাটসম্যান মাশরাফির জন্য এটাও স্মরণীয় একটা ম্যাচ হয়ে রইল।

দিনেশ কার্তিক, ওয়াসিম জাফর, রাহুল দ্রাবিড়, শচীন টেন্ডুলকারের সেঞ্চুরিতে প্রথম ইনিংসে ৩ উইকেটে ৬১০ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করেছিল ভারত। মাশরাফি ঠিক ১০০ রান খরচ করে কার্তিকের উইকেটটা কেবল নিতে পেরেছিলেন। জবাবে বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে ১১৮ রানে মাত্র অলআউট। দ্বিতীয় ইনিংসে এসে ১০ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর আশরাফুল ও রাজিনের একটু প্রতিরোধের পর আবারও একই রকম সংগ্রহেরই ইঙ্গিত ছিল।

শেষ পর্যন্ত মান বাঁচেনি, তবে সেই মান বাঁচানোর চেষ্টাটা একাই করেছিলেন মাশরাফি। টেন্ডুলকারের বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দেওয়ার আগে ১০২ মিনিট ধরে ব্যাট করেছিলেন। ৬৮ বলে খেলেছিলেন ৭০ রানের এক ইনিংস। ইনিংসে ছিল ৮টি চার ও ৩টি ছক্কা।

দুই ম্যাচ সিরিজে মাশরাফির উইকেট ৬টি এবং রান ১৫১; ব্যাটিং গড় ৫০.৩৪।

বাংলাদেশ-ভারত
১ম টেস্ট
তারিখ ১৮-২২ মে, ২০০৬
ভেন্যু বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম
টস : ভারত (ব্যাট)
ফল : ড্র
ম্যান অব দ্য ম্যাচ
মাশরাফি বিন মুর্তজা

ভারত : ১ম ইনিংস

ব্যাটসম্যান	**রান**	**মিনিট**	**বল**	**৪**	**৬**
ওয়াসিম ব মাশরাফি		১	১		০
কার্তিক ক আশরাফুল ব মাশরাফি	৫৬	১৪৬	১০২	৮	০
দ্রাবিড় ক মাসুদ ব শাহাদাত	৬১	১৫৪	৯৯	১১	০
টেন্ডুলকার ক আশরাফুল ব শাহাদাত	১০১	২৭৪	১৬৯	৯	০
সৌরভ ক রফিক ব মাশরাফি	১০০	২২২	১৬৫	১৩	২
ধোনি ক জাভেদ ব মাশরাফি	৩৬	৮১	৩৮	৬	০
পাওয়ার ব রফিক	৭	১৬	১২	১	০
কুম্বলে আহত অবসর	১	৯	৯		০
জহির ক মাসুদ ব শাহাদাত		২	৩		০
বিক্রম অপরাজিত	১	৯	৬		০
অতিরিক্ত (বা ২, লেবা ৮, ও ২, নো ১২) ২৪					
মোট (৯৮.৫ ওভারে, ৮ উইকেটে, ডি.) ৩৮৭					

বোলিং : মাশরাফি ২৪.৫-৫-৯৭-৪, শাহাদাত ১৮-১-৭৬-৩
রফিক ২৪-৩-৯৯-১, এনামুল জুনিয়র ১৫-০-৫৯-০
সাকিব ১৩-২-২৯-০, আশরাফুল ১-০-৫-০, রাজিন ৩-১-১২-০।

৩.

যুবরাজ সিংয়ের সঙ্গে মাশরাফির বন্ধুত্ব আজকের নয়। সেই যুব ক্রিকেটের সময় কী করে যেন পরিচয় হয়েছিল। তারপর থেকে আস্তে আস্তে দুজনের সম্পর্ক বেড়েছে। দুই দেশে দুজন বসে বসে ফোনে আড্ডা দেন। দেখা হলে সময় যেন চোখের পলকে ফুরিয়ে যায়।

সেদিন সকালে হঠাৎই যুবরাজের ফোন। নম্বরটা দেখেই হাসলেন মাশরাফি। তিনি জানেন, কেন ফোন করেছে যুবি। ফোন ধরতেই যুবরাজের গলা, 'খবর শুনেছ?'

'কী খবর?'

'এবার তো আমরা এক দলে খেলব।'

মাশরাফি সব জেনেও মজা করার সুযোগটা ছাড়লেন না, 'কেন, বাংলাদেশে চলে আসছ নাকি? তো কোন দলে খেলবে? আবাহনী?'

'আরে না। তুমি আর আমি দুজনই এশিয়া

বাংলাদেশ : ১ম ইনিংস

ব্যাটসম্যান	**রান**	**মিনিট**	**বল**	**৪**	**৬**
জাভেদ এলবিডব্লু আরপি সিং	৭	২৫	১৬	১	০
শাহরিয়ার নাফীস ক টেন্ডুলকার ব জহির	৩২	৭৭	৫৬	২	০
হাবিবুল ক টেন্ডুলকার ব আরপি সিং		২	২		০
রাজিন ক গাঙ্গুলী ব পাওয়ার	৪১	১৪৪	৮৩	৬	০
আশরাফুল ক কার্তিক ব আরপি সিং	৫	২৮	২০		০
সাকিব ব বিক্রম	২৭	৬২	৪৯	৪	০
মাসুদ এলবিডব্লু বিক্রম	২	২৮	১৯		০
মাশরাফি ব বিক্রম	৭৯	১৩৬	৯১	৭	৩
রফিক স্টা. ধোনি ব পাওয়ার	৯	২১	১৫	২	০
শাহাদাত ব টেন্ডুলকার	৩১	৭৪	৫৫	৫	০
এনামুল জুনিয়র অপরাজিত		১৪	৫		০
অতিরিক্তি (লেবা ১, ও ৩, নো ১)	৫				
মোট (৬৮.২ ওভারে, অলআউট)	২৩৮				

বোলিং : জহির ১৫-১-৬৩-১, আরপি সিং ১৭-২-৪৫-৩
বিক্রম ১৫.২-৫-৪৮-৩, পাওয়ার ১৭-১-৬৬-২
টেন্ডুলকার ৪-০-১৫-১।

ভারত : ২য় ইনিংস

ব্যাটসম্যান	**রান**	**মিনিট**	**বল**	**৪**	**৬**
ওয়াসিম ক হাবিবুল ব শাহাদাত	০	২	৩	০	০
কার্তিক ক নাফীস ব মাশরাফি	২২	৮২	৪৩	২	০
দ্রাবিড় ক রাজিন ব শাহাদাত	২	১৯	১১		০
টেন্ডুলকার ব রফিক	৩১	৬৯	৫০	২	০
সৌরভ ক নাফীস ব রফিক	১৩	২১	১৫	১	০
ধোনি অপরাজিত	১৭	২৮	১৭	১	১
পাওয়ার স্টা. মাসুদ ব রফিক	৬	৮	৬	১	০
জহির অপরাজিত	২	৩	৩		০
অতিরিক্ত (বা ১, ও ২, নো ৪)	৭				
মোট (২৪ ওভারে, ৬ উইকেটে, ডি.)	১০০				

বোলিং : শাহাদাত ৭-৩-৩০-২, মাশরাফি ৮-১-৩৬-১
রফিক ৮-০-২৭-৩, এনামুল জুনিয়র ১-০-৬-০।

একাদশে আছি। চলে আসো। এবার ইন্ডিয়াতে মজা হবে।'

তা মজা নিতান্ত কম হয়নি।

আফ্রো-এশিয়া কাপে এটা ছিল মাশরাফির দ্বিতীয় অভিযান। প্রথম ডাকে সেবার ম্যাচ খেলার সুযোগ হয়নি। সেবার স্রেফ ভ্রমণার্থীর মতো ঘুরেফিরে চলে আসতে হয়েছে।

এবার ভারতে অনুষ্ঠিত আফ্রিকা দলের ফিরতি সফরে তিন ম্যাচ সিরিজের দুটোতেই সুযোগ পেলেন খেলার। এবার ডাক পেয়েছিলেন হাঁটুর ইনজুরি থেকে সুস্থ হয়ে উঠতে না-পারা শোয়েব আখতারের বদলে। এর আগে একবার আফ্রো-এশিয়া কাপের স্কোয়াডে থাকার পাশাপাশি ছিলেন টি-টোয়েন্টি দলে; এবার তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের দলে ডাক পেলেন নতুন করে। তবে আগে থেকেই এই সিরিজের পাশে ৫ জুন বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠেয় একমাত্র টি-টোয়েন্টির দলেও ছিলেন।

বাংলাদেশ : ২য় ইনিংস

ব্যাটসম্যান	রান	মিনিট	বল	৪	৬
জাভেদ অপরাজিত	৫২	১২০	৮২	৮	১
নাফীস ক ধোনি ব আরপি সিং	১	১৪	৯		০
হাবিবুল ক আরপি সিং ব পাওয়ার	৩৭	৭৬	৪৯	৬	০
রাজিন অপরাজিত	৭	২৯	২৯		
অতিরিক্তি (লেবা ৬, নো ১)	৭				
মোট (২৮ ওভারে, ২ উইকেটে)	১০৪				

বোলিং : জহির ৭-০-২৪-০, আরপি সিং ৬-০-২৯-১
বিক্রম ৫-১-২২-০, পাওয়ার ৭-২-১৬-১, টেন্ডুলকার ৩-০-৭-০।

টি-টোয়েন্টি খেলা হয়নি। ওয়ানডে সিরিজেও খুব বলার মতো কিছু না হলেও এমন কিংবদন্তিদের সঙ্গে এক ম্যাচে খেলার দারুণ অভিজ্ঞতা নিয়েই ফিরলেন। সঙ্গী মোহাম্মদ রফিককে নিয়ে খেলতে গিয়েছিলেন এই সিরিজে।

বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচে আগে ব্যাট করা এশিয়ান দলটি মোহাম্মদ ইউসুফের ৬৬, জয়াবর্ধনের ৬৫ ও শেবাগের ৪২ রানে ভর করে ৩১৭ রান তুলেছিল। মাশরাফি ১৬ বলে করেছিলেন ১৩ রান।

জবাবে শন পোলকের ১৩০ রানের পরও ২৮৩ রান পর্যন্ত যেতে পেরেছিল আফ্রিকান দলটি। মাশরাফি ৬.৫ ওভার বল করে কেবল ওই শন পোলকের উইকেট নিয়ে আফ্রিকার ইনিংসের সমাপ্তি টেনে দিয়েছিলেন।

চেন্নাইয়ের এম চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় ম্যাচে খেলার সুযোগ হয়নি মাশরাফির। তবে সিরিজের শেষ ম্যাচে আবার একাদশে ফিরেছিলেন। জয়াবর্ধনের সেঞ্চুরিতে এশিয়া করেছিল ৩৩১ রান।

জবাবে আফ্রিকা দল এবি ডি ভিলিয়ার্স ও জাস্টিন কেম্পের দারুণ দুটো ইনিংসের

পরও ৩১৮ রানে থেমে গিয়েছিল। মাশরাফি ১০ ওভারে ১টি মেডেন পেলেও ৬২ রান দিয়ে উইকেটশূন্য ছিলেন। বাংলাদেশের আরেক প্রতিনিধি রফিক ৬৫ রানে নিয়েছিলেন ৪ উইকেট।

ওখানকার একটা ঘটনা আলাদা করে মনে করিয়ে দেওয়া জরুরি। শেবাগের সাথে মাশরাফির দ্বৈরথটা তো ততদিনে বিখ্যাত হয়ে গেছে। নেটে একদিন দুজন পরস্পরকে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন। মাশরাফি ছোট্ট করে বললেন, 'এই বলটা খেলো পারলে। তুমি বোল্ড।'

ফলাফল? অবশ্যই মাশরাফির যা বলেন, তাই করেন।

আফ্রো-এশিয়া কাপ খেলে দেশে ফেরা মাশরাফির জন্য ছোট্ট একটা সুখবরও অপেক্ষা করছিল।

এশিয়া একাদশ স্কোয়াড :

সনাৎ জয়াসুরিয়া, বীরেন্দর শেবাগ, সৌরভ গাঙ্গুলী, মাহেলা জয়াবর্ধনে, মোহাম্মদ ইউসুফ, যুবরাজ সিং, মহেন্দ্র সিং ধোনি, হরভজন সিং, মাশরাফি বিন মুর্তজা, জহির খান, মোহাম্মদ আসিফ, উপুল থারাঙ্গা, মোহাম্মদ রফিক।

৪.

আসলে এটা অনিবার্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বিশ্বকাপের পর থেকে অধিনায়ক ও সহ-অধিনায়ক হাবিবুল বাশার ও শাহরিয়ার নাফীসের ব্যাটের রান বড়ই অধৈর্য করে ফেলেছিল জাতিকে। সেই অধৈর্য হয়ে ওঠাটা ছড়িয়ে পড়েছিল ক্রিকেট বোর্ড পর্যন্তই। যার ফলে শাহরিয়ার নাফীসকে আগেই অব্যাহতি দিয়ে ভারতের বিপক্ষে হাবিবুল বাশারের ডেপুটি করে দেওয়া হয় মোহাম্মদ আশরাফুলকে।

ভারতের বিপক্ষে টেস্ট ও ওয়ানডে সিরিজ শেষ হতেই হাবিবুলকে পুরোপুরি নির্বাসনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে বোর্ড। মাশরাফি যখন আফ্রো-এশিয়া কাপ খেলতে ভারতে, সেই সময়ে বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে যে, জুনে শ্রীলঙ্কা সফরে বাংলাদেশ দলকে নেতৃত্ব দেবেন মোহাম্মদ আশরাফুল এবং তার ডেপুটি হবেন মাশরাফি বিন মুর্তজা।

মাশরাফিকে সেদিন ডেপুটি করার ভেতর দিয়ে অনেকে আসলে তাকে ভবিষ্যৎ অধিনায়ক হিসেবে দেখতে চাইছিলেন। দুই বছরের ভেতরে সে পথে মাশরাফি চলাও শুরু করেছিলেন। আর সে সময়ই বড় এলোমেলো হয়ে যায় মাশরাফির ক্যারিয়ার। শেষ পর্যন্ত ২০১৪ সালে এসে, অতিবিলম্বে আবার নিজের পুরোনো চেয়ারটা ফিরে পান মাশরাফি। আর সে দফাতেই হয়ে ওঠেন–পিপলস ক্যাপ্টেন, প্লেয়ার্স ক্যাপ্টেন।

সে গল্প শোনার আগে অবশ্য আমাদের আরও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে।

এদিকে আরও একটা পরিবর্তন ঘটে গেল। ডেভ হোয়াটমোরের সঙ্গেও আর চুক্তি নবায়ন না করার সিদ্ধান্ত নিল বোর্ড। এখানে অবশ্য ডেভের তরফেও কিছু ঘটনা ঘটল। বোর্ড প্রথম চেয়েছিল তার সঙ্গে আরেক দফা চুক্তি বাড়াতে। কিন্তু শোনা যাচ্ছিল, তিনি ভারতের শূন্য পদ পেতে আগ্রহী ছিলেন। এমনকি ভারতের বাংলাদেশ সফরের সময় সে জন্য যেচে যোগাযোগও করেছিলেন বলে শোনা যায়। পরে ভারতের সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ডেভ যখন আবার নবায়ন চাইলেন, বোর্ড মুখ ঘুরিয়ে নিল।

৫

২০০৭ সালে বাংলাদেশের শ্রীলঙ্কা সফর যতটা খারাপ হওয়ার সম্ভব ছিল, ততটাই খারাপ হয়েছিল। ব্যাটে-বলে বাংলাদেশকে একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল তারা এই সিরিজে।

কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব গ্রাউন্ডে প্রথম টেস্টে বাংলাদেশ হেরেছিল ইনিংস ও ২৩৪ রানে। প্রথম ইনিংসে মুরালিধরনের ভয়ানক স্পিনে আশরাফুলের দল অলআউট ৮৯ রানে; সর্বোচ্চ ১৬ রান ছিল সাকিবের।

মাইকেল ভ্যানডর্ট, জয়াবর্ধনে, প্রসন্ন জয়াবর্ধনে, এমনকি চামিন্ডা ভাসও সেঞ্চুরি করেছিলেন; শ্রীলঙ্কা ৬ উইকেটে ৫৭৭ রান তুলেছিল। প্রথম চার বোলারের মধ্যে একমাত্র মাশরাফিই শত রানের কম খরচ করেছিলেন। ৭২ রান দিয়ে পেয়েছিলেন কেবল মাহেলা জয়াবর্ধনের উইকেট। জবাবে ২৫৪ রানে শেষ বাংলাদেশের ইনিংস।

দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে আরও করুণ চিত্র; বাংলাদেশ অলআউট ৬২ রানে। সাঙ্গাকারার ডাবল সেঞ্চুরিতে ৪ উইকেটে ৪৫১ রান তোলে শ্রীলঙ্কা। মাশরাফি আবারও পরিমিত বোলিং করেন। ৩০ ওভারে ৭ মেডেন নিয়েছিলেন; ৭৭ রান দিয়ে নিয়েছিলেন প্রসন্ন ও ভ্যানডর্টের উইকেট। এর মধ্যে আগের ম্যাচের সেঞ্চুরিয়ান ভ্যানডর্টকে ফিরিয়েছিলেন মাত্র ১৪ রানে।

তবে এই ম্যাচের হাইলাইটস ছিল অধিনায়ক আশরাফুলের সেঞ্চুরি ও মুশফিকের ৮০ রান।

ক্যান্ডিতে তৃতীয় টেস্টেও পরিস্থিতির কোনো উন্নয়ন ঘটেনি। প্রথম ইনিংসে ১৩১ রানে অলআউট হয়েছিল বাংলাদেশ। আবারও সাঙ্গাকারা ডাবল ও জয়াবর্ধনের ১৬৫ রানে ৪ উইকেটে ৫০০ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করে। মাশরাফি সফরে সবচেয়ে খারাপ বোলিং করেন এই ম্যাচে। ১২৫ রান ব্যয় করে উইকেটশূন্য ছিলেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে শাহরিয়ার নাফীসের ফিফটি ছিল; বাংলাদেশ অলআউট হয়েছিল

১৭৬ রানে।

এই সিরিজে ব্যক্তিগতভাবে মাশরাফির কথা বললে, তার একটা উপকার হয়েছিল। ক্যারিয়ারের শুরু থেকে তার মূল অস্ত্র ছিল দুদিকে প্রাকৃতিক সুইং। কিছুদিনের মধ্যে এর সঙ্গে তার সবচেয়ে নিয়মিত অস্ত্র হয়ে ওঠে অফ কাটার। অফ কাটারে মাশরাফি এতটাই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন যে, অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে অফ স্পিনও করেছেন পরে!

এর সঙ্গে দুই রকমের স্লোয়ার ঝুলিতে থাকলেও অনেক দিন ধরে টান ছিল রিভার্স সুইংয়ের ওপর। ইতিমধ্যে তার বন্ধু মোহাম্মদ শরীফ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও রিভার্স করে দেখিয়েছেন। সেই রিভার্স শিখলেন বা বলা ভালো সেটাকে প্রয়োগের মতো জায়গায় গেলেন মাশরাফি এই সিরিজে। মূলত পাকিস্তানিদের এই অস্ত্র তিনি রপ্ত করার পেছনে একটা বড় কৃতিত্ব দিয়ে থাকেন ওই সিরিজে লাসিথ মালিঙ্গার সঙ্গে তার কথোপকথনকে।

এমন বীভৎস সফর শেষে ওয়ানডে সিরিজটাও আতঙ্ক হয়ে ওঠার কথা। তারপরও সহ-অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা সেদিন বলেছিলেন, যেকোনো মূল্যে ওয়ানডে সিরিজে তারা ভালো করতে চান। মাশরাফির দাবি ছিল, 'ওয়ানডেতে আমরা টেস্টের চেয়ে হাজার গুণ ভালো দল। ফলে আপনারা ওয়ানডেতে ভিন্ন এক বাংলাদেশকে দেখতে চলেছেন।'

কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, তার এই কথা বাস্তব হয়নি। প্রথম ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কা জিতেছিল ৭০ রানে। মাশরাফি অবশ্য খুব খারাপ করেছিলেন, বলা যাবে না। শ্রীলঙ্কা ২৩৪ রানের ইনিংস গড়ার পথে তিনি ১০ ওভারে ৩১ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়েছিলেন।

৬.

ক্রিকেট-বিশ্বে তখন এক নয়া কাণ্ড ঘটে গেছে। বছর দেড়েক আগেই যাত্রা শুরু করা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের বিশ্বকাপ হবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠেয় সেই টুর্নামেন্টের জন্য বেশ সাজ সাজ রব।

বাংলাদেশ সেই জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে অভিষেক টি-টোয়েন্টি খেলার পর এ অবধি আর কোনো টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেনি। ফলে বাংলাদেশ দল তখন মহা তোড়জোড় করে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আফ্রিকাতেই চলে গেল। ঠিক দক্ষিণ আফ্রিকা নয়; কেনিয়ায় গেল বাংলাদেশ।

কেনিয়া, পাকিস্তান, উগান্ডা ও বাংলাদেশকে নিয়ে কেনিয়ায় অনুষ্ঠিত হলো একটি চারজাতি টুর্নামেন্ট। বাংলাদেশ এখানে বেশ দৃষ্টি আকর্ষণীয় ক্রিকেটেই খেলল। প্রথম ম্যাচেই বাংলাদেশ হারাল কেনিয়াকে, ৫ উইকেটে। কেনিয়া আগে ব্যাট করে ১৩৮ রান করতে পেরেছিল। মাশরাফি ২৯ রান দিয়ে নিয়েছিলেন ২ উইকেট। দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তান জিতল বাংলাদেশের বিপক্ষে ৩০ রানে।

তৃতীয় ম্যাচে উগান্ডাকে হারাতে অবশ্য মাশরাফিকে জ্বলে উঠতে হয়েছিল। তার অপরাজিত ২০ বলে দুটি চার ও দুটি ছক্কায় ৪০ রানে ভর করে ১৪৫ রান তুলেছিল বাংলাদেশ। বল হাতেও ২৯ রানে ২ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি।

এই চারজাতি টুর্নামেন্টটা আর যা-ই হোক, বাংলাদেশকে বেশ একটা মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছিল। যার সুফল টুর্নামেন্ট শুরু হতেই পেয়েছিল বাংলাদেশ।

এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স মাথায় নিয়ে ইয়ান চ্যাপেল তার বিশ্বকাপ ভবিষ্যদ্বাণীতে লিখেছিলেন :

বাংলাদেশের নির্বাচকেরা ১৫ জনের দল নির্বাচনে প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন।...তাদের বোলিংকে আঁকড়ে রাখবেন দৃঢ় ও দীর্ঘদেহী সহ-অধিনায়ক মাশরাফি মুর্তজা। যাকে আমি একজন প্রাণবন্ত উইকেট টেকিং ফাস্ট বোলার মনে করি এবং সে ইনিংসের শেষ দিকে কিছু পিটুনিও দিতে পারে।

৭.

মাশরাফিকে তার প্রিয় বোলিং সঙ্গীর নাম করতে বললে তিনি এক নিঃশ্বাসে দুজনের কথা বলেন–তাপস বৈশ্য ও সৈয়দ রাসেল। এর মধ্যে রাসেল আবার বেশি কৃপণ ছিলেন। রাসেলের কৃপণতার একটা আদর্শ প্রদর্শনী ছিল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের উদ্বোধনী ম্যাচটা।

ক্রিস গেইল, চন্দরপল, স্যামুয়েলসের মতো ব্যাটসম্যানরা থাকা সত্ত্বেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ বাংলাদেশের বিপক্ষে ১৬৪ রানের বেশি করতে পারেনি ওই রাসেল ও মাশরাফির জন্য। প্রথম ওভারটাই মেডেন নিয়েছিলেন রাসেল। মোট ৪ ওভারে ওই এক মেডেনসহ মাত্র ১০টি রান ব্যয় করেছিলেন। বিপরীতে মাশরাফি ২ ওভারে খরচ করেছিলেন ১৬ রান; মাশরাফিকে বাকি ২ ওভার বোলিং না করানোয় আশরাফুলের সমালোচনা তখনই শুরু হয়েছিল।

সাকিব ৪টি উইকেট নিয়েছিলেন। তারপরও অধিনায়ক আশরাফুলের বিস্ময়করভাবে নিজে ৪ ওভার পুরো বল করে ৫৫ রান খরচ করে ফেলাটা বিরাট বিতর্কিত সিদ্ধান্ত ছিল। এই সিদ্ধান্তও বিপদ ঘটাতে পারেনি। আশরাফুল নিজে ও আফতাব স্মরণীয় দুই ইনিংস খেলে জয় এনে দিয়েছিলেন বাংলাদেশকে। এর ফলে বাংলাদেশ চলে যায় সুপার এইটে।

পরের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বাংলাদেশ হেরে যায় ৭ উইকেটে। মাশরাফি ৮ বলে ঠিক দুটো ছক্কা মেরে ১২ রান করেছিলেন।

সেবারের সুপার এইটেও আবার দুটি গ্রুপ। বাংলাদেশের গ্রুপে ছিল পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কা। সুপার এইটের প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া ৯ উইকেটে হারায় বাংলাদেশকে। পরের ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৬৪ রানের পরাজয়; মাশরাফি ৩৯

রানে ১ উইকেট নেন এবং ১২ বলে ১২ রান করেন।
আবারও পাকিস্তানের বিপক্ষে ৪ উইকেটের পরাজয় দেখতে হলো শেষ ম্যাচে এসে।

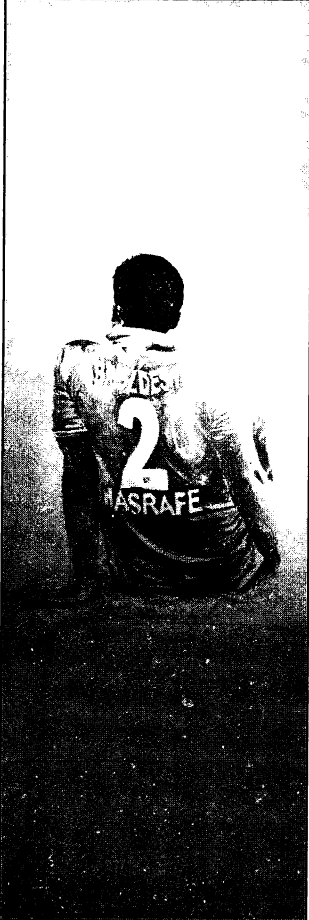
৯.
আবার নিউজিল্যান্ড!
ছয় বছর পার হয়ে গেছে। তারপরও নিউজিল্যান্ডের নাম শুনলেই মাশরাফির ভয় পাওয়ার কথা। শিউরে ওঠার কথা এই দেশটিতে প্রথম সফরের স্মৃতি মনে পড়ায়। এই সেই দেশ, যেখানে জোর করে মাঠে নামিয়ে কার্যত তারা সারাটা ক্যারিয়ারকে যন্ত্রণাময় করে ফেলা হয়েছে, তারা সারাটা ক্যারিয়ার ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে।
২০০৭ সালের একেবারে শেষলগ্নে; ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ আবার চলল নিউজিল্যান্ডে। সিরিজ বাই সিরিজ ভিত্তিতে অধিনায়কত্ব চালাতে থাকা আশরাফুল এই সিরিজেও দায়িত্ব পান কাজ চালানোর জন্য।
নিউজিল্যান্ডে যাওয়ার আগে ব্যক্তিগত সেই দুঃসহ ব্যাপারটা মনে আসলেও ফাস্ট বোলার হিসেবে মাশরাফি উল্লসিত ছিলেন–গ্রিন টপে বল করার একটা সুযোগ। তবে তিনি বারবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন, এটা কঠিন একটা সফর হতে যাচ্ছে।
বাংলাদেশের অগ্নিপরীক্ষাটা শুরু হলো ওয়ানডে থেকে। প্রথম ওয়ানডেতে ৬ উইকেটে হারল বাংলাদেশ। তামিম ও আশরাফুল ফিফটি করায় বাংলাদেশ সাকল্যে ২০১ রান করতে পেরেছিল। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ছিল ১০২ রানের পরাজয়। আর তৃতীয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশের জন্য অপেক্ষা করছিল সেই বিখ্যাত তাণ্ডব।
আগে ব্যাট করে মাত্র ৯৩ রানে অলআউট হয়েছিল বাংলাদেশ। ৬ ওভারে সে লক্ষ্য পার হয়ে যায় নিউজিল্যান্ড!
কেমন করে?
কারণ, ব্রেন্ডন ম্যাককালাম ২৮ বলে ৮০ রানের এক ইনিংস খেলেছিলেন। মানে স্কোরটা কল্পনা করুন–নিউজিল্যান্ড ৯৫; এর মধ্যে আরেক ওপেনার হাউ ৭, অতিরিক্ত ৮ এবং ম্যাককালাম ৮০!
টেস্টে দলীয় পারফরম্যান্স এই একই রকম থাকলেও মাশরাফি একটু হলেও নিজেকে খুঁজে পেলেন। দুই টেস্টে সাকল্যে দুই ইনিংস ও ৪ ওভার বল করার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাতে নিয়েছিলেন ৭ উইকেট।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ডানেডিন টেস্ট দিয়ে শুরু হলো নতুন বছর। বছরের চতুর্থ দিনটাতেই বাংলাদেশ তামিম ইকবালের ফিফটির পরও অলআউট ১৩৭ রানে। হাবিবুল দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৩, মাশরাফি তৃতীয় সর্বোচ্চ ২২ রান করেছিলেন। জবাবে নিউজিল্যান্ড ৩৫৭ রানে অলআউট হয়। আশরাফুল তার ডেপুটিতে তৃতীয়

পেসার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তারপরও মাশরাফি ৭৪ রানে নিয়েছিলেন ৪ উইকেট।

দ্বিতীয় ইনিংসে তামিম-জুনায়েদের ১৬১ রানের উদ্বোধনী জুটির পরও ২৫৪ রানে অলআউট বাংলাদেশ। নিউজিল্যান্ডের সামনে জয়ের লক্ষ্য ছিল ৩৫ রান। মাশরাফি তার মধ্যে এক ওপেনারকে তুলে নিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশ হেরেছিল ইনিংস ও ১৪৩ রানে; মাশরাফি একমাত্র ইনিংসে ২টি উইকেট নিয়েছিলেন।

সুভাষ চন্দ্রের ঝড়



১.

আমরা যদি সালওয়ারি একটা হিসাব কষতে বসি, তাহলে দেখতে পাব, মাশরাফির জীবনে উইকেটপ্রাপ্তির দিক থেকে দ্বিতীয় সফলতম বছর হলো ২০০৮ সাল। মাশরাফি নিজে বলেন, তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে চমৎকার বোলিং করেছেন, ২০০৮ ও ২০০৯ সালের একটা অংশজুড়ে; পরিসংখ্যান এই কথার সপক্ষেই কথা বলে।

তবে পরিসংখ্যান থেকে সরে গিয়ে যদি শুধু ঘটনার কথা বিবেচনা করি, তাহলে ২০০৮ থেকে ২০১১; এই চার বছর হলো মাশরাফির জীবনে অন্যতম ঘটনাবহুল চারটি বছর। এই সময়ে রোলার কোস্টারে চড়ে বসার মতো একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে দেশসেরা এই পেসারের।

অভিমান, বেদনা, যন্ত্রণা, হাসি, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি, উন্মাদনা; এমন কোনো আবেগ নেই যা প্রবলভাবে তাকে এই সময়ে ছুঁয়ে যায়নি। এ সময় দল থেকে বাদ পড়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে, পিঠে ছুরি বসে

যাওয়ার যন্ত্রণা সয়েছেন নিকটজনের কাছ থেকে। এই সময়ে টাকার পাহাড় এসেছে হাতের মুঠোয়, এই সময়ে অন্ধকার জগৎ থেকে দুহাত বাড়িয়ে ডেকেছে লোকেরা। এই সময়ে জীবনের অন্যতম বঞ্চনার সাক্ষী হয়েছেন। আবার এই সময়েই সন্তানের মুখ দেখার আনন্দে মেতেছেন।
আমরাও মাশরাফির সঙ্গে এই রোলার কোস্টারে চাপব। আর এসব কিছুর শুরু হবে, শ্রী সুভাষ চন্দ্রের আবিষ্কার আইসিএলের তৈরি করা ঝড় থেকে।

২.
২০০৮ সালের শুরুতে বাংলাদেশ ছিল নিউজিল্যান্ডে। সেখান থেকে তারা দেশে ফিরল, দক্ষিণ আফ্রিকাও এল বাংলাদেশে। অনুমিতভাবেই সেটা বাংলাদেশের জন্য ভয়ংকর একটা সফর হতে যাচ্ছিল।
খুবই লো স্কোরিং প্রথম ম্যাচে শাহাদাত হোসেন রাজীব ২৭ রানে ৬ উইকেট নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১৭০ রানে অলআউট করে বলেছিলেন—পিকচার আভি ভি বাকি হ্যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৫ উইকেটের হার দেখতে হয়েছিল। তারপরও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সে সময়ের বাংলাদেশের জন্য লড়াইটা একেবারে মন্দ ছিল না। মাশরাফি দুই ইনিংসেই উইকেটশূন্য ছিলেন।
দ্বিতীয় টেস্টে নিল ম্যাকেঞ্জি ও গ্রায়েম স্মিথের উদ্বোধনী জুটির বিশ্ব রেকর্ডের কাছে বাংলাদেশ হারে ইনিংস ও ২০৫ রানে। মাশরাফি এই ইনিংসেও উইকেটশূন্য ছিলেন।
তাহলে টানা কয়টা ম্যাচে উইকেটশূন্য ছিলেন মাশরাফি?
দুটো ম্যাচে।
এর শাস্তি হিসেবে দেশের সবচেয়ে সফল এবং মাস কয়েক আগেও প্রবল ফর্মে থাকা পেসার এবং দলের সহ-অধিনায়ককে একাদশ থেকে বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন মোহাম্মদ আশরাফুল ও জেমি সিডন্সের জুটি।
আশরাফুল-সিডন্স আদৌ জুটি ছিলেন কি না, এই সিদ্ধান্ত দুজনের কার; সে নিয়ে আমরা বিপুল বিতর্ক দেখতে পাব সে সময়ের সংবাদমাধ্যমে। তবে প্রকাশ্যে এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে কথা বলেছিলেন আশরাফুলই।
দল তখন এতটাই ভারসাম্যপূর্ণ ছিল যে, মাশরাফিকে দলে 'জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না' বলে দাবি করেছিলেন তিনি, 'মাশরাফি আমাদের এই প্ল্যান মানাচ্ছে না। দলে ভারসাম্য আনতেই তাকে দলে রাখা হয়নি। আমাদের তিন স্পিনার দরকার। রাসেল আজকাল খুব ইকোনমিক্যাল এবং শাহাদাত খুব ভালো ফর্মে আছে। আমরা স্রেফ তাকে জায়গা দিতে পারছি না।' [১]
মাশরাফিকে ছাড়া খুব ভারসাম্যপূর্ণ দল করে এমন বিরাট কিছু ফলাফল সেদিন আসেনি; মাশরাফি দলে ফেরার পর শেষ দুটি ওয়ানডেতেও আসেনি। তবে

মাশরাফি অন্তত যে দুটি ওয়ানডে খেলেছিলেন, তাতে এটুকু বোঝাতে পেরেছিলেন যে, দলের ভারসাম্যের জন্য বাইরে রাখার মতো বোলার অন্তত তিনি নন।
দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আগে ব্যাট করে ১৭৩ রানে অলআউট হয়েছিল বাংলাদেশ; এর মধ্যে ২০ রান মাশরাফির অবদান। আর সেই রান ৪৮.১ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে টপকে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। মাশরাফিকে সেদিন ১০ ওভারই বল করতে দেওয়া হয়েছিল। তাতে একটি মেডেন নিয়ে ২৭টি মাত্র রান ব্যয় করে হার্শেল গিবসের উইকেট নিয়েছিলেন মাশরাফি। ওয়ানডেতে ২.৭ ইকোনমি রেট একেবারে খারাপ নয়, নাকি?
পরের ম্যাচেও বাংলাদেশ ৭ উইকেটে হেরেছিল। এদিন মাশরাফি ৪ ওভার বল করেছিলেন; ব্যয় করেছিলেন ১৮ রান।

৩.

মার্চে বাংলাদেশে তিন ম্যাচ সিরিজ খেলতে এল আয়ারল্যান্ড।
বাংলাদেশ টেস্ট জগতে তখন সাত বছর কাটিয়ে ফেলেছে। অন্যদিকে আয়ারল্যান্ড ওয়ানডেতেই পা শক্ত করতে পারেনি। তারপরও এখানে বাংলাদেশের কিছু প্রমাণ করার ছিল। বিশ্বকাপে তাদের বিপক্ষে হারটা যে অঘটন ছিল, সেটা প্রমাণ করতে হতো।
প্রমাণ করার দায়িত্বটা নিজের কাঁধেই তুলে নিলেন মাশরাফি। সেদিন শুরু থেকেই আগুন ঝরানো বোলিং করছিলেন। আইরিশ দুই ওপেনারকেই উইকেটরক্ষক ধীমান ঘোষের হাতে ক্যাচ দিতে বাধ্য করেছিলেন। বলে রাখা ভালো, কিছুদিন আগেই দারুণ সূচনা করা মুশফিক তখন দলে জায়গা হারিয়েছেন ধীমানের কাছে। এই ধীমানের কথা খেয়াল রাখুন; খানিক পর কাজে লাগবে।
মাশরাফি সে ম্যাচে ১০ ওভারে নিয়েছিলেন ৪টি মেডেন; ২২ রানে ৩ উইকেট নিয়ে আয়ারল্যান্ডকে ১৮৫ রানে অলআউট করে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন।
দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ জয় পায় ৮৪ রানে। আগে ব্যাট করে বাংলাদেশ ২৪৬ রান করেছিল। ব্যাটে ১৫ বলে ৩টি চার ও একটি ছক্কায় সাজানো ২৬ রান ছিল মাশরাফির অবদান। বল হাতে অবশ্য ৩৭ রান ব্যয় করে উইকেটশূন্য ছিলেন।
তৃতীয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশ ৭৯ রানের জয় পায়। তামিম ইকবালের ১২৯ রানে ভর করে ২৯৩ করেছিল বাংলাদেশ। মাশরাফি ৭ বলে একটি চার একটি ছয় মেরে ১৬ রান করেছিলেন। বল হাতে আয়ারল্যান্ডকে ২১৪ রানে অলআউট করার পথে ৯ ওভারে ১টি মেডেন নিয়ে ৩২ রান ব্যয়ে ১ উইকেট নিয়েছিলেন।
সিরিজে মাশরাফির ৩ ম্যাচে ৪ উইকেট এবং ২ ম্যাচে ৪২ রান করেছিলেন ২২ বলে।
বাংলাদেশ এই সময়ে সম্ভব তাদের অতীত ইতিহাসের যেকোনো সময়ের তুলনায়

বেশি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নিয়ে ব্যস্ত ছিল। মার্চে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ শেষ করেই তারা ছুটল পাকিস্তানে। দেশটিতে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে হবে।

পাকিস্তানের বিপক্ষে পাঁচটি ওয়ানডে অনুষ্ঠিত হলো লাহোর, ফয়সালাবাদ, মুলতান ও করাচিতে। আর টি-টোয়েন্টি করাচিতেই।

লাহোরে প্রথম ম্যাচে, বৃষ্টির বাধার মধ্যে বাংলাদেশ হারাল ১৫২ রানে। আগে ব্যাট করা পাকিস্তান ৩২২ রান করেছিল। মাশরাফি ১০ ওভারে ২টি মেডেন নিয়েছিলেন বটে; কিন্তু ২ উইকেট নিতে বাকি ৮ ওভারে ৫২ রান খরচ করে ফেলেছিলেন। বাংলাদেশ ১২৯ রানে অলআউট হলো; তাতেও মাশরাফির অবদান ২০ বলে ২৫ রান, ৩টি চার ও একটি ছয়।

দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তান আবারও ডি-এল মেথডে জিতল ৭ উইকেটে। আগে ব্যাট করা বাংলাদেশ ২২৫ রান করেছিল। মাশরাফি উইকেটশূন্য থাকা ম্যাচে পাকিস্তান ৩ উইকেট খুইয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছিল।

তৃতীয় ওয়ানডেতে কিছুটা লড়াই করতে পেরেছিল বাংলাদেশ। আগে ব্যাট করে পাকিস্তান ৩০৮ রান তুলেছিল। মাশরাফি ১০ ওভার বল করে ৪৭ রানে ২ উইকেট নিয়েছিলেন। সাকিব ও মাশরাফির ভিত এবং মাশরাফির শেষবেলায় ১৫ রানে ভর করে ২৮৫ রান পর্যন্ত গিয়েছিল বাংলাদেশ।

চতুর্থ ম্যাচে আবারও ৭ উইকেটের হার। মাশরাফি খুবই স্বভাববিরুদ্ধ ৬৭ বলে ৩৮ রানের একটা ইনিংস খেলেছিলেন। শেষ ওয়ানডেতে পাকিস্তান ১৫০ রানের জয় পায়। মাশরাফি ৬৫ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন।

মাশরাফির পাকিস্তান সফরের শেষটা হয়েছিল যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে।

একমাত্র টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ ১০২ রানের ব্যবধানে হেরেছিল। মাশরাফি তার কোটার শেষ বলটা আর করতে পারেননি। শেষ বল করতে এসে একেবারে বল ছাড়ার আগ মুহূর্তে হাঁটুর ব্যথায় আর ডেলিভারিটা করতে পারলেন না। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সরে যেতে হলো। মাহমুদউল্লাহ ওভারের শেষ বলটা করে দিয়েছিলেন।

তবে শেষ পর্যন্ত চোটটা খুব বড় কিছু ছিল না।

৪.

পাকিস্তানের সঙ্গে এই সময় বাংলাদেশের যাতায়াত নিয়মিত হয়ে গেল কয়েক মাসের জন্য।

পাকিস্তান সফর শেষ করে দেশে ফেরার কয়েক দিনের মধ্যেই ঢাকায় কিটপ্লাই কাপ এবং তার কয়েক দিনের মধ্যে পাকিস্তানে আবার ফিরে যাওয়া এশিয়া কাপ খেলতে।

পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে শুরু হলো কিটপ্লাই কাপ। ফলাফলে কোনো পরিবর্তন নেই; ৭০ রানের হার। মাশরাফি ৩৬ রানে নিলেন ২ উইকেট। দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে ৭ উইকেটের হারে শেষ স্বাগতিকদের জন্য টুর্নামেন্ট।

পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত এবারের এশিয়া কাপের ফরম্যাট ছিল একটু আলাদা। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা; চারটি টেস্ট খেলুড়ে দেশের সঙ্গে যোগ করা হলো দুটো সহযোগী দেশ আরব আমিরাত ও হংকংকে। দুই গ্রুপে ভাগ করে দেওয়া হলো ৬টি দলকে। বাংলাদেশের গ্রুপে আমিরাত ও শ্রীলঙ্কা। প্রথম ম্যাচে আমিরাতকে ৯৬ রানে হারিয়ে সুপার ফোর নিশ্চিত করে ফেলল বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ৩০০ রানের জবাবে আরব আমিরাতকে ২০৪ রানে অলআউট করার পথে মাশরাফি ৪৬ রানে নিলেন ১ উইকেট।

এরপর অবশ্য প্রতিটা ম্যাচেই পরাজয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে বাংলাদেশকে। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গ্রুপ পর্বে ১৩১ রানে, সুপার ফোরে ভারতের বিপক্ষে ৭ উইকেটে, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ১৫৮ রানে ও পাকিস্তানের বিপক্ষে ১০ উইকেটে হারে বাংলাদেশ।

মাশরাফি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গ্রুপ পর্বে ২টি ও সুপার ফোরে ১টি উইকেট নেন।

৫.

এশিয়া কাপ খেলে ফিরেছে বাংলাদেশ।

কয়েকটা দিনের ছুটি। মাশরাফি একটু ক্লান্ত শরীরটার সেরে ওঠা, চিকিৎসা আর বাড়ি যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত। এমন সময় একটা অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন। নম্বরটা দেখে বোঝা যাচ্ছে, দেশের বাইরের কল।

একটু ভালো করে চোখ বোলাতে মনে পড়ল, এটা ভারতীয় কোনো নম্বর।

ফোনটা ধরতেই ওপাশ থেকে ঝরঝরে ইংরেজিতে কথা বলতে শুরু করল এক লোক। প্রথমটা বুঝতেই সমস্যা হচ্ছিল, কী বলতে চাচ্ছে লোকটা।

একসময় বুঝল লোকটা অনেক ডলার দিতে চাচ্ছে। বিরাট অংকের ডলার। ডলারে তো ঠিক বোঝা যায় না। টাকায় বোঝা দরকার। এক ডলারে যেন কত টাকা?

ওরে বাবা! এই লোক যা বলে তাতে তো টাকার অংক ১৬-১৭ কোটি হয়ে যায়।

ধুর! টাকার হিসাব করে লাভ কী। আগে শোনা যাক, লোকটা ডলার দেবে কেন? ডলার জিনিসটা কি সস্তা হয়ে গেছে? কেউ নিতে চাচ্ছে না!

মাশরাফি জিজ্ঞেস করল, 'কী করতে বললেন?'

'আপনাকে আইসিএল খেলতে হবে।'

'আইসিএল হলো ইন্ডিয়ান ক্রিকেট লিগ। ইন্ডিয়াতে একটা টুর্নামেন্ট হবে। আপনাদের দেশের অনেকেই খেলতে আসবে।'

‘সেটা খেলার জন্য এত টাকা দিতে চাচ্ছেন কেন?’

‘আসলে একটা ব্যাপার আছে...’

লোকটা তো তো করা অবস্থায়ই মাশরাফির মনে পড়ে গেল। এই আইসিএল জিনিসটার কথা সে শুনেছে। ক্রিকেটই খেলবে এরা। কিন্তু সমস্যা হলো ইন্ডিয়ান ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে কী একটা যেন ঝামেলা লেগে গেছে। তাই ভারতীয় বোর্ডের সঙ্গে মিলে বাকি বোর্ডগুলোও নিষিদ্ধ করেছে এই টুর্নামেন্টকে। এখানে খেললে আর বাংলাদেশের হয়ে খেলার কোনো চান্স নেই।

মাশরাফি এবার মজা নেওয়ার চেষ্টা করল, ‘আপনাদের এই টুর্নামেন্টে খেললে বাংলাদেশ দলে আর খেলতে পারব না, তাই না?’

‘হ্যাঁ।’

‘তাহলে ভাই ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ। কোনো দিন টুর্নামেন্ট যদি এসব বোর্ডের বৈধ হয়, আমার কাছে আসবেন। তার আগে আর যোগাযোগ করবেন না দয়া করে।’

আরও কী কী যেন বলার চেষ্টা করল লোকটা। মাশরাফির টাইম নাই।

***

এই বেলা আইসিএল সম্পর্কে একটু মনে করিয়ে দেওয়া যাক।

আইসিএল কোনোভাবেই কোনো অপরাধ ছিল না। এর নেপথ্যে নানা রাজনীতি ছিল। সেই রাজনীতির ফলে বোর্ডগুলোর একটা নিষেধাজ্ঞা ছিল টুর্নামেন্টটির ওপর। কিন্তু মাশরাফি তখনো মনে করতেন না, আজও মনে করেন না যে, আইসিএল খেলাটা একটা অপরাধ।

আইসিএলের যাত্রা শুরু হয়েছিল এসএল গ্রুপের প্রধান সুভাষ চন্দ্রের উদ্যোগে। এই ভদ্রলোকের অনেক প্রতিষ্ঠানের একটি হলো জি-টেলিভিশন। জি গ্রুপ ২০০৬ সালে ভারতের ক্রিকেট সম্প্রচার স্বত্ব কেনার জন্য দরপত্র জমা দেয়। কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতা কম যুক্তি দিয়ে তাদের দর সবচেয়ে ভালো হওয়া সত্ত্বেও দরপত্র খারিজ করে দেয় বিসিসিআই।

অন্যদিকে কাজ পায় নিমবাস; যারা একেবারেই নতুন প্রতিষ্ঠান। নিমবাসের পক্ষে যুক্তি দেখানো হয়, তারা যেহেতু তখন বিলুপ্ত ওয়ার্ল্ড টেল নামে বিখ্যাত প্রডাকশন হাউসকে কিনে নিয়েছে, তাই ওয়ার্ল্ড টেলের অভিজ্ঞতাই নিমবাসের অভিজ্ঞতা।

সুভাষ চন্দ্র তখন খেপে গিয়ে একদিকে মামলা শুরু করেন, অন্যদিকে নিজেই ক্রিকেট লিগ চালুর সিদ্ধান্ত নেন। সেই উদ্যোগেই ভারতীয় বিভিন্ন শহরের নামে একটি করে দল গঠন করা হয় একটা বিপুল টাকায় শেষ বয়সী বিভিন্ন ক্রিকেটারদের কিনে এনে শুরু করা হয় আইসিএল। পরে এই আদলেই আইপিএলও গড়ে ওঠে।

বাংলাদেশ থেকে এ সময় একঝাঁক ক্রিকেটার নিয়ে একটা দল করার জন্য প্রবল

চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এসএল গ্রুপ। এই চেষ্টা যে ভেতরে ভেতরে কিছু প্রভাব ফেলছে, তা অনেকেই অনুমান করতে পারছিলেন।
দলের ভেতরেই এক ধরনের ফিসফিস, আলাদা কথাবার্তা মাঝে মাঝেই দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। সেটা সবচেয়ে তীব্র হয়ে ওঠে আগস্টে বাংলাদেশের অস্ট্রেলিয়া সফরে।

৬.
অস্ট্রেলিয়ায় সেটা ছিল বাংলাদেশের দ্বিতীয় সফর।
এ সফরে যাওয়ার আগে মাশরাফি একটু চোটে ভুগছিলেন। পাকিস্তান সফরে যে ব্যথা পেয়েছিলেন, সেটা মাঝে মাঝে বিরক্তি তৈরি করছে। হাঁটুতে প্রায়ই যে ব্যথাটা হয়, সেটাও ফিরে ফিরে আসছে। সতর্কতা হিসেবে একটা স্ক্যানও করিয়ে নেওয়া হলো।
একটা সাবধানে থাকতে হবে কয়েকটা দিন।
এই অবস্থায়ই বাংলাদেশ দলের সঙ্গে রওনা হয়ে গেলেন অস্ট্রেলিয়ায়। সফরে বাংলাদেশের সব খেলাই ডারউইনে। এখানে তিনটি ওয়ানডে খেলার আগে ৫টি অনুশীলন ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ দল। প্রথম অনুশীলন ম্যাচে ৫ উইকেটের পরাজয় আসলে ইঙ্গিত দিয়ে দিচ্ছিল, ঠিক কোন দিকে যেতে যাচ্ছে লম্বা সিরিজের ফলাফল।
তবে অস্ট্রেলিয়ান ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টসের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচে মাশরাফির ৩ উইকেটে জয় পেয়ে যায় বাংলাদেশি দল। আগে ব্যাট করে এআইএস করেছিল ২৮৪ রান। ধীমান ও মাশরাফির ৫৬ রানের করে ইনিংসে ভর করে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ। অষ্টম উইকেটে দুজন অপরাজিত ৯৭ রানের জুটি যোগ করেন।
আগে বল করে মাশরাফি উইকেট নিয়েছিলেন একটি। তবে ব্যাট হাতে ম্যাচটা স্মরণীয় করে রেখেছিলেন ৪৪ বলে ৬টি চার ও একটি ছয়ে সাজানো ৫৬ রানের ইনিংস খেলে।
শেষ অনুশীলন ম্যাচে নর্দার্ন টেরিটরি চিফ মিনিস্টার একাদশের বিপক্ষে ১২০ রানে জয় পায় বাংলাদেশ। মেহরাব জুনিয়রের সেঞ্চুরিতে ৩০৮ রান করেছিল বাংলাদেশ।
কিন্তু এসব অনুশীলন ম্যাচ থেকে পাওয়া কোনো অভিজ্ঞতাই শেষতক কাজে লাগেনি। তিনটি ম্যাচে বাংলাদেশ যথাক্রমে ১৮০ রান, ৮ উইকেট ও ৮৩ রানে হার নিয়ে ফেরে।
প্রথম ম্যাচে মাশরাফি খুব ইকোনমিক ছিলেন। এক প্রান্ত দিয়ে ১০ ওভারে একটি মেডেন নেন এবং ৩১ রান ব্যয় করেন। এই ম্যাচের পর সতীর্থ বোলারদের আরেকটু দায়িত্ব নেওয়ার জন্য প্রকাশ্যেও কথা বলেছিলেন মাশরাফি।

যদিও মাশরাফি এখন আর সে সময়ের বর্ণনা দিতে রাজি নন। তবে সে সময় তাদের কয়েকজন খেলোয়াড়ের একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল দলকে উদ্বুদ্ধ করে রাখা এবং বাইরের নানা প্রলোভনের চেয়ে খেলাটাকে তাদের সামনে বড় করে উপস্থাপন করা। মাশরাফি পরে অবশ্য বলেছেন, তিনি মনে করেন না আইসিএলের কোনো প্রভাব অস্ট্রেলিয়া সফরের পারফরম্যান্সে পড়েছিল। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া সেই সফরের সঙ্গে থাকা সাংবাদিকেরা সাক্ষ্য দেন, সমস্যাটা তীব্র হয়ে উঠেছিল।

পরের ম্যাচেও মাশরাফি ৯ ওভারে ৩০ রান দিয়েছিলেন। শেষ ম্যাচটায় ছাড়া পুরো সিরিজেই অ্যাটাকিং বোলারের চেয়ে অনেক বেশি ইকোনমিক্যাল বোলারের ভূমিকা পালন করছিলেন।

৭.

অস্ট্রেলিয়ায় শেষ ম্যাচ খেলল বাংলাদেশ ৬ সেপ্টেম্বর। বাড়ি এসে নিঃশ্বাস নেওয়ার আগেই দেশ ফেটে পড়ল বিস্ফোরক খবরে। একটি শীর্ষ দৈনিক খবর প্রকাশ করল–১৪ জন বাংলাদেশি ক্রিকেটার যোগ দিচ্ছেন ভারতের বিদ্রোহী ক্রিকেট লিগ আইসিএলে।

এই ক্রিকেটাররা ছিলেন–সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার, সাবেক সহ-অধিনায়ক ও এক বছর আগের দেশের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক শাহরিয়ার নাফীস, নাজিমউদিন, আফতাব আহমেদ, অলক কাপালি, ফরহাদ রেজা, ধীমান ঘোষ, দেশের লিজেন্ডারি বাঁহাতি স্পিনার মোহাম্মদ রফিক, বাঁহাতি স্পিনের তখনকার ভবিষ্যৎ বলে বিবেচিত মোশাররফ হোসেন রুবেল, তাপস বৈশ্য, মঞ্জুরুল ইসলাম, মোহাম্মদ শরীফ, মাহবুবুল করিম গোলাম মাবুদ।

এই তালিকায় হাবিবুল, রফিক, গোলাম মাবুদ, মাহবুবুলদের নাম খুব একটা অবাক করল না লোকদের। এরা অবসর নিয়ে ফেলেছেন। একটা প্রথাবিরোধী লিগে যোগ দিতেই পারেন। কিন্তু জাতীয় দলের প্রায় নিশ্চিত ভবিষ্যৎ টাকার জন্য ছুড়ে ফেলায় শাহরিয়ার নাফীস, অলক কাপালি, আফতাবরা ব্যাপক সমালোচিত হলেন। বিশেষ করে তরুণ উইকেটরক্ষক ধীমান ঘোষ ব্যাপারটা জাতীয় শত্রুতার পর্যায়ে নিয়ে এলেন বিমানবন্দরে দেশের ক্রিকেট নিয়ে আপত্তিকর বক্তব্য দিয়ে।

১৪ সেপ্টেম্বর এই খবর প্রকাশের পরের দিনই ভারতের বিমান ধরলেন এই ক্রিকেটাররা। আর তিন দিন পরই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড জরুরি সভা আহ্বান করে প্রত্যেক ক্রিকেটারকে ১০ বছরের জন্য সব ধরনের ক্রিকেট থেকে নিষিদ্ধ করে। যদিও বিসিবি এই নিষেধাজ্ঞা যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করতে পারেনি। কারণ, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সাথে আইসিএলের দ্বন্দ্ব থাকলেও আইসিসি এই টুর্নামেন্টকে কখনোই নিষিদ্ধ কোনো টুর্নামেন্ট বলেনি।

৮.

আইসিএলের ধাক্কা লাগার কথা ছিল।

যদিও দলের কেন্দ্রীয় পারফরমার বলতে যা বোঝায়, তারা কেউ আইসিএলে যাননি। তারপরও এতগুলো সর্বোচ্চ পর্যায়ের খেলোয়াড় চলে যাওয়ার একটা ধাক্কা লাগারই কথা।

এমনিতেই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের কখনোই রেকর্ড ভালো না। ২০০৭ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে একমাত্র সাফল্য ছাড়া এই দলটির বিপক্ষে তখনো কোনো সাফল্যই কোনো দিন পায়নি বাংলাদেশ। প্রস্তুতি ম্যাচ আনুষ্ঠানিক না হওয়ায় তখনো নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে স্বীকৃত একটা জয়ের সন্ধানেই আছে বাংলাদেশ।

সেই জয়টা এল এমন আইসিএল ধাক্কার পরই।

মূলত মাশরাফির ভয়ানক প্রথম স্পেলেই নির্ধারিত হয়ে যায় ম্যাচের ভাগ্য। সাধারণত ৪-৫ ওভারে স্পেল করা মাশরাফি এদিন প্রথম স্পেলে টানা ৮ ওভার বল করেছিলেন। প্রথম স্পেলে মাশরাফির বোলিং বিশ্লেষণ ছিল ৮-৩-১৯-৩। শেষ পর্যন্ত পরের দুটো ওভারে একটু বেশি রান দিয়ে আরেকটা উইকেট পেয়েছিলেন। তবে শেষ ওভারে আরও দুটো ক্যাচ না পড়লে অবশ্যই ইনিংসে ৫ উইকেট পার হয়ে যেত।

মাশরাফির ওই বোলিং সম্পর্কে ক্রিকইনফো লিখেছিল :

বাংলাদেশের হয়ে মাশরাফি সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন জয়ের পথে। আশরাফুল ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর একেবারে নিখুঁতভাবে বল পিচ করতে থাকল এবং উইকেটের সুবিধা নিয়ে শুরুর মুভমেন্ট আদায় করে নিল। নিজের ৮ ওভারের টানা স্পেলে ব্যাটসম্যানদের খেলার মতো জায়গাই খুব একটা দেয়নি এবং তিনটি উইকেট তুলে নিয়েছে। [২]

যদিও পরে মাশরাফির সামর্থ্য নিয়ে বিভিন্ন সময় প্রশ্ন তোলার খুব চেষ্টা করলেও এই ম্যাচের পর জেমি সিডন্স একটা রায় দিয়েছিলেন, যেটা মাশরাফির ক্ষেত্রে রীতিমতো স্মরণীয় একটা কথা :

সেদিনের পরদিন এই কাজ আমাদের জন্য করে যাচ্ছে। যদিও সে প্রতিদিন এ রকম বোলিংয়ের ফলাফল পায় না। কারণ, প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যানরা এখন ওকে কোনোক্রমে সামলে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং অন্যদের আক্রমণ করে। কিন্তু আজকের এই দিনটাই ওর ছিল। [৩]

সিডন্সের এই কথার সত্যতা পরের ম্যাচেই পাওয়া গেল। আগুন ঝরানো বোলিং করলেন মাশরাফি। ১০ ওভারে মাত্র ২৯ রান দিয়ে ১ উইকেট নিলেন। তবে রাসেলের এই ম্যাচে বোলিংয়ের কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। তিনি ১০ ওভারে ৪ মেডেন দিয়ে ২৩ রান খরচ করে ৩টি উইকেট নিয়েছিলেন।

নিউজিল্যান্ডকে ২১২ রানে আটকেও বাংলাদেশ সে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারল না। মাশরাফি শেষবেলায় ২৭ বলে ৩টি চার ও একটি ছক্কায় ২৭ রান করে একটা চেষ্টা করেছিলেন।

শেষ ম্যাচে মাশরাফি ২ উইকেট নিলেন। মাত্র ২৪৯ রান তাড়া করতে গিয়ে ৭৯ রানে হারল বাংলাদেশ।

৯.

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এই সিরিজে মুলতান ও ফতুল্লার সঙ্গে যোগ হলো চট্টগ্রামের নামও। মুলতানে তখনকার পাকিস্তান অধিনায়ক ইনজামাম, ফতুল্লায় তখনকার অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক রিকি পন্টিং পুড়িয়েছিলেন বাংলাদেশকে; ছিনতাই করেছিলেন জয়।

এবার চট্টগ্রামে ঠিক একই ভূমিকা নিলেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক ড্যানিয়েল ভেট্টোরি। সাকিবের বোলার হয়ে ওঠার এই ম্যাচে সাকিব-ভেট্টোরি লড়াইয়ে ৩ উইকেটে জিতল নিউজিল্যান্ড।

প্রথম ইনিংসে ভেট্টোরি ৫ উইকেট, বাংলাদেশ ২৪৫। নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংসে ১৭১; সাকিব ৭ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশ ২৪২; সাকিব ৭১ ও ভেট্টোরি ৪ উইকেট। জয়ের জন্য নিউজিল্যান্ডের দরকার ছিল ৩১৭ রান। ভেট্টোরি ৭৬ রান করে বের করে নিয়ে গেলেন ম্যাচ!

নিউজিল্যান্ড-বাংলাদেশ

১ম ওয়ানডে

ভেন্যু : মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়াম

তারিখ : ৯ অক্টোবর, ২০০৮

ফল : বাংলাদেশ ৭ উইকেটে জয়ী

নিউজিল্যান্ড

ব্যাটসম্যান	**রান**	**বল**	**৪**	**৬**
রাইডার ক মাহমুদউল্লাহ ব মাশরাফি	৩৪	৩৫	৪	১
ম্যাককালাম ক রাসেল ব মাশরাফি	১৪	২১	৩	
জিমি হাউ এলবিডব্লু মাশরাফি	৭	২০	১	০
টেলর ক আশরাফুল ব শাহাদাত	২	৪		
স্টাইরিস এলবিডব্লু রাজ্জাক	৪	১৩		
ফিন ক মাহমুদউল্লাহ ব রাজ্জাক	৬	২০		০
ওরাম ক রাসেল ব রাজ্জাক	৫৭	৮৯	৪	১
ভেট্টোরি ক নাঈম ব সাকিব	৩০	৫৭	৪	
মিলস ক শাহাদাত ব মাশরাফি	১৬	২৬	১	১
সাউদি অপরাজিত	১৯	১৪	২	১
গিলেস্পি অপরাজিত	২	২		
অতিরিক্ত (লেবা ৫, ও ৫)	১০			
মোট (৫০ ওভারে ৯ উইকেট)	২০১			

বোলিং : মাশরাফি ১০-৩-৪৪-৪, রাসেল ২-০-১৮-০, শাহাদাত ৬-০-২৯-১, সাকিব ১০-০-৩০-১, রাজ্জাক ১০-০-৩৩-৩, নাঈম ১০-০-৩৪-০, মাহমুদউল্লাহ ২-০-৮-০।

দ্বিতীয় টেস্ট বৃষ্টিতে ড্র হলো; সিরিজ নিউজিল্যান্ডের।

বাংলাদেশ

ব্যাটসম্যান	রান	বল	৪	৬
তামিম ক স্টাইরিস ব মিলস	১২	১২	২	০
জুনায়েদ ক ওরাম ব গিলেস্পি	৮৫	১৩৭	৮	
মুশফিক ক রাইডার ব স্টাইরিস	৩০	৫৯	১	১
আশরাফুল অপরাজিত	৬০	৫৬	৫	১
সাকিব অপরাজিত	৫	৯		

অতিরিক্ত (লেবা ৬, ও ৪) ১০

মোট (৪৫.৩ ওভারে, ৩ উইকেটে) ২০২

বোলিং : মিলস ৭-০-২৮-১, গিলেস্পি ৮.৩-১-৩৭-১
সাউদি ৯-০-৪১-০, ওরাম ৫-০-৪৮-০, ভেট্টোরি ৯-০-৪৮-০
স্টাইরিস ৬-০-২২-১, রাইডার ১-০-৯-০।

১০

বছরের শেষ সফরে বাংলাদেশ গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়।

এ সফরটা শুরু হলো মাশরাফির পিঠে ব্যথা নিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছানোর পর থেকে ব্যথাটা ভোগানো শুরু করল। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা এয়ারওয়েজ চ্যালেঞ্জ একাদশের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচটা তার খেলা হলো না। মাশরাফি অবশ্য তখনো আশাবাদী ছিলেন ওয়ানডে সিরিজের আগেই পুরো সুস্থ হয়ে ওঠার।

তা ফিরলেন মাশরাফি। প্রথম দুটো ওয়ানডে খেললেন। তার বা দলের বলার মতো কোনো পারফরম্যান্সই ছিল না।

দুটো টেস্টেই ইনিংস ব্যবধানে হার। দুই ইনিংসে ১টি করে উইকেট পেলেন মাশরাফি। দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে কেবল ২১ বলে ২৩ রানের একটা ইনিংস খেলতে পেরেছিলেন। এটা বাদ দিলে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পিঠে ব্যথা ছাড়া আর কোনো অর্জন ছিল না।

তবে অর্জন বলুন আর ব্যথা–সবই অপেক্ষা করছিল পরের বছরের জন্য।

১১.

২০০৮ সালের মার্চে তখন পর্যন্ত মাশরাফি তার ক্যারিয়ারের দীর্ঘতম প্রিমিয়ার লিগ মৌসুম খেললেন। সেবার খেলেছেন বাংলাদেশ বিমানের হয়ে। এ মৌসুমে প্রথম পর্ব ও সুপার লিগ মিলিয়ে ৯টি ম্যাচ খেলে ফেলেন তিনি।

এর মধ্যে কয়েকটি ম্যাচ নিশ্চয়ই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পুরোনো দল আবাহনীর বিপক্ষে খেলতে নেমে ৫৬ বলে ৭৬ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। ভবিষ্যৎ দল মোহামেডানের বিপক্ষে প্রথম পর্বে ১৪ রানে ৪টি ও দ্বিতীয় পর্বে ৫২ রানে ৫টি উইকেট নেন। মানে মোহামেডানের বিপক্ষে ২ ম্যাচে ৯ উইকেট। মোহামেডান যে তাকে দলে ভেড়াতে উঠে পড়ে লাগবে, তাতে আর সন্দেহ কী! এ ছাড়া সূর্যতরুণের বিপক্ষে ১৪ রানে ৪ উইকেট নেন মাশরাফি।

[১] Ashraful defends decision to drop Mortaza; ক্রিকইনফো (১০ মার্চ, ২০০৮)
[২] Bangladesh maul sorry New Zealand; ক্রিকইনফো (৯ অক্টোবর, ২০০৮)
[৩] Proof of Bangladesh's ability; ক্রিকইনফো (৯ অক্টোবর, ২০০৮)

এত টাকা লইয়া কী করিব!



১.

রশি দিয়ে বেঁধে মানুষকে টানলে লম্বা হোক বা নাক, টানাটানি করলে লাখ টাকা যে কোটি টাকায় পরিণত হয়, তা সত্যি। টানাটানি করে মাশরাফি বিন মুর্তজার আইপিএল দর ৪ কোটির ওপরে নিয়ে গেলেন দুই বলিউড নায়িকা।

২০০৯ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি।

আইপিএলের নিলাম চলছে গোয়া শহরে। নিলামের 'এফ' গ্রুপের ৩৩ নম্বরে নাম ওঠে মাশরাফি বিন মর্তুজার। টেবিলে হাতুড়ির বাড়ি দিয়ে মাশরাফির নামটি ঘোষণা করতেই নাইট রাইডার্সেও টেবিল থেকে বেস প্রাইস ৫০ হাজার ডলার ডাক ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব ইলেভেনের টেবিল থেকে ৬০ হাজার ডাক দেন প্রীতি জিনতা। এভাবেই ১০ হাজার করে বাড়িয়ে ২ লাখ ডলারে নিলাম চলে। হলঘরের সবাই অবাক হয়ে যায় মাশরাফিকে নিয়ে জুহি চাওলা আর প্রীতি জিনতার কাড়াকাড়ি দেখে। প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে চলে দুপক্ষের দর-কষাকষি।

এ পর্যায়ে নাইট রাইডার্সের মালিক শাহরুখ খানের ফোন আসে ক্লাবের কোচ জন বুকাননের কাছে। তারপর থেকেই দর চড়তে থাকে মাশরাফির। এক লাফে আড়াই লাখে চলে যান জুহি চাওলা। যা দেখে জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার হার্ষা ভোগলে বলে ফেলেন, 'এবার বোধ হয় মাশরাফিকে নিয়ে দুই নায়িকার চুলাচুলি বেঁধে যাবে। পুরো নিলামপ্রক্রিয়ায় ট্রাফিক জ্যাম বাঁধিয়ে দিয়েছেন মাশরাফি।'

সত্যিই ম্যারাথন ডাক ওঠে মাশরাফিকে নিয়ে। দর ৪ লাখ ১০ হাজার ডলারে পৌঁছে যাওয়ার পর নিলামকারী জিজ্ঞেস করেন, '৪ লাখ ১০ হাজারের ওপরেও কি তোমরা কেউ বলবে?'

জুহি চাওলা ৫ লাখ ডলার বলে ফেলেন। এরপর প্রীতি জিনতা সাড়ে ৫ লাখেও চলে গেলেন। শেষ পর্যন্ত কলকাতা ছয় লাখে পৌঁছানোর পর আর এগোননি জুহি চাওলা। মাশরাফিকে নিয়ে দাপুটে মোট ১৯ বার দর-কষাকষি চলে। এটি একধরনের রেকর্ড। কারণ বেস প্রাইস থেকে সোলড প্রাইসের এত পার্থক্য গতবার কবল ইশান্ত শর্মাকে নিয়েই হয়েছে। বেস প্রাইস থেকে ১১০০% বেশি দামে বিক্রি হয়েছেন মাশরাফি। ভারতীয় টেলিভিশনগুলোতে ব্রেকিং নিউজ হয়ে যায়–আইপিএলে জ্যাকপট লেগেছে মাশরাফির।

নিলামের আগের রাত থেকেই অবশ্য নাকি নাটক শুরু হয়ে গিয়েছিল। নাইট রাইডার্স থেকে ফোন এসেছিল মাশরাফির কাছে। প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল নিলাম থেকে নাম তুলে নিলে বেস প্রাইসের তিন গুণ বেশি দামে কেনা হবে তাকে। এ ধরনের বিকল্প প্রস্তাবে রাজি হননি মাশরাফি। নাইট রাইডার্স চেয়েছিল নিলামের বাইরে থেকে 'রিপ্লেস' হিসেবে মাশরাফিকে তুলে নিতে। তাতে কিছু কম টাকায় হয়তো পেয়ে যেত তারা মাশরাফিকে। কিন্তু মাশরাফিকে আবার আরেকজন খুব করে চাচ্ছিলেন। তাকে নিয়ে পাঞ্জাব কিংস ইলেভেনের আগ্রহও ছিল যুবরাজের জন্য। বন্ধু মাশরাফিকে তার দলে ভেড়ানোর জন্য চেষ্টা করেছিলেন যুবরাজ। তিনি যেকোনো মূল্যে তাকে কিনতে অনুরোধ করেছিলেন।

তাকে নিয়ে এই ভয়ানক রশি টানাটানি অবাক করেছিল তখন খোদ মাশরাফিকেও

নিলামে আমাকে নিয়ে এত দর-কষাকষি হবে ভাবতে পারিনি। আমার বেস প্রাইস ছিল ৫০ হাজার ডলার। ভেবেছিলাম কম প্রাইস বলেই হয়তো কোনো ক্লাব আগ্রহ দেখাবে। তা ছাড়া কলকাতা নাইট রাইডার্সের কাছ থেকে ফোন পেয়েই অনেকটা আশাবাদী ছিলাম দল পাওয়ার ব্যাপারে। কিন্তু এত টাকা! সত্যি বলছি, আমি নিজেই অবাক হয়েছি। [১]

নায়িকারা যতই টানাটানি করুন, টাকা কিন্তু এখন মাশরাফির একার। এতে আর জুহি-প্রীতিরা ভাগ বসাতে পারছেন না।

২.
লটারিতে ৫০ হাজার টাকা পেলে কী করবেন? একজন নাকি উত্তর দিয়েছিলেন, ৫০ হাজার শিঙাড়া কিনে ফেলব (তখন টাকায় একটা শিঙাড়া পাওয়া যেত)! ভদ্রলোক যদি ৪ কোটি টাকার মালিক হয়ে যেতেন? ৪ কোটি শিঙাড়া কেনার 'ঝুঁকি' কি তিনি নিতেন? অত শিঙাড়া তৈরি করতে কত বছর সময় লাগত!
সন্দেহ নেই বড়ই আজব পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা শুনে যুক্তিবুদ্ধিওয়ালারা চটে উঠে বলতে পারেন, ৪ কোটি টাকার শিঙাড়া কেন কিনবে! এ কোন ধরনের পাগলামি?
পাগলামি বলুন আর আজগুবি, মাশরাফি বিন মুর্তজা প্রায় এ ধরনের পরিকল্পনা নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ৪ কোটি টাকার মালিক হয়ে কেমন লাগছে? প্রশ্নটা শুনে একটু থমকে গেলেন, তারপর হেসে বললেন, 'মালিক তো ঠিক হইনি। এখনো টাকা হাতে পাইনি। আর এত টাকা মনে হয় নগদ হাতে দেবেও না। তবে একবার মালিক হয়ে গেলে নিশ্চিত। নিশ্চিত যে সারা জীবনে আর কোনো দিন না খেয়ে থাকতে হবে না। ৪ কোটি টাকায় নিশ্চয়ই বাকি জীবনের খাবার হয়ে যাবে, নাকি বলেন?' ৪ কোটি শিঙাড়া কেনার পরিকল্পনার চেয়ে খারাপ কী!
মাশরাফি বিন মুর্তজা লটারিতে টাকা পাননি। রীতিমতো ঘাম ঝরিয়ে ক্রিকেট খেলে নিজেকে প্রমাণ করে তবে নিলামে বিকিয়েছেন ৪ কোটিরও বেশি টাকা দামে। তবে অংকটা এমনই ভয়ানক (হ্যাঁ, মাশরাফি ভয়ানকই বললেন) যে, মাঝে মাঝে লটারি বলেই ভ্রম হচ্ছে। অন্য মানুষের কথা কী বলবেন, খোদ মাশরাফিই এখনো 'ভয়ানক' এই কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে যাওয়া ব্যাপারটা ঠিক আত্মস্পর্শ করতে পারছেন না, 'এটা আসলেই কেমন একটা ব্যাপার না? আমি মাশরাফি ক্রিকেট খেলে বেড়াচ্ছি, ২-৪ লাখ টাকা আয় করছি। আমি কেন কোটি টাকার স্বপ্ন দেখব। হঠাৎ একদিন বিকেলে শুনি আমি নাকি কোটিপতি হয়ে গেছি! বোঝেন অবস্থা। তা-ও আবার এখন শুনতেছি ৪ কোটিও না, আসলে নাকি দুই বছর ঠিকঠাক খেললে ৮ কোটির বেশি টাকা পাব। আচ্ছা বলেন, এটা বিশ্বাস হয়!'
নাহ। বিশ্বাস হওয়া একটু কঠিন বৈকি। কিন্তু বিশ্বাসে আর কাজ কী। কোটিপতি যখন হয়েই গেছেন, এখন স্বপ্নগুলো পূরণ করে ফেললেই হয়! ছোটবেলায় নিশ্চয়ই কোটিপতি হওয়ার স্বপ্নটপ্ন দেখতেন? সে সময় তো নিজেকে বড়লোক ভাবতেই মজা লাগার কথা? 'আরে দূর! আমি কোটিপতি তো দূরে থাক, লাখপতি হওয়ারই স্বপ্ন দেখিনি কোনো দিন। একেবারে সত্যি কথা, আমার জীবনে আমি বিরাট বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন কোনো দিন দেখিনি। কোটিপতি হব এমন স্বপ্ন দেখার কোনো কারণ ছিল না'–স্রেফ উড়িয়েই দিলেন

'স্বপ্নের' ব্যাপারটাকে।

তাহলে তো বড় মুশকিল হলো! যে লোক কোটিপতি হওয়ার স্বপ্নই দেখেনি, সে এই টাকা খরচ করবে কী করে? এবার মাশরাফিও দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন, 'আমিও আসলে ঠিক ভেবে উঠতে পারছি না। ভাবার জন্য ফাঁকা একটা সময় বের করতে হবে। তবে এটা ঠিক যে, বাড়ি-গাড়ি করব না। সে এমনিতে যা আয় করি তাই দিয়েই করার চেষ্টা করছি। এই টাকাটার কী করা যায়, ভেবে বের করতে হবে। তবে আপাতত টাকাটা খরচ না করার একটা বুদ্ধি করে ফেলেছি।'

টাকা খরচ না করার আবার কী বুদ্ধি! 'আগের চেয়ে জামাকাপড় বেশি ময়লা করছি'–রহস্য আরও বাড়ালেন মাশরাফি। জামাকাপড় ময়লা করে লাভ কী? দুষ্টুমির হাসি হেসে বললেন, 'বুঝলেন না? জামাকাপড় ময়লা বেশি হলে বউ এই টাকা নিয়ে ভাবার সময় পাবে না, জামাকাপড় পরিষ্কার করা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। তাই আপাতত টাকাটা ওর হাতে অন্তত খরচ হচ্ছে না। হা হা হা।'

এটুকু বলে আবার পারিবারিক নিরাপত্তা ঠিক রাখার জন্য বোধ হয় মনে করিয়ে দিলেন, 'ফাজলামো করলাম'! তাহলে ভাই, স্ত্রীকে নিয়ে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়ুন না? সব দিক ঠিক থাকবে ওতে। এই ধরেন সাইবেরিয়া, সাহারা কিংবা আমাজনটা বেড়িয়ে এলেন। মাশরাফি যেন মহাবিরক্ত হলেন, 'কী যে বলেন? এতদূর কে যাবে! ও যেতে চাইবে কিনা বুঝতে পারছি না। তবে আমার বেড়াতে-টেড়াতে একদম ভালো লাগে না। সাইবেরিয়া-টিয়া তো দূরের ব্যাপার। আমার এই দার্জিলিং-কক্সবাজারও যেতে ভালো লাগে না।'

নাহ, এমন ঘরকুনো লোকের হাতে পড়ে কোটি টাকা না বিরক্ত হয়ে যায়! বেচারা টাকাগুলোর তো কোনো ব্যবহারই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এবার মাশরাফি একটু সিরিয়াস হলেন, 'আমি আসলেই জানি না, ঠিক কী কী করব। তবে কাজে তো লাগবেই। দুটো কাজ এখনই ঠিক করে ফেলেছি। এক নম্বর হলো, আমাদের গ্রামের স্কুলটার সঙ্গে একটা মসজিদ বানিয়ে দেব। আর একটা...। না থাক, এটা বলি না।'

একটু যেন বিব্রত আইপিএলে সাড়া ফেলে দেওয়া ফাস্ট বোলারটি। বারবার অনুরোধ করার পর বললেন, 'রানার বাসায় কিছু টাকা দিতে হবে। এটা আসলে আলাদা করে বলার কিছু নেই। ওটা তো আমারই বাসা।' রানা! এমন সুখের দিনে, কোটিপতি হয়ে যাওয়ার দিনে মাশরাফি ভোলেননি হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া বন্ধুটিকে। কোটিপতিদের হৃদয়টা বড় হলেই তো মানায়!

বারবার কোটিপতি শুনে একটু যেন বিরক্ত মিশুক স্বভাবের ক্রিকেটারটি। কী যেন ভেবে নিয়ে বললেন, 'দেখেন, আমি ওই টাকা পাই আর না পাই, আমার মনে কিন্তু কোনো পরিবর্তন নেই। এত টাকার টান এড়ানো তো সোজা কথা না। কিন্তু এই টাকার মালিক হওয়ার পরও আমি সেই মাশরাফি-ই আছি। আমার মনে কোনো

প্রভাব পড়েনি। আমি টাকাটারে শেষ কথা মনে করি না।'

কোটি টাকার মালিক হয়ে যাওয়ার পর, এ কথা আর খুব বেশি অর্থ বহন করে না। তবে আসলেই টাকা যে জীবনের সব না, সেটা মাশরাফি বিশ্বাস করেন। বিশ্বাস করেন, তার প্রমাণ মিলেছিল মাত্র কয়েক মাস আগে। ইন্ডিয়ান ক্রিকেট লিগ (আইসিএল) থেকে আসা কোটি টাকার প্রস্তাব অবহেলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। জানতে ইচ্ছে হলো, সেদিন কী অনুমান করেছিলেন, এই কোটি টাকা ফিরে আসবে অন্য কোনো চেহারায়? মাশরাফি আবার হাসলেন, ''আমি এক টাকার কথাও আশা না করে আইসিএলের প্রস্তাবে 'না' বলে দিয়েছিলাম। সিদ্ধান্তটা নেওয়ার আগে বাড়িতে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমার মা বলেছিলেন, 'টাকার দরকার আছে। কিন্তু যেকোনো কিছুর বিনিময়ে টাকা আয় করার দরকার নেই।' আমিও ও রকম ভাবি।''

কী রকম? দর্শনটা বড় সোজা। 'টাকার আয় করার জন্যই বেঁচে আছি, এটা ভাবতে কেমন জানি লাগে। আমি আমার মতো বাঁচব। বেঁচে থাকার জন্য যে কয় টাকা দরকার, সে কয় টাকার জন্যই চেষ্টা করব। বেশি টাকার জন্য আমি কোনো ত্যাগ করতে পারব না।'

মাশরাফি লোকেরা 'পাগলা' বলে। পাগলাদের জীবন-দর্শন বোধ হয় একটু অন্য রকমই হয়! *

৩.

মাশরাফি যেমনটা বলেছিলেন, টাকা তো হাতে পাননি; তাই এটা কাগজের একটা ডকুমেন্ট ছাড়া আর কিছু নয়। শুরুতে কথাটাকে কথার কথা বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু দিন গড়াতে থাকলে আস্তে আস্তে মনে হলো কথাটা নিতান্ত মন্দ নয়।

শুরুতে কলকাতা নাইট রাইডার্সের উৎসাহের অন্ত ছিল না মাশরাফিকে নিয়ে। সৌরভ গাঙ্গুলীর কাছ থেকে ফোন নম্বর নিয়ে দলের মালিক শাহরুখ খান স্বয়ং একদিন ফোন দিয়েছিলেন মাশরাফিকে। যেভাবে কথাবার্তা বলেছিলেন, তাতে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই।

বলিউডের কয়েক দশক ধরে একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে থাকা নায়ক শাহরুখের সঙ্গে সেই কথোপকথন নিয়ে সে সময় একটি দৈনিক পত্রিকাকে সাক্ষাৎকারও দিয়েছিলেন। সেখানে বলেছিলেন :

সত্যি বলতে কি, ওর কণ্ঠটা পুরো অন্য রকম লেগেছে। মনেই হয়নি শাহরুখ খান। সিনেমায় যে ভঙ্গিতে কথা বলে, কেঁপে কেঁপে হাসে, কিছুই পেলাম না টেলিফোনে। আমি তাকে বলেছিও, 'তোমার কথা অন্য রকম শোনাচ্ছে।' হেসে বলে, 'চিন্তা কোরো না। আসো, মজা হবে।'...ফোন করেছেন প্রথমে দাদা (সৌরভ গাঙ্গুলী)। বললেন, 'শাহরুখ তোকে খুঁজছে, কিন্তু তোর মোবাইলে পাচ্ছে

..:::ShOpNoHiN:::..

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Exclusive

স্ক্যানিং

এডিটিং



..:::ShOpNoHiN:::..

Visit Us at ..:::ShOpNoHiN:::..

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

না।' পরে দাদাই ওর নম্বর দিয়ে বলল, ফোন করতে। মজার ব্যাপার হলো, ও (শাহরুখ) ফোন ধরেই বলল, 'হাই মাশরাফি।' মনে হয় আমার নম্বরটা সেভ করা আছে। [২]

মার্চের ২১ তারিখ শাহরুখের সঙ্গে এমন আন্তরিক কথোপকথন। কিন্তু পরের একটা সপ্তাহের মধ্যে কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর) কর্তৃপক্ষ রীতিমতো টালবাহানা করা শুরু করল মাশরাফির সঙ্গে।

খেলা হবে দক্ষিণ আফ্রিকায়। কলকাতা থেকে কার সঙ্গে যাবেন, কলকাতায় গিয়ে কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন; এসব কিছুই জানানো হচ্ছিল না তাকে। এদিকে আসল ব্যাপার, মানে তার সঙ্গে চুক্তি করানোর ব্যাপারেও কেকেআর কর্তৃপক্ষ কিছু জানাচ্ছে না। পত্রপত্রিকায় সে সময় দেখা যাচ্ছে, মাশরাফির আদৌ চুক্তি হওয়া নিয়ে বা তার প্রতিশ্রুত ৪ কোটি টাকা পাওয়া নিয়ে খুবই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

এই অনিশ্চয়তা মাথায় নিয়েই এপ্রিল মাসের ২ তারিখ উড়ে গেলেন কলকাতার উদ্দেশে। এখানে খুবই বাজে একটা ব্যাপার ছিল, মাশরাফি যে কলকাতা যাচ্ছেন, সে ব্যাপারে কেকেআরের পক্ষ থেকে কোনো যোগাযোগ করা হয়নি। সেদিনের প্রথম আলো জানাচ্ছে, মাশরাফি নিজের উদ্যোগেই ভিসা ও বিমানের টিকিট কাটেন :

বিসিবি সূত্রে জানা গেছে, মাশরাফির সঙ্গে বিমাতাসুলভ আচরণ করছে নাইট রাইডার্স। দলের অন্য সব খেলোয়াড়ের চুক্তিপত্র চূড়ান্ত করে ফেললেও মাশরাফিরটা এখনো করেনি তারা। এমনকি ভিসা সংগ্রহ আর বিমান টিকিট নিজ উদ্যোগেই করতে হয়েছে তাকে। কলকাতা যাওয়ার ব্যাপারে সর্বশেষ যোগাযোগটাও হয়েছে মাশরাফির দিক থেকে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করলে একেকজন একেক রকম কথা বলছেন তাঁকে। মাশরাফি নিয়ে যার বেশি উৎসাহ ছিল, বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সেই 'দাদা' সৌরভ গাঙ্গুলী তো ফোনই ধরছেন না তিন দিন ধরে! [৩]

তবে এ সময় মাশরাফি বিসিবিকে খুব কাছে পেয়েছিলেন। কেকেআরের পাল্টা অনুযোগ করে পাঠানো এক মেইলের কড়া জবাব দিয়ে বিসিবি বুঝিয়ে দিয়েছিল, তারা মাশরাফির পাশে আছে। মাশরাফিকে নিয়ে ছেলেখেলা চলবে না।

এ অবস্থা মাথায় নিয়ে মাশরাফি ২ এপ্রিল রওনা হয়ে গেলেন কলকাতায়। যাওয়ার আগে বলে গিয়েছিলেন, আশা করছেন, কেকেআর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একবার দেখা হলে সব জটিলতার সমাধান হয়ে যাবে। এই আশা নিয়ে কলকাতা পৌঁছানোর পর কেকেআরের পৃষ্ঠপোষক পেপসির একটা বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ে চলে যেতে হয় তাকে মুম্বাই।

শাহরুখ খানের শহর মুম্বাই। শাহরুখের বাড়ি মান্নাতের কাছেই এক স্টেডিয়ামে

শুটিং করতে হলো।

পরবর্তীকালে এমন বিরক্তিকর শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা মাশরাফির ঢের হয়েছে। তবে সেবারই প্রথম একটি এলডিব্লু ও একটি বোল্ড করতে হবে এমন দৃশ্যের শুটিংয়ে ৭ ওভার বোলিং করে ফেলার অভিজ্ঞতা পেতে হয়েছিল মাশরাফিকে।

শুটিং শেষ করে আবার কলকাতা ফিরে আসেন মাশরাফি। এখান থেকে সদলবদলে 'প্রবাসী' আইপিএল খেলতে উড়াল দেওয়ার কথা দক্ষিণ আফ্রিকায়। কলকাতায় মাশরাফিকে একটি সংবাদ সম্মেলনেও হাজির হতে হলো কেকেআরের হয়ে।

আর এর ফাঁকে একটা দিন বিরতি পেলেন। ভারতে যাওয়ার সময়ই দেখে গিয়েছিলেন, মায়ের শরীরটা একটু খারাপ। একটা দিন ছুটি পেয়ে মাকে দেখতে তাই এক পলকের জন্য একটু ঢাকায় চলে এলেন। আর পেছন ফেরা নয়; এবার লক্ষ্য জোহানেসবার্গ।

৪.

দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছানোর পরও শুরুটা খারাপ হয়নি মাশরাফির।

কেকেআরের হয়ে ব্লুমফন্টেইন ফ্রি স্ট্রিটের বিপক্ষে একটা প্রস্তুতি ম্যাচে খেলেও ফেলেন তিনি। এই ম্যাচে ৪ ওভার বল করে ৩৩ রান দিয়ে পেয়েছিলেন ১ উইকেট। পরের প্রস্তুতি ম্যাচে ৪ ওভারে দিলেন মাত্র ১৮ রান; একটি উইকেট পেলেন।

ক্লাব ক্রিকেটে সে মৌসুমে আবাহনীর স্বার্থে এর আগে কয়েক মাস ধরে পেস বোলিং করতে পারেননি। দলকে জেতানোর জন্য স্পিন করছিলেন এ সময়। ফলে পেস অনুশীলন খুব একটা না করেই দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়া মাশরাফির জন্য শুরুটা খারাপ হয়নি।

এই শুরু পর্যন্তই। এরপর শুরু হলো জীবনের সবচেয়ে হতাশার এক অধ্যায়।

মাশরাফি যেন কেকেআরের বিশাল দলের মধ্যে একজন 'এলিয়েন'। দলের বিদেশি খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা হয়, আড্ডা হয়। দলের সঙ্গে অনুশীলনে যান। কখনো নেট করতে পারেন, কখনো পারেন না। কিন্তু সমস্যা হলো, তিনি কিছুতেই দলের একজন হয়ে উঠতে পারেন না। কেকেআরের সঙ্গে থেকেও তিনি যেন একজন বহিরাগত।

এখানে দুটো ব্যাপার মাশরাফিকে 'এলিয়েন' বানিয়ে রাখল–প্রথমত জন বুকাননের ম্যানেজমেন্ট মাশরাফির ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী বলে মনে হচ্ছিল না। দ্বিতীয়ত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, হঠাৎ করেই দলে সৌরভ যেমন ব্রাত্য হয়ে পড়লেন, তেমনই সৌরভের প্রিয় পাত্র মাশরাফির সঙ্গেও সৌজন্য করতে যেন ভুলে গেল কেকেআর কর্তৃপক্ষ।

সবচেয়ে বড় সংকটটা হলো, দলের সঙ্গে ঘুরছেন-ফিরছেন; কিন্তু দলের চুক্তিভুক্ত ক্রিকেটারই হতে পারছেন না। মানে, আনুষ্ঠানিকভাবে মাশরাফি তখনো কেকেআরের সদস্য নন!

মাশরাফি অবশ্য তখন দেশে স্বজনদের-সাংবাদিকদের বারবার আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছিলেন। নিজে যতই অশান্তিতে থাকুন, ফোনে বলছিলেন, 'চিন্তা করো না, ওরা বলেছে, সব ঠিক হয়ে যাবে। ওরা বলেছে, সবাই জানে আমি কেকেআরের খেলোয়াড়। আমার সঙ্গে সময়মতো চুক্তি করে ফলবে ওরা।'

মাশরাফির চুক্তি নিয়ে বাংলাদেশ থেকে নানা পক্ষ থেকেই যোগাযোগ করা শুরু হলো কেকেআরের সঙ্গে। কেকেআর কর্তৃপক্ষ সেসব যোগাযোগেও খুব একটা সৌজন্য রক্ষা করল না। তাদের এক কথা–এসব নিয়ে ভাবার দরকার নেই, তারা সময় হলে সব করবে।

অবশেষে শেষ দিকে এসে কেকেআরের পক্ষ থেকে চুক্তিপত্র তুলে দেওয়া হলো মাশরাফির হাতে। অত্যন্ত যৌক্তিকভাবেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টা বিসিবিকে জানালেন। বিসিবি চুক্তিপত্রের কপি চাইল। তারা নিজেদের আইনজীবী দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে তবে মাশরাফিকে সবুজসংকেত দিলেন সই করার জন্য।

আইনজীবীর পরীক্ষার পর মাশরাফি সই করে চুক্তিপত্র জমা দিলেন ১৫ মে; ১৬ মে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামলেন তিনি কেকেআরের হয়ে।

৫.

ক্রিকেট-বিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকইনফো লিখল–অবশেষে তার ছয় লাখ ডলার কাজে লাগাতে যাচ্ছে কলকাতা!

মাশরাফি অবশ্য আগের দিনও কিছু জানতেন না। কোনো কোনো ম্যাচের চূড়ান্ত স্কোয়াডে থাকলে যেমন মাঠে যান, সেদিনও গিয়েছিলেন। সবার সঙ্গে ওয়ার্মআপ করতে নামবেন, এমন সময় বুকানন ডাক দিয়ে বললেন, আজ তুমি খেলছ।

এক মাসের বেশি এখানে এসে প্রায় মরচে ধরে গেছে বোলিংয়ে। নেটেও খুব একটা সুযোগ মেলে না। মাশরাফি জীবনে প্রথমবারের মতো সংশয়ে পড়ে গিয়েছিলেন–আমি কি পারব?

তারপরও ডেকান চার্জার্সের বিপক্ষে মাঠে নেমে পড়লেন।

কলকাতা নাইট রাইডার্স আগে ব্যাট করে করেছিল ১৬০ রান। নিজের প্রথম ওভারের প্রথম দুটো বল ডট। এর পরের চার বলে দিলেন ১৫ রান। দ্বিতীয় ওভারে একটি ওয়াইডসহ ১১ রান। নিজের তৃতীয় ওভারটা টাইট করলেন, ৭ রান দিলেন। এই ওভারে দারুণ ফিল্ডিংয়ে একটা রানআউটও করলেন।

ফলে শেষ ওভারে বোলিং করার দায়িত্বটা মাশরাফির কাঁধেই পড়ল। ডেকানের জয়ের জন্য দরকার ছিল ২১ রান। প্রথম বলটাতে ভজকট লাগিয়ে ফেললেন

অধিনায়ক ব্রেন্ডন ম্যাককালাম। ৩০ গজের মধ্যে চারজন ফিল্ডার রাখার নিয়ম থাকলেও রাখা হলো তিনজন–ফলে নো। আর এই নো বলে রোহিত শর্মা মেরে দিলেন চার।

মাশরাফি এই ম্যাচ নিয়ে খুব একটা কথা বলেন না। তবে অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, ম্যাচের মধ্যে মাশরাফির বোলিং ব্যবহার নিয়ে মাইক হাসি ও হজের সঙ্গে ম্যাককালামের মতবিরোধও হয়েছিল। হজ ও হাসির যুক্তি ছিল, মাশরাফি ডেথ ওভারের খুব ভালো বোলার নয় এবং সে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছে; ফলে তাকে মিডল ওভারে ইকোনমি করাতে শেষ করে দেওয়া উচিত। তা ম্যাককালাম না শুনে বরং শেষ ওভারের জন্য রেখেছিলেন।

আরেকটা বড় সংকট হলো, ম্যাককালামের নির্দেশনা। টান টান পরিস্থিতিতে মাশরাফির প্রধান অস্ত্র স্লোয়ার ও কাটার। কিন্তু ম্যাককালাম চাইলেন ইয়র্কার। মাশরাফির গতিতে ইয়র্কার কতটা কার্যকর, এটা ম্যাককালাম নিশ্চয়ই না বোঝা নন।

৬.

মাশরাফির আইপিএল অধ্যায় আমরা এখানেই শেষ করে দিতে চাই।

পরের বছর, ২০১০ সালেও মাশরাফি আইপিএল 'খেলতে' গিয়েছিলেন। এর মধ্যে অবশ্য মাশরাফির জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। টানা লম্বা ইনজুরি-পরবর্তী পুনর্বাসন কাটিয়ে ফিরেই মার্চের ৯ তারিখ আইপিএলে পুরোনো দল কেকেআরেই যোগ মুম্বাইতে রওনা হয়ে যান মাশরাফি।

এর আগে নতুন নিয়মনীতির কারণে মাশরাফিকে দলে রাখা না-রাখা নিয়ে একটু সংশয়ে ছিল কেকেআর। তবে চুক্তি অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত এ বছরই ডেকে পাঠানো হয় তাকে। ইতিমধ্যে টেস্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। ফলে দেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলার চেয়ে তাকে আইপিএলে কিছু ম্যাচ প্র্যাকটিসের সুযোগ করে দিতেই টিম ম্যানেজমেন্টও রাজি নয়। সেই অনুযায়ী ছুটি নিয়ে চলে যান তিনি মুম্বাই।

কিন্তু এই এক বছরে মাশরাফির জীবনে অনেক পরিবর্তন হলেও আইপিএল অভিজ্ঞতার কোনো পরিবর্তন হয়নি। এবার কোচ হয়েছেন ডেভ হোয়াটমোর; তারপরও সেই দলের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোই ভাগ্য হয়ে রইল। এ বছর নতুন করে চুক্তি করার কিছু ছিল না। তবে দলে খেলোয়াড়ের নাম নিবন্ধনের একটা বিষয় থাকে। মার্চ মাস পুরোটা দলের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলেও ২৩ নিবন্ধিত ক্রিকেটারের মধ্যে নাম ঢোকানো হয়নি মাশরাফির।

এ বছর আইপিএলে যাওয়ার একটা বড় আকর্ষণ ছিল মাশরাফির ওয়াসিমের কাছ থেকে কিছু টিপস নেওয়া। কিন্তু ওয়াসিম এবার টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার পরপরই

পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ায় সে সুযোগও পেলেন না।
ফলে নেটে কিছু বল ছোড়া আর এ-শহর ও-শহর ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আর কোনো অভিজ্ঞতা অন্তত নিয়ে ফিরতে পারলেন না আইপিএল থেকে।

[১] আমি নিজেই অবাক: মাশরাফি; সঞ্জয় সাহা পিয়াল (সমকাল; ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯)
[২] 'মনেই হয়নি শাহরুখ খান'; প্রথম আলো (২৩ মার্চ, ২০০৯)
[৩] আইপিএলে মাশরাফির অনিশ্চিত যাত্রা; প্রথম আলো (২ এপ্রিল, ২০০৯)

* ৪ কোটি টাকায় বিক্রি হওয়ার পর মাশরাফির সঙ্গে কথাবার্তা বলে এই লেখাটা তৈরি করা হয়েছিল।

দুই দিনের অধিনায়ক



১.

সাকিব মজা করে একবার বলছিলেন, 'ফিল্ডিং করার সময় আমি এক চোখ বলের দিকে, এক চোখ মাশরাফি ভাইয়ের দিকে রাখি। উনি পড়ে গেলেই তো আমার ক্যাপ্টেনসি করতে হবে।'

২০০৯ ও ২০১০ সালে দফায় দফায় এমন ঘটনা ঘটনায় সাকিবের এই রসিকতাটা আসলে খুব বাস্তব বলে মনে হতো। মাশরাফি অধিনায়ক হিসেবে সিরিজ শুরু করবেন, কিছুটা সময় খেলার পর ইনজুরিতে পড়বেন এবং সাকিব বাকিটা সিরিজ সামলাবেন; এই এক দুষ্টচক্রে পড়ে গিয়েছিল বাংলাদেশ।

অথচ বড় স্বপ্ন নিয়ে মাশরাফিকে অধিনায়ক করা হয়েছিল।

মাশরাফির যেমন বাহ্যিক চরিত্র, তাতে তাকে অধিনায়ক করাটা একটা দারুণ দ্বিধার ব্যাপার। পুরো দলকে যে মাশরাফি এক করে রাখতে পারবেন; এ ব্যাপারে তার শত্রুরও সন্দেহ নেই। তার চরম প্রতিদ্বন্দ্বীরাও একগাল হেসে বলেন, 'ড্রেসিংরুম সামলাতে মাশরাফি ভাইয়ের কোনো বিকল্প নেই।'

কিন্তু সমস্যা হলো, সে খ্যাপাটে মানুষ; দলকে কী নিয়মশৃঙ্খলা মানাতে পারবে? সমস্যা হলো, সে পাগলা মানুষ। মাঠে কি মেধাবী ক্রিকেটের পরিচয় দিতে পারবে? সে আপনভোলা মানুষ। বিশ্বের সামনে কি জাতীয় দলকে মুখের কথায় সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারবে?

কালক্রমে এই জাতি জানতে পেরেছে, এসব কাজেও মাশরাফি বিন মুর্তজার চেয়ে যোগ্য ক্রিকেটার এই দেশে আর তেমন জন্মায়নি। বলা চলে নিজের সেরা রূপগুলো মাশরাফি অধিনায়কত্বের জন্যই জমিয়ে রেখেছিলেন বলে সন্দেহ করার অবকাশ নেই।

তবে ক্রিকেট মেধার পরিচয় খানিকটা কাব ক্রিকেটে ও জাতীয় ক্রিকেট লিগে দিয়ে ফেলেছিলেন। খুলনা বিভাগীয় দল ও আবাহনীকে পরিচালনা করতে গিয়ে যেসব ক্রিকেটীয় ও অপ্রচলিত সিদ্ধান্ত নিয়ে সাফল্য পেয়েছে, তাতে তার ক্রিকেট মেধা সম্পর্কে নতুন করে জানতে পারা গেল।

ফলে ২০০৯ সালের জুলাই মাসে তাকে দেশের নতুন অধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা করে দিতে খুব একটা ভাবতে হয়নি। আমরা সে গল্পে যাব। তার আগে আরেকটু পেছন ফিরব।

২.

বাংলাদেশের ২০০৮ সালের শেষ ও ২০০৯ সালের শুরুতে ছিল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ঘরের মাটিতে দুটো টেস্ট। প্রথম টেস্টটি দলীয় অর্থে, দ্বিতীয় টেস্টটি মাশরাফির অর্থে রোমাঞ্চকর ছিল।

প্রথম টেস্টটায় বাংলাদেশ এক অতিলৌকিক জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল আশরাফুল, মুশফিক ও সাকিব আল হাসানের কল্যাণে।

প্রথম ইনিংসে শ্রীলঙ্কা সাকিবের ৭০ রানে ৫ উইকেটে শেষ হয়ে যায় ২৯৩ রানে। মাশরাফি ৬৭ রানে নেন ২ উইকেট। বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে করেছিল মাত্র ১৭৮ রান। শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেটে ৪০৫ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করে; মাশরাফি আরও দুটি উইকেট নেন।

বাংলাদেশের সামনে জয়ের জন্য লক্ষ্য দাঁড়ায় ৫২১ রান; যা বিশ্ব রেকর্ডের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু ৫ উইকেটে ২৯২ ও ৬ উইকেটে ৪০৩ রান তুলে বাংলাদেশ চোখ রাঙাচ্ছিল সে বিশ্ব রেকর্ডে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ইতিহাসের চেয়ে বড় হওয়া হয়নি।

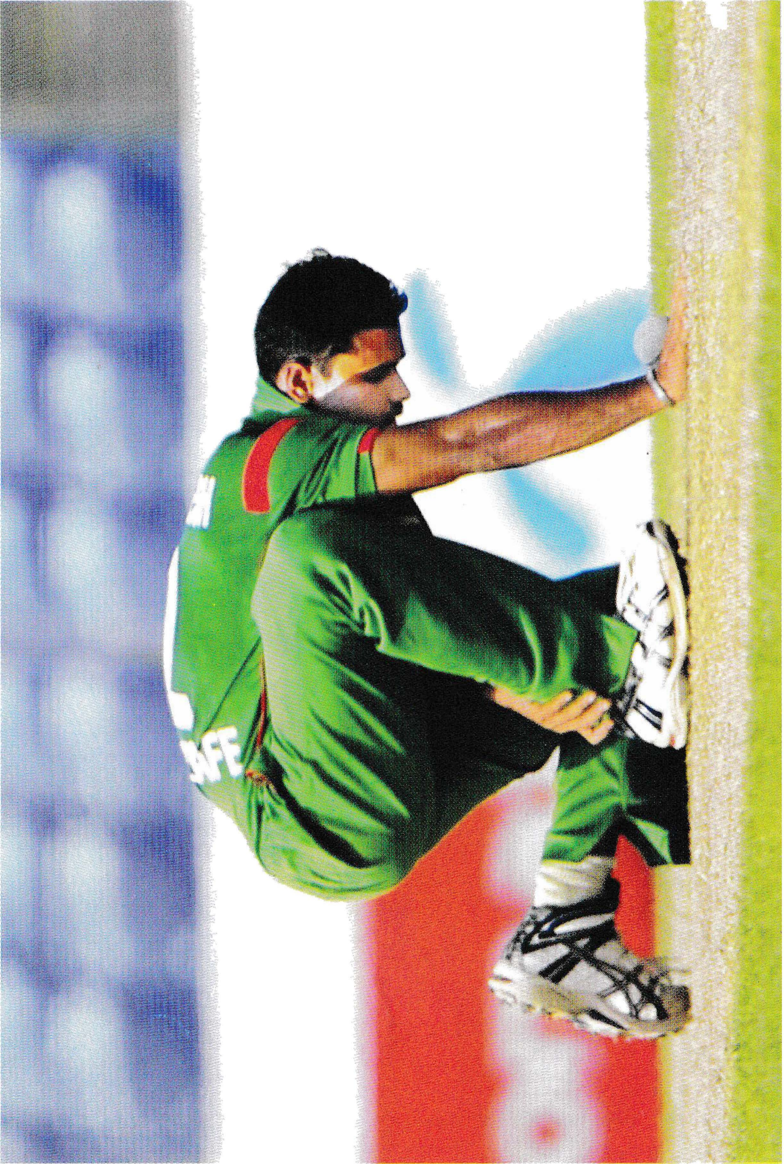
দ্বিতীয় ম্যাচে আগে ব্যাট করে শ্রীলঙ্কা করেছিল ৩৮৪ রান। মাশরাফি ৫৮ রানে নিয়েছিলেন ৩ উইকেট। এর মধ্যে নিজের প্রথম ২ ওভারেই ফিরিয়েছিলেন জয়াবর্ধনে ও সাঙ্গাকারার উইকেট। জবাবে ৯০ রানে ৬ ও ১৪৫ রানে ৯ উইকেট হারিয়ে ফেলে বাংলাদেশ। তারপরও শ্রীলঙ্কা পারল না বাংলাদেশকে ফলো অনে ফেলতে। কারণ নয় নম্বরে নেমে অনেক দিন পর একটা টেস্ট ফিফটি করলেন।



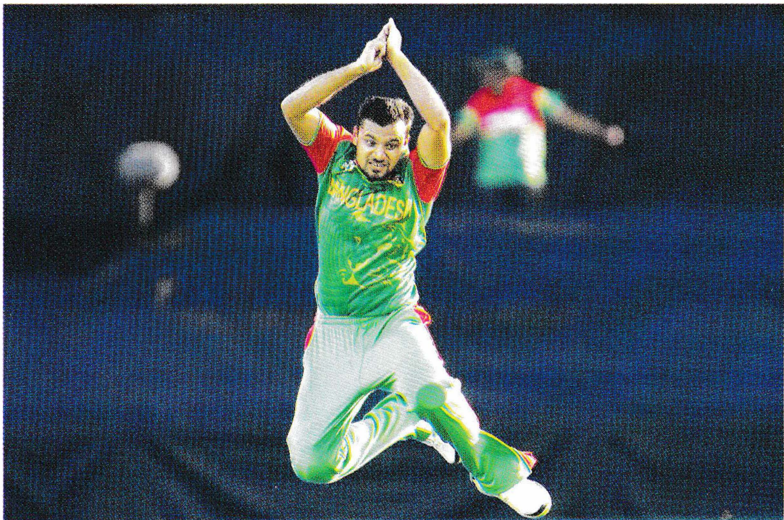
১২ ডিসেম্বর, ২০১০। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজ জয়
© শা. হ. টেংকু



২৬ নভেম্বর ২০০৯। চোটের পর প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে বোলিং
© বিসিবি



৫ অক্টোবর, ২০১০। আবার চোট। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ম্যাচেই। এই চোটই কার্যত শেষ করে দিল বিশ্বকাপ-স্বপ্ন © শা. হ. টেংকু



ব্র্যান্ড মাশরাফি; বিশ্বকাপ © সৌজন্য ছবি



স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে খেলতে নিউজিল্যান্ডে। পেলেন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সম্মাননাও © বিসিবি

২০০৭। ভারতের বিপক্ষে ওয়াসিম জাফরের উইকেট তুলে নেওয়ার পর © শা. হ. টেংকু

২০০৯। একটু শরীর গরম করে নেওয়া © শা. হ. টেংকু



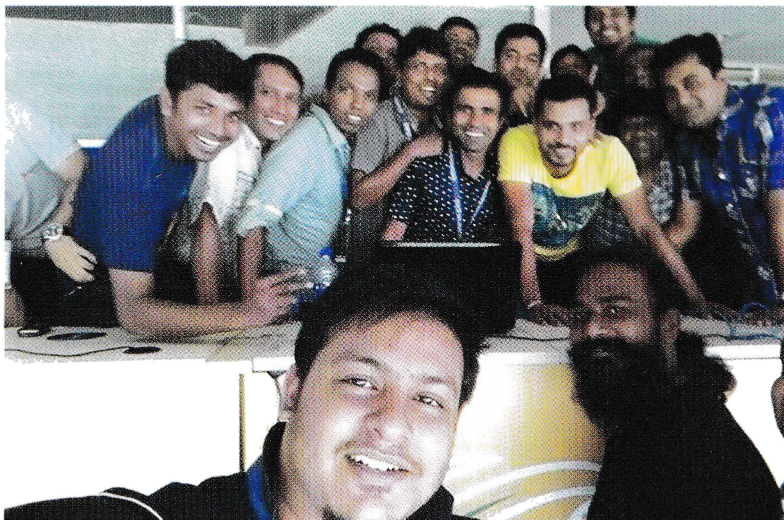


ম্যাশকিন!

বিশ্বকাপে একবার হয়ে গেল ভুবন মাতানো সেই উদ্‌যাপন © শা. হ. টেংকু



মোটরসাইকেল ট্রায়াল Ⓒ বিসিবি



একদিন, বৃষ্টিদিনে প্রেসবক্সে Ⓒ মিনহাজউদ্দিন খান



যে ছবির ক্যাপশন নেই © শা. হ. টেংকু

৮৯ বলে ৮টি চার ও ২টি ছক্কায় ৬৩ রানের ইনিংস খেলেছিলেন।
এই ম্যাচের বর্ণনায় ক্রিকইনফো খুব মজা করে লিখেছে :
সিনিয়র ব্যাটসম্যান হিসেবে অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে, স্ট্রাইক নিজের হাতে রেখে খেলেলেন মাশরাফি। অজন্তা মেন্ডিস ও মুত্তিয়া মুরালিধরন একটার পর একটা প্রলোভন তৈরি করা ডেলিভারি করছিলেন এবং মুর্তজার জন্য ডিপে ফিল্ডিং সাজানো হয়েছিল, মুর্তজা অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষের মতো সিঙ্গেল ফিরিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন এবং সঙ্গীকে ওভারে একটা অন্তত বল খেলতে দিচ্ছিলেন। [১]

দুজনে যখন একটু একটু করে ফলো অন এড়ানোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ম্যাচ জয়ের মতো আনন্দ পাচ্ছিল যেন স্টেডিয়াম। শেষ অবধি অবশ্য দ্বিতীয় ইনিংসে আরও একটা বিপর্যয় ৪৬৫ রানের পরাজয়ই দেখায় বাংলাদেশকে।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এই টেস্ট সিরিজের মধ্যে মাশরাফি ও শাহাদাত বেশ অনেকটা সময় ধরে পেস বোলিং নিয়ে কথা বলেছিলেন চামিন্ডা ভাসের সঙ্গে। সেই কথোপকথনের প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে মাশরাফি নিজেকে ফাস্ট বোলার থেকে মিডিয়াম পেসারে পরিণত করার কথা বলছিলেন :
আমি ইনজুরি থেকে ফিরে তো আসলে আগের সেই পেস করতে পারতাম না। মাঝে মাঝে ১৪০ মারিনি তা না। কিন্তু বুঝি যে, ওটা রোজ করা যাবে না। তারপর আমি ভাস আর ম্যাকগ্রার সাথে কথা বলেছিলাম। ওরা তো অনেক দিন ক্রিকেট খেলেছে। দুজনই বলেছিল, শরীরকে চাপ দিয়ে কিছু করবে না। জোর করে ১৪০ মেরে বল জায়গামতো রাখতে না পারলে তো লাভ নেই। আমিও শরীরকে বাড়তি চাপ দিই না। ভাস যে টিপসগুলো দিল কাজে লাগবে। [২]

৩.
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জয় এল ওয়ানডেতে; তবে তার আগেও অনেক নাটক।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এই টেস্ট সিরিজ শেষেই অনুষ্ঠিত হলো একটি ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্ট। যেখানে তৃতীয় দেশ হিসেবে এসে যুক্ত হলো জিম্বাবুয়ে। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচেই অঘটন–বাংলাদেশ ৩৮ রানে হারল জিম্বাবুয়ের কাছে। মাশরাফি ২ উইকেট নিয়েছিলেন জিম্বাবুয়ের ২০৫ রানের ইনিংসে।
জবাব দিতে নেমে ১৬৭ রানে অলআউট বাংলাদেশ!
এই পরাজয়ের ফলে বাংলাদেশের ফাইনাল খেলাই সংকটে পড়ে গেল। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গ্রুপের শেষ ম্যাচে শুধু জিতলেই চলবে না। ৩১ ওভারের ম্যাচে ২৪.৫ ওভারের মধ্যে টপকাতে হবে শ্রীলঙ্কার সংগ্রহ। ম্যাচের টোন সেট করে দেওয়ার একটা ব্যাপার থাকে। মাশরাফি সেটা করে দিলেন। নিজের পরপর দুই ওভারে এলবিডব্লু ও বোল্ড করে ফেরালেন উপুল থারাঙ্গা ও কুমার সাঙ্গাকারাকে। অন্য প্রান্তে সনাৎ জয়াসুরিয়া চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ৫৪ রান করার পর তাকেও ফেরালেন মাশরাফি। সব মিলিয়ে ৭ ওভার বল করে ১টি মেডেন নিলেন আর ২৫

রান ব্যয় করে ৩ উইকেট পেলেন। শ্রীলঙ্কা আটকে গেল ১৪৭ রানে।
সাকিবের অপরাজিত ৯২ রানে ভর করে ৫ উইকেটের জয় পেল এবং ফাইনালের টিকিট কাটল বাংলাদেশ।
সেই ২০০৯ সালের ১৬ জানুয়ারি বাংলাদেশ স্পর্শ করে ফেলতে যাচ্ছিল তাদের ইতিহাসের প্রথম ট্রফিটি। আগে ব্যাট করে মাত্র ১৫২ রান করতে পেরেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু ১৫২ রানকে আপনার ৫০০ রানের মতো বড় মনে হবে, যখন ৬ রানে প্রতিপক্ষের ৫ উইকেট তুলে নিতে পারবেন।
শ্রীলঙ্কা পুরো হকচকিয়ে গিয়েছিল। মূলত নাজমুল ও সাকিবের তোপে ৮ ওভারে ৬ রান তুলতে ৫ উইকেট হারাল তারা; মাশরাফিও নিলেন ১ উইকেট। মাশরাফি ১০ ওভারে রান ব্যয় করেছিলেন মাত্র ১৮টি!
তারপরও বাংলাদেশ হেরে গেল। এই হারের কথা আর কেউ না হোক, রুবেল হোসেন সারা জীবন মনে রাখবেন। শেষ ৫ ওভারে শ্রীলঙ্কার জয়ের জন্য দরকার ছিল ৩৫ রান; মানে ৩০ বলে ৩৫। ৪৬তম ওভারটিতে এসে রুবেল হোসেন এমন ম্যাচ কার্যত শেষ করে দিলেন ২০ রান ব্যয় করে। পরের ওভারে সাকিব আবারও ২ রান দিয়ে হিসাবটা একটু হাতে রেখেছিলেন। ১৮ বলে ১৩ রান চাই। ৪৮তম ওভারে রুবেল আবারও ১৩ রান দিয়ে সব আশা শেষ করে দেন।
এই প্রবল পিটুনিটা রুবেলকে কে দিয়েছিলেন মনে আছে? ১৬ বলে ৩৩ রানের ইনিংস খেলেছিলেন মুত্তিয়া মুরালিধরন!

৩.

ত্রিদেশীয় সিরিজটি খেলে শ্রীলঙ্কা ফিরে গেলেও জিম্বাবুয়ে থেকে গেল আরও তিনটি ওয়ানডে খেলার জন্য। সে সিরিজের শুরু হলো বাংলাদেশের ২ উইকেটে পরাজয়ে।
মাত্র ১২৫ রানের লক্ষ্য দাঁড় করাতে পেরেছিল বাংলাদেশ। তার মধ্যেই মাশরাফি ও সাকিব জয়ের আশা দেখাচ্ছিলেন। দুজন তিনটি করে উইকেট নিয়ে ৪৪ রানে জিম্বাবুয়ের ৬ উইকেট ফেলে দিয়েছিলেন। তারপরও শেষ রক্ষা হয়নি। মাশরাফির বোলিং বিশ্লেষণ ছিল ১০-৩-২১-৩।
দ্বিতীয় ম্যাচে ১০ ওভারে ২২ রান দিয়ে নিয়েছিলেন ২ উইকেট। বাংলাদেশ ৬ উইকেটে জিতেছিল। আর শেষ ওয়ানডেতে মাশরাফি ২৬ রানে ৩ উইকেট; বাংলাদেশ জিতল আবারও ৬ উইকেটে। সিরিজে মাশরাফি ৩ ম্যাচে ৮ উইকেট।
লক্ষ করুন–এটা পরবর্তী এক বছরের মধ্যে মাশরাফির শেষ ওয়ানডে।

৪.

এর মাঝে মাশরাফি পুরোনো শিবির আবাহনীতে ফিরে গেলেন; তখনকার ঘরোয়া ক্রিকেটের রেকর্ড পরিমাণ টাকা পেলেন।
একেবারে বছরের শুভসূচনাই হলো দেশে নতুন এক ঘরোয়া টুর্নামেন্ট–ঢাকা

প্রিমিয়ার লিগ টি-টোয়েন্টি দিয়ে। টুর্নামেন্টে মাশরাফির দল আবাহনী চতুর্থ হয়েছিল।

আবাহনীর হয়ে এ বছর ক্যারিয়ার-সর্বোচ্চ ১৩টি ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছিলেন। এর মধ্যে ৫টি ম্যাচে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছিলেন; ৩টি ফিফটি ছিল। বিকেএসপির বিপক্ষে একটি এবং মোহামেডান ও পারটেক্সের বিপক্ষে সুপার লিগে পরপর দুই ম্যাচে ফিফটি করেছিলেন।

৫.

বাংলাদেশের পরবর্তী মিশন ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

এর আগেই বোর্ড দীর্ঘ তর্কবিতর্কের পর আশরাফুলকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর পর্যন্ত টানা অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে। যদিও আশরাফুলের ব্যাটিং ও দুর্বল ক্যাপ্টেনসি নিয়ে তীব্র ভিন্নমত ছিল। কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত এক বোর্ড সভায় ঠিক হয়, জুলাই-আগস্ট পর্যন্ত আশরাফুলই কাজ চালাবেন। এই সভাতেই মাশরাফি ও মুশফিকের নাম ওঠে জোরেশোরে।

মাশরাফিকে আরেকটু সময় দিতে চায় বোর্ড। আর মুশফিক যুব পর্যায়ের সফল অধিনায়ক হলেও তার বয়স কম বিধায় সরে আসে এই চিন্তা থেকে। সাংবাদিকদের তরফে জানতে চাওয়া হয়েছিল, সাকিব বিবেচনায় আছেন কি না। বোর্ড জানিয়ে দেয়, দারুণ ফর্মে থাকা সাকিবকে এখনই বিরক্ত করার কারণ দেখছেন না তারা।

ফলে পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আশরাফুল ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অধিনায়কত্ব করলেন।

মাশরাফি তখন মাত্রই আইপিএলের সেই বিধ্বস্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছেন। তিনি ঢাকায় নেমেই বললেন, এখন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভালো কিছু করা ছাড়া তার আর কিছু করার নেই।

তার কোচ জেমি সিডন্স ও অধিনায়ক আশরাফুল জোর সমর্থন জানিয়েছিলেন, আইপিএলের বাজে অভিজ্ঞতা কাটিয়ে মাশরাফির এই টুর্নামেন্টেই ফিরে আসার ব্যাপারে।

তবে না মাশরাফি, না বাংলাদেশ; ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ কারো জন্যই স্মরণীয় কিছু হয়ে থাকেনি।

নিদেনপক্ষে গ্রুপ পর্ব বাংলাদেশ পার হবে বলেই আশা ছিল। গ্রুপে আয়ারল্যান্ড থাকায় সে আশাটা তৈরি হয়েছিল। ভারতের কাছে ২৫ রানের হার তো কষ্টের ছিল। কিন্তু আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ৬ উইকেটের হার রীতিমতো ক্ষোভ ও বিস্ময় তৈরি করে দিল। ওই হারের ধরন নিয়ে প্রশ্নও তৈরি হয়েছিল।

১৩৭ রান করেছিল বাংলাদেশ। তাও আবার নয় নম্বরে নামা মাশরাফির ১৬ বলে ২টি ছক্কা ও ১টি চারে সাজানো ৩৩ রান ছিল দলের সর্বোচ্চ স্কোর। বল হাতেও

২টি উইকেট নিয়েছিলেন মাশরাফি। তারপরও বাংলাদেশ দল ৬ উইকেটে হেরে বিদায় নিল বিশ্বকাপ থেকে।

৬.

২৩ জুন, ২০০৯।

মাশরাফির ক্রিকেট-জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোর একটা।

কয়েক দিন আগে থেকেই টের পেল অসুস্থ ব্যাপারটা। পত্রপত্রিকায় খুব জোরেশোরে আলোচনাটা আসছিল। তিনি খুব একটা পাত্তা দেননি। সেদিনও বলেছেন, আজও বলেন–জীবনেও অধিনায়কত্ব ব্যাপারটাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে মনে করেননি।

তার কাছে অধিনায়কত্ব একটা দায়িত্ব; ক্রিকেট খেলার পাশাপাশি যেটা করতে হয়। কিন্তু দায়িত্ব চাওয়া বা সেটার স্বপ্ন দেখার কিছু নেই। অধিনায়কত্বকে কোনো 'প্রমোশন' ভাবতে রাজি নন। ফলে আশরাফুলের অধিনায়কত্ব চলে যাচ্ছে বা তাকে অধিনায়ক করা হতে পারে; এমন আলোচনায় কখনোই গুরুত্ব দিতে চাননি মাশরাফি।

তারপরও এদিন বোর্ড সভা শেষে তাকে যখন ফোন দেওয়া হলো, একটু হলেও শিহরিত হয়েছিলেন। আজ থেকে বাংলাদেশ জাতীয় দলকে সামলাতে হবে তার!

তাৎক্ষণিক একটা ব্যাপার খুব করে মনে হয়েছিল, এটা অনেক বড় দায়িত্ব; অনেক বড়। তিনি জানেন, বাংলাদেশের অধিনায়কত্ব করা কত কঠিন। তার চেয়েও বড় কথা একজন অধিনায়কের ওপর পুরো দলটার ভাবমূর্তি নির্ভর করে। এই গুরুভার তার মাথা শুধু আরও নত করে দিয়েছিল।

সিদ্ধান্তটা নিয়েছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ইংল্যান্ডে বসে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ উপলক্ষে বোর্ড সভাপতিসহ নীতিনির্ধারক বেশ কয়েকজন কোচ তখন ইংল্যান্ডে। যদিও বাংলাদেশ দল ততক্ষণে হেরে ফিরে এসেছে। ইংল্যান্ডে বসেই দেশে থাকা পরিচালকদের সঙ্গে আলাপ করে বোর্ড সিদ্ধান্ত নিল, মোহাম্মদ আশরাফুলকে সরিয়ে জাতীয় দলের নতুন অধিনায়ক করা হবে মাশরাাফি বিন মুর্তজাকে।

বোর্ডের পক্ষ থেকে সংবাদমাধ্যমে জানানো হয় আসছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবুয়ে সফরে কমপক্ষে এই দায়িত্ব পালন করবেন মাশরাফি বিন মুর্তজা। তার ডেপুটি হিসেবে কাজ করবেন, তখনই বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার হয়ে যাওয়া সাকিব আল হাসান।

৭.

বোর্ডের তরফে সংবাদমাধ্যমে আশরাফুলকে অধিনায়কত্ব থেকে সরানোর ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে কথা বলেছিলেন বিসিবির মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস।

তিনি আশরাফুলকে তার দায়িত্ব পালনের সময়ের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে

বলেছিলেন, তারা শুধু আশরাফুলের ওপর থেকে বাড়তি চাপ কমাতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন :

এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্য, আশরাফুলের কাঁধ থেকে বোঝা কমিয়ে দেওয়া, যাতে সে তার স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারে। আমরা সবাই তার যোগ্যতা সম্পর্কে জানি এবং সে ব্যাটসম্যান হিসেবে কী করতে পারে, সেটাও জানি। আমরা বিশ্বাস করি যে, অধিনায়কত্বের বাড়তি চাপ ছাড়া তার ব্যাটিং আরও বিকশিত হবে এবং সে দলের জন্য আরও ভূমিকা রাখতে পারবে। [৩]

কিন্তু এই সরল ব্যাখ্যায় একমত ছিল না অন্তত দেশি সংবাদমাধ্যমগুলো। আশরাফুলকে সরিয়ে দেওয়ার আগের দিনই এমন ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে সেই অনুমান করে একটি প্রতিবেদন লিখেছিলেন তারেক মাহ্মুদ। তিনি দাবি করেছেন যে, আশরাফুলের বিপক্ষে ক্রিকেটের পারফরম্যান্স ছাড়াও আচরণগত সমস্যার অভিযোগও ছিল :

তাঁর অধিনায়কত্ব, ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স, এমনকি মাঠের বাইরের আচরণ–কোনোটাই সন্তোষজনক মনে হচ্ছে না পরিচালকদের কাছে। আশরাফুলের অধিনায়কত্বকে বরং টিম স্পিরিটের জন্য ক্ষতিকর মনে করছেন তারা। অভিযোগ আছে, বিশ্বকাপ চলাকালে মাঠের বাইরে দল থেকে একরকম বিচ্ছিন্নই থাকতেন আশরাফুল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বোর্ড কর্মকর্তা বলেছেন, আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচের আগের রাতে আশরাফুলসহ বাংলাদেশ দলের সাত ক্রিকেটার হোটেলে ফিরেছেন রাত ১১টার পর। [৪]

এই একই প্রতিবেদনের আশরাফুলের ব্যর্থতা ও দলকে একত্র করে রাখতে না পারায় সাবেক ক্রিকেটার ও বোর্ড পরিচালক গাজী আশরাফ হোসেন লিপুর মন্তব্যও প্রকাশ করা হয়।

মোদ্দাকথা, একটা ব্যাপার খুব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল যে, সে সময় বোর্ড ও দেশের ক্রিকেট নীতিনির্ধারকেরা অনুভব করছেন যে, দলকে একত্র করা ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনাটাই নতুন অধিনায়কের প্রধান কাজ হবে।

যদিও মাশরাফি সংবাদমাধ্যমে পরদিন যে প্রতিক্রিয়া দিয়েছিল, তাতে তিনি দলে কোনোরকম বিশৃঙ্খলা আছে বলেই মানতে রাজি ছিলেন না। তিনি বলছিলেন, দল ভালো অবস্থায়ই আছে। কারো আচরণগত সমস্যা আছে বলে তিনি মনে করেন না। অধিনায়কত্ব পাওয়ার পরদিন তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে করা প্রথম আলোর প্রতিবেদনে বলা হচ্ছিল

ইংল্যান্ড সফরে দলের শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, অভিযোগ আছে খেলোয়াড়দের আচরণ নিয়েও। প্রসঙ্গটা উঠতেই ঢাল হলেন নতুন অধিনায়ক, 'আমাদের সব খেলোয়াড়ের আচরণই ভালো। এখানে কোনো সমস্যা আছে বলে মনে করি না। সবাই জানে এ পর্যায়ের ক্রিকেট খেললে কীভাবে চলতে হবে।' [৫]

অধিনায়ক হলেই পুরো দলকে আগলানোর এই যে চেষ্টা করলেন, তাতেই বলা

যেতে পারে আমরা মাশরাফির প্রথম অধিনায়ক চরিত্রটা দেখতে পেলাম। তার আরেকটি ভূমিকা স্মরণ করাটা জরুরি।

আশরাফুলকে নিয়ে যত অভিযোগই থাক। একদিকে আশরাফুল তার বাল্যবন্ধু, অন্যদিকে বাংলাদেশের সর্বকালের সেরা প্রতিভাদের একজন। এমন একজন খেলোয়াড়ের হাত থেকে অধিনায়কত্ব নেওয়ার পর তাকে সামলানোটা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, মাশরাফি বলছেন :

'ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আমি বলেছিলাম, বাংলাদেশের ক্রিকেটে আশরাফুলের অবস্থান অনেক ওপরে। অনেক বড় বড় ম্যাচ সে আমাদের জিতিয়েছে। সব ধরনের ক্রিকেটে তাকে আমাদের দরকার।' [৬]

এই প্রশ্নটা আরও সরাসরি এসেছিল। আমরা দেখতে পাচ্ছি, ক্রিকইনফোর প্রতিবেদনের একেবারে আশরাফুলকে কীভাবে সামলাবে, সে প্রশ্নই চলে এসেছে। এই প্রসঙ্গে মাশরাফির কথা যেন আজকের মতোই পরিণত :

'আমার মনে হয় না, আশরাফুলের সঙ্গে কাজ করতে আমার কোনো সমস্যা হবে। সে তো আমার জন্য খেলবে না; সে দেশের জন্য খেলবে। সে অপরিণত ছেলে না, একজন পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে সে খুব ভালো করেই জানে, তার কাছ থেকে কী আশা করা হয়।' [৭]

শুধু আশরাফুলকে সামলালে চলবে না; পুরো একটা জাতীয় দল সামলাতে হবে। মাশরাফির তখনকার কথাবার্তাতেই পরিষ্কার ছিল, তিনি সেটা করতে পুরোপুরি প্রস্তুত।

অধিনায়ককে কী করতে হবে, সেটা তিনি জানতেন। সেই সময় বলছিলেন এক সাক্ষাৎকারে :

আমি দেখতে চাই, প্রত্যেক খেলোয়াড় কষ্ট করছে। না পারলে আলাদা কথা, কিন্তু চেষ্টা না করে পারছে না, সেটা দেখতে খারাপ লাগে। আমি চাই, সবাই কষ্ট করুক, চেষ্টা করুক। প্রত্যেক খেলোয়াড় যেন আত্মবিশ্বাস নিয়ে থাকে। তারা যেন চেষ্টা করে। প্রত্যেকটা পরিস্থিতিতে...হারার শেষ বলে, জেতার শেষ বলেও। যে খেলোয়াড়দের ভালো সামলাতে পারে, সে-ই ভালো অধিনায়ক। খেলোয়াড়েরা যেন অধিনায়কের ওপর খুশি থাকে। ছোট-বড় কোনো খেলোয়াড়ই যেন মনে না করে যে অধিনায়ক তাকে পছন্দ করে না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, অধিনায়ককে পারফর্ম করতে হবে। নিজে ঠিক না হলে অন্যকে ঠিক করা যায় না। [৮]

এই সাক্ষাৎকারটি আজও মাশরাফির জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যময় বলে বিবেচিত হতে পারে। এখানেই মাশরাফি বলছিলেন, ছোটবেলায় আমগাছতলার ক্লাবে বসে কীভাবে জাতীয় দলে খেলার স্বপ্ন দেখতেন। আর সেই স্বপ্নের দলে এখন তিনি অধিনায়ক!

৮.

একজনের পরনে মেরুন রঙের শার্ট, অন্যজনের পরনে একটা সাদা শার্ট।
ফরমাল পোশাকে ঝলমল করতে থাকা মুখে বিসিবি অফিস থেকে বের হলেন দুজনই। বিসিবির আয়োজিত আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে দুজনকে দেখে ক্রিকেটারের চেয়ে পর্দার নায়ক বেশি বলেই মনে হচ্ছিল।
নায়কই বটে–বাংলাদেশের ক্রিকেটের দায়িত্ব নিয়ে সেদিন সংবাদমাধ্যমের সামনে এসেছিলেন অধিনায়ক মাশরাফি ও সহ-অধিনায়ক সাকিব। মাশরাফি একটার পর একটা ভারী ভারী প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন এবং পাশে বসে সাকিব হাসছেন; এটা অনেক দিন মনে রাখার মতো দৃশ্যই ছিল।
মাশরাফি তার নতুন ভূমিকায় কী করতে চান বা না চান, সেটা নানাভাবেই বললেন। যদিও একটা ধারণা ছিল, সাকিব এখনই সহ-অধিনায়ক হতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু সাকিব সেদিন বলেছিলেন, বেশ কিছুদিন ধরেই দলে যে কোর গ্রুপ দল পরিচালনার বিভিন্ন ব্যাপারে একত্র হয়ে থাকেন, তিনি সেই গ্রুপে ছিলেন। ফলে এখন মাশরাফির সঙ্গে এসব আলোচনায় অংশ নিতে প্রস্তুত আছেন তিনি।
মাশরাফি সেদিনও বলেছিলেন, তার পরিকল্পনা হলো, যত দ্রুত সম্ভব সাকিবকে অধিনায়ক হিসেবে গড়ে তোলা। তিনি চান, সাধারণ সহ-অধিনায়ক যেমন থাকে, তেমন নয় সাকিব যেন নিজেই দায়িত্ব নেওয়ার মতো হয়ে ওঠে দ্রুত।
কেন বলেছিলেন মাশরাফি এমন কথা? ভেতর থেকে কেউ ভবিষ্যৎ দেখাচ্ছিল তাকে?
সাকিব তখনই হাসছেন পাশে বসে।
মাশরাফি-সাকিব এই রসায়নটা পরবর্তীকালে বাংলাদেশে ইতিহাস তৈরি করবে। এই জুটির কাছ থেকে আমরা আরও অনেক পরে যেমন অসামান্য রোমাঞ্চ উপহার পাব, দুজনের দারুণ সম্পর্ক দেখতে পাব; তেমনই কিছু অন্ধকার অধ্যায়ও দেখতে পাব দুজনের সম্পর্কের।
তবে আপাতত স্বস্তি এই যে, দুজনের জুটিটা প্রথম দিন সংবাদ সম্মেলনেই জমে গেল বলে মনে হয়েছিল। তবে অস্বস্তি থেকে গিয়েছিল অন্য জায়গায়।
বিসিবির প্রকৃত পরিকল্পনা ছিল দলের খোলনলচে বদলে ফেলা। সে অনুযায়ী অধিনায়ক পরিবর্তন হলো। কোচ তো রাতারাতি বদলে ফেলা সম্ভব না। তাই কোচের কাজে নজরদারি বলুন, আর দলে সমন্বয় করার উদ্দেশ্যে বলুন–জাতীয় দলে যুক্ত করে দেওয়া হলো সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাহমুদ সুজনকে।
কোচ জেমি সিডন্স দেশে ফেরার পর একটা সংকট তৈরি হলো। তিনি প্রশ্ন তুললেন, সহকারী কোচ হিসেবে খালেদ মাহমুদের ভূমিকাটা কী হবে। ভেতরে ভেতরে তৈরি হওয়া এই প্রশ্ন বোর্ড মেটানোর চেষ্টা করল ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের আগে জাতীয় দলের সবাইকে নিয়ে হয়ে যাওয়া এক নৈশভোজে। সেখানে বিসিবির পক্ষে দুজন পরিচালক সিডন্সকে নিশ্চিত করেন যে, তার কাজে মাহমুদ খবরদারি করবেন না। অনুমান করা

হলো, এই ব্যাখ্যায় নতুন এসব রদবদল মেনে নিলেন সিডন্স।

অধিনায়ক হিসেবে মাশরাফিকে তিনি আগেই মেনে নিয়েছেন। মাশরাফিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সিডন্স বললেন, অধিনায়ক হিসেবে এই ফাস্ট বোলারকে আগেই মেনে নিয়েছেন।

তবে একটা সার কথা বলেছিলেন সিডন্স। মাশরাফির কাজটা যে অধিনায়ক হিসেবে কঠিন হতে যাচ্ছে, সেটা উল্লেখ করে দিয়েছিলেন প্রথম দিনই :

'অধিনায়কত্ব বা কোচিং করানোর জন্য বাংলাদেশ একটা কঠিন দল। অধিনায়কের হাতে আফ্রিদির মতো বোলার নেই যে, চাইলেই বল ছুড়ে দিতে পারবেন। তার হাতে জয়াসুরিয়ার মতো ব্যাটসম্যান নেই, যে কিনা অমন করে ব্যাটিং শুরু করে দেবে। শেষ ৪ ওভার বল করার জন্য কোনো মালিঙ্গা নেই। তারপরও আমাদের হাতে যা সম্পদ আছে, তাই নিয়ে ভালো করতে হবে। আমার ধারণা, এই ওয়েস্ট ইন্ডিজেই আমাদের সময়টা আসতে যাচ্ছে। [৯]

একমাত্র নিয়তিই তখন জানে, ওয়েস্ট ইন্ডিজে মাশরাফির কী সময় আসতে যাচ্ছে।

মাশরাফির সর্বশেষ টেস্ট

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
১ম টেস্ট
ভেন্যু : কিংসটাউন, সেন্ট ভিনসেন্ট
টস : বাংলাদেশ (ব্যাটিং)
ফল বাংলাদেশ ৯৫ রানে জয়ী

বাংলাদেশ : ১ম ইনিংস

ব্যাটসম্যান	রান	বল	৪	৬
তামিম ক রেইফার ব বেস্ট	১৪	৬৬	১	
ইমরুল এলবিডব্লু স্যামি	৩৩	৬৬	৪	
জুনায়েদ ক ডাওলিন ব বার্নার্ড	২৭	৭০	৪	
রকিবুল ক স্যামি ব বার্নার্ড	১৪	৩৮	২	
আশরাফুল ক ওয়ালটন ব বেস্ট	৬	৩০	১	
সাকিব ক রিচার্ড ব রোচ	১৭	২৩	৩	
মুশফিক রানআউট	৩৬	৮১	৪	০
মাহমুদউল্লাহ ক ফিলিপস ব রোচ	৯	২৮	২	
মাশরাফি ক ওয়ালটন ব রোচ	৩৯	৫২	২	২
শাহাদাত ক ওয়ালটন ব অস্টিন	৩৩	৪৮	৪	১
রুবেল অপরাজিত	৩	৩০		০
অতিরিক্ত (বা ২, লেবা ২, ও ১, নো ২)	৭			
মোট (৮৮.২ ওভারে, অলআউট)	২৩৮			

বোলিং : বেস্ট ১৭-৪-৫৮-২, রোচ ২৩-১১-৪৬-৩, স্যামি ১৯-৭-৩৮-১, বার্নার্ড ১১-২-৩০-২, অস্টিন ১৩.২-৫-৩৫-১, মিলার ৫-১-২৭-০।

৯.
সময়টা মাশরাফির জন্য খুব কঠিন ছিল।

একদিকে প্রথমবারের মতো জাতীয় দলের অধিনায়কত্ব করতে যাওয়া; তাও আবার দল নিয়ে ক্রিকেট-স্বর্গ ওয়েস্ট ইন্ডিজেই যাওয়া। গোপন কথা হলো, ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারির একটা দল সামনে পড়বে টেস্ট ও ওয়ানডে সিরিজে। এমন অবস্থায় পৃথিবীর কোন ক্রিকেটারটার মন ফুরফুর করে ওঠে না!

মাশরাফি ফুরফুরে হতে পারছিলেন না ভেতর থেকে। বাড়িতে খুব প্রিয় দুজন মানুষকে অসুস্থ রেখে এসেছেন। জীবনে এই একমাত্র নয়। অন্তত তিনবার নিকটজনকে হাসপাতালে রেখেই দল নিয়ে দেশের বাইরে গেছেন অধিনায়ক মাশরাফি।

মাশরাফি বলেন—প্রতিবারই প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল, দলের সবাইকে মনের ভেতরের এই গুমোট ভাবটা টের পেতে না দেওয়া। সহ-অধিনায়ক সাকিব আল হাসানের সঙ্গে সব সময় এসব ব্যাপার শেয়ার করেন। এর বাইরে মাহমুদউল্লাহ হয়তো জানেন। তবে চেষ্টা করেন, বেশির ভাগ খেলোয়াড় যেন দেখে তাদের মাশরাফি ভাই আগের মতোই হাসি-ঠাট্টায় মাতিয়ে রাখছে সবাইকে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ১ম ইনিংস

ব্যাটসম্যান	রান	বল	৪	৬
রিচার্ড এলবিডব্লু সাকিব	১৩	২৪		১
ফিলিপস ক রকিবুল ব রুবেল	৯৪	১৭৭	৭	০
অস্টিন ক ইমরুল ব রুবেল	১৭	৮৫	১	০
ডাওলিন এলবিডব্লু সাকিব	২২	৪৫	৪	০
রেইফার ক সাকিব ব মাহমুদউল্লাহ	২৫	৫৯	২	০
বার্নার্ড ক মেহরাব ব শাহাদাত	৫৩	৮৯	৫	১
ওয়ালটন ক সাকিব ব মাহমুদউল্লাহ		১		০
স্যামি ব মাহমুদউল্লাহ	৪৮	৬১	৭	০
মিলার ক মুশফিক ব রুবেল		৩		০
রোচ ক মেহরাব ব আশরাফুল	৬	৩৬	১	০
বেস্ট অপরাজিত	১	১০		০
অতিরিক্ত (বা ৬, লেবা ৩, ও ২, নো ১৯)	২৮			
মোট (৯৫.১ ওভারে, অলআউট)	৩০৭			

বোলিং : মাশরাফি ৬.৩-০-২৬-০, শাহাদাত ১৩-২-৪৮-১, সাকিব ৩৫-১০-৭৬-২, রুবেল ১৫-১-৭৬-৩, মাহমুদউল্লাহ ১৯.৪-২-৫৯-৩, আশরাফুল ৬-০-১৫-১।

সেবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে কাজটা কঠিন ছিল।

মাকে অসুস্থ দেখে এসেছেন। হাসপাতালে রেখে এসেছেন স্ত্রী সুমনা হক সুমীকে। তিনি রওনা দেওয়ার সময় হাতটা ধরে কেঁদেছে। তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে চলে এসেছেন। ভেজা চোখ কাউকে দেখতে দিতে হয় না!

ব্রিজটাউনে এসেও সেটা দেখতে দেননি কাউকে।

মোটামুটি ভালোয় ভালোয় তিন দিনের প্রস্তুতি ম্যাচটা শেষ হলো। যদিও ব্যাটিং পারফরম্যান্স নিয়ে দুশ্চিন্তা থেকেই গেল। তবে বোলাররা খুব খারাপ করলেন না। একটা ব্যাপার স্মরণ করা যেতে পারে। প্রস্তুতি ম্যাচে প্রতিপক্ষ বোলার কেমার

রোচ অনেক বাউন্সার দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন তাকে।

সেখানে ছিলেন প্রথম আলোর ক্রীড়া সম্পাদক উৎপল শুভ্র। সেকালের ক্যারিবীয় ফাস্ট বোলারদের 'মাথা ভেঙে দেওয়া'র নীতির গল্প করছিলেন তিনি মাশরাফিকে। বিশেষ করে লোয়ার অর্ডার ব্যাটসম্যানদের সঙ্গে তারা এমন করত। মাশরাফি শুনে হেসে বলেছিলেন :

'ওয়েস্ট ইন্ডিজ এমন করত, এটা আমি জানতাম না। আমাকে যদি সে কারণেই টার্গেট করে, তা হলে আমি বরং খুশি। আশরাফুল-সাকিবরা তো বেঁচে যাবে। ফাস্ট বোলিং খেলতে আমার একটু সমস্যার কথা সবাই জানে। তবে এখানে কিন্তু আমি এক পা-ও পিছাইনি। আমি নিজে সাহস না দেখালে অন্যদের বলব কীভাবে?' [১০]

সাধে কি 'বাই বর্ন ক্যাপ্টেন' বলে এই লোকটাকে!

বাংলাদেশ : ২য় ইনিংস

ব্যাটসম্যান	রান	বল	৪	৬
তামিম ক ডাওলিন ব বার্নার্ড	১২৮	২৪৩	১৭	০
ইমরুল ক রোচ ব অস্টিন	২৪	৯৬	১	
জুনায়েদ ক রিচার্ড ব স্যামি	৭৮	১৬০	৪	
রকিবুল ব স্যামি	১৮	৩৫	২	০
আশরাফুল এলবিডব্লু রোচ	৩	৪		
সাকিব ক অস্টিন ব স্যামি	৩০	৪৮	২	০
মুশফিক ব রোচ	৩৭	৯৭	৩	০
মাহমুদউল্লাহ এলবিডব্লু রোচ	৮	২৯	১	
মাশরাফি ক রোচ ব স্যামি		৭		
শাহাদাত অপরাজিত		৫		
রুবেল এলবিডব্লু স্যামি	১	৪		
অতিরিক্ত (লেবা ৯, ও ২, নো ৭)	১৮			
মোট (১২০.১ ওভারে, অলআউট)	৩৪৫			

বোলিং : রোচ ২৬-৪-৬৭-৩, বেস্ট ১৩-৩-৪৯-০
অস্টিন ৩০-৪-৭৮-১, স্যামি ৩০.১-৬-৭০-৫
মিলার ১৭-৪-৪০-০, বার্নার্ড ৪-০-৩২-১।

১০.

দেশ ছাড়ার আগে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন–অধিনায়ককে পারফর্ম করতে হবে।
কিংসটাউন টেস্টে পারফর্ম করেছিলেন তিনি। ব্যাটিং করার সুযোগ এসেছিল প্রথম ইনিংসে। তাতে দলের সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেছিলেন। বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে চান।

বাংলাদেশ শেষবেলায় অলআউট হয়ে গেল। সামনে থেকে নেতৃত্ব বলতে, বল হাতে এবং ফিল্ডিং ও বোলিং পরিবর্তনে ক্যারিশমা দেখানোর খুব একটা সুযোগ পেলেন না। সেদিন আর ৭ ওভার খেলা হতেই দিনের আলো শেষ। পরের দিনের ঘটনা।

সেদিনও সেন্ট ভিনসেন্টে আর দশটা দিনের মতোই সূর্য উঠেছিল। আর দশটা

দিনের মতো শুরু হয়েছিল টেস্ট ক্রিকেট। দিনের সপ্তম ওভারের খেলা চলছে। ওভারের চতুর্থ বলটা করতে ছুটে এলেন; তখনই সেই মট করে শব্দটা।

হাঁটুটা পরিষ্কার ঘুরে গেল। মোচড় খেয়ে গেল ডান হাঁটু। এই হাঁটুতেই এর মধ্যে তিনবার অস্ত্রোপচার করা হয়ে গেছে। সইতে পারলেন না মাশরাফি। পড়ে গেলেন মাটিতে। পড়ে যাওয়ামাত্রই বুঝতে পারলেন–কী হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে। হাসপাতালের অবস্থা আবার যাচ্ছেতাই। সেন্ট ভিনসেন্টের কোনো হাসপাতালেই এমআরআই স্ক্যান করানোর ব্যবস্থা নেই। তাই প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে ফিরে আসলেন। সেখানে দলের চিকিৎসক, ফিজিও, এমনকি ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফিজিও এসে দেখে গেলেন। সবাই বললেন, খুব দুশ্চিন্তার কিছু নেই। লিগামেন্ট ছেঁড়েনি।

ম্যানেজার খালেদ মাহমুদ রসিকতা করে বলছিলেন, 'তোর তো ছেঁড়ার মতো লিগামেন্ট আর নেই। ছিঁড়বে কী?'

মাশরাফি হাসেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ২য় ইনিংস

ব্যাটসম্যান	রান	বল	৪	৬
রিচার্ড রানআউট	১৪	৯	৩	
ফিলিপস এলবিডব্লু সাকিব	১৪	২০	২	০
ডাওলিন ক ইমরুল ব মাহমুদউল্লাহ	১৯	৭৩	২	০
রেইফার এলবিডব্লু মাহমুদউল্লাহ	১৯	৪৩	২	০
বার্নার্ড অপরাজিত	৫২	১৩৪	৫	০
ওয়ালটন এলবিডব্লু মাহমুদউল্লাহ	১০	৯		
স্যামি ক শাহাদাত ব সাকিব	১৯	৪২	১	
মিলার ক মুশফিক ব আশরাফুল	৫	৫৪		
অস্টিন এলবিডব্লু মাহমুদউল্লাহ		২৪		
রোচ ক মুশফিক ব মাহমুদউল্লাহ	৩	৬		
বেস্ট এলবিডব্লু সাকিব	৯	১২	২	০
অতিরিক্ত (বা ৫, লেবা ৫, ও ২, নো ৫)	১৭			
মোট (৭০.১ ওভারে, অলআউট)	১৮১			

বোলিং : শাহাদাত ১২-২-৩২-০, রুবেল ১০-১-৪৫-০, সাকিব ২৮.১-১১-৩৯-৩, মাহমুদউল্লাহ ১৫-৪-৫১-৫, আশরাফুল ৫-১-৪-১।

তিনি জানেন, এই ডাক্তাররা ওপর থেকে যা-ই বলুক, ভেতরে ভেতরে আবার সেই সর্বনাশ ঘটে গেছে। আবার ছিঁড়ে গেছে লিগামেন্ট।

দুদিন অপেক্ষা করার পর বারবাডোজ পাঠানো হলো মাশরাফিকে। সেখানেই আবিষ্কার হলো–হ্যাঁ, মাশরাফির এই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর শেষ, শেষ অনেক বড় স্বপ্ন।

তখনো বাংলাদেশ জানে না, মাশরাফির টেস্ট ক্যারিয়ারও কার্যত ওখানে শেষ হয়ে গেল। ওই সেন্ট ভিনসেন্টের অভিশপ্ত এক মাঠে বিসর্জন দিয়ে গেলেন মাশরাফি সাদা পোশাক আর লাল বল!

[১] Last-wicket pair frustrate dominant Sri Lanka; কনিষ্ক বালাচন্দ্রন (ক্রিকইনফো; ৪ জানুয়ারি, ২০০৯)
[২] ‘জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় ছিল’; অল্পস্বল্প (প্রথম আলো; ৭ জানুয়ারি, ২০০৯)
[৩] Mortaza named Bangladesh captain; ক্রিকইনফো (২৩ জুন, ২০০৯)
[৪] অধিনায়কত্ব হারাচ্ছেন আশরাফুল; তারেক মাহ্‌মুদ (প্রথম আলো; ১৮ জুন, ২০০৯)
[৫] আলো দেখাবেন মাশরাফি; প্রথম আলো (২৪ জুন, ২০০৯)
[৬] ওই
[৭] Mortaza backs Ashraful to shine; জুধাজিৎ বসু (ক্রিকইনফো, ২৩ জুন, ২০০৯)
[৮] অধিনায়ককে পারফর্ম করতে হবে; তারেক মাহ্‌মুদ (প্রথম আলো; ২৮ জুন, ২০০৯)
[৯] Siddons upbeat about Bangladesh's future; ক্রিকইনফো (২৯ জুন, ২০০৯)
[১০] অধিনায়ক মাশরাফির প্রথম দিন; উৎপল শুভ্র (প্রথম আলো; ৫ জুলাই, ২০০৯)

অন্ধকার এক অধ্যায়



১.

জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জটা বাড়ির উঠোনের মতো চেনা এখন।

কম তো হলো না। আট বছর ধরে এই বিমানবন্দর থেকে যাতায়াত। কখনো খেলতে দল বেঁধে, কখনো একা একা। কখনো বাবাকে সঙ্গে করে চিকিৎসা করাতে; কখনো স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। কত ভূমিকায় দেশ থেকে গেছেন, কত ভূমিকায় এসেছেন।

২০০৯ সালের ২৪ জুলাই এই ভিআইপি লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে যে অনুভূতি হলো, সেটা আসলেই নতুন; এমন বীভৎস অনুভূতি বুঝি আগে কখনো হয়নি। এর আগেও অন্তত চারবার ইনজুরির কারণে দলকে ছেড়ে সিরিজের মাঝপথে দেশে ফিরে এসেছেন মাশরাফি। কিন্তু এবারের মতো যন্ত্রণা আর কখনো হয়নি।

এবার যে বড় স্বপ্ন নিয়ে গিয়েছিলেন। এবার যে প্রথমবারের মতো জাতীয় দল সামলানোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রতিজ্ঞাটা পূরণ না করে ফেরার যন্ত্রণা কুরে কুরে খাচ্ছে।

এক পাশে সগীর হোসেন পাভেল, আরেক পাশে শাহাদাত হোসেন রাজীবকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সামনে সাংবাদিকেরা আছেন, বোর্ডের কর্মকর্তাও আছেন; তারপরও নিজেকে ভয়াবহ একা মনে হচ্ছে।

টেস্ট সিরিজ পর্যন্ত দলের সঙ্গে ছিলেন। সেখানেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বোঝা গেল, খুব সহজে সারার নয় এই চোট। অনুমান করা যাচ্ছে যে, আবারও লিগামেন্টেই লেগেছে। সবচেয়ে খারাপ যেটা হতে পারে যে, লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে। সে ক্ষেত্রে অনেক লম্বা সময় ধরে খেলার বাইরে থাকতে হবে; এক বছর হতে পারে।

আর শুধু লিগামেন্ট আহত হলে সময়টা ছয় থেকে আট সপ্তাহ। তবে ঘটনা যা-ই হোক, তাকে অস্ট্রেলিয়াই যেতে হবে। ডেভিড ইয়াংকে দেখিয়ে তার ছুরির নিচেই পেতে দিতে হবে হাঁটু।

এসব ভাবনা মনে থাকলেও বিমানবন্দরে নেমে ক্রিকেট নিয়েই বেশি কথা হলো। ওয়েস্ট ইন্ডিজে টেস্ট সিরিজ জেতায় দারুণ খুশি তিনি। সাকিবের অধিনায়কত্বটা আসলেই চমৎকার লেগেছে। ও ক্রিকেটটা খুব ভালো বোঝে। অধিনায়কত্বটাও এত চমৎকার করবে, সেটা আগে অনুমান করা যায়নি। মনের কথাগুলোই বলছিলেন। ওয়ানডে সিরিজটাও যে সাকিব-রিয়াদ ভালো বল করলে জিতে ফেলা সম্ভব, সেটাও খুব জোর দিয়ে বললেন। চাচ্ছিলেন, হাঁটুর প্রসঙ্গটা না উঠুক।

উঠেই গেল। বলতে হলো এখনকার অবস্থাটা। যে পর্যন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, তখন পর্যন্ত, তাতে নিশ্চিত করে বলা যায় না হাঁটুর ভেতরে ঠিক কী অবস্থা। তবে তার ও ফিজিওর অনুমান, হাঁটুর ভেতরে এখনো রক্তক্ষরণ হচ্ছে। পরিষ্কার অবস্থাটা বলতে পারবেন ডাক্তার। তবে মাশরাফি তখনো জানেন না, আদৌ অপারেশন লাগবে কি না।

বিসিবি তাকে জানাল, দু-একদিনের মধ্যেই আলোচনা করে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার তারিখ ঠিক করা হবে।

২.

আসলে কেউই অনুমান করতে পারছিল না, ব্যাপারটা কতটা গুরুতর।

শুরুতে তাই ধরে নেওয়া হয়েছিল, জিম্বাবুয়েতেই অনুষ্ঠেয় জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচ সিরিজেই হয়তো আবার ফিরে আসবেন তিনি। এই ধরে নেওয়া থেকে মাশরাফিকে জিম্বাবুয়ে সফরের অধিনায়কও ঘোষণা করে দেওয়া হয়। কিন্তু জিম্বাবুয়ে নয়, মাশরাফি চলছেন অস্ট্রেলিয়ায়। দেশে আসার দুদিনের মধ্যেই মেলবোর্নে ডক্টর ডেভিড ইয়াংয়ের সঙ্গে ফোনে কথা হলো। তিনি বর্ণনা শুনে বললেন, এ অবস্থায় সামনাসামনি দেখার কোনো বিকল্প নেই। তাই চলে আসতে হবে।

ভিসাপ্রক্রিয়া শেষে ৫ আগস্ট মেলবোর্নের উদ্দেশে আবার বিমানে চেপে পড়লেন মাশরাফি। মেলবোর্নে ঠিকানা সেই চিরপরিচিত একরামুল ইসলাম বাবু। এবার

অবশ্য সঙ্গে স্ত্রী সুমী থাকায় স্বস্তিটা বেশি লাগছে।
৮ আগস্ট দেখা করলেন ডক্টর ইয়াংয়ের সঙ্গে। আবারও ডেভিড ইয়াং ভ্রু কুঁচকে ফেললেন, 'তুমি না ডান হাঁটুতে চোট পেয়েছিলে?'
'হ্যাঁ।'
'বাঁ হাঁটুও ফোলা কেন?'
'কী জানি।'
'এটারও এমআরআই করাতে হবে। অপারেশন মনে হচ্ছে দুটোতেই লাগবে।'
হ্যাঁ, আবারও দুই হাঁটুতেই অপারেশন। আবারও এসেছিলেন এক হাঁটুর ব্যথা নিয়ে; অপারেশন করাতে হলো দুই হাঁটুতে। বাঁ হাঁটুতে অবশ্য গুরুতর কিছু নয়। শুধু জমে ওঠা তরল বের করতে হলো। এখানে বলে রাখা ভালো, এরপর থেকে মাশরাফিকে এই কাজটা মাঝে মাঝেই করতে হবে। মাঝে মাঝেই বের করতে হবে হাঁটুতে জমে ওঠা তরল।
ডান হাঁটুতেও সবচেয়ে খারাপ যেটা হতে পারত, সেটা হয়নি। ডক্টর ইয়াং ও মাশরাফি দুজনেরই ভয় অসুস্থ, লিগামেন্টটা ছিঁড়েই গেছে হয়তো। হাঁটু খুলে ফেলার পর দেখা গেল ল্যাটারাল লিগামেন্টটা একটু ঢিলা হয়ে গেছে; ওটা ধরে চেপে টাইট করে দিতে হবে; তা না হলে হাঁটু দুলতে থাকবে। স্বস্তির ব্যাপার হলো, এসিএল বা অ্যান্টেরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্টে কোনো আঘাত লাগেনি। এই লিগামেন্টটা নিয়েই সবচেয়ে ভয়ে থাকেন মাশরাফি।
হাসপাতালে থেকে অপারেশনের একদিন পরই ছাড়া পেয়ে গেলেও আরও সপ্তাহ দুয়েক থেকে যেতে হলো মেলবোর্নে। সেরে ওঠার পথে আরও কয়েকটা চেকআপের ব্যাপার ছিল।
মেলবোর্নে বাবুর বাসায় বসে ইন্টারনেটে ক্রিকেট দেখেন। এদিকে হাঁটুর মধ্যে অসহ্য জ্বালা হয়; চোখ আটকে থাকে হারারে-বুলাওয়েতে সাকিবদের খেলার দিকে।

৩.
বিমানবন্দরে মাশরাফিকে এগিয়ে নিতে কোনো একটা লোক নেই।
লোক থাকাটা খুব জরুরি না। ক্রিকেট খেলে ফিরলে, বিশেষ করে জয় নিয়ে ফিরলে তো লোকের অভাব হয় না। ফুলের মালা নিয়ে, হাতে গোলাপ নিয়ে কতজন হাজির থাকেন। এই দিনটায় একটা লোকও নেই। মাঝরাতে বিমানবন্দরে নামলেন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে।
তবে কেউ অভ্যর্থনা জানাতে না থাকাটা মাশরাফির জন্য বেদনার ছিল না। ঝামেলার ব্যাপার ছিল, লাগেজ পৌঁছায়নি। লাগেজের জন্য ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করে রাত আড়াইটের দিকে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে বাসায় পৌঁছালেন। পরদিন বিকেলে সংবাদমাধ্যমে কথাও বললেন। তখনো বোর্ড জানে না, মাশরাফি

এসেছেন কি না বা কবে আসবেন!

হঠাৎ জাতীয় দলের অধিনায়ককে নিয়ে বোর্ডের এই নিরাসক্ততা নিয়ে সেদিন প্রতিবেদনও ছাপা হয়েছিল। দৈনিক প্রথম আলো লিখেছে :

মাশরাফি বিন মুর্তজা তো আর সিরিজ জিতে ফিরছেন না, ফিরছেন অস্ত্রোপচারের টেবিল থেকে! মেলবোর্ন থেকে মালয়েশিয়া হয়ে পরশু রাতে ঢাকায় নেমে জাতীয় দলের অধিনায়ক তাই দেখলেন বিমানবন্দরে তার অপেক্ষায় কেউ নেই।... মাশরাফি কবে ফিরবেন–কাল বিকেলে এই প্রশ্নের উত্তরে বিসিবির এক কর্মকর্তা জানালেন, 'মনে হয় আজ রাতে ফেরার কথা।' আরেকজন বললেন, 'ও তো এখনো আসেনি।' ক্রিকেট অপারেশনস ম্যানেজার শরফুদ্দৌলা ইবনে সৈকত অবশ্য একটু বেশি হালনাগাদ তথ্য দিতে পারলেন, 'মাশরাফি সম্ভবত কাল রাতে ফিরেছে। আমি নিজেই আসলে অসুস্থ। তাই খোঁজ নেওয়া হয়নি।' [১]

৪

বাংলাদেশে বা পৃথিবীতে এটা সম্ভবত সবচেয়ে নিয়মিত অনুশীলন, মানুষকে উসকানোর চেষ্টা করা। সে সময় সাকিবকে খুব উসকানোর একটা চেষ্টা হচ্ছিল। মাশরাফির অনুপস্থিতিতে সাকিব যেহেতু ভালো অধিনায়কত্ব করছেন, তাই সাকিব যেন পূর্ণকালীন অধিনায়ক হয়ে যান; এমন কথাবার্তা ছড়ানো হচ্ছিল। এর সপক্ষে স্বয়ং সাকিবের কাছ থেকে কথা খোঁজা হচ্ছিল।

সাকিব এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত মেধার পরিচয় দিয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজে ওয়ানডে সিরিজের পরই এক সাক্ষাৎকারে দফায় দফায় এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলেও, অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যাপারটা সামলেছিলেন এবং পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন, মাশরাফি ভাই যত দিন খেলবে, তারই জাতীয় দলের অধিনায়ক থাকা উচিত।

সাক্ষাৎকারের দুটি প্রশ্নোত্তর দেখে নিন :

❑ *তা কেন, মাশরাফি কবে ফিরবেন, তা তো একটু অনিশ্চিত। দীর্ঘ মেয়াদেও তো আপনি ক্যাপ্টেনসি পেতে পারেন।*

সাকিব : তেমন হলে দেখা যাবে। তবে আমি মনে করি, ম্যাশ যত দিন আছে, ও-ই অধিনায়ক। অধিনায়ক হিসেবে ও-ই ঠিক লোক।

❑ *কিন্তু এই সাফল্যের পর আপনাকেই অধিনায়ক রেখে দেওয়ার একটা দাবি তো উঠে গেছে।*

সাকিব : এর কারণ দল ভালো করছে, আমার নিজের পারফরম্যান্সও ভালো ছিল। তবে আমি তো বললামই, মাশরাফি ভাই যত দিন খেলবে, তারই অধিনায়ক থাকা উচিত। এ নিয়ে আমার খুব মাথাব্যথা নেই। [২]

এরপরও চেষ্টাটা বন্ধ হয়নি লোকদের।

৪.

যদিও অস্ট্রেলিয়া থেকে মাশরাফি জেনে ফিরেছিলেন যে, ছয় সপ্তাহের মধ্যে খেলায়

ফিরতে পারবেন তিনি। কিন্তু সেই ফেরাটা ফিরতে সময় লেগে গেল প্রায় আট মাস।

এর মধ্যে মাশরাফি আরেকটা রেকর্ড করে ফেললেন। আগের দুই মৌসুমেও দেশের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকে প্রিমিয়ার লিগ খেলার রেকর্ড করা মাশরাফিকে এবার ২০ লাখ টাকা দিয়ে আবাহনীই রেখে দিল। সেই সঙ্গে তারা একই পরিমাণ টাকা দিয়ে দলে ভেড়াল সাকিব আল হাসানকেও।

যদিও বিশাল অংকের চুক্তিতে আবাহনীতে এলেন। আগের বছরও ইনজুরির কারণে সেভাবে দলকে বোলিং সার্ভিস দিতে পারেননি। তবে ব্যাটসম্যান-অধিনায়ক হিসেবে খেলেছেন। এবার সে সার্ভিসটাও পেল না আবাহনী।

খুব ইচ্ছা ছিল সুপার লিগে অন্তত দলের হয়ে কয়েকটা ম্যাচ মাঠে নামার। কিন্তু ফিজিও মাইক হেনরি একদিন বললেন, এ অবস্থায় যদি আরেকবার লিগামেন্টের ইনজুরি হয়, তাহলে চিরতরে পঙ্গু হয়ে যেতে পারেন। মানুষের লিগামেন্ট প্রতিস্থাপনের যে ক্ষমতা, সেটার শেষ সীমানায় প্রায় চলে এসেছেন তত দিনে মাশরাফি। এরপর এমন টাটকা অপারেশনের ধাক্কার পরপর আবার লিগামেন্ট ছিঁড়লে কোনো মৃতদেহ থেকে লিগামেন্ট নিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে!

এর মধ্যে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে আরও একটা সিরিজ চলে গেল। এই সিরিজেও মাশরাফিকে অধিনায়ক ঘোষণা করা হয়েছিল এবং মাশরাফি ফেরার আশাও দেখছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুরো রানআপে বল করতে গিয়ে ব্যথা টের পেতে থাকায় সরে এলেন।

সামনে এল ভারত ও শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠেয় ত্রিদেশীয় সিরিজ। এবারও একই ঘটনা হলো। এবারও অধিনায়ক ঘোষণা করা হয়েছিল তাকেই। এই সিরিজেরও প্রাথমিক দলে থাকলেও শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত দলে থাকা হলো না। কারণ তখনো পায়ে ব্যথা টের পাচ্ছেন।

বোলিং তত দিনে শুরু করেছেন।

শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে সতীর্থরা যখন ত্রিদেশীয় সিরিজের জন্য অনুশীলন করেন, মাশরাফি তখন ছোট রানআপে বল করেন। পুরো রানআপে বল করতে গেলেই ব্যথা লাগে। সবচেয়ে বড় কথা, ফিল্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না বেশিক্ষণ–পা কাঁপে।

ফলে মাশরাফি-আতঙ্কের মুখোমুখি না হয়েই পার পেয়ে গেল ভারত!

৫.

দেখতে দেখতে ২০১০ সাল চলে এল।

বছরের শুরুতেই বাংলাদেশ চলল নিউজিল্যান্ড সফরে। এখানে মাশরাফির যাওয়া একরকম নিশ্চিত। তবে বোর্ডকে তিনি দুটো অনুরোধ জানালেন–প্রথমত এখন কিছুদিন তাকে টেস্টের জন্য বিবেচনা না করতে এবং অধিনায়কত্ব থেকে দূরে

থাকতে চান কিছুদিন।
বোর্ড দুটো ব্যাপারই মেনে নিল। নিউজিল্যান্ডে একমাত্র টেস্টের দলে রাখা হলো না তাকে। সেই সঙ্গে সাকিবের আপৎকালীন অধিনায়কত্বের মেয়াদ আরও বাড়ল। কিন্তু নিউজিল্যান্ড সফরের সময় আসতে আসতে জানা গেল মাশরাফি দলের সঙ্গে যাচ্ছে না। প্রবল জ্বরের সঙ্গে পায়ে ব্যথাটা বাড়ায় কয়েক দিন পর রওনা দেবেন। আর দল রওনা দেওয়ার ঠিক আগের দিন কোচ জেমি সিডন্স নিশ্চিত করলেন মাশরাফি আদৌ যাচ্ছে না। কারণ এই ব্যথা ও জ্বরের ধকলে তার অনুশীলন করা হয়নি।
ফেব্রুয়ারি মাসে আবার অস্ট্রেলিয়া গেলেন মাশরাফি। উদ্দেশ্য ডেভিড ইয়াংকে সর্বশেষ অবস্থাটা দেখিয়ে আসা। ডা. ইয়াং আবার এমআরআই করালেন। দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এমনিতে এখন কেমন আছ? কী করছ?'
'আর কী! সেই রিহ্যাব।'
'আর কত রিহ্যাব করবে? এবার খেলা খেলা শুরু করতে পারো।'
যদিও ডাক্তার বলেছিলেন, হাঁটুতে একটা ছোট সমস্যা আছে। এটা সারা জীবনই থাকবে। এই ঝুঁকি নিয়েই খেলতে হবে সারা জীবন। আবারও পড়ে গেলে আবারও লিগামেন্ট ছিঁড়বে। খেললে এই ঝুঁকি নিয়েই খেলতে হবে।
দেশে যতক্ষণে এসেছেন ফিরে, ততক্ষণে অবশ্য ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের জন্য দল ঘোষণার ব্যাপার-স্যাপার অনেকটা চূড়ান্ত হয়ে গেছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেল, মাশরাফিকে পরিকল্পনায় রাখেননি নির্বাচকেরা। পরে প্রধান নির্বাচক রফিকুল ইসলাম কথা বললেন সরাসরি ডেভিড ইয়াংয়ের সঙ্গে। ডা. ইয়াং চিত্রটা পরিষ্কার করে দিলেন। চাইলে মাশরাফি এখন খেলতে পারে। ক্রিকেটীয় ব্যাপার তো তিনি জানেন না; তিনি সুস্থতা নিশ্চিত করলেন।
সুস্থতা নিশ্চিত হয়ে মাশরাফিকে ২৩ ফেব্রুয়ারি বিসিবি একাদশের হয়ে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অনুশীলন ম্যাচে খেলিয়েও দেওয়া হলো।
ফলে সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেলা হলো–ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ দিয়ে ফিরছেন মাশরাফি।

৬.
২৮ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ।
মাশরাফি হোটেলে উঠলেন। জাতীয় দলের সঙ্গে সেই ২০০১ সালে হোটেলে উঠেছিলেন প্রথম। তারপর থেকে বাসার চেয়ে এই সতীর্থদের সঙ্গে হোটেলে কম সময় কাটাননি। সেই থেকে চিত্রা নদীর চেয়ে বেশি সময় কাটিয়েছেন ড্রেসিংরুমে। এর প্রতিটা লক্ষণ, প্রতিটি গন্ধ, প্রতিটা শব্দের অর্থ তিনি চেনেন।
এবার হোটেলে ওঠার পর থেকে আইপিএলে গন্ধ অসুস্থ। না, আইপিএলের মতো টাকার ঝনঝনানি নয়। আইপিএলে গিয়ে যেমন একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো

থাকতে হয়েছিল, এবার হোটেলে উঠে বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করলেন, মাশরাফি যেন একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ।

যেন তাকে কেউ চেনে না। কোত্থেকে উড়ে এসেছেন।

অবশ্য তিনি একাই বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, ব্যাপারটা এমন নয়। আসলে অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন মানুষ মিলে একটা কোলাহল বলে মনে হচ্ছিল। হয় তিনি খাপছাড়া হয়ে গেছেন, নইলে বাকি সবাই খাপছাড়া। কোনটা সত্যি, তা বের করার উপায় আর নেই। তবে এটুকু বলা যায় যে, ক্যারিয়ারে ওই একবারই খুব অস্বস্তি নিয়ে ক্রিকেট খেলেছেন। ওই একবারই মনে হয়েছে, হোটেলের চেয়ে বাসা ভালো, মাঠের চেয়ে ঘুম ভালো।

এই প্রবল অস্বস্তি নিয়েই মাঠে নামলেন মাশরাফি।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আগে ব্যাট করে বাংলাদেশ ২২৮ রানে অলআউট হলো। এর মধ্যে তামিম একাই করলেন ১২৫ রান।

আট মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যাট হাতে নামলেন; ৬ বলে একটি চারে ৪ রানই করলেন। বল হাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে খরুচে বোলার ছিলেন; ৬ ওভারে ৩৭ রান দিয়ে উইকেটশূন্য ছিলেন।

হোটেলে ফেরার পথে অস্বস্তিটা আরও ঘিরে ধরল। একেবারেই আর মন টানছে না। কিছুই যেন তার নয়। কেউ তাকে চাইছে না, তিনি কাউকে চাইছেন না।

এ অবস্থায় মাশরাফি তার জীবনের অন্যতম বিস্মরণযোগ্য একটা কাজ করে ফেললেন। একই পরিস্থিতিতে আরও এক হাজার বার পড়লেও মাশরাফি হয়তো এই কাজ করবেন না। করলে প্রতিবারই কাজটা ভুল বলে চিহ্নিত হবে।

মাশরাফি হোটেল ছেড়ে দিলেন।

ম্যানেজমেন্টকে জানালেন, মা অসুস্থ; তাই বাসায় যেতে চান। মা সত্যিই একটু অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু মাশরাফি অস্বীকার করেন না যে, মায়ের এমন অসুস্থতায় তিনি আগে-পরে দলের সঙ্গেই থেকেছেন। মাকে দেখার লোকের খুব অভাব নেই। অভাব ছিল ওই অবস্থায় তার হোটেলে থাকার ইচ্ছের।

একই সঙ্গে আরেকটা ব্যাপার মাশরাফির এই সিদ্ধান্তে ভূমিকা রেখেছিল বলে জানা যায়, তখন। টিম ম্যানেজমেন্ট আবার আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, মাশরাফিকে দ্বিতীয় ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হবে। বিশ্রামের সিদ্ধান্তে মাশরাফি ক্ষুব্ধ ছিলেন কি না, জানা কঠিন।

তবে প্রধান নির্বাচক রফিকুল আলম তখন সংবাদমাধ্যমে মাশরাফিকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছিলেন :

মাশরাফি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন ক্রিকেটার। তার ভালোর জন্যই শুরু থেকে আমাদের চিন্তা ভাবনা ছিল, তাকে বিশ্রাম দিয়ে আস্তে আস্তে খেলায় ফেরানো হবে। ওর একটা শুরু দরকার ছিল, সেটাই হলো ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে। তাকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত সম্মিলিত।' [৩]

সংবাদমাধ্যমগুলোতে মাশরাফির জন্য অস্বস্তিকর এই ড্রেসিংরুম আবহাওয়ার কথা খুব জোরেশোরে ছাপা হচ্ছিল। এমনও ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছিল যে দলের কোচ ও কোনো কোনো খেলোয়াড় মাশরাফির পেছনে তার ইনজুরি নিয়ে বাজে মন্তব্যও করছিলেন। আমরা এসব কথা বিশ্বাস করতে চাই না। তারপরও ফিরে দেখার স্বার্থে পড়ে দেখা যেতে পারে :

এবার দলে ফেরার পর থেকেই এক ধরনের অস্বস্তি ঘিরে ধরেছিল তাঁকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ইনজুরিতে না পড়লে এখন দলের অধিনায়ক থাকতেন, সেটা ছাড়াও পারফরম্যান্সের কারণেই জাতীয় দলে মাশরাফির গুরুত্ব সব সময় অন্য রকম। টিম ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে বাড়তি সমাদরই পেয়ে এসেছেন সব সময়। কিন্তু হাঁটুর চোটের কারণে আট মাস বাইরে থাকার পর দলে ফিরে মাশরাফি দেখছেন, দলের হাওয়া-বাতাস বদলে গেছে। কোচ-অধিনায়কের কোনো কোনো আচরণেও প্রচণ্ড আহত তিনি। এত দিন পর মাঠে নামার আগে কারও কাছ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক কিছু তো শোনেনইনি, বরং ড্রেসিংরুম-অনুশীলন সবখানেই উপলব্ধি করেছেন একধরনের অবহেলা আর তাচ্ছিল্য। প্রথম ওয়ানডেতে খেলছেন, এ কথাটাও কোচ বা অধিনায়ক তাঁকে জানাননি। মাশরাফি তা জেনেছেন এক নির্বাচকের কাছ থেকে। এসবের সঙ্গে যোগ হয়েছে নিউজিল্যান্ড থেকে ভেসে আসা কিছু কথাবার্তা। দল সূত্রের খবর, টিম ম্যানেজমেন্টের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য নাকি নিউজিল্যান্ডে দলের ক্রিকেটারদের সামনেই মন্তব্য করেছেন, অসুস্থতা-টসুস্থতা কিছু নয়। মাশরাফি নিউজিল্যান্ডে যাননি ভয়ে। দেশে ফিরে দলের দু-একজন ক্রিকেটার সেটা তুলেছেন মাশরাফির কানে। [8]

তবে ভেতরের ঘটনা যা-ই ঘটুক, মাশরাফি দল ছেড়ে গিয়েছিলেন, এটাই সত্যি। বলে গিয়েছিলেন–এই সিরিজে আর খেলব না।

৭.

মাশরাফির কথাটাকে আক্ষরিক অর্থেই নিয়েছিলেন সাকিব।

দল চট্টগ্রামে চলে যাওয়ার পর মাশরাফির সঙ্গে দফায় দফায় কথা বলেন বোর্ডের কর্মকর্তারা। তারা মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছিলেন যে, মাশরাফিকে তৃতীয় ম্যাচের আগে চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু তখনই সাকিব আল হাসানের বলা একটা কথা পরোক্ষ উদ্ধৃতি হিসেবে হেডিং হয়ে গেল–মাশরাফিকে দলে চান না সাকিব!

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, সাকিব এই কথা অস্বীকার করলেন না। তিনি বললেন, এমন কথা তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বলেননি। তবে অনানুষ্ঠানিক ফোরামে তিনি ম্যানেজার শফিকুল হক হীরাকে বলেছিলেন। তবে এটাও বললেন, তার কাছে বোর্ড মাশরাফিকে দলে নেওয়া না-নেওয়া প্রসঙ্গে মত চাইলে তিনি এই কথাটাই বলতেন। সাকিব কেন এমন বলতেন, তার পক্ষে তার যুক্তি ছিল :

'আগের দিনই মাশরাফি ভাই জানিয়ে দিয়েছেন সিরিজের শেষ দুই ম্যাচে তিনি নেই। হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন, দলের সঙ্গে নেই। আমি হয়তো ও কথাই বলতাম। মাশরাফি ভাইকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি, মাশরাফি ভাইও সেটা জানেন। কিন্তু অধিনায়ক হয়ে তো আমাকে দলের কথাই আগে ভাবতে হবে।' [৫]

দ্বিতীয় ম্যাচে অল্প ব্যবধানে হারের পর সাকিব নিজে সংবাদমাধ্যমে মাশরাফির বোলিং নিয়ে প্রকাশ্যে সমালোচনা করে একটু নজর কেড়েছিলেন। জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এই ম্যাচে মাশরাফির বোলিং মিস করেছেন কি না :

'ইনজুরির আগে যে মাশরাফি বল করতেন, আমরা আজ রাতে সেই মাশরাফিকে মিস করেছি। তবে সর্বশেষ ম্যাচে এবং অনুশীলন ম্যাচে তিনি যে বল করেছেন, তা নয়। তার আসলে পুরোপুরি আত্মবিশ্বাস ও ছন্দ ফিরে পেতে আরেকটু সময় লাগবে। ম্যাচ ফিট হয়ে উঠতে তার আরও কিছু ম্যাচ খেলা উচিত।' [৬]

সাকিব অবশ্য এটা পরিষ্কার বুঝতে পারছিলেন যে, তার এই কথা প্রকাশ্যে চলে আসা এবং অতিরিক্ত পেশাদারি মনোভাবে তার সঙ্গে মাশরাফির সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার সুযোগ আছে। তিনি চেষ্টা করেছিলেন ফোন করে ব্যাপারটা সমাধানের। ফোন ধরলেন না মাশরাফি।

সাকিব সংবাদমাধ্যমে পরিষ্কার করে বললেন, মাশরাফি তার বড় ভাইয়ের মতো; সেই ছোটবেলায় নড়াইলে মাশরাফিকে দেখার জন্য প্রথম ক্রিকেট ক্যাম্পে গিয়েছিলেন। আজও সেই ভক্তিটা আছে তার।

৭ মার্চ অবশেষে দুজনের দেখা হলো বিসিবি অফিসে। ব্যক্তিগত কাজে বিসিবি অফিসে এসেছিলেন। সেখানেই একান্তে অনেকটা সময় কাটিয়ে আবার মিল হয়ে গেল দুই ভাইয়ের।

সাকিবের সম্পর্কে এ ঘটনার ব্যাপারটা এখনো বিব্রত করে মাশরাফিকে। সাকিব আল হাসানের বিষয়ে প্রকাশিত বইয়েও তিনি বলেছেন :

আমি সব সময় বলি, সাকিব আমার ছোট ভাইয়ের মতো; আমার থেকে পাঁচ-সাত বছরের ছোট একটা ছেলে। আমরা সেভাবেই মিশি। ওকে আমি ছোট ভাইয়ের মতো ভালোবাসি। ওর সঙ্গে কেন সম্পর্ক আমি খারাপ করব? আমার জীবনের বেশির ভাগটা তো গেল মাঠের বাইরে বসে বসে থেকে। ফলে আমার তো ঈর্ষা করে ওর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করার কোনো কারণ নেই। শুধু এটুকু বলতে পারি, সাকিবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আগেও চমৎকার ছিল, এখন আমাদের সম্পর্ক আরও ভালো। আজকাল আমি ওর সঙ্গে আমার ভেতরের অনেক কথাও শেয়ার করি। আমার দিক থেকে তো কোনো সমস্যা নেই-ই। আমি এটাও বুঝি, সাকিবের দিক থেকেও আমার সঙ্গে কোনো সমস্যা নেই। সেও আমাকে খুব ভালোবাসে।

হয়তো ঘটনাটায় একটু রং চড়ানো হয়েছিল। আমিও কিছু ভুল করেছি। আমার ওভাবে মাথা গরম করে হোটেল থেকে বেরিয়ে আসাটা ঠিক হয়নি। আমার দিক থেকে কিছুটা ভুল ছিল। আর সাকিব হয়তো আমাকে জানতে পারার পর আমাকে

ফোন দিয়ে বলতে পারত, চলে আসেন। যাক, আমার মনে হয়, আমি ভুল করেছিলাম। তবে এটা জানাজানি না হলে ব্যাপারই না। এক সংসারে ভাইয়ে ভাইয়ে এর চেয়ে বড় গোলমালও হয়। [৭]

এসব কথায় একটা ব্যাপার পরিষ্কার, পুরো ব্যাপারটা ওখানেই শেষ করে ভাই-ভাই আবার মিল হয়ে গেল। আজকের বাংলাদেশ ক্রিকেট সাক্ষ্য দেয়, মিলটা আসলে মন থেকেই হয়েছিল।

তবে এরপরও অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে কিছু গরমিল থেকে গেল। যা দেখতে পাব আমরা পরের বছরটায়।

৮.

এ বছর বাংলাদেশ আরও একটা নতুন টুর্নামেন্ট দেখল ঘরোয়া ক্রিকেটে। জাতীয় ক্রিকেট লিগের টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট হলো। এটাকে বিপিএলের দূরসম্পর্কে পূর্বপুরুষ বলা যায়। খেলোয়াড়েরা নিজ নিজ বিভাগে নয়, খেললেন দলগুলোর পছন্দ অনুযায়ী। মাশরাফি হলেন সিলেটের আইকন খেলোয়াড়।

এই টুর্নামেন্টে ৬টি ম্যাচ খেললেন তিনি; ১০টি উইকেট নিলেন এবং ৯৩ রান করলেন।

৯.

আইসিসির বিকট সূচির কারণে এই সময়ে এসে প্রতিবছরই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজিত হতে থাকে। এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে বাংলাদেশকে ছুটতে হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজে।

ন্যক্কারজনক ফলাফল নিয়ে ফিরেছিল বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে ২১ রানের হার। দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২৭ রানে হার এবং বিদায়। দ্বিতীয় ম্যাচে মাশরাফি ৪ ওভারে ২৮ রান দিয়ে দুটি উইকেট নিয়েছিলেন।

১০.

দেখতে দেখতে এশিয়া কাপের আসর বসার সময় চলে এল।

নাহ, বাংলাদেশের সেই সোনালি এশিয়া কাপ নয়। ডাম্বুলায় অনুষ্ঠিত ২০১০ এশিয়া কাপ। এই এশিয়া কাপটা মাশরাফি এবং বাংলাদেশ ভুলেই যেতে চাইবে। প্রথম ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে ৬ উইকেটের হার। মাশরাফি ভারতের পতন হওয়া ৪ উইকেটের দুটো নিয়েছিলেন ৩৭ রানের ব্যয়ে।

দ্বিতীয় ম্যাচে ১২৬ রানের পরাজয় শ্রীলঙ্কার কাছে। মাশরাফি উইকেটশূন্য ও ব্যাটে ১৫ বলে ১৫ রান। তৃতীয় ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৩৯ রানের পরাজয়। মাশরাফি শূন্য। বল হাতে উইকেটশূন্য; ব্যাট করার সুযোগ হয়নি।

১১.

স্পিলিট ক্যাপ্টেনসি; দ্বৈত অধিনায়কত্ব।

সাদা চোখ বলে বিশ্বে একসময় জনপ্রিয় হয়ে ওঠা এই পদ্ধতিতে বাংলাদেশ প্রবেশ করেছে ২০১৪ সালে। এই সময়ে এসে টেস্টে মুশফিক এবং ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে মাশরাফি দায়িত্ব নেন। কিন্তু ইতিহাস বলছে, ২০১০ সালে অংশত ব্যবস্থাটা চালু হয়েছিল।

তখনো কেউ জানে না যে, মাশরাফির টেস্ট ক্যারিয়ার কার্যত শেষ হয়ে গেছে সেই ২০০৯ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে। তখনো আশা ছিল, মাশরাফি টেস্টে ফিরবেন, সেখানেও দায়িত্ব নেবেন। আপাতত তিনি ইংল্যান্ডে টেস্ট সফরে যাচ্ছেন না; তাই টেস্টে সাকিবই অধিনায়কত্ব করলেন। এ সফরটা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য তামিমের লর্ডস ও ম্যানচেস্টার সেঞ্চুরির কথা বলা যেতে পারে।

টেস্ট সফর শেষ করে ফিরে শ্রীলঙ্কায় এশিয়া কাপ খেলে তারপর বাংলাদেশ আবার যুক্তরাজ্য সফরে গিয়েছিল। দল রওনা দেওয়ার আগের দিন মাত্র প্রকাশ করা হয়েছিল যে ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও হল্যান্ডে এই সফরে দলকে নেতৃত্ব দেবেন মাশরাফি। এই দায়িত্ব নিয়েই আরেকটা ইতিহাসের বাঁক পার করে দিলেন দলকে। এটা সত্যি যে, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ায় একটু বিস্ময় তৈরি হয়েছিল। দারুণ করতে থাকা সাকিবকে সময় না দিয়েই এ রকম প্রতিস্থাপন করে ফেলায় কোচ জেমি সিডন্স, সহকারী কোচ খালেদ মাহমুদ বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

তবে মাশরাফি এই অধিনায়কত্ব নেওয়ার পক্ষে ছিলেন না। তিনি মনে করছিলেন, সাকিব ভালো করছে বলে তারই চালানো উচিত। আর তিনি নিজে যেহেতু টেস্ট খেলছেন না, তাই এখনই তাকে অধিনায়ক করা ঠিক হবে না। মাত্র কয়েক দিন আগেই তিনি বলেছিলেন

আমি এ সুযোগটা সাকিবকেই দেওয়ার পক্ষে। কারণ, সাকিব এখন পর্যন্ত দারুণ করছে। আমি তার দলের হয়ে খেলতে চাই। আরেকটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে, আমি এখনো দুই ফরম্যাটেই খেলছি না–শুধু ওয়ানডেটাই খেলতে চাই–দুটোতেই অধিনায়কত্ব না করলে কাজ চালানো এবং সম্পর্ক রক্ষা কঠিন ব্যাপার হয়ে যাবে। [৮]

তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ম্যাচে অনুমিতভাবেই বাংলাদেশ ৬ উইকেটে হেরেছিল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। দ্বিতীয় ম্যাচেই বাংলাদেশ পেল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে নিজেদের প্রথম জয়; ৫ রানের জয়।

ইমরুলের ৭৬ রানে ভর করে বাংলাদেশ ২৩৬ রান তুলেছিল ৫০ ওভারে। মাশরাফি ২৫ বলে ২২ রান করেছিলেন। মাশরাফি সেদিন ৬ জন বোলার ব্যবহার করেছিলেন। ১ ওভার বল করা আশরাফুল ছাড়া বাকি ৫ জনই ২টি করে উইকেট নিয়েছিলেন। মাশরাফি ১০ ওভারে ৪২ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়েছিলেন। ৪৭ ও ৪৯তম ওভারে তুলে নিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের অষ্টম ও নবম উইকেট। আর শেষ ওভারে এসে ম্যাচ বের করে নিতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকা ট্রটকে ফিরিয়ে ম্যাচ জেতান সফিউল।

শেষ ম্যাচে অবশ্য আবার ১৪৪ রানে হারে বাংলাদেশ। মাশরাফি বহুদিন পর

দারুণ বোলিং করেছিলেন। ১০ ওভারে ২ মেডেন নিয়েছিলেন, ৩১ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছিলেন। তার ইকোনমি রেট ছিল ৩.১০; বাকি কারো ৫-এর নিচে ছিল না; সফিউল ১০.৭৭ হারে রান দিয়েছিলেন।

১২.

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এত চমৎকার পারফরম্যান্সের পরও শঙ্কা ছিল। পরপরই যুক্তরাজ্য সফরের অংশ হিসেবে আয়ারল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডে যায় বাংলাদেশ ৩টি ওয়ানডে খেলতে। শঙ্কা ছিল এখানে আবার 'ফেবারিট' বাংলাদেশ না অঘটনের শিকার হয়। একটা নয়, এক জোড়া অঘটনের শিকার হলো বাংলাদেশ।

এই সফর থেকে ভীষণ হতাশার ফলাফল নিয়ে ফেরে বাংলাদেশ। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচেই ৭ উইকেটের হার। জুনায়েদের সেঞ্চুরির পরও ২৩৪ রান করে বাংলাদেশ। মাত্র ৩ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় আইরিশরা।

পরের ম্যাচে বাংলাদেশ অবশ্য ৬ উইকেটের জয় পায় আইরিশদের বিপক্ষে। তাতে ক্ষতে মলম লাগানোর খুব একটা সময় মিলল না।

চার দিন পরই গ্লাসগোতে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ৬ উইকেটের পরাজয় নিয়ে ফিরতে হয় মাশরাফির দলকে। সোজা কথায় একে 'ডিজাস্টার' বলা হয়।

[১] মাশরাফির এ কেমন অভ্যর্থনা!; প্রথম আলো (২৫ আগস্ট, ২০০৯)

[২] অধিনায়কত্বের জন্য ম্যাশই ঠিক লোক; উৎপল শুভ্র (প্রথম আলো; ২ আগস্ট, ২০০৯)

[৩] দল ছাড়লেন ক্ষুব্ধ মাশরাফি; প্রথম আলো (২ মার্চ, ২০১০)

[৪] ওই

[৫] মাশরাফি বিতর্ক ও সাকিব; প্রথম আলো (৪ মার্চ, ২০১০)

[৬] Mortaza replaces Shakib as Bangladesh captain; অ্যান্ড্রু মিলার (ক্রিকইনফো; ২৮ জুন, ২০১০)

[৭] সর্বকালের সেরাদের একজন হতে হবে; দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (সাকিব আল হাসান : আপন চোখে ভিন্ন চোখে; জানুয়ারি, ২০১৫)

[৮] Mortaza replaces Shakib as Bangladesh captain; অ্যান্ড্রু মিলার (ক্রিকইনফো; ২৮ জুন, ২০১০)

বুকের কান্না, চোখের জল



১.

একদিন ঘোর বর্ষায় চরাচর ভেসে যাচ্ছিল।

মাঠে খেলা নেই, প্রেসবক্সে কাজ নেই। মাশরাফি খুব জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলেন প্রেসবক্সের বাইরেই একচিলতে খোলা বারান্দায়। সব মজার মজার ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছিল সবার।

হঠাৎ করে কীভাবে যেন সেই প্রসঙ্গটা এল; কান্নার প্রসঙ্গ।

সব আওয়াজ থেকে গেল। বৃষ্টির শব্দ বড় প্রকট হয়ে কানে লাগছিল। মাশরাফি নিস্তব্ধতা ভেঙে হেসে উঠলেন, ম্লান হাসি, কান্না উচিত হয়নি; কান্নাটা উচিত হয়নি।

চোখের জলের এই এক দোষ–সে কিছুতেই উচিত-অনুচিত বিবেচনা করে না। শোভন-অশোভন ভাবতে পারে না। বুকের মধ্যে ব্যথাটা যখন জমে ওঠে, স্থান-কাল-পাত্র সব মিলিয়ে যায়; থাকে শুধু কান্না।

২০১১ সালের ১৯ জানুয়ারি মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে, মাশরাফির ক্রিকেটে কান্না ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে সেদিন বিসিবি প্রধান আ হ ম মুস্তফা কামাল জানিয়েছিলেন, দেশের মাটিতে আসছে বিশ্বকাপের দলে নেই মাশরাফি বিন মুর্তজা। শত নাটক, শত পরস্পরবিরোধী কথা, বিসিবির হিসাব না মেলাতে পারা আচরণ এবং সর্বোপরি কোচ জেমি সিডন্সের সকাল-বিকেল ভিন্ন ভিন্ন কথার শেষ পরিণতি মাশরাফির বিশ্বকাপ দলে না-থাকা।

১৯৯৯ বিশ্বকাপের নান্নু-কাণ্ড বা প্রথম টেস্টের হাবিবুল-কাণ্ড মাথায় রেখেই বলা চলে, বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে কোনো নির্দিষ্ট খেলোয়াড়ের নির্দিষ্ট টুর্নামেন্ট না-থাকা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনার ঘটনা সম্ভবত এটাই ছিল।

আমরা এই মহানাটকীয় ও আলোচিত ঘটনায় প্রবেশ করব।

২.

যুক্তরাজ্য সফর থেকে মিশ্র অভিজ্ঞতা নিয়ে ফেরা বাংলাদেশ তখন ঘরের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যে সিরিজ পরে প্রথম 'বাংলাওয়াশ' বলে কথিত হয়ে উঠবে।

সিরিজের আগে বাংলাদেশের অধিনায়ক মাশরাফি ও কোচ জেমি সিডন্স– দুজনই বলছিলেন, আয়ারল্যান্ড ও হল্যান্ডের বিপক্ষে পরাজয় সত্ত্বেও বাংলাদেশ ভালো ক্রিকেটের মধ্যে আছে। বিশ্বকাপ পর্যন্ত 'মার্জিনাল এরর'গুলো দূর করে তারা এই ক্রিকেট ধরে রাখতে চান। এর মধ্যেই বিশ্বকাপবিষয়ক এক প্রশ্নের উত্তরে জেমি সিডন্স পরিষ্কার করে বলেছিলেন, মাশরাফি ছাড়া অন্য কাউকে অধিনায়কই ভাবছেন না তিনি :

ম্যাশ ইংল্যান্ডে অসাধারণ অধিনায়কত্ব করেছে। ফলে আমার ধারণা, কোনো সন্দেহ ছাড়াই বিশ্বকাপ পর্যন্ত তার অধিনায়কত্ব করা উচিত। ইনজুরিমুক্ত মাশরাফি আমাদের নেতৃত্ব দেওয়ার সেরা লোক। সাকিব এর মাঝে অসাধারণ করেছে। কিন্তু সে আসলে এখনই অধিনায়কত্ব করতে চায় না; ক্রিকেট নিয়ে আরও কিছুকাল থাকতে চায়। অন্যদিকে মাশরাফি খুব আনন্দের সঙ্গে ভালোভাবে করছে কাজটা। [১]

ফলে নিউজিল্যান্ড সিরিজে যে মাশরাফিই অধিনায়কত্ব করতে নামছেন, সে নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

সিরিজের আগে মাশরাফির নিজেরও চোখ ছিল বিশ্বকাপের দিকে। আগের বছরটা খুব বেশি দেশের বাইরে সফর করা বাংলাদেশ বিশ্বকাপের আগ পর্যন্ত দেশে খেলবে। আর সেই খেলাতে প্রতিটি ম্যাচে নিজেদের পারফরম্যান্সটা আরও তুলে নিয়ে বিশ্বকাপে সর্বস্ব দিয়ে দেওয়ার কথা বলছিলেন মাশরাফি। বারবার বলছিলেন, এটা আমাদের দর্শকের সামনে প্রথম বিশ্বকাপ; ভালো করতেই হবে।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজটাও নিজেদের দর্শকের সামনে প্রথম ছিল; মাশরাফি প্রথমবারের মতো টস করতে নামলেন বাংলাদেশের মাটিতে। এর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজে একটি টেস্টে, যুক্তরাজ্যে ৬টি ওয়ানডেতে টস করেছেন। কিন্তু দেশের মাটিতে এই প্রথম নামলেন।

দিনটা ছিল মাশরাফির জন্মদিন।
সেদিনের ঝলমল করতে থাকা মুখটা আজও মনে পড়ে। যেন চাঁদ জয় করে আস্তে আস্তে হেঁটে সংবর্ধনা মাঠের মাঝখানে চলেছেন মাশরাফি।
বাংলাদেশ আগে ব্যাট করে করল ২২৮ রান। 'সহ-অধিনায়ক' সাকিব সর্বোচ্চ ৫৮ রান করলেন। মাশরাফি ১১ বলে ১টি চার ও একটি ছয়ে ১৫ রান করলেন।
এবার বোলিং শুরুর পালা। বেশ জমিয়ে ছেলের খেলা দেখতে মাঠেই বসেছেন গোলাম মুর্তজা; ছেলে প্রথমবারের মতো দেশের মাটিতে অধিনায়ক হিসেবে খেলতে নেমেছে।
নড়াইলেই থাকার কথা ছিল গোলাম মুর্তজার। কিন্তু ছেলের অনুরোধ রাখতে ঢাকায় এলেন। ইচ্ছা ছিল, দিন শেষে ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে দুজনে আনন্দে সময় কাটাবেন। হায়রে নিয়তি!
ইনিংসের তৃতীয় ওভারে, নিজের দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলটা করতে ছুটে আসছিলেন। কিন্তু সেই হাঁটুতে শব্দ, থেমে যাওয়া; খোঁড়াতে খোঁড়াতে সরে যাওয়া এবং সতীর্থদের কাঁধে ভর করে বের হয়ে যাওয়া।
দিন শেষে ভাগ্য ছাড়া আর দোষ দেওয়ার মতো কাউকে খুঁজে পেলেন না গোলাম মুর্তজা। কান্না-জড়ানো গলায় বললেন, 'ভাগ্য। স্রেফ ভাগ্যই আবার ছেলেটাকে ছিটকে দিল মাঠের বাইরে। আমাদের পরিবারটা আবার একটা বিরাট ধাক্কা খেল।'
এই কষ্ট, যন্ত্রণা থেকে মাঝেমধ্যে মুক্তি পেতে ইচ্ছা করে মুর্তজা সাহেবের। ইচ্ছা করে এর চেয়ে সাধারণ একটা ছেলের বাবা হয়ে জীবন কাটাতে, 'মাঝেমধ্যে মনে হয়, ওকে বলি ক্রিকেট ছেড়ে দিতে। কী হবে এমন বিপদের খেলা খেলে! আবার মনে হয়, এ কথা আমি বলি কী করে? ছেলে তো আমার একার নয়। ও এখন বাংলাদেশের অধিনায়ক। ও তো এখন দেশের সম্পদ।'
সম্পদ বলেই তো তাঁর জন্য দেশের এমন বুক কেঁপে ওঠে। আহা কী জন্মদিনের উপহার!

৩.
গোড়ালির ফোলা আর ব্যথা দেখে অবস্থা বুঝতে এখন আর ডাক্তার লাগে না।
ব্যথা, ফোলা দেখে নিজেই অনুমান করতে পারেন কী হয়েছে। ইনজুরির দিন তিনেক পর ক্রাচে ভর করে যখন বিসিবির মেডিকেল রুমে ঢুকছেন, তখনই ম্লান হেসে বলেছিলেন—লিগামেন্ট ছিঁড়েছে মনে হয়।
দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বেরিয়ে এলেন অধিনায়ক।
এদিকে সাংবাদিকেরা তখন অপেক্ষা করছেন আরেক 'অধিনায়ক' সাকিব আল হাসানের জন্য। আগেই মাশরাফি কথা বলে ফেললেন। তিনি ব্যাপারটা আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করে দিলেন। লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে। একটু পর বিসিবির প্রধান চিকিৎসক দেবাশিস চৌধুরী এসে জানালেন, আসলেই লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে। আপাতত অপারেশন করানো হবে না। এই অবস্থায় দু-এক দিনের মধ্যেই

শুরু হয়ে যাবে পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া। চিকিৎসক আশাবাদী যে, চার থেকে ছয় সপ্তাহের মতো সময় লাগবে তার মাঠে ফিরতে। সে ক্ষেত্রে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে খেলতে কোনো বাধা থাকার কথা নয় মাশরাফির।

পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কয়েক দিনের মাথায়ই মাশরাফি বুঝতে পারলেন, উন্নতিটা খুব ভালো হচ্ছে। কথায় কথায় বলছিলেন, জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে খেলা নিয়ে তো কোনো সংশয়ই দেখেন না। তবে জিম্বাবুয়ে নয়; মাথায় তার বিশ্বকাপ। একবাক্যে বলেছিলেন–*মরে না গেলে খেলবই।* *[২]*

৪.

নিউজিল্যান্ড সফর শুধু মাশরাফি নয়, মিস করেছিলেন তামিম ইকবালও। ফর্মের কারণে বাইরে ছিলেন মোহাম্মদ আশরাফুলও।

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হোম সিরিজটা ছিল তিনজনেরই পুরোদমে নিজেদের ফিরে পাওয়ার আসর। বিশ্বকাপের আগে নিজেদের প্রস্তুত করে তোলার আসর।

এমন প্রত্যাবর্তনেই অধিনায়কত্ব ফিরিয়ে নেওয়ার সব সময়ই বিরোধী ছিলেন মাশরাফি। এবার তার ইচ্ছেকেই সম্মান জানিয়ে, বিসিবি জিম্বাবুয়ে সিরিজে অন্তত তাকে অধিনায়ক না করারই সিদ্ধান্ত নেয়। কাজটা সাকিবই চালাবেন বলে জানানো হয়।

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচেই হেরে বসে বাংলাদেশ। পরের দুই ম্যাচে অবশ্য বাংলাদেশ ফিরে আসে। প্রথম দুই ম্যাচে কোনো উইকেটই পাননি। প্রথম দুই ম্যাচে যথাক্রমে ৬ ওভারে ৩৬ এবং ৩ ওভারে ১৭ রান ব্যয় করে ফেলেন।

এই দুই ম্যাচের পর মাশরাফি নিজেই নিজের বোলিং নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন সংবাদমাধ্যমে। তিনি এমন বোলিং করার পরও স্পিনারদের কল্যাণে বাংলাদেশ পার পেয়ে যাচ্ছে বলেও মন্তব্য করলেন। তবে বড় দলের বিপক্ষে বিশ্বকাপের আগে তার জ্বলে উঠতে হবে বলে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন।

বোলিং কোচ ইয়ান পন্ট মাশরাফির অবস্থাটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তখন বলছিলেন, এটা খুবই সাময়িক একটা ব্যাপার :

নেটে সবকিছু ঠিক আছে বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু ম্যাচে তা মনে হচ্ছে না। আসলে কামব্যাক ব্যাপারটা সব সময়ই কঠিন। ফাস্ট বোলাররা এই সময়ে ছন্দ হারায়, টাইমিং হারায়; কিছুটা আত্মবিশ্বাসও হারায়। আমার ধারণা, ম্যাশ অন্য যে কারো চেয়ে বেশি হতাশ। তবে কী জানেন, ও মারাত্মকভাবে ফিরে আসবে। ও বাংলাদেশের একজন গ্রেট বোলার। অসাধারণ প্রতিভাধর ছেলে, খুব চালাক ছেলে; আমাদের সেরা পেসার। [৩]

পন্টের কথা প্রমাণ করতে বেশি সময় নেননি মাশরাফি।

তৃতীয় ম্যাচে এসে ১০ ওভার বোলিং করানোর মতো উপায় পেলেন অধিনায়ক। একটু ছন্দ ফিরে পেয়ে ১০ ওভারে ২০ রান খরচ করেছিলেন; একটা মেডেন, একটা উইকেটও পেয়েছিলেন।

চতুর্থ ওয়ানডেতে একটু বিশ্রামও পেয়েছিলেন।

পঞ্চম ওয়ানডেতে ফিরে অনেক দিন পর মাশরাফিসুলভ বোলিং করলেন। শুরুতেই তুলে নিলেন ২ উইকেট। বাংলাদেশকে ৬ উইকেটে জয়ের পথ দেখালেন।

৫.

ডিসেম্বরের ১২ তারিখে শেষ ওয়ানডেটা খেললেন। নিজেকে আরও তৈরি রাখতে, সামনে বিশ্বকাপ বলে পুরো তৈরি রাখতে প্রিমিয়ার লিগে খেলারও সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৮ ডিসেম্বর সূর্যতরুণের বিপক্ষে ১০ ওভার বল করে ৩৪ রানে ৩টি উইকেটও নিলেন; দুটি মেডেন ওভার ছিল। ফলে ২১ তারিখ বিকেএসপিতে আবাহনীর বিপক্ষে খেলা নিয়ে কোনো সংশয়ই ছিল না। আবাহনী আগে ব্যাট করছিল।

ব্যাটিংয়ে নেমে সেটা ছিল মাশরাফির সামলানো প্রথম বল। ফ্লিক করে স্কয়ার লেগে পাঠিয়েছিলেন বলটা। ভাবলেন দ্রুত একটা রান বেরিয়ে আসবে। সে জন্য দৌড়ও শুরু করেছিলেন। কিন্তু নন-স্ট্রাইকিং প্রান্ত থেকে ফরহাদ হোসেন বুঝতে পারছিলেন, ওখানে রান নেই। তিনি 'নো' বলে প্রবল চিৎকার করলেন। ফেরার চেষ্টায় প্রচণ্ড গতিতে ঘুরতে গেলেন মাশরাফি; পড়ে গেলেন উইকেটের ওপর।

রানআউট হয়ে গেছেন। কিন্তু সামান্য এই রানআউটের চেয়ে বড় আউট মাশরাফি আসলে সেই পতনের সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেছেন। তিনি সুস্থ হয়ে উঠুন আর না-ই উঠুন; এই পতন তাকে আউট করে দিল আসলে ২০১১ বিশ্বকাপে। প্রথমবারের মতো ব্যাটিংয়ের সময় পাওয়া চোট হয়ে গেল ক্যারিয়ারের সবচেয়ে ট্র্যাজিক ঘটনা। আবার ডান হাঁটুর ব্যথা নিয়ে ফিরলেন মাশরাফি ঢাকায়।

পরের দিনই এমআরআই করানোর পর নিশ্চিত হওয়া গেল, ডান হাঁটুর এসিএল বা মূল লিগামেন্টের ৭০ শতাংশ ছিঁড়ে গেছে। বিসিবির ক্রীড়া চিকিৎসক মোহাম্মদ মনিরুল আমিন জানিয়েছিলেন, প্রাথমিক রিপোর্টে মনে হচ্ছে, লিগামেন্টের অংশবিশেষ ছিঁড়ে গেছে।

এরপর মাশরাফিকে অ্যাপেলো হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে বিশেষজ্ঞ অর্থোপেডিক সার্জন ও হাঁটু বিশেষজ্ঞ ডক্টর এম আলি, মেলবোর্ন থেকে ডক্টর ডেভিড ইয়াং ও অ্যাপেলো হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ রেডিওলজিস্ট বিদ্যুৎ সাহা আলোচনা করে ঠিক করেন, এ অবস্থায় বিশ্বকাপ সামনে রেখে মাশরাফিকে 'কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট' করা হবে।

এই পদ্ধতিতে অপারেশন বাদ দিয়ে ফিজিক্যাল থেরাপি ও হাঁটু আটকে রেখে চিকিৎসা এগিয়ে নেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় মাশরাফিকে ১০ দিনের পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া হলো। বোর্ড এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানাল, এই পদ্ধতিতে মাশরাফি তিন সপ্তাহের মধ্যে ব্যাটিং ও চার সপ্তাহের মধ্যে বোলিং শুরু করতে পারবেন।

পুরো ব্যাপারে বিসিবি প্রতিনিয়ত ডক্টর ডেভিড ইয়াংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল।

সেই সঙ্গে বিসিবি থেকে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়

বোর্ড আশা করে যে, এই অতিগুরুত্বপূর্ণ পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ায় সবাই মাশরাফির

প্রাইভেসিকে সম্মান দেবেন। মুর্তজা তার ক্যারিয়ারজুড়ে সাহস ও ইচ্ছাশক্তির এক রোল মডেল হয়ে আছে। একমাত্র মানসিক সমর্থন ও সাহসই পারে তার উপকার করতে।

৬.

মাশরাফি ইনজুরিতে পড়ার তিন দিনের মাথায় বিসিবি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, বিশ্বকাপে অধিনায়কত্ব করবেন সাকিব।

একটা টানাপোড়েন ছিল। সাকিব গত কিছুদিন অধিনায়কত্ব করছিল ভালোই; তার নেতৃত্বে নিউজিল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করা গেছে। আবার নিয়মিত অধিনায়ক মাশরাফিও ফিরে এসেছেন। কাকে অধিনায়ক করা হবে, সে নিয়ে মতবিরোধ ছিল বোর্ডে। তবে ২৩ ডিসেম্বরের বিশেষ সভায় বিসিবি সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারল যে, দায়িত্বটা সাকিবই পালন করবেন। কারণ, মাশরাফির যে ইনজুরি, তাতে বিশ্বকাপ খেলা নিয়েই শঙ্কা।

তবে এরও দিন তিনেক পর জানা গেল, মাশরাফির এ মুহূর্তে অপারেশনের যেহেতু সম্ভাবনা নেই, তাই তিনি দ্রুতই বোলিং শুরু করবেন। ফলে বিশ্বকাপে খেলার জোরদার সম্ভাবনা টিকে রইল তার। ২৯ তারিখ জেমি সিডন্স সংবাদমাধ্যমে বলছিলেন, তিনি আশাবাদী, মাশরাফির দ্রুত উন্নতি হচ্ছে এবং তাকে ফিট পাওয়া যাবে। মাশরাফির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বড় গলায় কথা বললেন সেদিন সিডন্স।

বিশ্বকাপে মাশরাফি থাকবেন কি না, এটা তখন জাতীয় বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দৈনিক কালের কণ্ঠে তখন বিশেষজ্ঞরা প্রতিদিন বিশ্বকাপের তাদের পছন্দের দল জানাচ্ছিলেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই তালিকায় শফিকুল হক হীরা, আমিনুল ইসলাম বুলবুল, ফারুক আহমেদ, খালেদ মাসুদ পাইলট, খালেদ মাহমুদ সুজনরা বলছেন–তারা দলে মাশরাফিকে রাখতে চান।

মাশরাফিকে রেখে দল তৈরি করেছিলেন প্রখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক, তখন সকালের খবরের ডেপুটি স্পোর্টস এডিটর আরিফুর রহমান বাবু। 'মাশরাফিকে ছাড়া ভাবতে পারছি না' শিরোনামে তিনি লিখেছিলেন :

বিশ্বকাপ দল গড়ার সময় আবেগের আগে যুক্তি থাকা উচিত। আমার যুক্তি বলছে, ৮০ ভাগ ফিট মাশরাফিকেও দলে নিতে হবে। ভারতের বিপক্ষে আমাদের প্রথম ম্যাচটাতে ওকে অবশ্যই দরকার। মাশরাফিকে ছাড়া আমি ভাবতে পারছি না।...দলের পেস বোলিং আক্রমণকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ওর অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য অমূল্য। শেষের দিকে ওর ব্যাটিংও কাজে দেবে। [8]

মজার ব্যাপার হলো, কালের কণ্ঠ সে সময় একটা পাঠক জরিপও করেছিল বিশ্বকাপের দল নিয়ে। তাতে দেখা গেল, বিশাল সংখ্যায় পাঠকের ভোট নিয়েও বিশ্বকাপ দলে আছেন মাশরাফি।

৭.

ইচ্ছাশক্তির একটা চরম রূপ দেখাবেন বলেই ঠিক করলেন মাশরাফি।

তিন সপ্তাহের মধ্যে নেটেই বল করা শুরু করলেন। চার সপ্তাহের মাথায় নিয়মিত ছোট রানআপে বল করা শুরু করলেন। বিশ্বকাপের দল ঘোষণার তখনো কয়েক দিন বাকি।

মাশরাফি শুধু কোচ-ফিজিওর কাছে জানতে চান, তিনি বিশ্বকাপ দলে থাকবেন কি না। কোচ জেমি সিডন্স প্রকাশ্যে যেমন বলেন, মাশরাফিকেও বললেন, ফিটনেস প্রমাণ করতে পারলেই মাশরাফি দলে থাকবেন।

সে জন্য মাশরাফিকে তিনি একটা ডেডলাইনও বেঁধে দিলেন। বললেন, ৭ তারিখের মধ্যে মাশরাফি ম্যাচ ফিট হলে তাকে বিশ্বকাপের দলে রাখা হবে। এ অবস্থায় মাশরাফির জন্য জরুরি ছিল, সরাসরি ডেভিড ইয়াংয়ের ভাষ্যটা জানা।

ঘটনাচক্রে ডা. ইয়াং তখন শ্রীলঙ্কায়। এখানে বিপুল চ্যারিটির কাজ আছে তার; সেই কাজে এসেছিলেন। মাশরাফি সোজা কলম্বোতে চলে গেলেন। মাশরাফিকে দেখে ডেভিড ইয়াং বললেন, 'তুমি কি বিশ্বকাপ খেলতে চাও?'

'অবশ্যই চাই।'

'তাহলে তোমার বোর্ড চাইলে তোমাকে খেলাতে পারে। এখন খেলানো আর এক মাস পরে খেলানোর মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই।'

'মানে?'

'মানে হলো, এখন পুনর্বাসন করে যে ফিটনেস ফিরে পাওয়ার, তা তোমার চলে এসেছে। বাড়তি যেটা করা যেতে পারে, আরেকবার হাঁটু ওপেন করে লিগামেন্টটা চেপে দেওয়া যেতে পারে। এর চেয়ে আমি এ অবস্থায় খেলা সমর্থন করি।'

'একটু বুঝিয়ে বলবে?'

'দেখো, এখন খেলায় অন্য কোনো ঝামেলা নেই। খেলাধুলার অর্থে তুমি পুরো ফিট। তবে ঝুঁকি আছে। খেলতে গিয়ে পড়ে গেলে লিগামেন্টটা পুরো ছিঁড়ে যাবে। অপারেশন লাগবে। আমার কথা হলো, আরেকটা অপারেশন তোমার লাগবেই; বিশ্বকাপের পর। ফলে সেটা ছিঁড়ে গিয়ে লাগলে খুব একটা ক্ষতি নেই।'

মাশরাফি শুধু বললেন, এই পুরো ব্যাপারটা লিখে বোর্ডকে জানাতে। ডা. ইয়াং বললেন, তার সাথে যেহেতু ফিজিও মাইক হেনরির যোগাযোগ হয়, তাই তিনি তাকে মেইল করে দেবেন। আর কপি পাঠাবেন মাশরাফিকে।

৮.

বিসিবির সংবাদ সম্মেলনের জন্য আগে বোর্ডের মূল ভবনের নিচতলায় একেবারে শেষ প্রান্তে ছোট একটা সংবাদ সম্মেলনকক্ষ ছিল। সেটা ছোট হওয়ায় পরে বর্তমানের বিশাল সংবাদ সম্মেলনকক্ষ তৈরি করা হয়েছে মিডিয়া সেন্টার ভবনে।

সে সময়ও বর্তমানের এই সংবাদ সম্মেলনকক্ষ চালু না হওয়ায় বিসিবি একটু বিপাকেই পড়ল—দেশ-বিদেশের এত সংবাদমাধ্যমের এত সাংবাদিক নিয়ে কোথায় সংবাদ সম্মেলন করা যায়। শেষ পর্যন্ত বিসিবি একাডেমি ভবনের থিয়েটার হলে আয়োজিত হলো বিশেষ এই সংবাদ সম্মেলন।

সংবাদ সম্মেলনের আগের রাতেই একটা নাটক অবশ্য হয়ে গেল। বোর্ড মাশরাফির নাম দলে নেই দেখে তালিকা ফেরত পাঠিয়েছিল নির্বাচক কমিটির কাছে। বেশ কয়েকজন পরিচালক নাকি ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। অন্তত তেমনটা জানিয়েছিল তখনকার সংবাদমাধ্যম। টেকনিক্যাল কমিটির কাছে ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছিল নির্বাচকদের অবস্থা। সেই ব্যাখ্যাপর্বে শেষ পর্যন্ত অবশ্য দুপক্ষ একমত হয়েছিল।

অবশেষে প্রধান নির্বাচক পড়া শুরু করলেন বাংলাদেশের বিশ্বকাপ দল। আস্তে আস্তে শেষের দিকে এগোচ্ছেন, কলম-কাগজ নিয়ে শ্বাসরোধ করে অপেক্ষা করছেন সবাই।

না, একে একে সবার নাম ঘোষণা করা হয়ে গেল। এই তালিকায় মাশরাফি বিন মুর্তজার নাম নেই। আরেকবার সবাই লেখা নামগুলো পড়ে দেখলেন। তারপরই প্রশ্ন করার জন্য একসঙ্গে প্রায় সব সাংবাদিক হাত তুলে ফেললেন। সবার প্রশ্ন একটাই–মাশরাফির কী হলো।

খুব তাড়াহুড়ো করে কোনোক্রমে এই প্রশ্নে উত্তর দিলেন প্রধান নির্বাচক। তিনি পরে সংবাদমাধ্যমে মাশরাফির ফিটনেস নিয়ে বলেছিলেন, মাশরাফি ফিটনেসের আশপাশেও নেই!

***

এদিকে সংবাদ সম্মেলন চলছে, ওদিকে একাডেমি মাঠেই নেট করছেন মাশরাফি বিন মুর্তজা। সংবাদ সম্মেলন শেষ হতেই সবাই ছুট দিলেন মাশরাফির দিকে।

মাশরাফি খবরটা জেনে ফেলেছেন।

প্রথম ধাক্কাটা ভালোই সামলালেন। বললেন–এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বেদনার দিন।

এরপর আরেকটু ব্যাখ্যা করে বললেন, তিনি নিজের ফিটনেস নিয়ে শতভাগ নিশ্চিত ছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত এটাকে দুর্ভাগ্য বলে মেনেই নিয়েছেন, *‘আমি আমার ফিটনেস ফিরে পাওয়া নিয়ে শতভাগ নিশ্চিত ছিলাম। যাই হোক, এটাই জীবন। আমি এটা মেনে নিয়েছি।’ [৫]*

এমন কেতামাফিক কথায় শেষ হলে তো কথা ছিল না।

কিন্তু কথোপকথনের একেবারে শেষলগ্নে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, ‘এই বাদ পড়া আসলে কতটা বেদনার?’

আর মাশরাফির কথা নেই, এই প্রশ্নের কোনো উত্তর হয় না। শুধু হয় বুকচেরা কান্না।

৯.

দল ঘোষণার সময় মাশরাফিকে না রাখার পেছনে একটা বড় যুক্তি ছিল, ফিজিও তাকে ফিট মনে করেননি। তিনি ডা. ডেভিড ইয়াংয়ের কাছ থেকে যে মেইল পেয়েছেন, তাতে নাকি বলা হয়েছে, মাশরাফি এখনো ম্যাচ ফিট নন।

অথচ সেই মেইলের কপি বলছে ভিন্ন কথা।
ফিজিও মাইক হেনরি দল ঘোষণার আগের দিনও সংবাদমাধ্যমে বলেছিলেন *'(মাশরাফি) দারুণ সাড়া দিচ্ছে এবং সে বোলিং করার পরও কোনো নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখিনি। সব ঠিক আছে।' [৬]*
দল ঘোষণার আগের দিন জেমি সিডন্সও বলছিলেন :
'সে (সেরে ওঠার) সঠিক পথেই আছে। ও আজও বল করবে। আট-দশ দিনের মধ্যে পুরো রানআপে বল করবে। আমি আশা করছি, ও বিশ্বকাপের আগে পুরো সুস্থ হয়ে যাবে। আমি তাকে দলে চাই, আমি ফিট মাশরাফিকে চাই।' [৭]
এই চাওয়ার কী প্রতিফলন তিনি দেখিয়েছেন, তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন তোলা চলে।

১০.
মাশরাফির বিশ্বকাপ দল থেকে বাদ পড়াতেই নাটক শেষ হলো না। টিম ম্যানেজমেন্ট মাশরাফির সঙ্গে ছেলেখেলা আরও অনেকটা সময় ধরে চালিয়ে গেল। তাকে বাদ দিতে গিয়ে বলা হয়েছিল, ফিটনেস প্রমাণ করতে পারেননি। ফিজিও মাইক হেনরি নাকি বলেছেন, তিনি এই সময়ের মধ্যে ফিটনেস ফিরে পাবেন না। এদিকে মাইক সংবাদমাধ্যমে বলছেন, তিনি এমন কোনো কথা তার রিপোর্টে বলেননি :
যার রিপোর্টের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন নির্বাচকেরা, সেই ফিজিও মাইকেল হেনরি কিন্তু বলছেন অন্য কথা, 'আমি আমার রিপোর্টের কোথাও লিখিনি যে, বিশ্বকাপের আগে ফিট হতে পারবে না মাশরাফি। আপনাদের তাহলে ভুল জানানো হয়েছে।' [৮]
জেমি সিডন্স তাকে বলেছিলেন, ৭ তারিখের মধ্যে ম্যাচ ফিটনেস প্রমাণ করতে; তাহলে যেভাবে হোক দলে রিপ্লেসমেন্ট এনে হলেও দলে ফেরাবেন তাকে।
৫ তারিখ মাশরাফি প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচ খেলতে নেমে গেলেন আবাহনীর হয়ে। ব্যাট করলেন, ৫০ ওভার ফিল্ডিং করলেন; ১০ ওভার বলও করলেন। স্লিপ ও মিড উইকেটে দুর্দান্ত দুটো ক্যাচও নিলেন।
এই ম্যাচে তার পারফরম্যান্স প্রতিপক্ষ দলে থেকে দেখেছিলেন খালেদ মাসুদ পাইলট। তিনি মনে করেন, মাশরাফি বিশ্বকাপ খেলার মতো ফিটনেস এখানে প্রমাণ করে ফেলেছে। আবাহনীর কোচ হিসেবে খেলা দেখে রীতিমতো মুগ্ধ ছিলেন খালেদ মাহমুদ সুজন। তারও মতে, ফেরার ম্যাচ হিসেবে অসাধারণ বল করেছেন তিনি।
জাতীয় দলের সাবেক কোচ ও বোলিং কোচ সারোয়ার ইমরান দেখেছিলেন খেলা। তিনি সংবাদমাধ্যমে বলছিলেন :
পেপারে ওর ব্যাপারে পড়ছিলাম অনেক কিছু। কিন্তু মাঠে ওর ছন্দটা দেখলাম বেশ ভালো। পেস একটু কম মনে হলেও কয়েকটা ম্যাচ প্র্যাকটিসের সুযোগ পেলে পুরোপুরি ফিট হয়ে যাবে বলে মনে হয়েছে। [৯]
এই ম্যাচ নিয়েও হলো নাটক। মাশরাফির ফিরে আসার ম্যাচ, এই ম্যাচ দেখতে

এমনিতেই ফিজিও মাইক হেনরির মাঠে থাকার কথা। কিন্তু মাইক হেনরি তো দূরে থাক, ফতুল্লায় আবাহনীর এই ম্যাচ দেখতে টিম ম্যানেজমেন্টের কেউ সেদিন ফতুল্লায় যাননি। সেই ম্যাচ না দেখে, সহকারীদের কারো কাছ থেকে না শুনেই জেমি সিডন্স বলে দিলেন, 'মাশরাফি আনফিট'।

কিছু না দেখেই তিনি বললেন :

দলের বাইরে যারা আছে, তাদের নিয়ে চিন্তিত নই। মাশরাফি আনফিট। তাকে নিয়ে ভাবছি না। [১০]

এত দিন পর্যন্ত নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করলেও, ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ থাকলেও কারোর সঙ্গে কোনো বিবাদে জড়াননি। তাকে নিয়ে যে ছেলেখেলা হচ্ছিল, কোনো কিছুতেই কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি। এদিন আর পারলেন না।

সিডন্স বুঝতে পারছিলেন, ভেতরে ভেতরে যাই করুন, এমন কথা তার বলাটা একটা কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে। কারণ, ততক্ষণে ফিজিও আবার মাশরাফিকে বলে দিয়েছেন, সিডন্সের এমন কথা বলা ঠিক হয়নি।

এসব টের পেয়ে সিডন্স একটা এসএমএস করেছিলেন মাশরাফিকে–আমি তোমার শত্রু নই; আরও অনেক কিছু বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। কোনো কিছুতে কাজ হয়নি।

পত্রিকায় সিডন্সের ওই কথা পড়ে সোজা হাজির হলেন মিরপুর স্টেডিয়ামের ইনডোরে। সেই দৃশ্যটা দেখে রীতিমতো শিউরে উঠেছিলেন উপস্থিত অন্য খেলোয়াড়েরা ও সাংবাদিকেরা। দীর্ঘক্ষণ ধরে সিডন্সের সঙ্গে বাদানুবাদ চলল মাশরাফির।

প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এটুকু মনে করা যায়, সিডন্স চেষ্টা করছিলেন মাশরাফিকে থামাতে। মাশরাফিই বলছিলেন। একপর্যায়ে মাশরাফিকে ধরে আরও ভেতরে নিয়ে যান সিডন্স। সেখানে কী হয়েছিল, সেটা বলা কঠিন। তবে মাশরাফি বের হওয়ার সময় শুধু বলে গিয়েছিলেন, 'আমি ওকে বলেছি, আমি ফিট কি না, এটা ওর বলার কথা নয়। ফিজিওর বলার কথা। কিন্তু সে বা ফিজিও কেউ কি দেখেছে, আমি ফিট কি না!'

তবে পরদিনের পত্রিকা সাক্ষ্য দিচ্ছে, মাশরাফির অভিযোগ এর চেয়েও গুরুতর ছিল। তিনি সিডন্সকে মিথ্যাচারের দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন। নিজেই তাকে ফিটনেসের প্রমাণ দিতে বলে সে প্রমাণের আগেই তাকে আনফিট রায় দিয়ে দিয়েছিলেন :

ইনডোরের দরজা থেকে মাশরাফিকে টেনে নিয়ে গেলেন ভেতরে। দুজনের মধ্যে যুক্তি-পাল্টা যুক্তি চলল মিনিট বিশেক। কথা বলার সময় দূর থেকে দুজনকেই মনে হয়েছে, যার যার যুক্তিতে অটল। আলোচনার পরিবেশ আর যাই হোক সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল না।...বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে কোচকে তেমন কিছুই বলেননি মাশরাফি। তবে অভিযোগ তুলেছেন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের। মাশরাফিকে ৭ তারিখের মধ্যে ফিটনেস প্রমাণ করতে বলা হয়েছিল। ৫ ফেব্রুয়ারি প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচের পুরো ১০ ওভার

বোলিং ও ৫০ ওভার ফিল্ডিং করে মাশরাফি সেটা প্রমাণও করেছেন। [১১]
ঘটনা এখানেও শেষ হলো না।
মাশরাফি নেটে দারুণ বল করছেন এবং প্রিমিয়ার লিগে ভালো বল করছেন, এটা দেখে বাংলাদেশের টিম ম্যানেজমেন্টের শোক তৈরি হয়েছিল। তারা আফসোস শুরু করলেন, কেন মাশরাফিকে দলে রাখা হয়নি।
যদিও প্রত্যেকে প্রত্যেকের ঘাড়ে দোষ দেওয়ার চেষ্টা চালানো চলতে থাকল। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বোর্ড কর্মকর্তারা নির্বাচক কমিটিকে, নির্বাচক কমিটি কোচকে এবং কোচ নির্বাচক কমিটিকে দোষারোপ করলেন। জেমি সিডন্স মাশরাফিকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, তিনি ১৫ সদস্যের দল নির্বাচনে কোনো ভূমিকা রাখেননি। এমনকি তিনি এও দাবি করলেন যে, তিনি নির্বাচকদের বলেছিলেন, দল ঘোষণার আগে মাশরাফির সর্বশেষ অবস্থা যাচাই করতে প্রয়োজনে চিকিৎসকদের সঙ্গে আরেকবার আলাপ করে নেওয়া হোক!
এ সময় একদিন নেট থেকে দলের শীর্ষস্থানীয় দুজন তারকা অনুশীলন শেষ করে এসে মাশরাফিকে বলেছিলেন–কোচ বলছিল, কেউ ইনজুরিতে পড়লেও ভালো হতো; আপনাকে দলে নেওয়া যেত।

১১.
কেউ ইনজুরিতে পড়লে মাশরাফি ডাক পেতে পারেন–এই সম্ভাবনাটা তো বটেই, নানাভাবেই মাশরাফির বাদ পড়ার পরও বিশ্বকাপে ফেরার সম্ভাবনা তীব্র হয়ে উঠল।
মাশরাফির বাসায় গিয়ে সমবেদনা জানালেন স্বয়ং ক্রীড়ামন্ত্রী আহাদ আলী সরকার, বিসিবি সভাপতি আ হ ম মুস্তফা কামাল। প্রধান নির্বাচক রফিকুল আলম ২০ জানুয়ারিতেও বলছেন, 'ফিট হয়ে গেলে মাশরাফির খেলার সম্ভাবনা আছে।'
১৯ জানুয়ারি অধিনায়ক সাকিব আল হাসান বলছিলেন, তিনি মনে করেন না, মাশরাফির বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গেছে :
অনেক সময়ই তো অনেকভাবে অনেক কিছু করা যায়। উনি যেভাবে উন্নতি করছেন, তাতে উনি ফিট হয়ে গেলে দলের জন্য ভালো। এটা নিয়ে খুব একটা ঝামেলা হওয়ার কথা নয়। আর স্কোয়াডের একজন তো ইনজুরড হতেই পারে। [১২]
২০ জানুয়ারি বোর্ডে একটা হইচই পড়ে গেল। বোর্ড কর্মকর্তারা আইসিসির প্লেয়িং কন্ডিশন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা শুরু করলেন। মাশরাফিকে এই সময়ে বল করতে দেখে তারা একরকম প্রতিজ্ঞাই করে ফেললেন, যেকোনো মূল্যে মাশরাফিকে দলে ঢোকাতে হবে। আইসিসির সাধারণ আইন বলছে, কেউ ইনজুরিতে পড়লে সুযোগ আছে। এ ছাড়া আর কোনো উপায় আছে কি না, খতিয়ে দেখা হতে লাগল।
এসব আলোচনা চলতে থাকা অবস্থায় ১৭ ফেব্রুয়ারি মহা ঢাকঢোল পিটিয়ে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়ে গেল। ১৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বাংলাদেশ ও ভারত উদ্বোধনী ম্যাচ খেলে ফেলল। এরপরও ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কাঁপিয়ে দিল

কালের কণ্ঠের একটি খবর–মাশরাফিকে ফেরানোর পথ খোঁজা হচ্ছে!
এই রিপোর্টে সাইদুজ্জামান লিখলেন, ইনজুরি তো বটেই, বিশেষ ব্যবস্থাতেও বিশ্বকাপ দলে মাশরাফিকে নেওয়ার সুযোগ আছে। কোনো কারণ ছাড়াই দলে অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসেবে নেওয়া যেতে পারে তাকে। আর টেকনিক্যাল কমিটির অনুমোদন পেলে তিনি খেলতেও পারবেন। তবে এই অনুমোদনের চেয়ে সহজ হলো, কোনো খেলোয়াড় যদি নিজে থেকে বিশেষ কারণ দেখিয়ে নাম প্রত্যাহার করেন, তার বদলে খেলা। আর এটাকেও এখন কাজে লাগাতে চাইছে বোর্ড :
অতিরিক্ত খেলোয়াড় ম্যাচের একাদশে তো দূরে থাক, দ্বাদশ ব্যক্তির ভূমিকাও নিতে পারবেন না। অবশ্য বিশ্বকাপের টেকনিক্যাল কমিটির অনুমোদন মিললে ম্যাচও খেলতে পারবেন পরে দলে ঢোকা খেলোয়াড়টি। তবে সে অনুমোদন মিলবে শর্ত সাপেক্ষে। ফর্ম হারিয়ে ফেলা কারো পরিবর্তে নতুন কাউকে অনুমোদন দেবে না টেকনিক্যাল কমিটি। তবে যদি কেউ চোট পান কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাহলে 'রিপ্লেসমেন্ট; যেকোনো সময়ে নেওয়া যাবে। রিপ্লেসমেন্ট আইনে আরেকটি দিগন্ত উন্মোচন করে দেওয়া ধারা আছে। ফর্ম ছাড়া বিশেষ কারণে যদি কোনো ক্রিকেটার বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেন, তাহলে তার পরিবর্তে অন্য কাউকে চাইতে পারবে সংশ্লিষ্ট দল। যে 'বিশেষ কারণ'-এর সুনির্দিষ্ট পরিধি উল্লেখ কোথাও নেই।
সীমাহীন এ 'বিশেষ কারণ' কি মাশরাফির বিশ্বকাপ স্বপ্নের পরিধি বাড়িয়ে দিচ্ছে? [১৩]

১২.

মাশরাফি শোকগ্রস্ত ছিলেন, কিন্তু কোচের সঙ্গে ওই একটা বাদানুবাদ বাদ দিলে ক্ষোভ অন্তত কোথাও প্রকাশ করেননি। কিন্তু মাশরাফি-ভক্তরা এমন নির্মোহ থাকতে পারছিলেন না।
দেশের বিভিন্ন জায়গায় মানববন্ধন, ছোটখাটো মিছিল হয়েছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সামনেও কিছু মাশরাফি-ভক্ত জড়ো হয়ে ক্ষোভ দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। মাশরাফি তার ও চিকিৎসকের ভাষ্যমতে সুস্থ থাকা সত্ত্বেও মাশরাফিকে দলে না রাখায় সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল নড়াইল।
নড়াইলে ২০ জানুয়ারি আধাবেলা হরতাল পালন করা হলো। শুভেচ্ছা ক্লাবে মাশরাফির বন্ধুরা সে হরতালে যতটা সম্ভব অহিংস রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু স্থানীয় কিছু অতি আবেগপ্রবণ কিশোর কিছু ভাঙচুরও করেছিল বলে খবর প্রকাশিত হয়েছিল।
শহরজুড়ে মানববন্ধনের পাশাপাশি পুরো ঘটনায় ভিলেন বানিয়ে ফেলা হয় জেমি সিডন্সকে। তার ধোঁয়াশাপূর্ণ ভূমিকার কারণে একাধিক স্থানে কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয় এই অস্ট্রেলীয় কোচের।
শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে মাশরাফি অনেকটাই শান্ত হয়ে উঠেছেন তখন।
আবাহনীর জার্সি গায়ে প্রায়ই অনুশীলনে আসছেন। পুরোদমে বল করছেন। এমনই

একদিন নেটে পুরো রানআপে ৬ ওভার টানা বল করে ফেরার পথে বলছিলেন
আমি খুব হতাশ, কারণ আমি এখানে (বিশ্বকাপে) কাল কোনো ভূমিকা রাখতে পারব না। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হলো, আমি পুরোপুরি ফিট; তারপরও আমি বাইরে আছি। তবে শেষ পর্যন্ত যা-ই হোক, দলে যারা আছে এরা সবাই যোগ্য খেলোয়াড়। তবে আমি সব সময় অনুশীলন করে নিজেকে তৈরি রাখছি, দল দরকার হলেই যেন আমাকে পাওয়া যায়। আমি কোনোমতেই আশা করছি না যে, কারো ইনজুরির ফলে আমি দলে ডাক পাই। তবে নিজেকে তৈরি রাখছি আর কী। [১৪]

একবার যখন বুঝে ফেললেন, কার্যত এই বিশ্বকাপটা দুঃস্বপ্নই হয়ে গেছে, তার জন্য। মাশরাফির কাছে রইল শুধু দলের জন্য শুভকামনা :
বাংলাদেশ দলে কে খেলছে, কে খেলছে না–এগুলো এখন আর কোনো বিষয় নয়। বিশ্বকাপ একেবারে দোরগোড়ায়। আমাদের সবার উচিত এই দলটাকেই মনেপ্রাণে সমর্থন দেওয়া; সবাই যেন বিশ্বকাপে দলের পাশে থেকে তাতের মঙ্গল কামনা করে। শুধু এই ১৫ জন ক্রিকেটার নয়, বিশ্বকাপটা যেন হয় বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের লড়াই। [১৫]

১৩.

মাশরাফি বিন মুর্তজা বাংলাদেশ দলে নেই বলে কি খুশি?

অন্তত এবার তো আর সে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হতে পারছে না। এতেই আপাতত খুশি।

সংবাদ সম্মেলনে এই উত্তরটা দিয়ে মহেন্দ্র সিং ধোনি যেমন ভাবে হাসছিলেন, তাতে মনে হতে পারে, মাশরাফি না থাকাতেই বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচটা জিতে গেছেন তারা।

ম্যাচে ভারত সত্যিই জিতে গিয়েছিল। তবে ম্যাচের আগ পর্যন্ত কিন্তু বিশ্বকাপ দলে না থেকেও ভারতীয়দের কাছে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় ছিলেন মাশরাফি। ম্যাচের আগের দিন পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেটাররা নানাভাবে খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেছেন, শেষ সময়ে মাশরাফিকে খেলিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা।

তাদের এমন আশঙ্কা করার যুক্তিও ছিল। বাংলাদেশ দলের তিন পেসারই কমবেশি ইনজুরি নিয়ে ঘুরছেন। সঙ্গে মাশরাফিকে দেখা যাচ্ছে দলের সঙ্গে সুস্থ অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে ফলে মাশরাফি-ভীতি কেন থাকবে না?

অবশ্য ভেতরের খবরাখবর নিশ্চিত করছিল, মাশরাফিকে নিয়ে ভারতের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আরেকটি পোর্ট অব স্পেন অন্তত মাশরাফি ঢাকায় এবার তৈরি করে দিচ্ছেন না। তারপরও মাশরাফি-বিষয়ক আলোচনা কি শেষ হয়ে গেল?

মোটেও না। ধোনির সংবাদ সম্মেলনে ম্যাশরাফির প্রসঙ্গ এল। ভারতীয় অধিনায়ক স্বস্তির হাসি হেসে বুঝিয়ে দিলেন, এ-যাত্রা একটা বিপাক থেকে রক্ষে পেয়েছেন তারা।

[১] Mortaza will captain Bangladesh in World Cup–Siddons; ক্রিকইনফো (উদ্ধৃত 'ক্রিকেট ৩৬৫ ডট কম'; ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১০)
[২] মরে না গেলে খেলবই; প্রথম আলো (৯ অক্টোবর, ২০১০)
[৩] 'I need time to get my rhythm back': Mortaza; ক্রিকইনফো (৫ ডিসেম্বর, ২০১০)
[৪] মাশরাফিকে ছাড়া ভাবতে পারছি না; আরিফুর রহমান বাবু (কালের কণ্ঠ; ৯ জানুয়ারি, ২০১১)
[৫] Mashrafe Mortaza not in World Cup squad; ক্রিকইনফো (১৯ জানুয়ারি, ২০১১)
[৬] ওই
[৭] ওই
[৮] মাশরাফি কি সত্যিই আনফিট?; মাসুদ পারভেজ (কালের কণ্ঠ; ২০ জানুয়ারি, ২০১১)
[৯] বড় একটা ভুল হয়ে গেছে; কালের কণ্ঠ (৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১১)
[১০] মাশরাফি আনফিট; প্রথম আলো (৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১১)
[১১] মাশরাফি-সিডন্স মুখোমুখি; প্রথম আলো (৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১১)
[১২] সাকিব তবু মনে করেন না মাশরাফির বিশ্বকাপ শেষ; কালের কণ্ঠ (২০ জানুয়ারি, ২০১১)
[১৩] মাশরাফিকে ফেরানোর পথ খোঁজা হচ্ছে; সাইদুজ্জামান (কালের কণ্ঠ; ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১১)
[১৪] Bullish Bangladesh ready for battle; সিদ্ধার্থ মঙ্গা (ক্রিকইনফো; ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১১)
[১৫] আমি নেই তো কী হয়েছে! মাশরাফি বিন মুর্তজা (প্রথম আলো; ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১১)

একলা পুরুষ পিতায়



১.

হুমায়রা খুব বাবার নেওটা।

বাবা ছাড়া তার একটা মুহূর্তও চলে না। বাসায় খেলতে বাবাকে চাই, ঘুরতে বাবাকে চাই; টুকটুক করে দুটো কথা বলতেও বাবাকেই চাই।

বাবা জামাকাপড় পরতে শুরু করলেই বুঝতে পারে, এবার বাবার কোল থেকে আর নামা চলবে না। যেখানেই বাবা যাবে না কেন, হুমায়রাকে নিয়ে যাওয়া চাই। কার সাধ্যি তখন বাবার কোল থেকে হুমায়রাকে নামিয়ে রাখে!

মিরপুরে অনুশীলন বা খেলার সূচি না-থাকা দিনে একাকী জিমে আসা মাশরাফিকে যারা দেখেছেন, তারা প্রায়ই দেখে থাকবেন, মাঠের পাশেই কারো হাত ধরে বাবার জন্য অপেক্ষা করছে লক্ষ্মী মেয়ে হুমায়রা। কোনো তাড়া নেই, বাসায় যাওয়ার কোনো বায়না নেই। শুধু বাবাকে চোখের আড়াল করা চলবে না।

সমস্যা হলো, খেলা বা প্র্যাকটিস থাকলে তো সব সময় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আসা চলে না। তাই সেদিন কোনো একটা

কৌশল করতে হয়। কখনো পালিয়ে আসতে হয়, কখনো 'বাথরুম যাচ্ছি' বলে পাশের রুম থেকে দৌড়। এমন করে আর কত দিন চলে!
একদিন মাশরাফি বলল, 'বাবাকে যেতে দিতে হবে। নইলে চাচুগুলো আছে না, যারা মাঠে খেলে, ওরা বাবাকে মারবে।'
'আমি সঙ্গে গেলে কি মারবে?'
'হ্যাঁ। কাউকে সঙ্গে নিলেই চাচুরা বাবাকে মারবে।'
সেই থেকে হুমায়রা খেলতে আসার সময়, হোটেলে ওঠার সময় বা বিদেশ যাওয়ার সময় আর আটকায় না। নিজেই মাকে বলে, 'বাবাকে ছেড়ে দাও। না গেলে চাচুরা মারবে।'
বাবাকে ছেড়ে থাকার কষ্ট তবু সহ্য করা যায়; চাচুদের হাতে কি বাবার পিটুনি সহ্য করা যায়!
এই হলো বাবা-মেয়ের গল্প। গল্পটা এখন আসলে পিতা ও পুত্র-কন্যার।
আমাদের সেই ছোট্ট কৌশিকের গল্প বলতে বলতে আমরা অনেক দূর চলে এসেছি। কৌশিক এখন মাশরাফি এবং মাশরাফি এখন দুই সন্তানের পিতা। তবে এমন সরল করে গল্পটা আমরা বলে ফেলতে পারছি না। মাশরাফির সারাটা জীবন যেমন নাটকীয়তায় ভরপুর। দুটি সন্তানের জন্ম ও জন্মপরবর্তী ঘটনাও তেমন নাটকীয়তায় ভরপুর।

২.
মাশরাফি হতাশ হতে জানে না। বেশি সময় মন খারাপ করে থাকাটা তার সহ্য হয় না।
কিন্তু ২০১১ বিশ্বকাপের যন্ত্রণা যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছিল না। প্রতিদিন অনুশীলনে যায়, জোরের ওপর বল করে আসে। বাসায় বিষণ্ন মুখে টেলিভিশনের চ্যানেল ঘোরান; পুরোনো দিনের বাংলা সিনেমা দেখেন এবং জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকেন।
এই সময়টায় আড্ডায় যেতেও ভালো লাগে না।
একটা তবু কাজ হচ্ছে। বাসায় সুমী বিছানায় শুয়ে আছে। ওর পেটে মাশরাফির-সুমীর প্রথম সন্তান। সুমীর শরীরটা মোটেও খারাপ ছিল না। তারপরও একটু সময় দেওয়া হচ্ছে মেয়েটাকে। সেই কত ভালোবেসে বিয়ে, কত স্বপ্ন। কিন্তু ব্যস্ততার জীবনে দুদণ্ড সময় দেওয়া হয় না সুমীকে। তবু এ সুযোগ একটু সময় দেওয়া হচ্ছে। মাঝে মাঝে স্কুলজীবনের, কলেজজীবনের টুকটাক গল্প করেন; সময় কেটে যায়।
সাত মাস ধরে জীবনটা বড় করে চলছে সুমী। আর তো কয়েকটা দিন। নতুন এই স্বপ্ন একটু করে আশা দেয় মাশরাফিকে।
হঠাৎ একদিন স্বপ্নের জগৎটা টলে উঠল, মাশরাফি বের হয়ে আসতে হলো

হতাশার ঘোর থেকে। সুমী বলল–শরীরটা খুব খারাপ।
ঘটনাচক্রে সেদিন বাসায় কেউ নেই। বাড়ি থেকে মা-বাবা আসবে আরও কিছুদিন পর। এ সময়টা একাই ছিল বাসায়। প্রথমটা মাশরাফি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না, কী করতে হবে। এমন কাজ তো করে অভ্যেস নেই। বাড়িতে অন্তত তাকে নিয়েই সব সময় সবাই ব্যস্ত থাকে। সে তো এই সময়ে কী করতে হয়, তাই পরিষ্কার জানে না। এটুকু জানে যে, মোহাম্মদপুরের একটা হাসপাতালে সুমীকে চেকআপের জন্য নেওয়া হয়।
হাসপাতালটা বেশি চেনার বিশেষ কারণ, এখানে মাশরাফির নানি আছেন। মাশরাফির মায়ের খালা। ঢাকার বেশ নামকরা প্রসূতিবিদ্যা বিশেষজ্ঞ। তাড়াতাড়ি তাকেই ফোন দিল মাশরাফি, 'নানি, সুমী বলছে, শরীরটা খুব খারাপ।'
মুখে বর্ণনা শুনে নানি বললেন, 'এখনই হাসপাতালে নিয়ে আয় আমি আছি।'
তাড়াতাড়ি ধরাধরি করে সুমীকে লিফট পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া, সেখান থেকে দ্রুত হাসপাতাল। এখানে এসেও ঘোরটা কাটছে না–হঠাৎ কী হলো?
কয়েকটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডাক্তাররা এসে ডেকে নিয়ে গেলেন তাকে। সেখানে নানিও ছিলেন। সিনিয়র এক ডাক্তার বললেন, 'আপনার স্ত্রীর প্রেগনেন্সি জন্ডিস। বিলুরুবিন লেভেল ভয়াবহ রকমের বেশি। সেই সঙ্গে প্লাটিলেট লেভেল কমছে।'
পরিস্থিতি আরেকটু পরিষ্কার করে নানি বললেন, 'কৌশিক, সুমীর অবস্থা আসলে ভালো না। আল্লাহর কাছে দোয়া কর।'
মাশরাফির মাথার মধ্যে কেমন যেন লাগছে। তারপরও ঢোঁক গিলে বলল, 'এখন কী ট্রিটমেন্ট হবে? ওকে কি বাইরে কোথাও নিয়ে যাব?'
'আপাতত তেমন কিছু করে লাভ নেই। এখন রাত হয়ে গেছে অনেক। আজ সারা রাত স্যালাইন চলবে। সকাল থেকে প্লাটিলেট দেওয়া শুরু করতে হবে। আর বিলুরুবিন লেভেল দেখে তবে সিদ্ধান্ত নেব।'
সেই রাত যেন আর কাটে না।
কোনোক্রমে সকাল হলো। ডাক্তাররা আবার বিলুরুবিন পরীক্ষা করলেন; বিস্ময়করভাবে সারা রাত স্যালাইন চলার পরও লেভেল বাড়ছে। ততক্ষণে সুমীর শরীর হলুদ হয়ে যেতে শুরু করেছে। ডাক্তাররা বললেন, 'আমরা আরও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নিয়ে বসব। আপনি ততক্ষণে প্লাটিলেট ম্যানেজ করেন।'

৩.
ছয় ব্যাগ প্লাটিলেট লাগবে। এক ব্যাগ প্লাটিলেট তৈরি করতে চার ব্যাগ রক্ত লাগে।

সকাল থেকে রেড ক্রিসেন্ট থেকে শুরু করে সব রক্তদাতা প্রতিষ্ঠানে ছুটছেন মাশরাফি। একদিকে সরাসরি রক্তও দিতে হবে। রাতেই বন্ধুদের ফোন করেছেন। মিরপুর থেকে মিছিলের মতো বন্ধুরা চলে এসেছে। ছয় ব্যাগ রক্ত লাগবে; ১০ জন

ডোনার তৈরি হয়ে গেছে। পাঁচ ব্যাগ প্লাটিলেটও চলে এসেছে।
আরও এক ব্যাগ লাগবে। চার ব্যাগ রক্ত দিয়ে আনতে হবে এক ব্যাগ প্লাটিলেট। এবার দ্রুত লাগবে। এই প্লাটিলেটটা চালু করেই পরের সিদ্ধান্ত নেবে ডাক্তাররা। ডোনার নিয়ে মাশরাফি নিজেই ছুটল।
প্লাটিলেট আলাদা করতে অনেকটা সময় লাগে। ধৈর্যে কুলাচ্ছে না। বারবার তাড়া দিচ্ছে। এক ভদ্রলোক হাতে এক ব্যাগ প্লাটিলেট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অনেকক্ষণ ধরে মাশরাফির ব্যস্ততা দেখছেন। আস্তে করে কাছে এসে বললেন, 'ভাই সাহেব, আপনার কি প্লাটিলেট খুব জরুরি?'
'জি। এখনই এটা নিয়ে চালু করলে তারপর অপারেশন করবে কি না সিদ্ধান্ত হবে।'
'আপনি এই প্লাটিলেটটা নিয়ে যান।'
'আপনি কোথায় পাবেন?'
'আমার ডেঙ্গুর পেশেন্ট। একটু পরে হলেও সমস্যা হবে না। আপনার জন্য যেটা তৈরি হচ্ছে, ওটা আমি নিয়ে যাব। দেরি কইরেন না; যান।'
লোকটার নামও জিজ্ঞেস করা হলো না। একছুটে গিয়ে গাড়িতে।
আজও গল্পটা বলার সময় ওই লোকটার কথা খুব মনে করেন। নাম নেই, ফোন নম্বর নেই, চেহারা মনে নেই; একটা লোককে মাশরাফি খুঁজে বেড়ান কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য।

৪.
'কৌশিক, তোর বাবা-মা কখন আসবে?'
'রাত হয়ে যাবে মনে হয়। কেন নানি?'
'সুমীর মনে হয় অপারেশনই লাগবে।'
যেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের উইকেটে সেই আমলের ফাস্ট বোলারদের বিপক্ষে ব্যাটিং। একটার পর একটা বাউন্সারে মাশরাফির মন-শরীর তখন অবশ হয়ে গেছে। এই সাত মাসের বাচ্চা পেটে নিয়ে অপারেশন! ধকল সহ্য করতে পারবে সুমী?
প্রশ্নটা শুনে একটু থমকে গেলেন ডাক্তাররা সবাই।
তুলনামূলক এক সিনিয়র ডাক্তার বললেন, 'বাবা, একটা কথা বলি। একটু মাথা ঠান্ডা করে শোনো...'
'বলেন'–মাথা নয়, শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে ডাক্তারের গলা শুনে।
'সুমীর জীবন আমাদের হাতে নেই। সুমীকে বাঁচানো খুব কঠিন হবে।'
'মানে কী!'
'হ্যাঁ, শোনো। এখন যে অবস্থা, অপেক্ষা করলে বাচ্চা-মা দুজনের কাউকে বাঁচানো যাবে না। আমরা এখন অপারেশন করে বাচ্চাকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে পারি।'
মাশরাফির কিছু বলার নেই। কিছু বলার মতো শক্তি নেই তার। কী বলে এসব

ডাক্তাররা। তার সুমী!

তারপরও একবার তর্ক করার শেষ চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন, 'আমার সর্বস্ব বিক্রি করে দেব। আমার যা টাকা আছে, সব ব্যয় করে ফেলব। ওর কি পৃথিবীর কোথাও এর চেয়ে ভালো চিকিৎসা হবে?'

কৌশিকের নানি রায় দিয়েছিলেন, 'আমি ডাক্তার হিসেবে ভাবছি না, কৌশিক। এর চেয়ে ভালো কোনো ব্যবস্থা কোথাও থাকলে, তোমাকে আমি বলতাম। তুমি পারবে জানি। কিন্তু মানুষের পক্ষে যা করা সম্ভব, এখানে সেই সর্বোচ্চটাই করা হবে।'

৫.

তরুণতর এক ডাক্তার রাউন্ডে এসেছেন।

অপারেশনের সব প্রস্তুত। সুমী জানেন, সাধারণ একটা অপারেশন হবে। খুব গুরুতর কিছু নয়। তিনি হাসিখুশিই আছেন; অন্তত সেই চেষ্টা করছেন। বাড়ি থেকে লোকজন চলে আসবে। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

ডাক্তার এসে তাকে প্রস্তুত করার নির্দেশনা দিয়ে গেলেন সেবিকাদের। সেই সঙ্গে সুমীর কাছে এসে বললেন, 'ভয় পাবেন না। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।'

সর্বোচ্চ চেষ্টা মানে কী!

তাহলে কি গুরুতর কিছু হলো? হঠাৎ সব এলোমেলো লাগছে। কৌশিক এমন সময় গেল কোথায়? কৌশিককে খুব দরকার। তাকে তো এখন অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাবে। কৌশিকের সঙ্গে আর দেখা হবে না?

ওই তো কৌশিক।

ততক্ষণে সুমীকে পোশাক পরিয়ে ফেলেছে। অপারেশন থিয়েটারে নেওয়ার জন্য একটা হুইলচেয়ারে বসিয়ে ফেলেছে। কৌশিক রক্ত জোগাড় করে ডাক্তারদের কাছ থেকে সব জেনে এসেছেন সুমীর কাছে। বুঝতে পারছেন না কী বলবেন। হেসে পরিস্থিতি হালকা করার চেষ্টা করলেন।

সুমীও বুঝতে পারছেন, ভারী কথা বলা ঠিক হবে না। পাগল ছেলেটা সহ্য করতে পারবে না। পরিস্থিতি হালকা করার জন্য বললেন, 'কৌশিক, কোনো অন্যায় করে থাকলে মাফ করে দিয়ো।'

চেয়েছিলেন রসিকতা করতে; হলো না। চোখ থেকে অঝোরে পানি বের হয়ে এল। আজও সুমী বুঝতে পারেন না, সেদিন রসিকতাটা কেন হয়নি!

মাশরাফি আর নিতে পারছেন না।

পেছন থেকে হুইলচেয়ার ঠেলছেন আর দুচোখ থেকে অঝোরে পানি ঝরছে। সুমী আজ বলে, ওকে মাফ করে দিতে।

এক লহমায় জীবনের সব না করতে পারার বোধ এসে হাজির হলো মাথার মধ্যে। মানুষ কত কী করে। হানিমুনে যায়, বউকে নিয়ে এখানে বেড়ায়, ওখানে ঘোরে। মাশরাফি তো কিছুই করলেন না। শুধু প্রেম করে বিয়ে করাই সার। বউকে একটু

সময় দেওয়া, বউয়ের ভালো লাগা; কিছুই জানলেন না। সুমী কী করতে পছন্দ করে, কোথায় বেড়াতে পছন্দ করে; কিছুই জানা হলো না।

জীবনটাকে একপলকে খুব অর্থহীন বলে মনে হলো।

মাশরাফির এই জীবন অনুসরণ করার সুবাদে এমন এক রায় দিয়ে ফেলা যায়, সেদিন হুইলচেয়ার ঠেলতে থাকা মানুষটিই আজকের মাশরাফি। যে গভীর জীবনবোধ, এই তুচ্ছ ক্রিকেটের চেয়ে বড় এক না-দেখা জগতের যে আবিষ্কার; সে সবকিছুরই যাত্রা যেন শুরু হয়েছিল সেদিন।

সুমীকে অপারেশন থিয়েটারে ঠেলে দিয়ে একটা জিনিস মুহূর্তে বুঝে ফেললেন–এই পৃথিবীতে মানুষ কিছুই নির্ধারণ করার মালিক নয়। সেই মালিক আছেন ওপরে কোথাও। কাঁধের ওপরে ছুটে আসা মায়ের হাত পড়ল। মা বললেন, 'আল্লাহর কাছে হাত পাত কৌশিক, আল্লাহর কাছে হাত পাত।'

সেই মাশরাফি যেন বুঝতে পারলেন, কোথায় আসলে মানুষের নিয়তি বাঁধা।

৬.

দীর্ঘ ক্লান্তিকর অপেক্ষার পালা শেষ হলো।

মাত্র সাত মাস বয়সী মেয়েসন্তান জন্ম দিয়েছে সুমী। তাকে এ মুহূর্তে কোলে নেওয়ারও উপায় নেই। বিশেষ পর্যবেক্ষণ যন্ত্রের আশ্রয়ে রাখতে হবে তাকে। ওদিকে সুমীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আইসিইউতে। সেই শুরু আইসিইউয়ের দরজায় বসে থাকা।

একনাগাড়ে ২১ দিন ধরে সেই অপেক্ষা আর ফুরোয় না। হঠাৎ একদিন ডাক্তাররা সুখবর দিলেন; জেনারেল বেডে আনা সম্ভব সুমীকে। ওই আনা পর্যন্তই। আবার পরপরই নিয়ে যেতে হলো আইসিইউতে। ততদিনে আরও সমস্যা তৈরি হয়েছে। হৃদ্‌যন্ত্রটা ঝামেলা করছে সুমীর।

শেষ পর্যন্ত একদিন নানি এসে ডাক দিলেন, 'কৌশিক আল্লাহ রহমত করেছেন মনে হয়।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল কৌশিক। নানি বললেন, 'মা-মেয়ে দুজনকেই মনে হয় বাসায় নিয়ে যেতে পারবি।'

কৌশিক কাঁদেন। আজও কাঁদেন। একটা ব্যাপার বোঝেন, দুনিয়ার সবকিছুতেই মহান সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনা আছে। নইলে তিনি বিশ্বকাপ দল থেকে কেন বাদ পড়বেন?

বিশ্বকাপ খেলতে থাকলে, সেদিন সুমীর শরীরের অমন অবস্থা টেরও পেতেন না তিনি। হয়তো অনেক দেরি হয়ে যেত। কে বলে, ভাগ্য খারাপ। খারাপ ভাগ্য বলে পৃথিবীতে কিছু নেই।

হুমায়রা আর সুমীর মুখের দিকে তাকিয়ে একা একা আনন্দে চোখ চকচক করে ওঠে তার এবং কৃতজ্ঞতায় মাথা নিচু করে ফেলেন।

৭.

আমরা কয়েকটা বছর এগিয়ে যেতে চাই।

এখন আমরা গল্প করছি ২০১১ সালে বসে। দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ চলছে। মাশরাফি দলে থাকতে পারেননি।

আমরা এগিয়ে যেতে চাই আরও চারটি বছর। ২০১৫ সালের অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড বিশ্বকাপের ঠিক আগে আগের সময়টাতে পৌঁছে যেতে চাই টাইম মেশিনে করে। আমরা দেখতে পাব, ফিনিক্স পাখির মতো আবার ডানা মেলে সেই মাশরাফি অধিনায়কত্বের আলোচনায়।

আমরা দেখতে পাব, ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের ত্রাণ ঘটানোর জন্য আবার সামনে নিয়ে আশা হয়েছে সেই মাশরাফিকে। পরীক্ষামূলকভাবে তাকে এশিয়ান গেমসে অধিনায়ক করে পাঠানো হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ায়।

আবার বিশ্বকাপ, এবার অধিনায়ক; এমন আলোচনা বাজারে থাকা অবস্থায় আবার বাবা হলেন মাশরাফি। দিনটা ছিল পবিত্র ঈদের দিন। ৫ অক্টোবর। কাকতালীয়ভাবে মাশরাফিরও জন্মদিন এই ৫ অক্টোবর।

ছেলের জন্মের সময় মাশরাফির সহধর্মিণী সুমীকে অন্তত ওই রকম কোনো জীবনমরণ সংকটে পড়তে হয়নি। এবার সংকটে পড়ল ছেলেটাই। জন্মের পরপরই প্রধান সমস্যা হলো ছেলেটা শুধু চোখ ওপরের দিকে দিয়ে কাঁদে। আর কোনো দিকে তাকাতেই যেন কষ্ট হয়। ডাক্তাররা সন্দেহ করলেন, মস্তিষ্কে কোনো সমস্যা নয় তো!

সেই সংকট চলতে থাকা অবস্থায়ই স্ত্রী-পুত্র হাসপাতালে রেখে কোরিয়ায় ছুটলেন মাশরাফি।

সেখানে থেকেই জানতে পারলেন ছেলের মস্তিষ্কে কোনো সমস্যা নেই। তবে প্রথম ধাপের টাইফয়েড ধরা পড়েছে। ওই অবস্থায় ছেলের চিকিৎসা শুরু হলো। মাশরাফি দেশে ফিরতে ফিরতে ছেলেকে বাসায় নিয়ে আসার মতো অবস্থা তৈরি হলো।

ছেলেকে একটু অসুস্থ রেখেই অস্ট্রেলিয়া রওনা হয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়া পৌঁছাতে না-পৌঁছাতেই জানতে পারলেন ছেলেকে আবার হাসপাতালে নিতে হয়েছে। আবার টাইফয়েড ধরা পড়েছে। চিকিৎসা শুরু হলো।

১৮টি ইনজেকশন দিতে হবে ওইটুকু ছেলেকে।

ঢাকা থেকে খবর পান ছেলের অবস্থার কোনো উন্নতি নেই। আর টিকতে ইচ্ছা করে না। ইচ্ছে না করলে হবে না, তার হাতে যে জাতীয় দায়িত্ব। এই দায়িত্বে অবহেলা করা চলবে না।

মুখ হাসি হাসি করে সংবাদ সম্মেলনে যান, টিম মিটিং করেন, অনুশীলন করেন। রিয়াদ আর সাকিব ছাড়া কাউকে টেরও পেতে দেন না, কী সময়ের ভেতর দিয়ে

চলছেন তিনি। ঢাকা থেকে খবর পান ছেলের এমআরআই করাতে হবে। ফোনের পর ফোন করতে থাকেন।

মাশরাফির ছেলের এমআরআই করতে হবে; তারপরও ছুটি, দিনের কর্মসময় শেষ; এসবের জন্য দেরি হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বিসিবির এক কর্মকর্তা মাঠে নামেন। তার তৎপরতায় সমাধান হয়। তবে ছেলের খুব একটা উন্নতির খবর পান না।

এদিকে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ হচ্ছে না, এটা একরকম পরিষ্কার হয়ে যায়। মাশরাফি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন–দুদিনের জন্য দেশে ফিরবেন। সেভাবেই কথা বলেন কোচ হাথুরুসিংহে ও ম্যানেজার খালেদ মাহমুদ সুজনের সঙ্গে। ফোন করেন ঢাকায়। সুমীকে পরিকল্পনাটা জানান।

সুমী কণ্ঠটা শক্ত করে বলে, 'যদি তোমার আসার মতো পরিস্থিতি হয়, আমি তোমাকে আসতে বলব। তার আগ পর্যন্ত তুমি আসার কথা ভেবো না। আমি আছি।'

এই কথাটাই খুব বলেন মাশরাফি। সুমী সারা জীবন এই সাহসটা অন্তত তাকে দিয়েছেন–আমি আছি।

হুমকি দিয়ে ক্রিকেট!



১.
কেউ ইনডোর স্টেডিয়ামে, কেউ ড্রেসিংরুমের সামনে, কেউ ভিআইপি গেটের মুখে; সাংবাদিকেরা অপেক্ষা করছিলেন। অপেক্ষা মাশরাফি বিন মুর্তজার দেখা পাওয়ার জন্য, তার কথা শোনার জন্য। হঠাৎ ইনডোর স্টেডিয়ামে একঝলক দেখা পাওয়া গেল মাশরাফির। কোচ জেমি সিডন্সের সঙ্গে কথা বলতে যাওয়ার আগে বলে গেলেন, 'সব বলব। আর আধা ঘণ্টা ভেবে বলি।'
সেই 'আধা ঘণ্টা' শেষ হলো ঘণ্টা দুয়েক পর।
তখন ভিড় জমিয়ে তোলা সাংবাদিকদের বাড়িয়ে দেওয়া মাইক্রোফোন আর রেকর্ডারের সামনে একগাল হেসে মাশরাফি বললেন, 'আসলে আরেকটা দিন সময় নিতে চাই। অস্ট্রেলিয়া সিরিজে খেলব কি না, সেটা আগামীকাল ঠিক করব। আজই নিশ্চিত কিছু বলতে পারছি না।'
বিশ্বকাপের ঠিক পরপরের ঘটনা।
বিশ্বকাপের আগে যে মাশরাফির ফিটনেস নেই বলে বোর্ড এত আওয়াজ তুলেছিল,

বিশ্বকাপের পর সেই মাশরাফিকে নিজেদের ইচ্ছেয় 'ফিট ঘোষণা' করে মাঠে নামিয়ে দেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা হয়েছিল বোর্ডের তরফে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঘরের মাটিতে সিরিজে যেকোনো মূল্যে তাকে খেলাতেই হবে।

বোর্ডের তরফ থেকে প্রথমে জানানো হলো, মাশরাফি সিরিজ খেলছেন না। বোর্ডের টেকনিক্যাল কমিটির প্রধান এনায়েত সিরাজ জানিয়েছিলেন, মাশরাফি সিরিজ থেকে অব্যাহতি চেয়ে একটা চিঠি জমা দিয়ে দিয়েছেন। বোর্ডের ভেতরে সূত্রগুলোকে উদ্ধৃত করে তখন সংবাদমাধ্যমগুলো লিখেছিল, চিঠি আসলেই মাশরাফি দিয়েছেন। তবে সেটা বোর্ড খুব সহজে নেয়নি। তাকে ভেবে দেখতে বলা হয়েছে। বোর্ডই নাকি মাশরাফিকে বলেছে, আরেক দিন সময় নিতে। কেউ কেউ বলছেন, বেশ কড়া স্বরেই মাশরাফিকে তার সিদ্ধান্ত বিবেচনা করতে বলা হয়েছে।

মাশরাফির না খেলার যুক্তি খুব কঠিন ছিল না :

'আসলে বিশ্বকাপের আগে আমার ফিটনেস যে রকম ছিল এখনো তাও নেই। ফিটনেস লেভেল অনেক কমে গেছে। জোরে বল করতে পারছি না। বল করতে পারলেও ফিল্ডিং করা খুবই কষ্টকর। শরীরে কেমন যেন জোর পাচ্ছি না।' [১]

মাশরাফির আরেকটা যুক্তি ছিল পরিবারকে সময় দেওয়া। সদ্যই বাবা হয়েছেন। সদ্যোজাত কন্যা ও তার মা, দুজনই অসুস্থ তখনো। ফলে তাদের কাছে থাকাটাকেও বেশ গুরুত্ব দিচ্ছেন বাংলাদেশের ইতিহাসে সফলতম এই পেসার। তবে আসল যুক্তি ফিটনেস কমে যাওয়া।

এই যুক্তিটা শুনেই একটু খটকা লাগতে পারে।

যে মাশরাফি বিশ্বকাপের আগে বললেন '২০০ পারসেন্ট ফিট', এর মধ্যে এমন কী ঘটল যে তিনি 'আনফিট' হয়ে গেলেন!

এ ব্যাপারটা মাশরাফিকে যারা অনুসরণ করছেন না, ক্রিকেটের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক নেই, তাদের পক্ষে বোঝা কঠিন, 'আসলে পারিবারিক কারণেই গত মাস দেড়েক আমি রিহ্যাব প্রোগ্রামটা ফলো করতে পারিনি। গত মাস খানেকেরও বেশি বল হাতে নিইনি। মাইক হেনরি আমাকে যে কাজ দিয়েছিল আমার জন্যই আমি সেগুলো ঠিকমতো করতে পারিনি। ফলে ফিটনেস লেভেলটা কমে গেছে।' [২]

কিন্তু এর কি কোনো পরীক্ষা হয়েছে? নিরুত্তর টেকনিক্যাল কমিটি, নির্বাচক কমিটি। পরীক্ষা হয়নি।

তবে মাশরাফি জানিয়েছিলেন, তিনি পরীক্ষা ছাড়াই বুঝতে পারছেন, ফিটনেস নেই। এর মাঝে একটা অনুশীলন ম্যাচ খেলে ফেলেছেন। অনুশীলন ম্যাচের চেয়ে বড় ফিটনেস টেস্ট আর কী আছে? ওখানেই টের পেয়েছেন ফিটনেসে সমস্যা। বল করতে খুব সমস্যা সেদিন না হলেও পরে ঠিক পেয়েছেন, সমস্যা আছে।

সে যত সমস্যাই থাক। মাশরাফিকে খেলানোটা তখন ইগোর ব্যাপার হিসেবে নিয়ে ফেলল বোর্ড। তাকে খেলানো হলো। অধিনায়ক সাকিব আল হাসান শুধু প্রকাশ্যে জানালেন, তিনি দলের সঙ্গেই থাকছেন; তিনি এই সিরিজে খেলছেন।

২.

নাটকীয়ভাবে দলে এসে দল থেকে বাদ পড়াটাও হলো নাটকীয়।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে প্রত্যাবর্তন ম্যাচ ও ফিটনেস ফিরে না পাওয়া একজন খেলোয়াড়ের হিসাব বিবেচনায় নিলে মাশরাফির পারফরম্যান্স খুব খারাপ ছিল না। মাইকেল ক্লার্কের সেঞ্চুরিতে আগে ব্যাট করা অস্ট্রেলিয়া ২৭০ রান করেছিল। মাশরাফি ৬৫ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়েছিলেন।

বাংলাদেশ ৫ উইকেটে ২১০ রানে থমকে গিয়েছিল।

'হাফ ফিট' মাশরাফির এই বোলিং নিয়ে ম্যাচের পর জেমি সিডন্স প্রশংসাও করেছিলেন।

এই পারফরম্যান্স দেখে অন্তত মাশরাফিকে দল থেকে বাদ দিয়ে দেওয়ার মতো কিছু ঘটেনি। কিন্তু বিস্ময়করভাবে দ্বিতীয় ম্যাচে একাদশে ছিলেন না মাশরাফি।

কেন ছিলেন না, এ নিয়ে হাজারটা ব্যাখ্যা থাকতে পারে। সবচেয়ে আনুষ্ঠানিক ও কেতামাফিক কথা হলো–বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরদিনের পত্রপত্রিকাগুলোর দাবি ভিন্ন ছিল। সেখানে বলা হচ্ছে, মাশরাফি আসলে কোচের সঙ্গে তীব্র বচসায় জড়িয়ে পড়ে একাদশে জায়গা হারিয়েছেন।

সেদিনের 'সকালের খবর' পত্রিকা এই কথিত বচসার বিস্তারিত লিখেছিল

আগের ম্যাচে 'হাফ ফিট' মাশরাফি বিন মুর্তজার বোলিং মুগ্ধ করেছিল জেমি সিডন্সকে। বলেছিলেন, ফিট থাকলে পরের ম্যাচও খেলবেন। এর মধ্যে মাশরাফির ফিটনেসে নতুন কোনো সমস্যা হয়েছে বলে শোনা গেল না। তাহলে মাশরাফি কেন দলে নেই? স্বাভাবিক উত্তর হতে পারত–টিম কম্বিনেশন!

দল থেকে সে রকম ব্যাখ্যাই দেওয়ার চেষ্টা করা হলো। কিন্তু ভেতরের খবর বলছে, আসল ঘটনা ভিন্ন। আসলে নাকি ড্রেসিংরুমে কাল ম্যাচ শুরুর আগের একটা ঘটনাই বদলে দিয়েছে একাদশ। একটি সূত্রের খবর, মাশরাফি আসলে দ্বিতীয় ওয়ানডের একাদশে ভালোমতোই ছিলেন। কিন্তু সকালে কোচের সঙ্গে বচসা হওয়ার পর নাকি নাম কাটা গেছে তার।

সকাল বেলায় মাঠে দল এসে পৌঁছানোর পর ড্রেসিংরুমে মাশরাফিকে কোচ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কি ফিট আছো?'

এই সামান্য প্রশ্নেই নাকি চটে ওঠেন মাশরাফি। এই সামান্য প্রশ্ন দেশসেরা পেসারকে কেন চটিয়ে দিল, সেটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে, গত মাস দুয়েকেরও বেশি সময় ফিটনেস নিয়ে যে নাটকের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে মাশরাফিকে, তাতে হতাশা থেকেই এই বিস্ফোরণ।

বিশ্বকাপের আগে আগে বিকেএসপিতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ খেলতে গিয়ে চোট পেয়েছিলেন হাঁটুতে। সেই চোট কাটিয়ে দুর্দান্ত গতিতে সেরেও উঠছিলেন। কিন্তু তাকে বাদ দিয়েই ঘোষণা করা হলো বিশ্বকাপের দল। যুক্তি, মাশরাফি যদি খেলতে না পারেন!

অবশ্য এ রকম ইনজুরড খেলোয়াড় দলে রেখে পরিবর্তনের ঘটনা এই বিশ্বকাপেই ঘটেছে। মাশরাফির ক্ষেত্রে সেটা ঘটল না। বরং মিথ্যে আশা দিয়ে তাকে রাখা হলো। দিনকে দিন ফিটনেসের উন্নতি হতে থাকল। একসময় বিশ্বকাপের আশা শেষ হলো তার। ওদিকে শুরু হলো পারিবারিক সংকট।

সন্তানসম্ভবা স্ত্রী লড়ছিলেন হাসপাতালে। তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে ক্রিকেট থেকেই দূরে চলে গেলেন মাশরাফি। আবার ফিটনেসে ঘাটতি দেখা দিল। এবার নিজেই বললেন, অস্ট্রেলিয়া সিরিজ খেলার মতো অবস্থায় নেই। কিন্তু এবার বোর্ড উল্টোটা ঠিক করে বসল। তাদের মাশরাফিকে খেলানো চাই চাই।

অনেকটা হুমকিধমকি দিয়ে মাঠে নামানো হলো তাকে। ফিটনেসের সীমাবদ্ধতাকে সঙ্গে নিয়েই মান বাঁচানো বোলিং করলেন মাশরাফি। এমন অবস্থায় 'ফিটনেস' শব্দটা শুনলেই তো চটে ওঠার কথা। [৩]

ভেতরের ঘটনা এমন হোক আর না-ই হোক, সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ আবার খেলতে নামলেন মাশরাফি।

আগের দুই ম্যাচের মতো এই ম্যাচেও বড় ব্যবধানে হারল বাংলাদেশ। তবে মাশরাফি একটু হলেও নিজেকে ফিরে পেলেন। অস্ট্রেলিয়ার ৩৬১ রানের ইনিংসে ৮০ রানে ৩ উইকেট পেলেন তিনি।

পরে ব্যাট করে বাংলাদেশ করল ৬ উইকেটে ২৯৫ রান।

এই ওয়ানডে খেলার পর মাশরাফিকে অপেক্ষা করতে হবে ঠিক ১৩ মাস। ২০১১ সালের এপ্রিলে এই ম্যাচ খেলার পর মাশরাফি আবার মাঠে ফিরবেন ২০১৩ সালের মে মাসে।

৩.

এ অবস্থাটা আর টেনে নিতে চাইলেন না মাশরাফি।

লিগামেন্টটা চেপে দিতেই হবে। হাঁটু আবার খুলতে হবে এটা সেই বিশ্বকাপের আগে থেকেই জানা তথ্য ছিল। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের আগেই ডা. ডেভিড ইয়াংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এখন যেহেতু খেলার চাপ নেই, তাই দ্রুতই অপারেশন করিয়ে ফেলা ভালো।

সেই অনুযায়ী মে মাসের শুরুতে অস্ট্রেলিয়া চলে গেলেন মাশরাফি। ডেভিড ইয়াং প্রথম দেখায় হেসে প্রশ্ন করেছিলেন, 'এই নিয়ে কতবার?'

মাশরাফিও একগাল হেসেছিলেন, 'তোমার খাতাপত্র বলতে পারবে। আমি মনে রাখিনি।'

/

আমাদের হিসাব বলছে, এটা ছিল মাশরাফির সপ্তমবারের মতো শুধু হাঁটু খুলে ফেলে অপারেশন।

অপারেশনের পর খুব দ্রুতই ক্রাচে ভর করে হাঁটতে শুরু করলেন। ভালো দিক হলো অপারেশনের পর কোনো ফোলা বা কিছু ছিল না। ফলে মে মাসের শেষ দিকে শুরু হয়ে গেল তার পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া। বোর্ডের চিকিৎসকের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছিল, অক্টোবরের আগে বোলিং শুরু করতে পারবেন না তিনি।

৪.

কুয়াশায় ঢেকে গেছে চরাচর, কনকনে ঠান্ডা, ঝিরিঝিরি বাতাস, ফ্লাডলাইট জ্বেলে দূর করা যাচ্ছে না অন্ধকার।

আদর্শ পেস বোলিং কন্ডিশন বলতে যা বোঝায়, ঠিক তাই। উইকেট যেমন হোক এই প্রতিকূল আবহাওয়াকে কাজে লাগিয়ে শীতল পরিবেশ উত্তপ্ত করে ফেলার কথা পেসারদের। কিন্তু হায়! বাংলাদেশের তিন পেসার এমন সকালেও কাল নিজেদের খুঁজে ফিরলেন। বারবার মনে হলো–আহা, যদি মাশরাফি থাকতেন!

মাশরাফি ছিলেন তো! দুপুরবেলায় একেবারে মাঠের মাঝখানে পুরো রানআপে দৌড়ে এসে বল ছুড়ে দিলেন। একবার নয়, প্রায় আধা ঘণ্টা মাঝমাঠে বল করলেন বাংলাদেশের এখন পর্যন্ত সেরা এই পেসার। তাহলে ম্যাচের মাঝে বিপদ দেখে কি মাশরাফিকে ডেকে আনা হলো?

তাই কি হয়!

মাশরাফি বিন মুর্তজা বেশ কিছুদিন ধরেই এমন খেলার বিরতিতে বল করছেন, নিজেকে প্রস্তুত করছেন আর একটু মনঃকষ্ট নিয়েই দেখছেন সতীর্থ পেসারদের ব্যর্থতা।

ইচ্ছা ছিল, পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজটা খেলা। সেটা হলো না। এখন সামনে লক্ষ্য দুটো–বিপিএল আর এশিয়া কাপ।

বিপিএলে অবশ্য এই দীর্ঘ বিরতির পর কেউ আর তাকে কিনবে কি না, এ নিয়েই সন্দেহ ছিল তার।

[১] মাশরাফি খেলতে চাইছেন না; দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (সকালের খবর; ৭ এপ্রিল, ২০১১)

[২] ওই

[৩] আবার মাশরাফি-কাণ্ড (সকালের খবর; ১১ এপ্রিল, ২০১১)

বিক্রয়ের জন্য নহে



১.

সভ্যতার হাত সারা পৃথিবীর প্রকৃতিকেই প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত করছে।

প্রতিদিনই জঙ্গল উজাড় হচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে খোলা মাঠ এবং জলাধার। এ নিয়ে পরিবেশবাদী লোকজনদের প্রতিবাদ আছে, পরিকল্পনা আছে, ক্ষোভ আছে। মাশরাফি বিন মুর্তজা ঠিক পরিবেশবাদী কর্মী নন। তবে নড়াইলে তার সঙ্গে ইদানীং আড্ডা দিতে বসলে মনে হয়, তিনি পারলে সভ্যতার এই কালো হাতটা একটা গুঁড়িয়ে দিতেন।

তার ছোটবেলার সেই দাপিয়ে বেড়ানোর বাগান, তুলসীর বাগানটা আজ শেষ হতে বসেছে। সেখানে একটার পর একটা দালান উঠছে। নিজেদের বাড়ির ঠিক উল্টো দিকে ছিল একটা ঘন জঙ্গল। সেটা হারিয়ে গিয়ে কংক্রিটের দালান উঠেছে; এখন আর তাকালে নদী চোখে পড়ে না।

মাশরাফি হা-হুতাশ করতে থাকেন, 'মানুষ এত লোভী। শুধু এদের কথা বলছি না। সবাই লোভী। এভাবে বন-

জঙ্গল সব শেষ করে দালান করছে। একদিন দেখবেন এসব দালান আবার মানুষকে শেষ করে দেবে।'

কেউ একজন প্রতিবাদ করেন। কেউ একজন মনে করিয়ে দেন, মানুষ লোভের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। মাশরাফিকেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন, 'ছোট টাকার প্রলোভন তুমি এড়িয়ে থাকতে পারো। কোটি কোটি টাকার লোভ এড়াতে পারবে না।'

মাশরাফি হো হো করে হাসেন, 'টাকার লোভ! বাজিকররা জানে, অনৈতিক কাজ যারা করে; তারাও জানে, আমাকে এই জিনিসটার লোভ দেখিয়ে লাভ হয় না। আমার জীবনে যদি কিছু করতে পেরে থাকি, সেটা হলো–সবাইকে এই মেসেজটা দিতে পেরেছি, আমাকে কেনা যাবে না।'

এটা এক শ ভাগের চেয়েও মনে হয় সত্যি কথা। মাশরাফিকে আপনি চাইলেই কিনতে পারবেন না। মাশরাফির টাকার দরকার আছে। তার সংসার চালাতে হয়, বিপুল মানবিক কাজ করতে হয়; টাকার দরকার তারও আছে। কিন্তু টাকা কখনো তার নীতি ঠিক করে দিতে পারেনি। জীবনে একবার নয়, অন্তত তিনবার বিশাল বিশাল ঘটনা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন–এই মাশরাফি বিক্রির জন্য নয়।

দুই বিপিএলেই ম্যাচ পাতানোর ঘটনাবলি চলে এসেছিল তার সামনে; মাশরাফি অনড় ছিলেন। এরও আগে আইসিএলে যাওয়ার জন্য বিশাল টাকার প্রস্তাব ছিল। মাশরাফি যাননি; টাকার জন্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ত্যাগ করবেন না বলে।

মাশরাফির এই 'নট ফর সেল' ব্যাপারটা প্রথম তীব্রভাবে টের পাওয়া গেল প্রথম বিপিএলে।

২.

বাংলাদেশে তখন এক নতুন উন্মাদনা এসেছে।

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের মাথা খারাপ করে দেওয়া সাফল্যে দিশেহারা হয়ে প্রায় ক্রিকেট খেলুড়ে দেশেই তখন একটার পর একটা প্রিমিয়ার লিগ চালু হচ্ছে। বাংলাদেশ সেই ধারায় গিয়ে আইপিএলের পরই সবচেয়ে ব্যয়বহুল ও জাঁকজমকপূর্ণ টি-টোয়েন্টি লিগ– বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বিপিএল চালু করে ফেলল।

শুধু তারকার বিচারেই বিপিএল কোনো কোনো অংশে আইপিএলকেও ছাপিয়ে গেল। আইপিএলের মহাতারকা ক্রিস গেইলরা তো ছিলেন। বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে পাকিস্তানি তারকারাও ছিলেন। সে এক ডলারের মহোৎসবও বটে। কাগজে-কলমে কোটি কোটি ডলার উড়তে শুরু করল বাতাসে। এসব ডলারের বেশির ভাগই অবশ্য এখনো নাকি খেলোয়াড়দের পকেটে ঢোকেনি; সে এক আলাদা আলোচনা।

তবে মাশরাফিকে কেউ কোটি ডলার দিয়ে কিনবে এমন আশা তিনি করেননি। দুই

বছর ধরে ইনজুরিতে প্রায় মাঠের বাইরে আছেন। বিশ্বকাপের অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে জোর করে মাঠে ফিরেছিলেন। তারপরই অপারেশন করিয়ে এক বছরের জন্য ছিলেন বাইরে। ফলে এ ধরনের টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে তার প্রতি আকর্ষণ থাকার কথা নয়।

শেষ পর্যন্ত ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্স দল ভিত্তিমূল্য ৪৫ হাজার ডলার দিয়ে নিয়ে নিল দেশের সাবেক অধিনায়ককে। সে সময় মাশরাফি বলছিলেন–তিনি এ ধরনের মূল্যই আশা করছিলেন। একটা দল যে তার প্রতি আগ্রহী হয়েছে এতকাল ক্রিকেটের বাইরে থাকার পরও, তাতেই তিনি খুশি হয়েছেন।

কিন্তু এই খুশিটাই বিরক্তিতে পরিণত হলো। সারা জীবন যেসব ব্যাপারকে ঘৃণা করেছেন, অপছন্দ করেছেন তাই এসে সামনে হাজির হলো।

তবে তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে এভাবে আসবে ব্যাপারটা।

মাশরাফি সে বছর বাংলাদেশ বিমানে খেলছেন। দলের সঙ্গে থাকা তাদের এক সিনিয়র ক্রিকেটার শরিফুল হক প্লাবন একদিন খুব আটপৌরে ভঙ্গিতে মিরপুর স্টেডিয়ামের ড্রেসিংরুমে গল্প শুরু করেছিলেন মাশরাফির সঙ্গে। প্লাবন জাতীয় দলে ১৯৯৮ সালে একটি ওয়ানডেও খেলেছেন। সে খেলুন আর না-ই খেলুন, মাশরাফির সঙ্গে আড্ডা দিতে তো আর কোনো পরিচয় লাগে না।

এটা-ওটা নিয়ে কথা বলতে বলতেই প্লাবন হঠাৎ প্রস্তাব দিলেন, মাশরাফি তাকে বিপিএলে ঢাকা গ্লাডিয়েটরস সম্পর্কে কিছু তথ্য দিতে পারেন কি না।

ঢাকা গ্লাডিয়েটরস নিয়ে কী তথ্য? মালিকের নাম, দলে কারা কারা আছে, কোচ-ক্যাপ্টেন-ম্যানেজমেন্ট কারা; এ তো সবাই জানে। এসব তথ্য মাশরাফির কেন দিতে হবে!

প্লাবন হালকা চালেই বললেন, আরেকটু 'ক্ল্যাসিফায়েড' তথ্য লাগবে তার।

কোন ম্যাচে মাশরাফি খেলবেন বা খেলবেন না; এটা আগে থেকে জানাতে হবে। কোন ম্যাচের একাদশ কী হবে, সেটা টসের একটু আগে জানাতে হবে। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার মাশরাফি কোন ম্যাচে কখন ক্যাপ পরা থাকবেন, কখন সানগ্লাস পরবেন; সেটাও একটু আগে জানাতে হবে।

প্রস্তাবগুলো শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন মাশরাফি। কেন জানাবেন তিনি এসব তথ্য? আর এসব তথ্য তো আগে থেকে জানানো আইসিসিরও নিষেধ আছে। কেন প্লাবন এসব জানতে চাইছেন?

এবার প্লাবন আসল কথাটা বললেন–এসব তথ্য জানালে প্রতি ম্যাচে যে স্পট বেটিং হবে, তার মোট আয়ের ১৫ থেকে ২০ শতাংশ মাশরাফিকে দেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতি ম্যাচের একটা আনুমানিক অংকও জানিয়ে দিলেন প্লাবন। সেটা সাত অংকের নিচে নামছে না!

এ পর্যন্ত শুনে চোখ বড় বড় হয়ে গেল মাশরাফির, 'প্লাবন ভাই, আপনি আমাকে এতকাল ধরে এই চিনলেন? আমাকে আপনি এসব প্রস্তাব দিলেন কী করে!'

প্লাবন সঙ্গে সঙ্গে কথা ঘুরিয়ে ফেলার চেষ্টা করলেন। বোঝাতে চাইলেন তিনি রসিকতা করেছেন। এই ব্যাপার-স্যাপার যেন মাশরাফি আর কাউকে না বলেন, সে অনুরোধও করলেন মাশরাফি।

একটা সত্যি কথা হলো, কোনো ষড়যন্ত্রমূলক কথা মাশরাফিকে বলে চেপে রাখতে বলা আর অনলাইনে সে কথা প্রচার করে দেওয়া সমান কথা। মাশরাফি যে ব্যাপারটা নিয়ে এক সেকেন্ডও চুপ থাকবেন না, তার প্রমাণ ছিল পরদিনের পত্রিকা।

পরদিন দৈনিক কালের কণ্ঠে বিশাল হেডিং; সাইদুজ্জামান লিখলেন–শুরুর আগে ফিক্সিং নিয়ে তোলপাড়, মাশরাফিকে প্রস্তাব।

সেখানে মাশরাফি বললেন, এমন কিছু যদি মাঠে ঘটার লক্ষ দেখেন, তাহলে তিনি আর অধিনায়কত্ব করবেন না:

বিস্ময় এবং লজ্জায় হতবাক মাশরাফি বিন মুর্তজা। তাঁকে কিনা জাতীয় দলের সাবেক এক ক্রিকেটার স্পট ফিক্সিংয়ের সরাসরি প্রস্তাব দিয়ে বসেছেন! বিপিএলে ঢাকা গ্লাডিয়েটর্সের অধিনায়ক তাৎক্ষণিক বিষয়টি জানিয়েছেন টিম ম্যানেজমেন্টকে।...ঘটনার ব্যাপারে কাল জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান, 'যা বলার আমি আমার টিম ম্যানেজমেন্টকে জানিয়েছি। এ ব্যাপারে এ মুহূর্তে মিডিয়ায় কিছু বলার ইচ্ছা নেই। তবে হ্যাঁ, এক-দুই ম্যাচ দেখার পর যদি বুঝতে পারি যে দলে এ রকম কিছু ঘটছে, তাহলে অধিনায়কত্ব করব না। ম্যাচ ফিক্সিং কিংবা স্পট ফিক্সিংয়ের মতো কোনো ইস্যুতে জড়ানোর কোনো ইচ্ছা কখনো ছিল না, নেইও। [১]

দৈনিক পত্রিকায় বলে দেওয়ার পাশাপাশি মাশরাফি এই তথ্য জানালেন তার দলের উপদেষ্টা ও তার ব্যক্তিগত অভিভাবকতুল্য বড় ভাই হাবিবুল বাশারকে। জানালেন ঢাকা গ্লাডিয়েটরস টিম ম্যানেজমেন্টকেও।

একটা কাজ অবশ্য বাকি রেখেছিলেন। তিনি কোথাওই ওই ক্রিকেটারের নাম প্রকাশ করেননি। একটা ভয় কাজ যে করছিল না তা নয়।

৩.

ব্যাপারটা পত্রিকায় চলে আসায় বিসিবি ও বিপিএল কর্তৃপক্ষ একেবারে নড়েচড়ে বসল। তাদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল, পত্রিকায় জানানোর আগে মাশরাফি কেন তাদের জানালেন না?

বিপিএলের সদস্যসচিব সিরাজউদ্দিন আলমগীর বলেছিলেন :

আমরা পত্রিকার খবর পড়ে ব্যাপারটা জানতে পেরেছি। আমি বুঝতে পারছি না,

আমাদের জানানোর আগে ব্যাপারটা সে পত্রিকায় জানাল। সবকিছুর তো একটা পদ্ধতি আছে। সে আমাদের কাছে রিপোর্ট করলে, আমরা তৎক্ষণাৎ তদন্ত শুরু করে দিতাম। তারপরও আমরা মাশরাফির সঙ্গে কথা বলব এবং তার আনুষ্ঠানিক বিবৃতি নেব। [২]

তবে ঘটনাক্রম বলছে, মাশরাফি নিয়ম অনুসরণ করেছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী এ রকম কোনো প্রস্তাব পেলে হয় বিপিএল কর্তৃপক্ষ, না হলে নিজ দল কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করতে হয়। তিনি নিজে বলেছিলেন, ঢাকা গ্লাডিয়েটরস ম্যানেজমেন্টের একাধিক কর্মকর্তাকে তিনি ব্যাপারটা জানিয়েছিলেন।

দলটির মিডিয়া ম্যানেজার ক্রিকইনফোকে নিশ্চিত করেছিলেন যে, তারা মাশরাফির কাছ থেকে রিপোর্ট পেয়ে বিপিএল কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন :

'আমি আমার টিম ম্যানেজমেন্টকে বলেছি এবং আমি নিশ্চিত তারা সঠিক কাজই করবেন', মাশরাফি ইএসপিএনক্রিকইনফোকে বলেছেন। গ্লাডিয়েটর্সের মিডিয়া ম্যানেজার মিনহাজ উদ্দিন খান রিপোর্ট নিশ্চিত করেছেন এবং বলেছেন ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃপক্ষ এই তথ্য বিপিএলকে জানিয়ে দিয়েছে। [৩]

এরপর অবশ্য এই চাপান-উতোর বেশি চালু না রেখে বিসিবি দুটো কাজ করল, প্রথমত বিপিএল উপলক্ষে ঢাকায় আসা আইসিসির দুর্নীতি দমন ও নিরাপত্তা ইউনিট (আকসু) প্রতিনিধিকে ব্যাপারটা জানাল। সেই সঙ্গে নিজেরা তদন্ত করতে চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে ফেলা হলো।

বিসিবির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহবুব আনামকে প্রধান করে গঠিত এই তদন্ত কমিটিতে আরও ছিলেন বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান গাজী আশরাফ হোসেন লিপু, বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব ও বিসিবি ডিসিপ্লিনারি কমিটির চেয়ারম্যান সিরাজউদ্দিন আলমগীর এবং বিসিবির তখনকার ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী নিজামউদ্দিন চৌধুরী সুজন।

কমিটির কাজ শুরু করার পর সুজন সংবাদমাধ্যমে বলেছিলেন, তারা ম্যাচ বা স্পট ফিক্সিংয়ের ব্যাপারে জিরো টলারেন্স দেখাতে চান। সে জন্যই মাশরাফির সঙ্গে কথাবার্তা বলে এই প্রস্তাব দেওয়া খেলোয়াড়ের নাম বের করা ও আরও বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা করবেন তারা।

পুরো ব্যাপারটা মাশরাফির ব্যক্তিগত জীবন অশান্তিময় করে তুলল। আকসুর প্রতিনিধি হাওয়ার্ড বিয়ার দফায় দফায় মাশরাফির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। কথা বলতে বারবার ডাকছিল বিসিবির তদন্ত কমিটিও। সবার একটাই চাওয়া–আগে ওই খেলোয়াড়ের পরিচয় জানাও, যে প্রস্তাব দিয়েছে।

এদিকে মাশরাফির পেছনে অদৃশ্য একটা ভয় ছিল। কিছু ফোন পাচ্ছিলেন। ফোনটা যখন হুমকিতে পরিণত হলো, তখন মাশরাফি খেপে গেলেন। তিনি ভাবছিলেন, নামটা বললে লোকটা বিপদে পড়বে। এখন যখন হুমকি পর্যন্ত গেল,

তিনি যে পরোয়া করেন না, সেটা প্রমাণ করতে এবং সততাটা ধরে রাখতে নাম বলেই দেওয়াটাই জরুরি।
ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া এই ঘটনা শেষ হলো এসে সেপ্টেম্বর মাসে।
দীর্ঘদিন পর তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী শরিফুল হক প্লাবনকে আজীবন ক্রিকেট-সংশ্লিষ্ট সব ধরনের কাজ থেকে নিষিদ্ধ করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। একদিন এক সংবাদ সম্মেলনে বোর্ড সভাপতি আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, প্লাবনের বিপক্ষে অভিযোগের সত্যতা পেয়েছেন তারা। সে কারণেই তাকে ক্রিকেটের সব ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে নিষিদ্ধ করা হয়। এটি ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম এ ধরনের ঘটনা।

৪.
এর মধ্যে প্রথম বিপিএল অবশ্য শেষ হয়ে গেছে।
শেষটা হয়েছে মাশরাফির হাসির ভেতর দিয়েই। টুর্নামেন্টের নায়ক ছিলেন সাকিব আল হাসান। তবে 'অধিনায়ক' ছিলেন মাশরাফিই।
সাকিবের দলকেই সেমিফাইনালে হারিয়ে মাশরাফি নিজের দল ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটরসকে নিয়ে আসেন ফাইনালে। আর ফাইনালে বরিশাল বার্নার্সকে ৮ উইকেটে হারিয়ে শিরোপা জিতে নেয় মাশরাফির দল।
বোলার মাশরাফির জন্যও বেশ ছিল টুর্নামেন্টটা। ১১ ম্যাচে ১০ উইকেট নিয়েছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা একটা টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে, তাও উপমহাদেশে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে তার ইকোনমি রেট ছিল মাত্র ৬.৮৫।

৫.
আবার একটু সামনে এগিয়ে যাব আমরা। এক বছর এগিয়ে পরের ফেব্রুয়ারিতে চোখ রাখব।
১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা।
দ্বিতীয় বিপিএলে তখন আগেরবারের চ্যাম্পিয়ন ঢাকা গ্লাডিয়েটরসের একক আধিপত্য। ছয় ম্যাচের পাঁচটাই জিতে ফেলেছে তারা। ঢাকার গ্ল্যাডিয়েটরস কোচ, সাবেক জাতীয় দলের বোলিং কোচ ইয়ান পন্ট তার হোটেল রুমে শুয়ে সুখে সময় কাটাচ্ছিলেন–পালকে তার আরেকটা সাফল্য যোগ হতে যাচ্ছে।
এমন সময় হঠাৎ হোটেল রুমে এলেন দলের মালিকের ছেলে জিসান চৌধুরী ও নাম না-জানা আরেকটি লোক। তেমন কথা না বাড়িয়ে জিসান বললেন, তারা পরের দিন চট্টগ্রাম কিংসের বিপক্ষে ম্যাচটা পাতাতে চান।
কোনো দ্বিধা নেই, কোনো সংকোচ নেই। শুধু ম্যাচ পাতাতে চাওয়া নয়, ম্যাচের ভেতর আরও অনেক কিছু করতে চায় তারা। সেই চাওয়ার রীতিমতো একটা

তালিকা করে নিয়ে এসেছে জিসান।

পন্টের সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো–আমাকে পালাতে হবে।

তার মাথা ঘোরাচ্ছে। যেভাবে তারা কথা বলছিল, মনে হচ্ছিল, আরও অনেক লোক জড়িত এর সঙ্গে। এমনকি দলে তারা দুজন নতুন বোলার ঢোকাতে চায়, যারা নিশ্চিত করবে যে, যা যা চাওয়া হচ্ছে, সব যেন ঠিকমতো হয়।

এই পর্যায়ে এসে জিসান নিজেই বলল, তারা মাশরাফিকে দলের বাইরে রাখতে চায় এবং আশরাফুলকে অধিনায়কত্ব দিতে চায়। কেন?

পন্টের মুখেই শুনুন :

তারা চাইছিল, নিয়মিত অধিনায়ক মাশরাফি মুর্তজাকে সরিয়ে মোহাম্মদ আশরাফুলকে অধিনায়ক করা হবে। কারণ, তারা বলছিল যে, তারা জানে মাশরাফিকে দিয়ে দুর্নীতির কোনো কাজ করানো যাবে না। সে এর আগেই একবার তাকে যে প্রস্তাব (ফিক্সিংয়ের) দেওয়া হয়েছিল তা প্রকাশ করে দিয়েছিল এবং মিডিয়াতেও বলে দিয়েছিল। ফলে তাকে পাশে সরিয়ে রাখতে চাইল ওরা। [৪]

পন্টের এই ভাষ্যটাই হতে পারে মাশরাফির জন্য সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন। খোদ ম্যাচ পাতাতে আসা লোকজন বলছে, মাশরাফিকে কেনা যাবে না!

পন্ট পুরো ঘটনা হজম করতে না পেরে স্ত্রীকে ফোন করে বললেন, তিনি চলে আসতে চান। এর মধ্যে এই চক্রটা ওয়াইজ শাহকে প্রস্তাব দিল; তিনি আকসুকে জানিয়ে দিলেন। ড্যারেন স্টিভেন্স না জানালেও পন্টের বক্তব্য মতে খুব হতাশ ছিলেন।

পন্ট সারা রাত ঘুমাতে পারলেন না। পরদিন সকালেই আকসুর পিটার ও'শিয়াকে জানালেন তিনি। ব্রেকফাস্ট টেবিলে ও'শিয়াকে বললেন, তার কাজ জানানো, জানিয়েছেন। এবার তিনি পরের ফ্লাইটেই ইংল্যান্ড চলে যেতে চান। ও'শিয়া একমত হলেন। বললেন, এটা ঠিক পরিকল্পনা। তবে পন্ট যদি সত্যিই চান এই চক্রটা ধরা পড়ুক এবং আর কখনো যেন এই চক্র ক্রিকেটে এসব কাজ করতে না পারে, তাহলে যেন থেকে যান এবং তাদের তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করেন।

পন্ট একমত হলেন।

এবার আকসুর গোয়েন্দারা এসে পন্টের হোটেলরুমে কলমের মতো একটা ভিডিও যন্ত্র বসিয়ে রেখে গেল হোটেলের ডিরেক্টরি বইয়ের ভেতর। আর একটা অডিও রেকর্ডার রাখা হলো ড্রয়ারে। সঙ্গে পন্টের ল্যাপটপে রেকর্ডিং চালু করে দেওয়া হলো। ল্যাপটপ বিছানার ওপর রেখে পাশে এক গাদা কাগজপত্র রেখে দেওয়া হলো, যেন পন্ট কাজ করছিলেন।

এবার পন্ট জিসান চৌধুরীকে ফোন করলেন, রুমে আসার জন্য।

জিসান চৌধুরী এলে পন্ট আবার পরিকল্পনাটা আরও বিস্তারিত আকারে শুনতে চাইলেন। জিসান ধাপে ধাপে বলে গেলেন, কোন কোন খেলোয়াড় তাদের সঙ্গে

জড়িত আছেন। কী কী করা হবে, সব বললেন। পন্ট পরদিনই চেয়েছিলেন রেকর্ডিংগুলো আকসুর হাতে তুলে দিয়ে চলে যেতে।

কিন্তু পাওনা টাকার জন্য যেতে পারলেন না তিনি। এখানেই গোলমালটা লাগল, জিসান তাকে ৬ হাজার পাউন্ড দিলেন। যে অংকটা পন্টকে পাতানোর সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য দেওয়ার কথা। আর পন্ট দাবি করলেন এই অংকটা তিনি নিয়েছে, তার বকেয়া বেতন ১০ হাজার পাউন্ডের একটা অংশ হিসেবে।

সে যাই হোক, পন্ট জেনেশুনেও পরের ম্যাচে কোচ হিসেবে কাজ করলেন। এবং রীতিমতো নোংরামির এক চূড়ান্ত দেখল ক্রিকেট। *

৬.

ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটরস দল ভালো অবস্থায় আছে বলে ফুরফুরে মেজাজে মাঠে এসেছিলেন মাশরাফি।

খেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে মাশরাফির মাঠে আসা মানে বিরাট একটা হ্যাঙ্গাম। হাঁটুতে টেপিং করতে হয়, হাঁটুর ক্যাপ পরতে হয়, বিশেষ ম্যাসাজ নিতে হয়। এতসব ঝামেলা করে মাঠে এসে ওয়ার্মআপ করছেন। তখন ইয়ান্ট পন্ট এসে তাকে বললেন, 'ম্যাশ, আজ তুমি খেলছ না?'

প্রথমটা ভেবেছিলেন রসিকতা। সিরিয়াস বুঝতে পেরে প্রশ্ন করলেন, 'কে ঠিক করল? আমি ক্যাপ্টেন, খেলব কি না; আমি ঠিক করব না!'

'ঠিক হয়েছে। তুমি আজ খেলছ না।'

'কেন? ব্যাখ্যা দাও।'

নিরুত্তর মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন পন্ট। মাশরাফির এই নাটক, এসব ব্যাপার কখনো ভালো লাগে না। প্রিয় কয়েকটা অশ্রাব্য গালি দিয়ে কাছেই পড়ে থাকা পানির বোতলে মারলেন লাথি।

পন্ট সেটা হজম করে সরে এলেন।

একটু পর মাশরাফি শুনলেন সাকিবকেও খেলানো হচ্ছে না। ক্যাপ্টেনসি করবে আশরাফুল। মাশরাফি আর সাকিব পাশাপাশি বসে খেলা দেখছেন। মাঠে যা হচ্ছে তা হাস্যকর, তা নোংরামি, তা ছেলেখেলা; তা ক্রিকেট কিছুতেই নয়।

সাকিবকে একবার বললেন, 'দেখছিস, কী হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, ভাই। এ জন্যই আপনারে আর আমারে নেয় নাই মনে হয়।'

অনুমানই তারা কেবল করতে পারেন, কিছু তো জানেন না। অনুমানটা সেদিন শুধু মাশরাফি-সাকিব করেছিলেন তা-ই নয়। যারা খেলা দেখেছিলেন, প্রত্যেকে বুঝেছিলেন, দিনেদুপুরে অন্যায় হচ্ছে।

একদিন যেতে না-যেতেই বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় সব সংবাদপত্রই এই ম্যাচকে সন্দেহজনক বলে রায় দিয়েছিল। প্রথম আলো পরিষ্কার লিখেছিল–চিত্রনাট্যের ম্যাচ

বলেই মাশরাফি বাদ!

তারেক মাহমুদ এই রিপোর্টে পরে যেসব ঘটনা দুনিয়া তোলপাড় করেছেন, সেদিকে অত্যন্ত সঠিকভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন :

ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটরসের পেসার মাহবুবুল আলমের একটা নো বল, ব্যাটিংয়ে ড্যারেন স্টিভেনসের রানআউট, আরও দু-একজন ব্যাটসম্যানের সহজ ক্যাচ তুলে দেওয়া, টি-টোয়েন্টি পাওয়ার প্লে ৬ ওভারে এবার বিপিএলের সর্বোচ্চ ১৫ রান ওঠা—এসবও যোগ হচ্ছে সন্দেহের উপকরণের তালিকায়। কেউ কেউ আতশি কাচের তলায় আনছেন টসে জিতে ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটরসের পরে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্তটাও। [৪]

ঘটনার দুদিন পর পত্রপত্রিকায় ওঠা এসব প্রশ্ন এবং আকসু কর্মকর্তাদের দৌড়ঝাঁপ দেখে ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটরস কর্তৃপক্ষ একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠায়। সেখানে তারা দাবি করে, ফিজিওর পরামর্শে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে তাকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন কোচ পন্ট। কিন্তু এই ব্যাখ্যাতেও একটা গোলমাল থেকে যায়, দল থেকে বলা হয়, হাঁটুর পুরোনো ইনজুরির কারণে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল তাকে। অথচ ম্যাচের দিন বলা হয়েছিল কোমরের ব্যথা।

এসব কথা বলার পাশাপাশি ঢাকা দল আশাবাদ শোনায় যে, মাশরাফি পরের ম্যাচে স্বভূমিকায় ফিরে আসবেন। তবে কিছু ভেতরের সূত্রের খবর হলো, মাশরাফি আর অধিনায়কত্ব করতে আপত্তি করেছেন। অধিনায়কত্ব করতে পারেন, তবে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে সে জন্য।

৭.

বিপিএল শেষ হয়ে গেছে। সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছে।

এমন সময় একদিন হঠাৎ মাশরাফি বিসিবি থেকে ফোন পেলেন, তাকে একটু হোটেল র‍্যাডিসনে যেতে হবে।

কেন?

আইসিসি থেকে একদল তদন্ত কর্মকর্তা এসেছেন। তারা কথা বলবেন।

মাশরাফি আর কী বলবেন? তিনি তো তেমন কিছু জানেনেই না। তারপরও যা দেখেছেন, যা বুঝেছেন বললেন। একে একে সব খেলোয়াড়কে জেরা করা হলো। এরপর ডাকা হলো মোহাম্মদ আশরাফুলকে। আশরাফুলের সাক্ষ্যে বেরিয়ে এল কেঁচো খুঁড়তে কেউটে। দুটি পত্রিকা পরপর দুটি বিশেষ প্রতিবেদনে ফাঁস করে দিল আশরাফুলের সাক্ষ্য। শুধু বিপিএল নয়, বাংলাদেশের অনেক আন্তর্জাতিক ম্যাচের ব্যাপারস্যাপারও উঠে এল এই সাক্ষ্যে।

শুরু হয়ে গেল দেশজুড়ে তোলপাড়। বাংলাদেশের ইতিহাসে বৃহত্তম ফিক্সিং কেলেঙ্কারির পর্দা উঠতে শুরু হলো। পর্দা উঠতে থাকলে জানা গেল, আইসিসির

দুর্নীতি দমন ও নিরাপত্তা ইউনিট– আকসু আসলে অনেক দিন ধরেই জাল গোটাচ্ছিল।

বিপিএলের দ্বিতীয় আসরে ম্যাচগুলোর দিকে চোখ রাখার জন্য বিসিবি ও আইসিসির মধ্যে এক চুক্তি হয়। আর সেই চুক্তির ফলে আইসিসির দুর্নীতি দমন ও নিরাপত্তা ইউনিট (আকসু) প্রতিটি ম্যাচে তদন্ত করে ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্সের কমপক্ষে দুটি ম্যাচ সন্দেহজনক বলে রায় দেয়। এরপর অধিকতর তদন্ত শেষে চাঞ্চল্যকরভাবে বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও দেশের অন্যতম সেরা তারকা মোহাম্মদ আশরাফুলসহ কয়েকজন ক্রিকেটারের নাম বেরিয়ে আসে। এরপর দীর্ঘ গুঞ্জনের পর ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরেই আইসিসি ও বিসিবি সংবাদ সম্মেলন করে বলে ৯ জন খেলোয়াড় বা কর্মকর্তা এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত।

এরপর সে বছর ১৪ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি ও আইন কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুর রশীদকে ডিসিপ্লিনারি কমিটির প্রধান হিসেবে মনোনীত করে বিসিবি। পরে চেয়ারম্যান নিয়োগ দেন কমিটির বাকি ১০ সদস্যকে। এরপর ১০ নভেম্বর ওই ডিসিপ্লিনারি কমিটি সাবেক বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে প্রধান করে ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। ট্রাইব্যুনালের বাকি দুই সদস্য হলেন আজমালুল হোসেন কিউসি এবং সাবেক ক্রিকেটার শাকিল কাশেম।

কয়েক দফা শুনানির পর ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রাথমিক রায় ঘোষণা করেন সেই ট্রাইব্যুনাল। রায়ে বলা হয়, অভিযুক্ত সেলিম চৌধুরী, জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ রফিক, ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্সের কর্মকর্তা গৌরব রাওয়াত, জাতীয় ক্রিকেটার মোশাররফ রুবেল ও মাহবুবুল আলম রবিন এবং ইংলিশ ক্রিকেটার ড্যারেন স্টিভেন্সের বিপক্ষে কোনো অভিযোগ প্রমাণ হয়নি। মোহাম্মদ আশরাফুল নিজমুখেই দোষ স্বীকার করেছিলেন।

প্রাথমিক এই রায়ে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুলকে ৮ বছরের জন্য সব ধরনের ক্রিকেট থেকে নিষিদ্ধ করেন ট্রাইব্যুনাল। সেই সঙ্গে ১০ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ট্রাইব্যুনাল। তবে আশরাফুল এই শাস্তি তাঁকে কার্যত চার বছরে নামিয়ে আনতে পারেন। এরপর অবশ্য আপিল করায় আশরাফুলের শাস্তি নেমে আসে পাঁচ বছরে; যার মধ্যে দুই বছর স্থগিত দণ্ডাদেশ।

ট্রাইব্যুনাল রায়ে বলেন, আশরাফুলের বিরুদ্ধে চারটি অভিযোগ ছিল। চারটিই ম্যাচ পাতানোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সব অভিযোগের ভিত্তিতে আট বছর তাকে খেলাধুলা থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আট বছরের মধ্যে পাঁচ বছর ন্যূনতম হবেই। বাকি অংশটুকু বাতিল হতে পারে। তার শর্ত হলো, বিসিবি, আইসিসি বা এসিসি আয়োজিত এডুকেশন বা রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে

হবে। যেদিন থেকে আশরাফুল সাময়িক নিষিদ্ধ ছিলেন, সেদিন থেকেই এই সাজা হিসাব করা হবে।

৮.

এদিকে দেশজুড়ে এসব তোলপাড় চলছে, মাশরাফি নানা রকম উড়োফোন পাচ্ছেন। একটু ভয় করছে। তিনি তো ভেতরের কিছুই জানেন না। তারপরও কে বা কারা ধরে নিচ্ছে, তিনি অনেক কিছু ফাঁস করে দিতে পারেন। সেই ধরে নেওয়া থেকে হুমকি পাচ্ছেন।

একদিন রাষ্ট্রের খুবই ক্ষমতাধর একটি এজেন্সি থেকে মাশরাফি ফোন পেলেন। তৎপর গোয়েন্দারা বললেন, তারা জানেন, মাশরাফি একধরনের হুমকির মধ্যে আছেন। তারা মাশরাফিকে বিশেষ নিরাপত্তা দিতে চাইলেন।

মাশরাফি 'না' করলেন। যথোপযুক্ত সম্মান দেখিয়ে বললেন, আমার সঙ্গে সব সময় বন্ধুরা থাকে ভয় নেই। রাষ্ট্রীয় এজেন্সিটি মাশরাফির কথা মেনে নিলেও পরে তিনি টের পেয়েছেন, তিনি একধরনের নিরাপত্তা ছায়ায় ছিলেন।

তখন তো এই ছায়ার কথা জানতেন না। তাই বন্ধুদের ছায়ায় থাকতেন। সামনে-পেছনে মোটরসাইকেল করে বন্ধুরা থাকত। মাঝে গাড়িতে মাশরাফি।

* এই অনুচ্ছেদটি মূলত ইয়ান পন্টের ২০১৫ সালে ইএসপিএনক্রিকইনফোকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লেখা। তার এই ভাষ্যকে নিরপেক্ষ বলে মনে না করার অবকাশ রয়ে গেছে। বিশেষত বিপিএলের দুর্নীতির বিচার করতে গঠিত ট্রাইব্যুনাল তার দেওয়া ভাষ্যকে সন্দেহাতীতভাবে সত্য বলে মনে করেননি। তার ৬ হাজার পাউন্ড রেখে দেওয়া এবং জেনেশুনেও একটি অন্যায় ম্যাচ সংঘটিত হতে দেওয়ার বক্তব্যকে যেভাবে আইসিসি ও পন্ট যৌক্তিক প্রমাণের চেষ্টা করেছেন, তা সঠিক মনে করেননি ট্রাইব্যুনাল। ফলে এই বর্ণনা প্রামাণ্য নয়।

[১] শুরুর আগে ফিক্সিং নিয়ে তোলপাড়, মাশরাফিকে প্রস্তাব; সাইদুজ্জামান (কালের কণ্ঠ; ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১২)

[১] Mashrafe reports spot-fixing approach; মোহাম্মদ ইশাম (ক্রিকইনফো; ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১২)

[২] ওই

[৩] Pont speaks of struggle after corruption sting; জর্জ ডোবেল (ক্রিকইনফো; ২ এপ্রিল, ২০১৫)

[৪] চিত্রনাট্যের ম্যাচ বলেই মাশরাফি বাদ!; তারেক মাহমুদ (প্রথম আলো, ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩)

অবশেষে ক্রিকেট



১.

বাংলাদেশের ক্রিকেটে সে একটা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়।

বোর্ড সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন একদিন সংবাদ সম্মেলনেই বড় হতাশ হয়ে বলছিলেন–বিপিএল একটা যন্ত্রণায় পরিণত হয়েছে।

বিপিএলের ফিক্সিং কেলেঙ্কারি নিয়ে যন্ত্রণা তো ছিলই। তার চেয়ে বড় হয়ে উঠল দুই মৌসুমের পাওনা টাকা নিয়ে খেলোয়াড়দের ধর্মঘটে যাওয়ার হুমকি। অধিনায়ক হিসেবে মুশফিকুর রহিম সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

মাঠের বাইরে বিতর্ককে আরও উসকে দিতে এই সময় ঘটল তামিম-কাণ্ড। ফিটনেসের অজুহাতে ঘোষিত দল থেকে তামিমের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হলো খোদ বোর্ড সভাপতির হস্তক্ষেপে। এ ঘটনার প্রতিবাদে প্রধান নির্বাচক আকরাম খান, যিনি আবার তামিম ইকবালের চাচা, পদত্যাগ করে বসলেন। পুরো ঘটনায় দেশের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে হস্তক্ষেপ করার পর তামিমকে আবার দলে ফেরানো হলো এবং

আকরাম পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করলেন।

এর কিছুদিন আগেই ঘটে গেছে আরও নাটকীয় ব্যাপার।

জিম্বাবুয়ে সফরে বাংলাদেশের একটি টেস্ট হার ও ওয়ানডে সিরিজে পরাজয়ের জের ধরে অধিনায়ক ও সহ-অধিনায়ক পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো সাকিব আল হাসান ও তামিম ইকবালকে।

বোর্ড জানাল, শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আছে এই দুজনের বিপক্ষে। এই অভিযোগ প্রশ্নাতীত কি না, তা নিয়ে অবশ্য অনেক প্রশ্ন থেকে গেল। প্রশ্ন থাকলেও নতুন অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেলেন মুশফিকুর রহিম, তার ডেপুটি মাহমুদউল্লাহ।

মোট কথা, এশিয়া কাপের জন্য তৈরি হচ্ছিল বিপর্যস্ত, বিতর্কজর্জর এক বাংলাদেশ দল। আর এই দলেরই অংশ হিসেবে ১৩ মাস পর আবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন মাশরাফি বিন মুর্তজা।

ফিরছেন আসলে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে আনন্দের, সবচেয়ে ট্র্যাজেডির এক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের অংশ হতে।

২.

মাঝে অনেক ঘটনাবহুল সময়, বেশ কিছু ক্রিকেট খেললেও এত দিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বলে একটা রোমাঞ্চ তো ছিলই।

প্রথম ম্যাচে ২১ রানে পাকিস্তানের বিপক্ষে হারে শুরু হলো এশিয়া কাপ। আগে ব্যাট করে পাকিস্তান ২৬২ রান করল। মাশরাফি ৫৫ রানে একটি উইকেট নিতে পারলেন। জবাব দিতে নেমে তামিম-সাকিবের ফিফটি ও নাসিরে ৪৭ রানে ৫ উইকেটে ২২৪ রান তুলে ফেলেছিল বাংলাদেশ ৪৩ ওভারে। কিন্তু আজমল ও গুলের হঠাৎ তাণ্ডবে ২৪১ রানে অলআউট বাংলাদেশ।

১৯৯৯ বিশ্বকাপ বাদ দিলে এর আগ পর্যন্ত পাকিস্তানের বিপক্ষে যা ইতিহাস, তাতে এই লড়াকু পারফরম্যান্সেই অনেকে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু আসল ভেলকি তো জমা ছিল।

দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে লড়াই। শচীন টেন্ডুলকার শততম সেঞ্চুরি করে ফেললেন। অনেকেরই কপালে হাত। কিন্তু ভারতের বিপক্ষে আরও একটা বড় আসরে নাটকীয় জয় এনে তামিম-নাসির-জহুরুল, সাকিব-মুশফিক। আগে বল করা মাশরাফি এদিন স্বরূপে ফিরলেন ১০ ওভারে ১ মেডেন নিলেন; ৪৪ রান দিয়ে ২ উইকেট।

এই জয়ে বাংলাদেশ হঠাৎই এশিয়া কাপ ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছিল। অবশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি, মাশরাফি দলের সিনিয়র খেলোয়াড় হিসেবে দাবি করছেন যে, তারা ফাইনালে ওঠার চাপ নিচ্ছেন না :

আমরা এমন একটা দল যে, আমাদের এক-দুজন খেলোয়াড়ের ওপর ভরসা করা চলে না। আমাদের পাঁচ-ছয়জন খেলোয়াড়কে ভালো পারফর্ম করতে হয় ভালো

ফল পেতে, যেটা ভারতের বিপক্ষে করেছি আমরা। হ্যাঁ, আমাদের আরেকবার এটা করার সামর্থ্য আছে। তবে টুর্নামেন্ট শুরুর আগেও আমি বলেছিলাম, আমরা ফাইনাল খেলতে আসিনি, ভালো ক্রিকেট খেলতে চেয়েছি। ভারতের বিপক্ষে জয় পাওয়ায় আমরা এ অবস্থায় এসেছি। কিন্তু সে জন্য আমরা লক্ষ্য বদলাব না। আমাদের যে পরিকল্পনা ছিল, আমরা সেভাবে খেলতে পারলেই সামনে এগোতে পারব। [১]

এই কথার মধ্যে আপনি কি অধিনায়কত্ব দেখতে পান?

শ্রীলঙ্কা আগে ব্যাট করে নাজমুলের দারুণ বোলিংয়ে ২৩২ রানের বেশি এগোতে পারল না। মাশরাফি ৩০ রানে ১ উইকেট নিলেন। বৃষ্টি-বাধায় কমে এল ম্যাচের দৈর্ঘ্য। ৪০ ওভারে বাংলাদেশের লক্ষ্য ২১২ রান। মাঝে ধাক্কা খেলেও সাকিবের ফিফটিতে ২ ওভার ৫ বল হাতে রেখেই লক্ষ্যে পৌঁছে গেল বাংলাদেশ।

এবার ফাইনাল।

মাশরাফি, রাজ্জাক, সাকিব ঘিরে ধরলেন পাকিস্তানকে। মাশরাফি ৪৮ রানে ২ উইকেট নিলেন। রাজ্জাক ১০ ওভারে ৩টি মেডেন নিলেন, ২৬ রানে ২ উইকেট। পাকিস্তান করতে পারল ২৩৬ রান।

তামিম ইকবাল টানা চার ফিফটি করলেন; চার আঙুল দেখালেন।

সাকিবও আবার ফিফটি করলেন। জয় তখন দেখা যাচ্ছে। এই সময়ে দলকে ১৭৯ রানে রেখে পঞ্চম ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হয়ে গেলেন সাকিব। মাহমুদউল্লাহ ও মুশফিক জুটিটা লম্বা করতে পারলেন না। মুশফিক ফিরলেন এক ওভার পরই। এবার উইকেটে এলেন মাশরাফি।

জয়ের জন্য তখন ২৯ বলে চাই ৪৭ রান; সঙ্গী রিয়াদ। উমর গুলের করা ৪৭তম ওভারটায় রিয়াদ একটি এবং মাশরাফি পরপর দুটি চার মেরে সমীকরণ অনেকটাই হাতে নিয়ে এলেন–৩ ওভারে ২৫ রান দরকার প্রথম ট্রফিটা স্পর্শ করতে। সাঈদ আজমলের ৪৮তম ওভারের প্রথম বলটায় জায়গা বানিয়ে এক্সট্রা কাভারের ওপর দিয়ে মেরেছিলেন; দুর্দান্ত ফিল্ডিংয়ে চার বাঁচল, ৩ রান হলো। দুই বল পরে সেই আজমলকেই প্যাডেল করতে গিয়ে ৯ বলে ১৮ রান করা মাশরাফি ফেরত এলেন। ১৪ বলে তখন ১৯ রান দরকার। শেষ ওভারে দরকার ছিল ৯ রান। শেষ দুই বলে দরকার ছিল ৪ রান। কিন্তু হায়! রিয়াদ স্ট্রাইক পেলেন না, রাজ্জাক-রাজীব কাজ করতে পারলেন না। কাঁদল সারা বাংলাদেশ।

৩.

এবার সময় আরেকটা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের।

২০০৭ সালের পর প্রতিটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপই বাংলাদেশ খেলেছে খেলতে হয় বলে। বহুকাল পর ২০১২ সালের এই শ্রীলঙ্কা আসরটিকে কিছুটা গুরুত্বের সঙ্গে নিল বিসিবি। সেই ভাবনা থেকে বাংলাদেশকে টানা বেশ কিছু টি-টোয়েন্টি খেলতে

পাঠিয়ে দিল আয়ারল্যান্ড, হল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে।

যদিও শ্রীলঙ্কায় উপমহাদেশীয় কন্ডিশনের আসরের জন্য ইংলিশ কন্ডিশনে প্রস্তুতি নিতে যাওয়াটা বাস্তব ছিল কি না, সে প্রশ্ন ছিল।

সফর শুরু হয়েছিল কোম্বারে আয়ারল্যান্ড একাদশের বিপক্ষে প্রস্তুতিমূলক টি-টোয়েন্টি দিয়ে। মাশরাফিরই শুরুর তুখোড় বোলিং ম্যাচ বাংলাদেশের হাতে নিয়ে আসে। শুরুতেই পরপর ৩ উইকেট নিয়ে আয়ারল্যান্ডকে ৬ উইকেটে ১০৩ রানের বেশি যেতে দেননি তিনি। সব মিলিয়ে ৪ ওভারে ১৪ রানে নেন তিনি ৩ উইকেট। পরে মুশফিকের ২৫ বলে ৪০ রানে ভর করে ৭ উইকেটের জয় পায় বাংলাদেশ।

জুলাইতে সফরের প্রথম ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে ৭১ রানে হারাল বাংলাদেশ। সাকিবের ফিফটিতে ১৯০ রান করেছিল সফরকারীরা। জবাবে আইরিশরা অলআউট হয় ১১৯ রানে। ইলিয়াস সানি অভিষেকে ১৩ রানে ৫ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা।

দ্বিতীয় ম্যাচে আইরিশদের বিপক্ষে ১ রানের জয়। তৃতীয় ম্যাচে ২ উইকেটের জয়। এই ম্যাচটায় একেবারে অলরাউন্ডার মাশরাফিকে পেলাম আমরা। ৬ নম্বর বোলার হিসেবে বল করতে এসে ৪ ওভারে ১৯ রান দিয়ে ৪ উইকেট। আবার দলের জয় হাত ছাড়া হতে থাকা অবস্থায় ১৩ বলে ৪টি ছক্কায় ৩০ রান।

তবে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে বেশ একটা ধাক্কা হজম করতে হয়েছিল। মাশরাফি ৪ ওভারে ২২ রান দিয়ে ২ উইকেট নেওয়ার পরও স্কটিশরা ১৬২ রান করে ফেলেছিল। মাশরাফি ৯ বলে ২টি ছক্কায় ১৫ রান করেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ ১২৮ রানে অলআউট হয়েছিল।

এ অঘটনের ধাক্কা সামলেও সফরের শেষে নেদারল্যান্ডসকে ৮ উইকেটে হারিয়ে ফিরেছিল মুশফিকের দল। আগে ব্যাট করা ডাচরা ১৪৪ রান করেছিল। মাশরাফি ৪ ওভারে ১টি মেডেন নিয়েছিলেন; বাকি ৩ ওভারে ২২ রান নিয়ে ২ উইকেট।

৪.

শ্রীলঙ্কা একটা বিশাল, বিশাল দ্বীপ।

দ্বীপের এপাশ থেকে ওপাশ পার হয়ে গেছে দেশের বৃহত্তম নদী মহাবলী। বলা হয় এই নদীর কূলে কূলেই গড়ে উঠেছিল শ্রীলঙ্কার সভ্যতা। নদীর সেই আগের দিন আর নেই। কিন্তু এখনো নদীটির পাড়ে শ্রীলঙ্কার নামকরা সব স্থাপনা গড়ে ওঠে। পর্তুগিজ সংস্কৃতির ছোঁয়া ছড়িয়ে থাকা ক্যান্ডি শহরের পাঁচ তারকা হোটেল মহাবলী রিচ যেমন তৈরি হয়েছে এই নদীরই পাড়ে।

এই হোটেল আর নদীকে আলোচনায় আনার কারণ হলো, এই হোটেলেই বেস ক্যাম্প ছিল বাংলাদেশের ২০১২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। জুলাইতে ইউরোপ সফর শেষ করে ফেরার পর সেপ্টেম্বরে শুরু হয় শ্রীলঙ্কায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

এই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের গ্রুপটাকে বলা হচ্ছিল, গ্রুপ অব ডেথ।

গ্রুপে দল হলো তিনটি–বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তান। পরের রাউন্ডে যাবে দুটি দল। তার মানে, একটি পরাজয়ই শেষ করে দিতে পারে যেকোনো দলের স্বপ্ন; আবার একটি জয়ও যথেষ্ট হতে পারে পরের রাউন্ডের জন্য।

সেবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশ দলের 'টিম স্লোগান' হলো–অনেক ম্যাচ খেলা হয়েছে, তাই প্রস্তুতি ভালো।

কিন্তু কলম্বোতে এসে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচেই আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে পরাজয়ের ধাক্কায় শুরু হলো অভিযান। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে পরাজয়ের দিনই, সোমবার কলম্বো থেকে ক্যান্ডিতে চলে গেল বাংলাদেশ। গ্রুপ পর্ব শেষ হওয়া পর্যন্ত এই ক্যান্ডি, তথা পাল্লেকেলেই বাংলাদেশের 'বেসস্টেশন'। এখনো দিব্যি স্মরণ থাকার কথা সেখানে মাশরাফি বারবার বলছিলেন, এই পরাজয়টার চেয়ে বড় ব্যাপার হলো, বাংলাদেশ প্রস্তুতি হিসেবে অনেক ম্যাচ খেলতে পেরেছে।

একসময় বাংলাদেশ দল যে খুব একটা টি-টোয়েন্টি খেলার সুযোগ পেত না, সেটা উল্লেখ করেই বলছিলেন, 'আমাদের প্রস্তুতি অনেক ভালো হয়েছে। আগে আমরা খুব বেশি টি-টোয়েন্টি খেলার সুযোগ পেতাম না। বেশ কিছুদিন ধরে আমরা টানা টি-টোয়েন্টি খেলছি। এটা খুব কাজে দেবে। ম্যাচ খেলতে থাকলে একধরনের আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়, সেটা হয়েছে।'

সেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফলাফল যা-ই হোক, মাশরাফির একটা খুব স্বস্তির ব্যাপার হলো, নানা ঘাত-প্রতিঘাত পার করে বাংলাদেশ তত দিনে একটা দল হয়ে উঠতে শুরু করেছে, 'আগের বিশ্বকাপ বা যেকোনো টুর্নামেন্টের চেয়ে আমাদের এই দলটার পার্থক্য হলো, আমরা অনেক দিন ধরে একসাথে খেলছি। এটা আলাদা একটা বন্ডিং তৈরি করে। দলকে একটা ইউনিট হিসেবে তৈরি করে ফেলে। আমরা সে রকম একটা ইউনিট হয়ে গেছি।'

৫.

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাচ্ছেতাই একটা অভিজ্ঞতাই হলো।

প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৫৯ রানের হার। আগে ব্যাট করে ৫৮ বলে ১২৩ রানের ইনিংস খেলে ম্যাককালামই আসলে শেষ করে দিয়েছিলেন বাংলাদেশকে। মাশরাফি সবচেয়ে 'মিতব্যয়ী' বোলার ছিলেন। ৪ ওভারে ২৬ রান দিয়ে ১ উইকেট নিয়েছিলেন।

জবাবে নাসিরের দৃষ্টিনন্দন ৫০ রানের পরও বাংলাদেশ ৮ উইকেটে ১৩২ রানের বেশি এগোতে পারেনি।

দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে লড়াইয়ের আগে একটা হাইপ তৈরি হয়েছিল–বাংলাদেশ জিতে যেতে পারে। সাধারণত বাংলাদেশের ব্যাপারে এ রকম হাইপ তৈরি হলে সে ম্যাচের ফলাফল বাংলাদেশের পক্ষেই যায়। ব্যাটিংটা সে রকমই হয়েছিল। সাকিব ৫৪ বলে ৭১ রানের একটা ইনিংস খেলে বাংলাদেশকে ৬

উইকেটে ১৭৫ রানের পুঁজি এনে দেন। কিন্তু বোলাররা চরমভাবে ব্যর্থ হন। বা ইমরান নাজির ও হাফিজ খুব সফল হন।
ফলে বাংলাদেশ ৭ উইকেটে হেরে যায় ম্যাচ।

৬.
নাসির খুব ভালো নৌকা চালাতে পারেন।
নাসির ভালো ব্যাট করতে পারেন আমরা জানি। নাসিরের অফ স্পিনটা কেমন তা আর কেউ না হোক ২০১৫ সালে বিশ্বসেরা সব ব্যাটসম্যানই টের পেয়েছেন। নাসিরের মিডিয়াম পেসটাও ভালোই ছিল। নাসির বাংলাদেশের নিঃসন্দেহে অন্যতম সেরা ফিল্ডার।
কিন্তু নড়াইলের লোকজন জানে, নাসির ভালো নৌকা চালাতে পারেন।
২০১২ সালের নভেম্বরে শুধু নাসির নন, বাংলাদেশ জাতীয় দলের সব খেলোয়াড়ই মাতিয়ে ফেলেছিলেন নড়াইল শহর; চিত্রা নদী, মাশরাফির মাছের খামার। হঠাৎ করে ছোট্ট, শান্ত শহরটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল মুশফিক, তামিম, রিয়াদ, রুবেল, রাজ্জাকদের আগমনে।
তখন বাংলাদেশের সিরিজ চলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। এর মধ্যে জাতীয় দলের সব তারকা কেন নড়াইলে?
কারণ, মাশরাফি চেয়েছিলেন খেলোয়াড়েরা একটু গুমোট হাওয়া থেকে মুক্তি পান। আফসোসে ঘেরা বদ্ধ সময় থেকে বের হয়ে একটু খোলা হাওয়ায় চলে আসুক। ঝেড়ে ফেলুক ক্রিকেট মাঠের অপ্রাপ্তি।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ঢাকা ও খুলনায় মাঠে দারুণ পারফর্ম করেছিল বাংলাদেশ। দুটো টেস্টেই অধিকাংশ সময় দাপট দেখিয়েও হারতে হলো। ফলে এই লড়াইয়ের প্রত্যাশিত ফল না পেয়ে দলটা একটু মনমরা হয়েছিল। এ অবস্থায় ওয়ানডেতে বাংলাদেশের পারফরম্যান্সে প্রভাব পড়ার শঙ্কা ছিল।
এর মধ্যে আবার টানা খেলার ক্লান্তিজনিত চোটে ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন সাকিব। ফলে চ্যালেঞ্জটা আরও বড় হয়ে উঠেছে। খুলনার হোটেলে দাঁত-মুখ শক্ত করে সেই চ্যালেঞ্জের অপেক্ষায় ছিলেন খেলোয়াড়েরা।
ওয়ানডে দলে যোগ দিতে একটু আগে আগে খুলনা পৌঁছে এই চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেলেন মাশরাফি। দলের চেহারা এমন থাকবে কেন? হারজিত যা-ই আসুক; দল চনমনে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় চলে এল বুদ্ধিটা–এদের এই পরিবেশ থেকে বের করতে হবে।
হঠাৎই দায়িত্ব পেয়ে ভালো পারফর্ম করতে থাকা কোচ শেন জার্গেনসেন ও ম্যানেজমেন্টকে মাশরাফি আইডিয়াটা বললেন। সবাই একমত–আসলেই কিছু একটা করা দরকার। এ অবস্থায় মাশরাফি ছাড়া আর ত্রাতা কে হতে পারে।
অতএব, সবাই মিলে নড়াইল চলো; নড়াইল চলো।

খেলোয়াড়েরা যেন সত্যিই প্রাণ খুঁজে পেলেন। মাশরাফি ভাইয়েরর মুখে কত চিত্রা নদীর গল্প শুনেছেন। এসব গাছপালায় নাকি ম্যাশ ভাইয়ের ছোটবেলা কেটেছে; এখনো সে সময় পেলে গাছে চড়ে। ম্যাশ ভাইয়ের এমন গল্পের মতো শহরে এসে তাদেরও অমন না করলে চলে।

মাশরাফির ছোটবেলার বন্ধুরা খুব মজা পেয়ে গেল তাদের বয়সে ছোট জাতীয় দলের তারকাদের এই আনন্দ দেখে। রাজু যেমন বলছিলেন, 'ওরা তো ছোট থাকতেই প্রায় সবাই ক্রিকেটের জন্য বাইরের জগৎ ছেড়ে দিয়েছে। অনেকে শহরেরই ছেলে, এমন করে নদী-বন সেভাবে দেখেওনি। ফলে এখানে যতটুকু সময় ছিল, যেন এক দিনের স্বাধীনতা পেয়েছিল।'

মাশরাফি নিজে সে সময় বলছিলেন, 'ওদের হতাশা দেখেই আমি ওদের নড়াইল নিয়ে গিয়েছিলাম। দলের জুনিয়রদের সঙ্গে কথা বলাটা জরুরি। আমি খেলার বিভিন্ন দিক নিয়ে ওদের সঙ্গে গল্প করি। আবার খেলার বাইরে ওদের নিয়ে যাওয়াটাই কখনো কখনো খুব জরুরি।'

হঠাৎ এ ধরনের স্বাধীনতা যে কতটা প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পারে, তার প্রমাণ মিলল দুদিন পরই শুরু হয়ে যাওয়া ওয়ানডে সিরিজে।

৬.

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে এই সিরিজটা ছিল নিউজিল্যান্ড ছাড়া পূর্ণ শক্তির কোনো টেস্ট খেলুড়ে দেশের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডে সিরিজ জয়।

প্রথম ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে একেবারে কেনিয়া-জিম্বাবুয়ে বানিয়ে ফেলল বাংলাদেশ। আগে ব্যাট করে ক্রিস গেইল, ডোয়াইন ব্র্যাভো, মারলন স্যামুয়েলস, কাইরন পোলার্ডের দল অলআউট হলো ১৯৯ রানে!

মূল ম্যাজিকটা সেই সোহাগ গাজীই দেখালেন। টেস্ট সিরিজজুড়ে গেইলকে বোতলবন্দী করে রাখা সোহাগ এ ম্যাচেও ২৯ রানে ৯ উইকেট নিলেন। মাশরাফি ৯ ওভারের মধ্যে ২টি মেডেন নিলেন; ৩৯ রানে খরচ করেছিলেন। একমাত্র উইকেট হিসেবে দলের হয়ে প্রথম আঘাতটাই হেনেছিলেন।

জবাবে তামিম, এনামুল হক বিজয় ও নাঈম এনে দিলেন ৭ উইকেটের জয়। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আবারও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে নিয়ে ছেলেখেলা করল বাংলাদেশ। এনামুল হক বিজয়ের সেঞ্চুরিতে আগে ব্যাট করে ২৯২ রান তুলেছিল বাংলাদেশ। তবে রানরেটটা খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। শেষবেলায় ৬ বলে ১টি চার ও ২টি ছক্কায় মাশরাফির ১৮ রান পুঁজিটাকে দর্শনীয় করে।

আবারও হিরো সেই সোহাগ। ২১ রানে নিলেন ৩ উইকেট। রাজ্জাক শ্রেয়তর ছিলেন; ১৯ রানে ৩ উইকেট। মাশরাফি ২৬ রানে ১ উইকেট নিলেন। আর ক্যারিবীয়রা অলআউট হলো ১৩২ রানে।

এই ম্যাচের আগে অনুশীলনে একটা দৃশ্য দেখে খুব মজা পেয়েছিলেন

ক্রিকইনফোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি মোহাম্মদ ইশাম। তিনি লিখেছেন, বোলারদের সঙ্গে বিদেশি কোচ কথা বলে শেষ করার পর মাশরাফি প্রায়ই তাদের পুরো কথোপকথনটা আবার বাংলায় বলে শোনান। নিশ্চিত করতে চান যে, সব বোলার যেন সব কথা ঠিকমতো বোঝেন। ইশাম লিখছেন :

বোলারদের আলাদা মিটিংয়ে কোচ ইংরেজিতে কথা বলে যাওয়ার পর তিনি আবার বাংলায় বোলারদের কথাগুলো বুঝিয়ে বললেন, এটা নিশ্চিত করতে চাইলেন যে, সবাই যেন একই জিনিস বোঝে। এসব ছোটখাটো ব্যাপার ছাড়াও মাশরাফি নতুন বল হাতে অসাধারণ কাজ করছেন। সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৭ ওভারের প্রথম স্পেলে ক্রিস গেইল ও লেন্ডল সিমন্সকে আটকে রাখলেন। দ্বিতীয় ম্যাচে একই কাজ করলেন, এবার তার প্রথম স্পেল আরও ধ্বংসাত্মক ছিল; কারণ তিনি গেইলকে তুলে নিলেন। আসলে বাংলাদেশ দল সৌভাগ্যবান যে, তাদের তাতে একজন মাশরাফি ও রাজ্জাক ছিল, যারা তরুণ সতীর্থদের সঙ্গে, যাদের একটু পথ দেখানো দরকার; তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে। [২]

মনে রাখবেন, মাশরাফি যখন এই দলকে উদ্বুদ্ধ করতে নড়াইল নিয়ে যাচ্ছেন বা খেলোয়াড়দের বোঝাপড়া বাড়াতে কাউন্সেলিং করছেন; তখন তিনি কিন্তু অধিনায়ক নন!

৭.

দ্বিতীয় ম্যাচেই টানটা লেগেছিল উরুর পেশিতে। কাউকে বলেননি। তিনি জানতেন, এই সময়ে তাকে খুব দরকার দলের। তাই তৃতীয় ও চতুর্থ ম্যাচটা প্রবল ব্যথা নিয়েই খেলে গেলেন। ব্যাপারটা জানতেন শুধু অধিনায়ক মুশফিক, কোচ ও ফিজিও।

টান টান উত্তেজনার সিরিজের এই দুই ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতে সিরিজে সমতা নিয়ে এল।

তৃতীয় ম্যাচে তারা জিতল ৪ উইকেটে। বাংলাদেশ আগে ব্যাট করে ২২৭ রান করেছিল; রিয়াদ ফিফটি করেছিলেন। মাশরাফি চতুর্থ ওভারেই গেইলকে ফেরালেও পাওয়েলকে নিয়ে স্যামুয়েলস জয়ের দিকে তরতর করে এগিয়ে যান। কিন্তু হঠাৎ করেই মাশরাফি, রিয়াদ, নাঈম এবং বিশেষ করে রাজ্জাক খেলায় ফিরিয়ে আনেন বাংলাদেশকে। তারপরও কাজের কাজ হয়নি। মাশরাফি ৩৪ রানে ২ উইকেট নিয়েছিলেন।

চতুর্থ ম্যাচে বীভৎস ব্যাটিং-ব্যর্থতায় হারতে হলো ৭৫ রানে। মাত্র ২১২ রান তাড়া করতে গিয়ে ১৩৬ রানে অলআউট হলো বাংলাদেশ। এরপর পঞ্চম ম্যাচ জিতে সিরিজ ঠিকই নিশ্চিত করে মুশফিকের দল। কিন্তু মাশরাফি সে ম্যাচ ও টি-টোয়েন্টিটা খেলতে পারেননি। কারণ ওই ব্যথাটা।

চতুর্থ ম্যাচ শেষে বিসিবি নিশ্চিত করল, মাশরাফিকে অন্তত তিন সপ্তাহের বিশ্রাম

দিতেই হচ্ছে। মুশফিক সংবাদ সম্মেলনে বলছিলেন, মাশরাফির অবস্থা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। এ অবস্থায় আর খেলানো হলে তাকে লম্বা সময়ের জন্য আবার মিস করতে পারে বাংলাদেশ। মাশরাফি বললে হয়তো খেলবেন; কিন্তু আর কত চাওয়া যায়!

মুশফিক এই সময় কথা বলতে গিয়ে রুদ্ধ গলায় স্যালুট জানিয়েছিলেন মাশরাফিকে :

আমার মনে হয় না, উনি সাধারণ মানুষ। গত দুটো ম্যাচও অসম্ভব ব্যথা নিয়ে খেলেছেন। আমার মনে হয় না, উনি যে অবস্থায় খেলেছেন, দুনিয়ার আর কেউ তা করত। ওনাকে স্রেফ স্যালুট জানাই! [৩]

৮.

বিপিএলে যত ঘটনাই ঘটুক, শেষ পর্যন্ত সেই মাশরাফিরাই চ্যাম্পিয়ন।

২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে চট্টগ্রাম কিংসকে হারিয়ে বিপিএলের দুই আসরের দুটি শিরোপা ট্রফিই হাতে তুললেন মাশরাফি। এমনিতেই তারকাখচিত দল। তার ওপর তরুণদের ভালো পারফরম্যান্স মিলিয়ে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল ঢাকা।

আশরাফুল, এনামুল বিজয় ও সাকিব তিন শতাধিক রান করেছিলেন ঢাকা গ্লাডিয়েটর্সের হয়ে। সাকিব ৩২৯ রান ও ১৫ উইকেট নিয়ে আবারও টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়। ফাইনালে জয়টা এসেছিল বিজয়ের হাত ধরে। সব মিলিয়ে মাশরাফির মুখভরা তখন হাসি।

কিন্তু এই হাসির আড়ালে একটা যন্ত্রণা লুকিয়েছিল।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের ইনজুরি কাটিয়েই বিপিএলে খেলতে নেমেছিলেন। কিন্তু ফাইনালে একই ম্যাচে গোড়ালি ও পায়ের তালুতে জোড়া ব্যথা পেলেন। পায়ের তালুর ব্যথাটা প্রথম ওভারেই পেয়েছিলেন। ওই অবস্থায় বোলিং চালিয়ে যাওয়ার ফলে গোড়ালি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে ম্যাচের পরপরই ডাক্তার দেখে জানান, তিন সপ্তাহের বিশ্রাম লাগবে অন্তত।

এই ইনজুরির ফলে তিনি প্রথমে মিস করলেন দলের শ্রীলঙ্কা সফর। এরপর শুরুতে তিন সপ্তাহ মনে হলেও প্রায় দুই মাস কেটে গেলেও ব্যথা কমছিল না। এবারের ইনজুরি থেকে সেরে উঠতে সময়ও লাগছিল অনেক। ফলে অনেক ভেবেচিন্তে জিম্বাবুয়ে সফরে যাওয়া বাংলাদেশ দলের থেকেও নাম বাদ দেওয়া হলো মাশরাফির।

এই শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়ে সফর দুটোকে স্মরণে রাখতে মনে করে দেখতে পারেন শ্রীলঙ্কায় মুশফিকের ডাবল সেঞ্চুরি এবং জিম্বাবুয়েতে অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া। জিম্বাবুয়েতে সিরিজ হারের পর আবেগপ্রবণ হয়ে সেখানেই অধিনায়কত্ব আর না চালানোর ঘোষণা দিয়ে দেন মুশফিক।

পরে দেশে এসে বোর্ড সভাপতির সঙ্গে দীর্ঘ কথোপকথনের পর মন বদলান।

যদিও তার পদত্যাগ করার ঘোষণা প্রত্যাহারের দরকার ছিল না। কারণ ওই সিরিজ পর্যন্তই তার দায়িত্ব ছিল। মন বদলানোতে নতুন করে দাায়িত্ব দেওয়া হলো তাকে নিউজিল্যান্ড সিরিজ পর্যন্ত।

৯.

২০১৩ সালের জুলাই মাসে শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে খেলোয়াড়দের একটা ফিটনেস ক্যাম্প হলো। সেখানে হঠাৎ চমকে উঠতে হলো একেবারে চিকন, লিকলিকে এক ফাস্ট বোলারকে দেখে।

আসলেই প্রথম দেখায় চেনা কঠিন যে, তিনি মাশরাফি বিন মুর্তজা। একেবারে কৈশোরের মতো লিকলিকে হয়ে গেলেন এই সময়ে। মাঝে জমে ওঠা বিভিন্ন জায়গার চর্বি একেবারে ঝেড়ে ফেলে অন্য মানুষ তিনি তখন পুরো সুস্থ হয়ে ওঠার তাড়নায়। ভাত, তেল, শর্করা একেবারে বন্ধ!

এত কিছু করার কারণ ছিল, শরীরের ওজন তাকে সেরে উঠতে দিচ্ছিল না সর্বশেষ ইনজুরিটা থেকে।

মাশরাফি ইনজুরিতে পড়েন এবং সেরে ওঠেন; এটা ১৫ বছর ধরে বাংলাদেশের ক্রিকেটের নিয়মিত চিত্র। ১১ মাস, ১৩ মাসও পুনর্বাসনে কেটেছে তার। কিন্তু এই দফা ছোট্ট একটা ইনজুরি যা ভোগাল, সেটা বিস্ময়কর। পায়ের পাতা ও গোড়ালির ইনজুরিটা সেরেও সারছিল না। অবশেষে জুলাই মাসের দিকে ওজন কমিয়ে ফিটনেসের পথে ফিরে এলেন।

এই ক্যাম্প চলাকালে আরও ৪ কেজি ওজন কমালেন। লক্ষ্য ঠিক করলেন, আসছে অক্টোবরের মধ্যে আরও ৫ কেজি ওজন কমাবেন। ক্যাম্পের পরপরই ছোট রানআপে বল করা শুরু করলেন। তবে সে সময়ও পুরো রানআপে দ্রুত গতিতে বল করলে পায়ে লাগছিল। তাড়াহুড়োও ছিল না। কারণ, তার লক্ষ্য ছিল অক্টোবরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজটা।

লক্ষ্য একেবারেই পূরণ হলো। শুধু ফিটনেস নয়, নতুন চেহারা, নতুন আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ শুরু করলেন মাশরাফি।

এটা ছিল নিউজিল্যান্ডকে টানা দ্বিতীয় 'বাংলাওয়াশ' করার সিরিজ।

১০.

ঘরোয়া ক্রিকেটের উল্লেখ না করাটা অন্যায় হবে।

২০১২ সালে মাশরাফি আবার বিমানে গিয়েছিলেন। তাদের হয়ে ৪টি ম্যাচ খেলেছিলেন সে বছর জানুয়ারিতে। এ বছর নভেম্বরে, চার বছর পর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলতে নেমেছিলেন খুলনার হয়ে।

মাঠে নেমে প্রথম ইনিংসেই ৫৮ রানের ঝলমলে এক ইনিংস খেলেছিলেন খুলনার শেখ আবু নাসের স্টেডিয়ামে। চিকিৎসকদের বেঁধে দেওয়া নিয়মমতো ১০ ওভার বল করে প্রথম ইনিংসে ২৯ রান দিয়ে একটি উইকেট নিয়েছিলেন ঢাকা মেট্রোর

বিপক্ষে এই ম্যাচে।
২০১৩ সালে এলেন মোহামেডানে। দীর্ঘদিন ধরে ঢাকার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী এই দলটা ভেড়ানোর চেষ্টা করছিল মাশরাফিকে। সে চেষ্টা সফল হলো। প্রিমিয়ারের প্রথম পর্বে ৭টি ম্যাচ ও সুপার লিগে ৫টি ম্যাচ খেললেন এ বছর মোহামেডানের হয়ে।
লিগের শেষ ম্যাচে ফিফটি করেছিলেন, ভেতরে একটা ৪৯ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। আবাহনীর বিপক্ষে বল হাতে নিয়েছিলেন ৪০ রানে ৪ উইকেট। এ ছাড়া খুব বলার মতো পারফরম্যান্স ছিল না। মোট ১২ ম্যাচে ১৩ উইকেট নিয়েছিলেন।
২০১৩ সালের শেষ দিকে এসে আরও দুটো বিসিবির আয়োজিত ঘরোয়া টুর্নামেন্টে খেলেছিলেন। প্রথমে ছিল বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ 'এ' দলের তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। দুই ম্যাচে ৩টি উইকেট নিয়েছিলেন। এরপর এল বিজয় দিবস টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট।
এখানে মোহামেডানের হয়েই খেললেন। ৫টি উইকেট নিয়েছিলেন এই টুর্নামেন্টে।

১১.
মাশরাফির এবারের প্রত্যাবর্তনটাকে তাকে সেই ভারতের বিপক্ষে প্রত্যাবর্তনের পর দ্বিতীয় সেরা প্রত্যাবর্তন বলা চলে।
প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ জিতেছিল ৪৩ রানে। মুশফিকের ৯০ ও নাঈমের ৮৪ ছিল বাংলাদেশের ২৬৫ রানের হাইলাইটস। জবাবে নিউজিল্যান্ড ১৬২ রানে অলআউট। এই ম্যাচে নায়কের চেয়েও বেশি কিছু ছিলেন রুবেল। ২৬ রানে ৬ উইকেট নিলেন; তার মধ্যে আবার হ্যাটট্রিকও ছিল!
তবে ৬ ওভারে একটি মেডেন নেওয়া ও ২০ রান দেওয়া মাশরাফির ওপেনিং স্পেলটা রীতিমতো আটকে রেখেছিল নিউজিল্যান্ড টপ অর্ডারকে। এই ম্যাচের পরিসংখ্যান কখনোই বোঝাতে পারবে না প্রথম স্পেলে মাশরাফির নিয়ন্ত্রিত বোলিং; চমৎকার আউটসুইং ও অফ কাটারের দৃশ্যগুলোকে।
দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ জিতল ৪০ রানে। এবার তামিমের ফিফটিতে বাংলাদেশ ২৪৭ রান করতে পেরেছিল। মাশরাফি অনেক দিন পর ব্যাটে কিছু রান পেলেন; ৮ বলে ২টি চার ও ১টি ছক্কায় ১৪ রান। উইকেট স্বীকৃতিটাও পেলেন। ৮.৪ ওভার বল করে ৪৩ রান দিয়ে পেয়েছিলেন ৩টি উইকেট।
এই দুই ম্যাচের পারফরম্যান্স নিয়ে ক্রিকইনফো লিখেছিল :
মাশরাফির এই দুই ম্যাচের পারফরম্যান্সে দলের খুশি হওয়ার কথা। প্রথম ম্যাচে সে খুবই ভালো পারফরমার ছিল; নিশ্চিত করেছে ইনজুরি থেকে ম্যাচ ফিটনেস ফিরে পাওয়ার প্রক্রিয়াটা সুন্দর ছিল। গত ম্যাচে তার ৩ উইকেট শিকারটা ছিল ২০১১ সালের এপ্রিল মাসের পর প্রথম এবং ২০১০ সালের জুলাই মাসের পর

দ্বিতীয় সেরা পারফরম্যান্সে। তার প্রথম স্পেল নিউজিল্যান্ডের দুই ওপেনারকে একেবারে হুক দিয়ে আটকে রেখেছিল। নিখুঁত লাইনে বল করে গেছে সে; কিন্তু কোরি অ্যান্ডারসনকে এসে যেই প্রথম বাইরে বলটা দিয়েছে, সেই এজটাই অসাধারণ ডাইভ দিয়ে ধরে ফেলেছে মুশফিকুর রহিম। [৪]

তৃতীয় ম্যাচটাতেও প্রথম স্পেলে ভালো শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত অবশ্য মাশরাফির জন্য খারাপ ম্যাচ ছিল। ৮ ওভারে ৭৩ রান ব্যয় করে উইকেটশূন্য ছিলেন। তবে বাংলাদেশ ঠিকই শুভ, নাঈমের ব্যাটে ভর করে ৩০৭ রান তাড়া করেও জয় পেয়েছিল ৪ উইকেটের।

এই তৃতীয় ম্যাচটা বাদ দিলে মাশরাফির ফেরাটা তো দারুণ ছিল। তার চেয়ে বড় ব্যাপার ছিল, মাশরাফিকে টিমের বরণ করে নেওয়াটা। মাশরাফি ইনজুরিতে পড়ে লম্বা বিরতির পর ফিরলে দু-একবার বিরূপ বরণের শিকার হয়েছেন। এ ব্যাপারটা এবার মুশফিক অন্তত বিশেষ বিবেচনায় রেখেছিলেন বলে মনে হয়েছে।

ক্রিকইনফো তাকে বরণ করে নেওয়ার ব্যাপারটা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিল :

আপনার যখন এ রকম একজন খেলোয়াড় থাকবে, যার ইতিহাসের মূল অংশ ইনজুরিময় এবং যে প্রতিবছরই প্রায় ইনজুরিতে পড়ে লম্বা সময় বাইরে থাকে এবং ফিরেই আবার বেরিয়ে যায়; এমন খেলোয়াড়ের প্রত্যাবর্তনে দুই ধরনের প্রতিক্রিয়াই হতে পারে। মুর্তজা ও তার সতীর্থরা দুই ধরনের ব্যাপারই দেখেছে। তিন বছর আগে যখন ফিরেছিলেন তিনি, বাজে অভ্যর্থনাই পেয়েছিলেন। কিন্তু এবার তার জন্য মুশফিকের ক্যাচ নিতে ঝাঁপিয়ে পড়া ও উল্লাস দেখে বোঝা গেল, দল এখন এই যোদ্ধার জন্য বেশি কিছু করতে প্রস্তুত। [৫]

যোদ্ধাও দলের জন্য আরও কিছু করতে প্রস্তুত।

[১] Bangladesh relying on team effort, not individuals; সিদ্ধার্থ রবিন্দ্রন (ক্রিকইনফো; ১৯ মার্চ, ২০১২)

[২] Senior players take responsibility; মোহাম্মদ ইশাম (ক্রিকইনফো; ২ ডিসেম্বর, ২০১২)

[৩] Mortaza out for three weeks; মোহাম্মদ ইশাম (ক্রিকইনফো; ৯ ডিসেম্বর, ২০১২)

[৪] Bangladesh discover new match-winners; মোহাম্মদ ইশাম (ক্রিকইনফো; ৩১ অক্টোবর, ২০১৩)

[৫] ওই

সেই পুরোনো সুবাস



১.

১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪। জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম চট্টগ্রাম।

বাংলা পঞ্জিকা বলছে, এটা মাঘ মাস। তবে বাঘ পালানোর মতো শীত আর নেই। সাগরের কোলের শহরটা থেকে শীত যেন আগে আগেই পালাচ্ছে। তিনের বেলায় মাছে মাছে চৈত্র-বৈশাখ বলে ভুল হয়। তবে বিকেল গড়াতেই হিমেল হাওয়া জানান দেয়, শীত আছে।

অমন এক হিমেল হাওয়া দোলানো বিকেল বেলায় দৃপ্ত পায়ে হেঁটে উইকেটে গেলেন তিনি। সঙ্গে ম্যাচ রেফারি ডেভিড বুন ও শ্রীলঙ্কান অধিনায়ক দিনেশ চান্ডিমাল। বুন তার হাতে তুলে দিলেন কয়েনটা।

একটু মৃদু হেসে বুড়ো আঙুল দিয়ে শূন্যে ছুড়ে দিলেন তিনি টসের মুদ্রা। প্রেসবক্সের ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে এক রেডিও সাংবাদিক তার স্টেশনে সর্বশেষ খবর জানাচ্ছিলেন–এই মাত্র টস করতে গেছেন বাংলাদেশের অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা চট্টগ্রামের এক

কর্মকর্তা খুব স্মৃতিকাতর হয়ে বললেন, 'অধিনায়ক শব্দটা ওর নামের আগে কী সুন্দর মানায়, দেখেছেন। মাশরাফিই তো ক্যাপ্টেন।'

হ্যাঁ, মাশরাফি সেদিন ক্যাপ্টেন ছিলেন।

এই দফা অধিনায়ক হয়ে সারা ক্রিকেট-বিশ্বকে মোহিত করা শুরু করেননি তখনো। সেটা ছিল একটা ট্রেলার। বলতে পারেন, বিসিবির একটা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার বিজ্ঞাপনচিত্র মঞ্চায়ন হয়েছিল ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। অসুস্থ মুশফিকুর রহিমের বদলি হিসেবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুটি টি-টোয়েন্টিতে অধিনায়কত্ব করেছিলেন মাশরাফি।

তাৎক্ষণিকভাবে এটাকে আপৎকালীন ব্যবস্থা বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু পেছন ফিরে দেখলে এটা পরিষ্কার যে, যতটা বিতর্ক সহ্য করে বিসিবি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল; তাতে তারা অন্তত জানতেন, ভবিষ্যতে কী করতে যাচ্ছেন তারা।

বিসিবি আসলে বাংলাদেশের সেরা অধিনায়ককে তার না পাওয়াটা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল এবং বাংলাদেশের সেরা ক্রিকেট মস্তিষ্কটিকে যেকোনো উপায়ে আবার নিজ দায়িত্বে শেষলগ্নে হলেও বহাল করতে চাচ্ছিল।

২.

পুরো ব্যাপারটা ঘটল মুশফিক আঙুলে চোট পাওয়ায়।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্টে আঙুলে চোট পাওয়ার পর ওই টেস্টে তিনটা দিন ধরে মাঠে অধিনায়কত্ব সামলাতে হয়েছিল তামিম ইকবালকে। আর উইকেটের পেছনে কাজটা সামাল দিয়েছিলেন সামসুর রহমান শুভ।

টেস্ট শেষ হওয়ার পরপর নিশ্চিত করা হলো, মুশফিক চট্টগ্রামেই অনুষ্ঠিত দুই ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজ অন্তত খেলতে পারছেন না। একটা স্বাভাবিক অনুমান ছিল, তামিমের প্রত্যাশা ছিল, অধিনায়কত্বটা মুশফিকের ডেপুটি হিসেবে তামিম ইকবালই সামলাবেন।

কিন্তু সিরিজ শুরুর তিন তিন আগে বিসিবি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাল, এই দুটি টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবেন মাশরাফি বিন মুর্তজা। তার সহকারী হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন তামিম ইকবাল। বোর্ড সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকায় কয়েকজন পরিচালকের সঙ্গে আলাপ করে এই সিদ্ধান্ত নিলেন। বোর্ড সূত্র জানাল, সিনিয়রিটি, দলে গ্রহণযোগ্যতা ও অধিনায়কত্বের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

ব্যাপারটা শুনতে যত সরল শোনাল, আসলে তত সরল ছিল না।

সিদ্ধান্তটা খুব সহজভাবে নিতে পারলেন না তামিম ইকবাল। সহ-অধিনায়ক হিসেবে তিনি আশা করেছিলেন, এমন পরিস্থিতি তার প্রমোশন হবে। সেটা না হওয়ায় পদত্যাগ করলেন তিনি সহ-অধিনায়কের পদ থেকে।

সহ-অধিনায়কের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোটা এমনিতে কোনো অর্থপূর্ণ ব্যাপার নয়; তবে এটা পরিষ্কার একটা প্রতিবাদ। এ ঘটনায় বিসিবি একটু নড়েচড়ে বসল। যদিও প্রকাশ্যে বিসিবি থেকে বলা হলো, তামিম ইকবালকে নির্ভার ক্রিকেট খেলতে দেওয়ার জন্য বিসিবিই তাকে সহ-অধিনায়ক না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

৪৮ ঘণ্টার জন্য সব খেলোয়াড়ের সব ধরনের মিডিয়া কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলো। বাইরে থেকে মনে হচ্ছিল, ভেতরে বুঝি যুদ্ধ বেধে গেছে। কিন্তু ৪৮ ঘণ্টা পর মাশরাফি যখন প্রথম প্রকাশ্যে কথা বললেন, তখন মনে হলো ফ্রন্টের সবকিছু এক নিমেষেই শান্ত হয়ে গেছে।

মাশরাফি পরিষ্কার করে বললেন, তাদের ভেতরে কোনো সমস্যা নেই, বাইরে এসব নিয়ে অনেক আলাপ হয় বটে, তারা এসব আলাপে প্রভাবিত হন না। পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে এমন অনেক কিছু ঘটবে জীবনে, কিন্তু এসব ঘটনার চেয়ে ক্রিকেট খেলায় বেশি মনোযোগ দিতে চান তারা।

এমনকি মাশরাফি 'মিডিয়া ব্যান'-এর একটা ব্যাখ্যাও দেওয়ার চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন, এর সঙ্গে তামিম-কাণ্ডের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা করা হয়েছে, দলে একঝাঁক তরুণ খেলোয়াড়ের কথা ভেবে। দলে অনভিষিক্ত কয়েকজন খেলোয়াড়ও আছেন। তাদের সবার শুধু খেলা নিয়ে ভাবার মতো সময় করে দিতেই মিডিয়া থেকে দুটো দিন দলকে দূরে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছিলেন মাশরাফি।

কিন্তু এসব প্রকাশ্য, আনুষ্ঠানিক কথাই সত্যি বলে ধরে নেওয়ার খুব একটা কারণ নেই।

ভেতর থেকে পাওয়া নানান খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকল। সেসব খবর দাবি করল, পুরো পরিস্থিতি এমন শান্ত করে তুলতে মাশরাফিকে কিছু কাজ করতে হয়েছে। কাজটা আর কিছু না–তামিম ইকবালকে নিয়ে লম্বা সময়ের জন্য বসেছিলেন মাশরাফি।

সেই কথোপকথনে কী হয়েছে, তা হয়তো আর কখনোই জানা যাবে না। শুধু এটুকু বলা যায়, এই আলাপের পর থেকে আজ পর্যন্ত তামিমের সেরাটা পেতে মাশরাফির কখনো কোনো সমস্যা হয়নি।

অবশ্য মাশরাফি সংবাদমাধ্যমে দাবি করেছিলেন, তামিমের সঙ্গে কোনো কথা এই বিষয়ে আলাদা করে বলেননি তিনি :

সত্যি বলি, আমি এই বিষয় নিয়ে আলাদা করে ওর সাথে কথা বলিনি। কারণ, ও খুবই পেশাদার একজন ক্রিকেটার। সারা পৃথিবীতে ক্রিকেট খেলেছে সে। সে এসব প্রক্রিয়াই খুব ভালো জানে। আমি বাংলাদেশের সব ক্রিকেট-ভক্তকে নিশ্চিত করতে চাই যে, এই ইস্যু নিয়ে আমরা একদমই আর ভাবছি না। [১]

৩.

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুটো টি-টোয়েন্টিরই নিষ্পত্তি হলো শেষ বলে। দুটোতেই ভাগ্য উল্টো দিকে চলে গেল বাংলাদেশের।

আগে ব্যাট করা শ্রীলঙ্কা ৭ উইকেটে ১৬৮ রানে আটকাল। মাশরাফি ২ উইকেট নিলেন বটে; ৪৩ রান খরচ করে ফেললেন।

তামিম-মাশরাফি যে আর সমস্যা নেই, সে প্রমাণ দিতেই অসামান্য শুরু এনে দিলেন তামিম। ২৫ বলে তামিমের ৩০ ও এনামুল হক বিজয়ের ৪৫ বলে ৫৮ রানে জয়ের পথেই ছিল বাংলাদেশ।

শেষ ওভারে ১৭ রান দরকার ছিল; প্রথম ৫ বলে ১৪ রান নিয়ে নিলেন এনামুল হক বিজয়। শেষ বলে দরকার ছিল ৩ রান। পেরেরা বুকসমান উঁচু এক ফুল টস ছুড়লেন। বিজয়ের শট ক্যাচে পরিণত হলো। কিন্তু এর মধ্যে এক রান নিয়েছেন দৌড়ে। এবার প্রশ্ন হলো, বলটা কি নো-বল ছিল? তা হলে ম্যাচ টাই। কিন্তু অনেক আলোচনার পর আম্পায়াররা জানালেন এই বৈধ বল ছিল–ফলে ২ রানে হারল বাংলাদেশ।

দ্বিতীয় ম্যাচে একই নাটক।

আগে ব্যাট করা বাংলাদেশ ১২০ রানে অলআউট হলো। মাশরাফি ১০ বলে ৪টি চারে ১৭ রান করলেন। জবাবে বাংলাদেশ টাইট বোলিংটা একেবারে শেষ ওভার পর্যন্ত ধরে রেখেছিল। শেষ ওভারে ৯ রান দরকার। ফরহাদ প্রথম পাঁচটা বল ভালোই করেছিলেন। শেষ বলে দরকার ছিল ২ রান। চার মেরে দিলেন সেনানায়েকে!

মাশরাফি ম্যাচগুলোর মূল্যায়ন করতে গিয়ে অত্যন্ত যথার্থভাবেই বলেছিলেন, দুই ম্যাচেই বাংলাদেশ সমানে সমান ছিল শ্রীলঙ্কার। কিন্তু শেষলগ্নে ভাগ্য প্রতারণা করায় আসলে ম্যাচ জেতা হয়নি। নইলে বাংলাদেশ যে ক্রিকেট খেলেছে, তাতে অখুশি হওয়ার কোনো কারণ দেখেন না বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক।

৩.

এশিয়া কাপে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ভারতের বিপক্ষে। ম্যাচের আগে কোনো কোনো ভারতীয় পত্রিকা লিখল–আরেকটি অঘটনের সন্ধানে বাংলাদেশ।

২০১৪ সালে বাংলাদেশের যে পারফরম্যান্স, তাতে আফগানিস্তানের সঙ্গে জিতলেও 'অঘটন' হয়ে যায় আর কী! জয় কিছুতেই বন্দরে ভিড়ছিল না। এমন অবস্থায় এই কথা হজম করে নেওয়া ছাড়া উপায় কী!

তারপরও মাশরাফি প্রতিবাদ করেছিলেন। ম্যাচের আগের দিন তীব্রভাবেই বলেছিলেন, ভারতের বিপক্ষে জেতাটা এখন আর বাংলাদেশের জন্য অঘটন নেই। এই কাজ বাংলাদেশ আগেও করেছে। গুরুত্বপূর্ণ সব সময়ে করেছে। ২০০৭

বিশ্বকাপে ভারতকে ছিটকে দিয়েছে বাংলাদেশ। ২০১২ এশিয়া কাপে টেন্ডুলকারের শততম সেঞ্চুরির পার্টি ম্লান করে দিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের হারিয়েছিল। অতএব, আরেকবার এই দলটাকে হারানোয় অঘটনের কিছু দেখছিলেন না মাশরাফি।
তার কথা ছিল পরিষ্কার, বাংলাদেশ নিজের সেরা খেলাটা খেলতে পারলে ভারত এ মুহূর্তে যত ভালো ফর্মেই থাকুন না কেন, তাদের হারানো সম্ভব।
বাস্তবে সে চেষ্টাটা বাংলাদেশ করেনি, তা নয়। মুশফিকের সেঞ্চুরি ও বিজয়ের ৭৭ রানে ২৭৯ রানের বেশ ভালো একটা পুঁজিই গড়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু বিরাট কোহলির বিশাল সেঞ্চুরিতে ১ ওভার বাকি থাকতে ম্যাচ বের করে নিয়ে যায় ভারত।
শুনলে যেমন মনে হয়, আসলে ঘটনাটা এত সোজা ছিল না। মাশরাফি ও রুবেল শুরুর কয়েকটা ওভার অন্তত ভালোভাবে চেপে রেখেছিলেন ভারতীয় ব্যাটিং লাইনআপকে।
তবে এই পরাজয়ের চেয়েও বড় ধাক্কা হয়ে এল মাশরাফির সাইড স্ট্রেইন। ভারতের বিপক্ষে এই ম্যাচেই পিঠের পাশের পেশিতে টান লেগেছিল তার। পরদিন ফিজিও বিভব সিং নিশ্চিত করলেন যে, মাশরাফি এই টুর্নামেন্টে অন্তত আর খেলতে পারছেন না।
এটা ছিল বাংলাদেশের জন্য তিন নম্বর আঘাত। ইতিমধ্যে দেশের সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান এক বিতর্কিত কাণ্ড করে নিষেধাজ্ঞা ভোগ করছেন। তামিম ইকবাল ইনজুরির কারণে খেলতে পারছেন না। তৃতীয় সিনিয়র খেলোয়াড় হিসেবে মাশরাফিকেও হারাল বাংলাদেশ। এমনকি মুশফিকও আঙুলের চোটের পর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে কাঁধেও চোট পেলেন।
শেষ অবধি এশিয়া কাপ একটা দুঃস্বপ্নই হয়ে রইল।

৪.

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট তখন বিয়েবাড়ির মতো সেজে উঠেছে। স্টেডিয়ামমুখী প্রতিটা রাস্তা রাতের বেলায় যেন মায়াবী কোনো ভিনদেশি সড়ক হয়ে উঠছে নানা রঙের আলোয়। সারা দেশ তখন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত। বাংলাদেশের মাটিতে আরেকটা বিশ্বকাপ এসেছে।
ওয়ানডে বিশ্বকাপকে 'দুধ' বলা হলে এটাকে অবশ্য ঘোলই বলা চলে। মাশরাফি সেই ঘোল দিয়ে দুধের আফসোস মেটাতে চাইছেন কি না, এমন প্রশ্ন রোজই তাকে শুনতে হচ্ছিল। দেশের মাটিতে ২০১১ বিশ্বকাপ মিস করার জ্বালা এই বিশ্বকাপ খেলে কী ভুলবেন?
এদিক শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে দাঁড়িয়ে একটু বিরক্তিই প্রকাশ করেছিলেন, 'টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে পারলে তো ভালো কথা। দেশের মাটিতে টুর্নামেন্ট।

ভালোই লাগবে। কিন্তু ওয়ানডে বিশ্বকাপের দুঃখ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে ভোলা যায় না। ওয়ানডের থেকে টি-টোয়েন্টি এখনো অনেক দূরে।'

পাশাপাশি আরেকটা ব্যাপার ছিল।

মাশরাফি আদৌ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু থেকে খেলতে পারবেন কি না, সেটা বোঝা যাচ্ছিল না ম্যাচের আগের দিন পর্যন্ত। ভারতের বিপক্ষে এশিয়া কাপের ম্যাচে হওয়া ইনজুরি থেকে তখন তিনি সেরে উঠছেন। দ্রুত সারিয়ে তোলার জন্য ইতিমধ্যে তাকে ইনজেকশনও দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বকাপ শুরুর কয়েক দিন আগেও জানা যাচ্ছে, ৮০ শতাংশ ফিট হতে পেরেছেন মাশরাফি। একেবারে উদ্বোধনী ম্যাচের আগের দিন পর্যন্ত মাশরাফি নিশ্চিত নন।

এই উদ্বোধনী ম্যাচটা আবার বাংলাদেশের জন্য একটা দারুণ পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খেলাটা আফগানিস্তানের বিপক্ষে। এমনিতে মাত্র কয়েক বছর আগে ক্রিকেট কাঠামোতে আসা এই দলটার সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবধান কয়েক যোজন। কিন্তু সদ্য শেষ হওয়া এশিয়া কাপে ওয়ানডে ফরম্যাটে বাংলাদেশকে হারিয়ে একধরনের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে রেখেছে তারা।

ফলে আফগানিস্তানের বিপক্ষে জেতাটা রীতিমতো সম্মানের প্রশ্ন।

তবে বিশ্বকাপের বিচারে এই ম্যাচটার গুরুত্ব সম্মান বাঁচানোর চেয়ে অনেক বেশি। বাংলাদেশ আসলে খেলছিল বাস্তবিক অর্থে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে। সে পর্বে বাংলাদেশের গ্রুপে ছিল এই আফগানিস্তান ও নেপাল; এখান থেকে একটি দল মূল পর্বে খেলবে। নেপালকে দুদলই হারিয়ে দেবে, এমন সম্ভাবনা ধরে নিয়ে বলা যায়–বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান ম্যাচের জয়ী দলই আসলে পরের রাউন্ডে যাবে।

এই কঠিন সমীকরণ নিয়ে ১৬ মার্চ মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হলো বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান।

শেষ পর্যন্ত সব শঙ্কা দূর করে খেলতে নামলেন মাশরাফি এবং ম্যাচের প্রথম বলেই মোহাম্মদ শাহাজাদকে আউট করে সুরটা ঠিক করে দিলেন। মাশরাফি শেষমেশ দুই ওভার বল করে ৮ রানে ওই ১ উইকেট পেয়েছিলেন। আফগানিস্তান ১৭.১ ওভারে অলআউট হয়ে গিয়েছিল ৭১ রানে। বিজয় ৪৪ রানের ইনিংস খেলে জয় নিশ্চিত করে ফেলেছিলেন।

আফগানিস্তানের বিপক্ষে এই ম্যাচে বুকের পাঁজরে ব্যথা পেয়েছিলেন মাশরাফি। তবে এটা নিয়ে খুব একটা চিন্তিত হননি বা কাউকে চিন্তায় ফেলতে চাননি। খেলা চালিয়ে গেছেন।

দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ ৮ উইকেটে হারাল নেপালকে।

নেপাল ১২৬ রান পর্যন্ত গিয়েছিল। মাশরাফি ৪ ওভারে ২৩ রান দিয়ে ১ উইকেট নিয়েছিলেন। আবারও বিজয় ৪২ রানের এক ইনিংস খেলেন। তবে ব্যাটিংয়ে

আসল কাজটা ১৮ বলে ৩৭ রান করা সাকিবই করেছিলেন।
মূল পর্বে ওঠার পর আবার একটা বিভীষিকাময় সময় শুরু হলো বাংলাদেশের। প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৭৩ রানে হার। মাশরাফি মাঝারি বোলিং করলেন–৪ ওভারে ২৫ রান। দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে ৮ উইকেটে হার। মাশরাফি ৪ ওভারে ২৩ রান দিয়ে একটি উইকেট।
এরপর পাকিস্তানের বিপক্ষে ক্যারিয়ারের সবচেয়ে খারাপ টি-টোয়েন্টি বোলিং করলেন এবং নতুন করে ইনজুরিতে পড়লেন। ৪ ওভারে ৬৩ রান নিয়ে উইকেটশূন্য থাকার এই দিনে আবার হাঁটুর ইনজুরিতে পড়লেন।
ফলে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ থেকে, কার্যত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকেই ছিটকে গেলেন মাশরাফি।

৫.

তাসকিন আহমেদ প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ম্যাচের ড্রেসিংরুমে ঢুকেছেন।
সিনিয়ররা সবাই বসে পড়েছেন। একটা ফাঁকা চেয়ার খুঁজছেন তিনি বসার জন্য। দ্বিতীয় সারিতে সোফার পেছনে একটা চেয়ার ফাঁকা, ওটাতে বসে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে কে একজন বললেন, 'তুই ওটাতে বসলি? জানিস ওই চেয়ারে কে বসে?'
তাসকিন মাথা নেড়ে বোঝালেন, তিনি জানেন না।
উত্তর এল, 'মাশরাফি ভাই।'
তাসকিন সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ার চেষ্টা করেছিলেন। পাশ থেকে সাকিব মুচকি হাসলেন, 'বসেছিস যখন আজকে বসেই থাক। কিন্তু মনে রাখিস, মাশরাফি ভাইয়ের চেয়ারে বসেছিস, কাজটাও তার মতোই করতে হবে।'
তাসকিনের বুকটা একটু কেঁপে উঠেছিল।
হয়তো তাকে নিয়ে সবাই রসিকতা করল। কিন্তু এটা তো সত্যি যে, তার সেই শৈশবের আইডল মাশরাফির বদলে অভিষেক ম্যাচে খেলতে এসেছে সে। এটা তো সত্যি যে, এই ড্রেসিংরুমের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটার সঙ্গে খেলার স্বপ্নেই সে ক্রিকেটে এসেছে।
সেই স্বপ্নটা পূরণ হতে দেরি হলো না। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মাস দেড়েক পরই শুরু হলো ভারতের বিপক্ষে সিরিজ। আর সেখানেই তাসকিন-মাশরাফি জুটির যাত্রা শুরু হয়ে গেল। শুরু হয়ে গেল দেশের সবচেয়ে সিনিয়র পেসারের সঙ্গে তখনকার কনিষ্ঠতম পেসার তাসকিনের বিখ্যাত উদ্‌যাপন–ম্যাশকিন।
ওই উদ্‌যাপন ও তাসকিনের ৫ উইকেটের কথা বাদ দিলে ভারতের বিপক্ষে এই তিন ম্যাচের সিরিজটা যেকোনো মূল্যে ভুলে যেতে চাইবে বাংলাদেশ। এটা ভয়ানক একটা স্মৃতি। আধা শক্তির ভারতীয় দলকে যেখানে বাংলাদেশের

হোয়াইটওয়াশ করার কথা ছিল, উল্টো কোনো এক স্টুয়ার্ট বিনিদের হাতে হোয়াইটওয়াশ হলো বাংলাদেশ।

প্রথম ম্যাচে রানটা খারাপ করেনি বাংলাদেশ। মুশফিক-সাকিবের ফিফটিতে ২৭২ রান করেছিল স্বাগতিকেরা। জবাবে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ৭ উইকেটের জয় পায় ভারত। মাশরাফি ২৫ রানে ১ উইকেট নিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় ম্যাচে তাসকিনের সেই আগুন ঝরানো বোলিং। শুরুটা অবশ্য মাশরাফিই করেছিলেন। ম্যাচের দ্বিতীয় বলেই এলবিডব্লু রাহানে। এরপর তাসকিনের ধ্বংসযজ্ঞ–২৮ রানে ৫ উইকেট। আর মাশরাফি ৯ ওভারে ৩৫ রান দিয়ে ২ উইকেট; একটি মেডেন ছিল। ভারত অলআউট ১০৫ রানে।

বিস্ময়কর হলেও সত্যি, স্টুয়ার্ট বিনির মতো অনিয়মিত খেলোয়াড় ৪ রানে ৬ উইকেট নিয়ে বাংলাদেশকে ৫৮ রানে অলআউট করে দিলেন।

তৃতীয় ওয়ানডেতে আবার ভারতকে ১১৯ রানে অলআউট করে দিল বাংলাদেশ। মাশরাফি ৮ ওভারে ১টি মেডেন নিলেন আর ২৫ রান দিয়ে ১ উইকেট নিলেন। তাসকিন ৮ ওভারে ১৫ রান মাত্র খরচ করে ২ উইকেট নিয়েছিলেন।

এই ম্যাচেও কি কোনো বিনি ওই কাণ্ড ঘটাতেন? নাকি বাংলাদেশ পারত নিজেদের ফিরে পেতে?

বৃষ্টি এসব প্রশ্নের জবাব দিতে দেয়নি। বাংলাদেশ ব্যাটিংয়েই নামতে পারেনি।

৬.

সময়টাই বাংলাদেশের ক্রিকেটের অন্ধকার এক যুগ।

ভারতের বিপক্ষে সিরিজের পর বাংলাদেশ চলল ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে। এ সফরে আবার নিষেধাজ্ঞায় পড়ে সঙ্গে নেই সাকিব। টেস্ট সিরিজে যথারীতি বাজে ফলাফলের পর দলের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলেন মাশরাফি।

ফলাফল তথৈবচ।

প্রথম ম্যাচে লড়াই হলো। এনামুল হক বিজয়ের সেঞ্চুরিতে ২১৭ রান করল বাংলাদেশ। আল আমিনের বোলিংয়ে কিছুটা লড়াই করল মুশফিকের দল। ষষ্ঠ ওভারে গেইলকে ফিরিয়ে প্রথম আঘাত করেছিলেন মাশরাফিই। লাভের লাভ হয়নি। সাত নম্বরে নেমে পোলার্ডের করা ৮৯ রানে ৩ উইকেটে জিতেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

দ্বিতীয় ম্যাচ থেকে এই লড়াইটাও বন্ধ হয়ে গেল।

যদিও মাশরাফি দ্বিতীয় ম্যাচে ৩৯ রানে ৩ উইকেট নিয়েছিলেন; ১০ ওভারের মধ্যে একটি মেডেনও ছিল। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২৪৭ রানের জবাবে ৭০ রানে অলআউট বাংলাদেশ!

তৃতীয় ম্যাচে সব বিভাগেই পরাজয়। আগে ব্যাট করা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩৩৮ রান

করেছিল। মাশরাফি ৯ ওভারে ৬৩ রান দিয়ে উইকেটশূন্য ছিলেন। বাংলাদেশ অলআউট হলো ২৪৭ রানে। মাশরাফি ৯ বলে ১টি চার ১টি ছয়ে ১৫ রান করেছিলেন।

এই ম্যাচের ভেতর দিয়ে শেষ হলো আরেকটা দুঃস্বপ্ন।

মাশরাফি যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে দেশে ফিরছেন, তখন তার জন্য অপেক্ষা করছে একটা খবর–তার না হলেও বাংলাদেশের ক্রিকেট-ভাগ্য বদলে দেওয়া একটা খবর; বাংলাদেশের একটা যুগ বদলে দেওয়া খবর।

৭.

দেশে ফিরে মোহামেডানের হয়ে প্রিমিয়ার লিগ খেললেন মাশরাফি; ১১টি ম্যাচ খেললেন এ বছর।

মৌসুমের শেষ দিকে এসে ব্যাটে-বলে ঝলসে উঠলেন মাশরাফি। সব মিলিয়ে ১১ ম্যাচে ১৭ উইকেট নিয়েছিলেন। আর শেষ ৪ ইনিংসে ১৪৯ রান করেছিলেন। এর মধ্যে প্রাইম ব্যাংকের বিপক্ষে আগে বোলিং করে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন। পরে ব্যাট হাতে লিস্ট-এ ম্যাচের ক্যারিয়ার-সেরা ইনিংস খেলেন; ৬২ রান করেছিলেন। এই ইনিংস খেলার পথে লিস্ট 'এ' ম্যাচে দুই হাজার রান টপকে যান মাশরাফি।

ঘরোয়া ক্রিকেটের কথাটা শুরু করলে আরেকটু আগে যাওয়া দরকার। জানুয়ারিতে পরীক্ষামূলকভাবে আরও দুটি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলেছিলেন। প্রথমে বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগে দক্ষিণাঞ্চলের হয়ে খেললেন মধ্যাঞ্চলের বিপক্ষে। এ ম্যাচে প্রথম ইনিংসে ১৪ ওভার বল করেছিলেন; পেয়েছিলেন ৩ উইকেট। ওই একটিই ইনিংস করে খেলা হয়েছিল। জানুয়ারিতেই খুলনার হয়ে জাতীয় ক্রিকেট লিগ খেললেন বরিশালের বিপক্ষে। ১৭ ওভার বল করে ২ উইকেট নিয়েছিলেন।

খেয়াল করুন, যে লোকটি চার বছর ধরে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলেন না; তিনি তিন মাসের ব্যবধানে তিনটি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলে ফেললেন। কিছু মেলাতে পারছেন?

হ্যাঁ, সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজে টেস্ট খেলাটা এখন পর্যন্ত শেষ টেস্ট হয়ে আছে। এর পরের বছর জাতীয় লিগে একটা ম্যাচ খেলে ক্ষান্ত দিয়েছিলেন। এই ২০১৩ সালে এসে মাশরাফি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলেন, তাকে আবার টেস্ট খেলতে হবে। সে বছরের শেষ দিকেই মাঠে নেমে পড়ার পরিকল্পনা আঁটছিলেন।

আমরা সেই সময়ের মাশরাফির ভাবনাটা ফিরে দেখতে এই লেখকেরই একটা প্রতিবেদন উল্টে দেখতে পারি

সাদা পোশাকের অপেক্ষায়

৩ জুলাই, ২০১৩; ইত্তেফাক

মাত্রই অনুশীলন শেষ করে এসেছে ছেলেটি। সারা শরীর থেকে টপটপ করে ঘাম ঝরে পড়ছে। সেদিকে খেয়াল নেই। ক্রিকেট বোর্ড অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চোখ বড় বড় করে চেয়ে আছে মাঠের দিকে। কাছে গিয়ে কথা বলার চেষ্টা করতে নিজেই হেসে বলল, 'মাশরাফি ভাইয়ের অ্যাকশন দেখি। ওনার নাম মাশরাফি বিন মুর্তজা, আমার নাম হাসান বিন মুর্তজা। আমি ওনার মতো বোলার হতে চাই। উনি আমার আইডল।'

অনূর্ধ্ব-১৯ দলের পেসার হাসান বিন মুর্তজা একাই নয় মাশরাফির এই ভক্ত তালিকায়। কথা বলতে গিয়ে দেখা গেল, মাশরাফিদের পাশেই অনুশীলন করতে থাকা অনূর্ধ্ব-১৯ ও অনূর্ধ্ব-২৩ দলের বেশির ভাগ পেসারই অনেক আগে থেকে নাম লিখিয়ে বসে আছে এই 'মাশরাফি-ভক্ত' তালিকায়! এর মধ্যে হাসানের মতো কেউ এক ধাপ এগিয়ে এসে বলে, 'দেখবেন, উনি আগের চেয়েও ভালো ফর্মে ফিরে আসবেন।'

আগের চেয়ে ভালো ফর্মে ফিরবেন কি না, সেটা সময় বলবে। তবে মাশরাফি নিজেও নিশ্চিত, আরেকবার ফেরার সময় হয়ে গেছে তার। শরীর-মন বলছে, এখন শুধু মাঠে নামার অপেক্ষা; বাকি সব তৈরি। আরেকবার ফিটনেসটাকে ঝালিয়ে দেখে ফিরতে ফিরতে বললেন, 'একেবারে শতভাগ তৈরি, সেটা বলতে পারছি না। তবে হ্যাঁ, এখন আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার জন্য পস্তুত আমি। এখন আবার টেস্ট খেলার জন্য মুখিয়ে আছি।'

এটাই আসল কথা। ইনজুরির ছোবলের দেহটা নিয়ে ওয়ানডে মাঝে মাঝেই খেলছেন। ফলে ওয়ানডেতে মাশরাফির ফেরাটা আর বিরাট কোনো খবর নয়। এখন অপেক্ষা–চার বছর পর আবার সেই সাদা পোশাকে, লাল বল হাতে মাঠে নামবেন মাশরাফি।

শরীর প্রস্তুত হয়ে গেলেও সাদা পোশাকে মাঠে নামতে আরও কিছুদিন অপেক্ষা মাশরাফিকে করতেই হচ্ছে। অক্টোবরে নিউজিল্যান্ড দল ঢাকায় এলে তবেই আবার টেস্ট খেলার সুযোগ মিলবে তার। সে পর্যন্ত মাশরাফির সময় কাটানোই যেন সমস্যা!

টেস্ট খেলার জন্য ক্রিকেটাররা সব সময়ই আকুলি-বিকুলি করেন। মাশরাফিও করছেন। তবে মাশরাফির ব্যাকুলতার নিজস্ব কিছু ব্যাখ্যাও আছে, 'আসলে টেস্ট খেলব না, এটা বলেছিলাম, শরীর আর সাড়া দিচ্ছিল না বলে। কিন্তু টেস্ট খেলার মজা তো আর কোনো ফরম্যাটে নেই। বিশেষ করে আমাদের বোলারদের জন্য বাকি দুই ফরম্যাটে তো আর কিচ্ছুই নেই। একমাত্র টেস্টেই নতুন কিছু করা, নিজেকে মানিয়ে নেওয়া, নানা রকম লড়াই করা; এগুলোর সুযোগ আছে। আর

আমার ক্ষেত্রে লংগার ভার্সনটা আরেকটু জরুরি বলে ইদানীং মনে হচ্ছে। আমার ক্যারিয়ারটা তো এই যাওয়া-আসার মধ্যেই চলছে। মাঝে মাঝে এসে হঠাৎ হঠাৎ ওয়ানডে খেলছি; এতে মানিয়ে নিতে সমস্যা হয়। টেস্ট একটা খেলে তারপর সীমিত ওভারের যেকোনো ম্যাচ খেললে, যেকোনো বোলারের বল হবে গুলির মতো পারফেক্ট। সেটাই করার জন্য মুখিয়ে আছি।'

ড্রেসিংরুমে বসে কথাগুলো বলছিলেন আর হাতে লাল একটা বল অস্থিরভাবে ঘোরাচ্ছিলেন; যেন পারলে এখনই বলটা নিয়ে দৌড় দেন!

দলের আর সবার মতোই ফিটনেস ট্রেনিং দিয়ে এই দফা ক্যাম্প শুরু করেছেন। একাডেমির নেটে ক্যাম্পের বাকি পেসারদের সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ ছোট রানআপে বলও করলেন। মাঝে মাঝেই ট্রেনার এসে জিজ্ঞেস করছিলেন, সব ঠিক আছে কি না। মাশরাফিকে নিয়ে ম্যানেজমেন্ট যে বাড়তি ভাবিত, সেটা বোঝা গেল অনুশীলন শেষ হয়ে যাওয়ার পর আবার তাকে নিয়ে শেন জার্গেনসেন কাজ শুরু করায়।

পুরো রানআপ মেপে মূল মাঠে অনেকক্ষণ বল করলেন মাশরাফি। জার্গেনসেন বারবার রানআপের দৈর্ঘ্যটা ঠিকঠাক করে দিচ্ছিলেন, অ্যাকশন নিয়ে ধরে ধরে কথা বলছিলেন। বোঝাই যায়, এতসব মনোযোগের কারণ একটাই–আবার যেন ইনজুরি এসে কামড় বসাতে না পারে।

এই যে বারবার ইনজুরির কামড়, বারবার ছিটকে যাওয়া; এ নিয়ে আফসোস আছে, বেদনা আছে মাশরাফিরও। তারকাসত্তার দেয়াল ভেঙে নিজেই বলে উঠলেন, 'মাঝে মাঝে ভাবলে খুবই কষ্ট লাগে। শুধু ওয়ানডের কথাই ধরেন না; প্রায় ১০০ ওয়ানডে মিস করেছি। ১২৮ ওয়ানডে খেলে আমার ১৬২ উইকেট এখন। আর এক শ ওয়ানডে খেললে হয়তো আড়াই শ বা তিন শ উইকেটের মালিক থাকতাম। শুধু উইকেটসংখ্যার কারণেই লোকেরা গ্রেটদের সঙ্গে আমার নাম উচ্চারণ করত।'

একটু মাথাটা নিচু করে ফেললেন মাশরাফি। তাহলে কি ভেঙে পড়ছেন? প্রশ্নটা শুনেই আবার সেই চকচকে চোখ নিয়ে ফিরে তাকালেন, 'কখনোই না। আমি এভাবে আসলে খুব একটা ভাবিই না। আমি বরং উল্টোটা বলি নিজেকে। এমনও হতে পারত, প্রথম ইনজুরির পরই আর ফিরতে পারিনি। তাহলে? তাহলে কয়টা উইকেট থাকত আমার? সে হিসাব করলে তো অনেক ভালো আছি, তাই না? এখনো তো লড়াইটা করার শক্তি আছে আমার।'

এই হলো মাশরাফি বিন মুর্তজা। সামান্য একটু মন খারাপ করার মেঘকে যিনি এই মনের জোর দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারেন। হো হো করে হেসে বলতে পারেন, 'সবচেয়ে বড় ব্যাপার কি জানেন, সেই অভিষেকের মতো থ্রিল টের পাই প্রতিবার ফেরার আগে। ক্রিকেট তো খুবই উপভোগ করি। আর এ রকম ফেরার আগে

আগে প্রতিবারই মনে হয়, কবে মাঠে নামব? এটাই মনে হয় টিকিয়ে রেখেছে আমাকে। যত দিন এই আগ্রহ আছে, তত দিন আমিও আছি।'
আমরা প্রার্থনা করি, এই আগ্রহটা যেন অটুট হয়ে টিকে থাকে অনন্তকাল।

[১] *Bangladesh unaffected by Tamim issue;* মোহাম্মদ ইশাম (ক্রিকইনফো; ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪)

মাশরাফি-যুগ



১.

দেশে মাশরাফি বিন মুর্তজার শেষ সংবাদ সম্মেলনের দিনের কথা।

সংবাদ সম্মেলন শেষ হতে হতে বাকি ক্রিকেটাররা প্রায় সবাই চলে গেছেন। মাশরাফি ঘণ্টা খানেক খুব আড্ডা দিলেন। সাংবাদিক, কর্মকর্তা, গ্রাউন্ডসম্যান; সবার সাথে ডেকে ডেকে ছবি তুললেন। একটি ছোটদের পত্রিকা থেকে একঝাঁক খুদে সাংবাদিক এসেছিল, ওদের সঙ্গে তুমুল হাসিতে মেতে উঠে সাক্ষাৎকার দিলেন।

বিসিবির কে একজন তাড়া দিলেন শেষ করার জন্য। মাশরাফি উল্টে- ধমকে উঠলেন, 'কত দিন দেখা হবে না, সবার সাথে। একটা দিন একটু মন ভরে আড্ডা দিয়ে যাই।'

কে যেন সেই সময় একেবারে অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রশ্নটা করেছিলেন, 'ম্যাশ, কী হবে? কত দূর যাবেন?'

মাশরাফি সারা দিনে ওই একবার গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, 'বললে তো বিশ্বাস করবেন না, আমার মনে হয়, আমরা কোয়ার্টার ফাইনালে যাব। আরও বেশি

কিছুও হতে পারে।'
সব আড্ডা একসময় ফুরোল; সব পাখি নীড়ে ফিরছে।
মাশরাফিও একসময় উঠলেন। শেষ পর্যন্ত যারা ছিলেন, তাদের জড়িয়ে ধরছেন একে একে। শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা অধমকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'দোয়া করবেন, দল যেন ভালো করে। আমি যেন সুস্থ থাকি।'
মাশরাফি হাসিমুখে গাড়িতে ওঠেন। আমরা নির্বাক হয়ে ওপরের দিকে চেয়ে থাকি। ওপরের খেলা!
চারটে বছর আগে এমনই এক বিশ্বকাপের আগে মাশরাফি কাঁদছিলেন; বিশ্বকাপ দলে জায়গা হয়নি তার। চার বছর পর আরেকটা বিশ্বকাপের আগে তিনি হাসছেন। ক্যারিয়ারের তৃতীয় ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ দলের দায়িত্ব নিয়ে। বাংলাদেশের পতাকা আজ মাশরাফির হাতে।

২.
কী বলবেন একে? নিয়তির খেলা!
২০১১ সালে ঘরের মাঠে যখন বিশ্বকাপ হলো, আবার ইনজুরি জাঁপটে ধরেছিল তাকে। ইনজুরি থেকে সেরে উঠতে না পেরে অনেক স্বপ্নের সে বিশ্বকাপে খেলাই হয়নি। নিজে বারবার বলছিলেন, তিনি ফিট আছেন। তারপরও দলে ঠাঁই না পাওয়ার খবরটা শুনে চোখের পানিও ফেলেছিলেন।
তখন অনেকেই বলে ফেলেছিলেন–এখানেই শেষ মাশরাফি বিন মুর্তজার ক্যারিয়ার।
অথচ নিয়তির কী চক্র। পরের বিশ্বকাপ আসতে না-আসতে শুধু আবার দলে নয়, অধিনায়কত্বের আলোচনায় আবার সেই মাশরাফি। কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা তখনো কোথাও থেকে আসেনি; তবে আগস্ট মাসের শুরুর দিকে একটা জিনিস অনুমান করা গেল, সবকিছু ঠিক থাকলে, নতুন কোনো দুর্ঘটনা এসে থাবা না বসালে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে ওয়ানডে বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছেন সেই মাশরাফিই।
তবে বোর্ডের কয়েকজন পরিচালক নাম প্রকাশ না করার শর্তে এই গ্রন্থকারকেই জানিয়েছিলেন, আলোচনা সেদিকেই এগোচ্ছে। এর আগে মুশফিকুর রহিমের অধিনায়ক হিসেবে কিছু সিদ্ধান্তে প্রকাশ্যেই হতাশা ব্যক্ত করেছেন বোর্ডের অনেকেই। এমনকি সর্বশেষ বোর্ড সভা শেষে সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন নিজেই বলে দিয়েছেন, এ অবস্থায় তারা টেস্ট ও ওয়ানডেতে ভিন্ন ভিন্ন অধিনায়কের ব্যাপারে খুব গুরুত্বের সঙ্গে ভাবছেন।
এই ভিন্ন ভিন্ন অধিনায়কত্ব আলোচনা থেকেই এটুকু বেরিয়ে এসেছে যে, আপাতত টেস্টে মুশফিকুর রহিমকে তার দায়িত্ব থেকে সরানো হবে না। তবে ওয়ানডে অধিনায়কত্ব তুলে দেয়া হবে জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও দেশসেরা পেসার

মাশরাফির হাতে। এরই মধ্যে এই পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্ব হিসেবে প্রায় পূর্ণশক্তির জাতীয় দলকে এশিয়ান গেমসে নেতৃত্ব দেবেন মাশরাফি।

বোর্ড পরিচালকেরা অবশ্য এ সিদ্ধান্তের কারণ হিসেবে মুশফিকের খারাপ অধিনায়কত্ব বা চলমান ব্যর্থতাকে খুব একটা সামনে আনতে রাজি নন। তারা বরং দেশের অন্যতম সেরা এই ব্যাটসম্যানের চাপ কমানোটাকেই বড় করে দেখতে চান। একটি দায়িত্বশীল সূত্র যেমন বলছিল, 'মুশফিক অধিনায়ক হিসেবে খারাপ, এমনটা আমরা মনে করছি না। সে ভালো অনেক রেজাল্ট এনে দিয়েছে। কিন্তু ওর চাপ খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। এমনিতেই চাপে সে একটু বেশি প্রতিক্রিয়া দেখায়। আবার মাঠে তাকে কিপিং করার পাশাপাশি লম্বা সময় ব্যাটিং করতে হয়। এর সঙ্গে দলের পারফরম্যান্স নিয়ে মিডিয়া ও বোর্ডের কাছে জবাবদিহি, নিজের ভেতরে চাপ; এসব থাকে। ফলে তার চাপটা একটু কমানো উচিত।'

এই চাপ কমানোর পরিকল্পনা থেকে ভিন্ন ভিন্ন ফরম্যাটে ভিন্ন ভিন্ন উইকেটরক্ষকও ব্যবহারের পরিকল্পনা আছে ম্যানেজমেন্টের; যার বাস্তবায়নও আমরা পরে দেখেছি। তবে আপাতত পরিকল্পনাটা হলো, ওয়ানডে অধিনায়কত্ব থেকে তাকে অন্তত মুক্ত করে দেওয়া। আর সে ক্ষেত্রে মাশরাফি ছাড়া আর কাউকে পছন্দ করতে পারছে না বোর্ড।

এটাও পরিষ্কার করলেন আরেক সূত্র, 'মাশরাফি ছাড়া বিকল্প তো নেই। ধরুন, সাকিব আছে। কিন্তু এখন যে অবস্থা। তাতে সাকিবের ভাবমূর্তি একটা সমস্যা। আর বোর্ড তার নিষেধাজ্ঞা তোলার পরপরই তাকে অধিনায়ক করলে সেটা বুমেরাং হতে পারে। তাই মাশরাফিকেই ওয়ানডের দায়িত্ব দেওয়া হবে হয়তো।'

আরেকটি সূত্র অবশ্য অধিনায়ক হিসেবে এমনিতেই মাশরাফিকে এগিয়ে রাখছেন। তিনি যুক্তি দিয়েই বললেন, ইনজুরি বাধা হয়ে না দাঁড়ালে এখনো সব ফরম্যাটেই মাশরাফি অধিনায়ক থাকতেন, 'মাঠের কথা বলুন, আর মাঠের বাইরে মাশরাফি তো বেস্ট ক্যাপ্টেন। ইনজুরি যদি না ভোগাত, তাহলে ওকে তো সরানোই হতো না। ওর যোগ্যতা নিয়ে তো প্রশ্ন নেই। এখন সে ইনজুরিমুক্ত আছে, ওয়ানডে টানা খেলতে পারছে; তাই মাশরাফিকেই দায়িত্বটা দেওয়া যেতে পারে।'

৩.

পুরো ব্যাপারটার বাস্তবায়ন শুরু হলো মাশরাফি বিন মুর্তজাকে এশিয়ান গেমসের দায়িত্ব দেওয়ার ভেতর দিয়ে।

বিয়ে উপলক্ষে এশিয়ান গেমস থেকে আগেই ছুটি নিয়ে রেখেছিলেন নিয়মিত অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম। দলে রিয়াদ, তামিম থাকা সত্ত্বেও মাশরাফিকে দায়িত্ব দিয়ে দল ঘোষণার ভেতর দিয়ে ইঙ্গিতটা পরিষ্কার করে দিল বোর্ড। আসলে ব্যাপারটা খুব একটা ইঙ্গিতও থাকল না।

এশিয়ান গেমসগামী দলের ফটোসেশনে এসে বোর্ড সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন বলে দিলেন, পানি মাশরাফির দিকেই গড়াচ্ছে। যদিও তখনো বোর্ড আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেয়নি। তবে তিনি জানিয়ে দিলেন যে দ্বৈত অধিনায়কত্বের কথা সিরিয়াসলি ভাবছেন তারা। আর সে ক্ষেত্রে ওয়ানডের দায়িত্ব মাশরাফি পাবেন বলেই পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন।

বোর্ড সভাপতি অবশ্য শুরুতে বোঝাতে চেয়েছিলেন, মুশফিক নেই বলেই মাশরাফিকে এশিয়ান গেমসে ভাবছেন তারা। পরে নিজেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন, আসলে লম্বা মেয়াদেই তারা দুই ফরম্যাটে দুই অধিনায়ক চান, 'এখানে (এশিয়ান গেমসে) যেহেতু মুশফিক নেই, তাই একজনকে নেতৃত্ব দিতেই হতো। তাই মাশরাফিকে অধিনায়ক করা হয়েছে। হ্যাঁ, আমরা ওয়ানডে এবং টেস্টের জন্য পৃথক অধিনায়কের কথা চিন্তা করছি। আগামী বোর্ড সভায় এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। সেখানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের পারফরম্যান্স মূল্যায়নের পাশাপাশি নেতৃত্বের বিষয়টিও আসবে।'

সিদ্ধান্ত ভেতরে ভেতরে হয়ে গেলেও সেদিন পর্যন্ত একটু সাসপেন্স রাখতে চাইছিলেন বিসিবি সভাপতি। তবে খুব বেশিক্ষণ নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি, 'মাশরাফি ছাড়াও তো অপশন আছে আমাদের। তামিম আছে, সাকিব আছে। ওরা সবাই অধিনায়ক হতে পারে। এখানে আমাদের কোনো বিশেষ পছন্দ নেই। আমরা অবশ্যই এটা নিয়ে বোর্ড সভায় আলোচনা করব এবং সবার কথা শুনব। আসলে টেস্ট আর ওয়ানডে যেহেতু আমরা ভাগ করে ফেলছি, তাহলে একটার নেতৃত্ব তো ওর (মাশরাফি) হাতে ছেড়ে দিতেই হবে।'

তবে যৌক্তিক কারণেই সেদিন তিনি মাশরাফিকে বিশ্বকাপের অধিনায়ক বলতে চাননি। এটুকু 'ফাঁস' করে দিয়েছিলেন ওয়ানডে অধিনায়ক হিসেবে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে আবার শুরু করবেন মাশরাফি, 'বিশ্বকাপে কে অধিনায়ক, সে সিদ্ধান্ত আমরা এখনই নিচ্ছি না। কারণ মাশরাফি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় খেলোয়াড়, কিন্তু ও যেকোনো সময় ইনজুরিতে পড়ে যেতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই ওকে নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি চিন্তা করা কঠিন। এখন এশিয়ান গেমসে যাচ্ছে। জিম্বাবুয়ে সিরিজেও থাকবে। এই সিরিজটা দেখি। এখনই চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত দিতে চাই না।'

এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানোর আগে মাশরাফি এশিয়ান গেমস শেষ করে আসবেন।

৪.

এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলেছিল। ম্যাচ সেই কুয়েতের বিপক্ষে। অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়া কাপের সেই কুয়েতের কথা মনে আছে।

এবার মাশরাফির দল তাদের ২০৩ রানে হারাল ২০ ওভারের খেলায়। আগে ব্যাট করে বাংলাদেশ ২২৪ রান করেছিল। কুয়েত জবাবে ২১ রানে অলআউট। মাশরাফির বোলিং বিশ্লেষণটা শুনবেন ২-২-০-০; ২ ওভারে কোনো রান নেই,

উইকেট নেই!
সেমিফাইনালে বাংলাদেশ পুড়ল আজব এক রসিকতায়। বাংলাদেশ ১১ ওভার খেলার পর এল বৃষ্টি। আর খেলা চালানো সম্ভব না হওয়ায় কয়েন টস করে ফলাফল ঠিক করা হলো–বাংলাদেশ সেমিফাইনাল থেকে বিদায়। আর তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে ২৭ রানে হারিয়ে পদক একটা নিয়ে ফিরল বাংলাদেশ।

৫.
মাশরাফির আসল যুগটা শুরু হলো ঘরের মাটিতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বৈত অধিনায়কত্বের যুগে প্রবেশ করল বাংলাদেশ। এখন থেকে ওয়ানডেতে বাংলাদেশ জাতীয় দলের অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা।
সেই থেকে শুরু হলো বাংলাদেশের কল্পলোকের পথে চলা।
৫টি ওয়ানডেতে যথাক্রমে বাংলাদেশের ৮৭ রানে, ৬৮ রানে, ১২৪ রানে, ২১ রানে এবং ৫ উইকেটে জয়! এর মধ্যে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ম্যাচসেরাও হলেন জিম্বাবুয়ের প্রথম ৩টি উইকেটই তুলে নেওয়া মাশরাফি। ৫ ওয়ানডেতে মাশরাফির সংগ্রহ ৯ উইকেট।
অধুনা লোকেরা ভুলে যায় যে, মাশরাফি শুধু অধিনায়কত্ব করেন না; কিঞ্চিৎ বোলারও বটে!
এই সিরিজের পর আসলে আর আনুষ্ঠানিক ঘোষণার খুব একটা অবকাশ ছিল না। তারপরও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এক শুভ সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাল–অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় ২০১৫ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ জাতীয় দলের অধিনায়কত্ব করবেন মাশরাফি বিন মুর্তজা।

৬.
সে যেন চাঁদের চোখে জল!
তার চোখে-মুখে সারা জীবন হাসিই দেখেছে মানুষ। নিজের কান্না চেপে মানুষকে হাসাতে জীবন দিয়ে দিতে প্রস্তুত থেকেছেন সারা জীবন। শরীরের যন্ত্রণা, মনের বেদনা কখনো কাউকে দেখাননি। সেই সর্বংসহা মানুষটির চোখেই জল দেখেছিল বাংলাদেশ–কেঁদে ফেলেছিলেন মাশরাফি বিন মুর্তজা।
চার বছর আগে ঠিক এমনই বিশ্বকাপের দল ঘোষণা হয়েছিল। আগে থেকেই তিনি বারবার বলছিলেন–আমি সুস্থ আছি। কিন্তু সেই মাশরাফিকেই 'অসুস্থ' বলে বিশ্বকাপের স্কোয়াডেই জায়গা দেওয়া হলো না। প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে জীবনে প্রথম ও শেষবারের মতো ভেঙে পড়েছিলেন।
নিয়তির কী অসাধারণ প্রতিদান!
চার বছর পর সেই মাশরাফির চোখ আবার চকচক করে উঠল। কে জানে, এবারও হয়তো একটু জল বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল; কিন্তু এবারেরটা আনন্দের অশ্রু। চার

বছর আগে যে মাশরাফির এপিটাফ লিখে ফেলেছিলেন নির্বাচকেরা, যে মাশরাফির শেষ দেখে ফেলেছিলেন অনেকে; সেই মাশরাফির কাঁধেই চার বছর পর আরেকটি বিশ্বকাপে দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব পড়ল। নিয়তি এবার ঋণ শোধ করার দায়িত্ব নিল।
বিশ্বকাপে মাশরাফির দল নিয়ে রওনা হওয়া নিয়ে খুব বেশি নাটকীয়তা করার সুযোগ নেই। সেই সময়টাকে ধরে রাখতে আমরা শুধু মাশরাফির দেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে সংবাদ সম্মেলনটা পুরোটা ফিরে দেখব :

পূর্ণাঙ্গ সংবাদ সম্মেলন

এটাই পৃথিবীর শেষ নয়

মাশরাফি বিন মুর্তজা

২০০৭ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে হুঙ্কার দিয়েছিলেন–ধরায়ে দেবানি!
সেই তারুণ্য নেই, সেই চনমনে ব্যাপারটাও যেন একটু কম। তারপরও পরিষ্কার বলে দিলেন–অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ড বলে কাউকে ছাড় দিতে বিশ্বকাপে যাচ্ছেন না। এখনো তার কণ্ঠে সেই হুঙ্কার। তবে হুঙ্কার দেওয়ার পাশাপাশি মনে করিয়ে দিয়েছেন, এই বিশ্বকাপ দুনিয়ার শেষ নয়। এখানে ভালো করতে হবে; সেটা না পারলেই সব শেষ হয়ে যাবে, তা নয়।
এই ভারসাম্যবোধ নিয়ে, এই আশাবাদ নিয়ে দেশ ছাড়ার একদিন আগে দীর্ঘ সংবাদ সম্মেলনে নিজের ও দলের বিশ্বকাপ-ভাবনা ফুটিয়ে তুললেন জাতীয় দলের অধিনায়ক, দেশের অন্যতম সেরা পেসার মাশরাফি বিন মুর্তজা–

চার বছর আগের কথা মনে পড়ছে? সেই দুঃসময় কাটিয়ে এবার অধিনায়ক হিসেবে বিশ্বকাপে যাচ্ছেন...
চার বছর আগের কথা বলে লাভ নেই। এখন নতুন বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছি। শুরুটা ভালো করতে চাই। আগেরটা নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। এবারেরটা ভালো করতে চাই।

অনেকে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার কথা বলছেন। আপনাদের দলীয় লক্ষ্যটা কী?
আসলে ইচ্ছের তো শেষ নেই। পারলে তো শেষ পর্যন্ত যেতে চাই। তবে আমরা চেষ্টা করব দ্বিতীয় রাউন্ডে যাওয়ার। এটাও অনেক কঠিন কাজ। আমাদের ভালো করতে হবে। শুরুটা ভালো করতে হবে। তাহলে সবাই একটা প্ল্যাটফর্ম পাবেন। এরপর থেকে বড় ম্যাচগুলো আসবে। শুরুটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আফগানিস্তানের

বিপক্ষে ম্যাচটাকেই আমরা ফোকাসে রাখছি।

আফগানিস্তানের কথা ভাবতে গিয়ে স্কটল্যান্ড কি পেছনে পড়ে যাচ্ছে?
আমাদের সঙ্গে স্কটল্যান্ডের খেলা পঞ্চম ম্যাচে। তার আগে ওরা ৪টা ম্যাচ খেলবে। তখন ওদের দেখার সুযোগ হবে। বিশ্বকাপের শুরুতে আমাদের পরিকল্পনাগুলো আফগানিস্তানকে নিয়ে করা উচিত। প্রতিটি ম্যাচে আমরা ৩ থেকে ৪ দিন করে সময় পাব। এর মাধ্যমে প্রতিটা দলকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তার সময় পাব। স্কটল্যান্ডকে নিয়ে অবশ্যই একটা পরিকল্পনা আছে, যেটা ম্যানেজমেন্ট করছে। আমাদের দিকে সেই পরিকল্পনাগুলো এখনো আসেনি। কেননা আমাদের প্রথম ম্যাচ আফগানিস্তান; আমরা এগুলো নিয়েই আসলে ভাবছি। অবশ্যই স্কটল্যান্ডের সঙ্গে মাঠে নামার আগে তাদের নিয়ে পরিকল্পনা করব।

বাস্তবতা আসলে কী? আমাদের খেলোয়াড়দের কি প্রথম পর্ব পার করার সামর্থ্য আছে?
অবশ্যই। আসলে এই পর্যায়ে মানসিক সামর্থ্যটা মূলত পার্থক্য গড়ে দেয়। স্কিল প্রায় সব দলের কাছাকাছি থাকে। আমার মনে হয় না স্কিলের দিক থেকে আমরা কারো চেয়ে খুব পিছিয়ে আছি। আসলে এই পর্যায়ে যে সবচেয়ে বেশি প্রেশার নিতে পারবে, সে তত বেশি উপকারী হবে। আমরা চেষ্টা করব এই জায়গায় উন্নতি করার। আমাদের সামর্থ্য আছে দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলার এবং ভালো খেললে তা সম্ভব।

দ্বিতীয় পর্বে যেতে চাইলে আফগানিস্তান ও স্কটল্যান্ড ছাড়া একটা বড় দলকে কমপক্ষে হারাতে হবে। এর মধ্যে গ্রুপে আছে দুই স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। তাহলে আমাদের কি ইংল্যান্ড বা শ্রীলঙ্কাকে টার্গেট করা উচিত?
সত্যি কথা বলতে জয়ের জন্য আমি নির্দিষ্ট কোনো দলের দিকে তাকিয়ে নেই। নির্দিষ্ট কোনো দলকে টার্গেট করলে ওই ম্যাচটার ওপর অনেক প্রেশার থাকবে। আমাদের গ্রুপে যারা আছে তাদের প্রত্যেকেই আমরা বিভিন্ন সময়ে হারিয়েছি। এমন না যে আমাদের কন্ডিশনে জিতেছি। ওদের কন্ডিশনেও আমরা জিতেছি। ইংল্যান্ডকে ওদের মাটিতে, অস্ট্রেলিয়াকে কার্ডিফে হারিয়েছি। কোনো নির্দিষ্ট দল নিয়ে নয়, প্রতিটি দলকে নিয়ে কাজ করছি।

মুশফিক বলছিলেন, মূল দায়িত্বটা সিনিয়র খেলোয়াড়দেরই নিতে হবে...
এটা তো জানা কথা, পুরোনো কথা যে–সিনিয়র ক্রিকেটারদের অনেক দায়িত্ব। সিনিয়র ক্রিকেটারদের মাঠে ভেতরে ও বাইরে দুই জায়গায় কাজ থাকে। তবে আমার মনে হয় যদি কোনো দলকে অনেক ভালো ফলাফল পেতে হয় তাহলে

তরুণ ক্রিকেটারদের অনেক ভালো করতে হয়। আমাদের যারা আছে তারা খুবই ভালো। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা কম থাকলেও তারা যেখানে খেলেছে ভালো ক্রিকেট খেলেছে বলে এই জায়গায় এসেছে। আমার বিশ্বাস ওরা বিশ্বকাপে বেশ ভালো করবে। কারণ ওরা বিশ্বকাপ নিয়ে চিন্তিত।

আপনি নিজে আমাদের চারটি বিশ্বকাপ দলকে কাছ থেকে দেখলেন। কোন দলটাকে এগিয়ে রাখবেন?

আমাদের দল যতগুলো বিশ্বকাপ খেলেছে তার মধ্যে ১৯৯৯ ও ২০০৭ বিশ্বকাপের দল দুটোই ভালো। আরেকটা বিশ্বকাপ সামনে এসেছে নতুন করে শুরু করে ভালো কিছু করার। ২০০৭-এর গ্রুপটা বেশ কঠিন ছিল। এবারেরটাও। ২০০৭ সালের মতো যদি এবারও শুরুটা ভালো করতে পারি তাহলে এবারও ভালো ফলাফল আসবে।

বলা হয়, ২০০৭ বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে আপনি বলেছিলেন–ধরায়ে দেবানি! এবার তেমন কোনো হুংকার দেওয়ার মতো অবস্থায় আছেন?

হা হা হা...। আসলে ওটা আপনারা কার কাছ থেকে শুনছেন তা তো জানি না। আমি তো ড্রেসিংরুমে বলেছিলাম। হ্যাঁ, এবারও আমি আত্মবিশ্বাসী। গ্রুপের প্রতিটা দলকেই হারানো সম্ভব। এত আগে কোনো দলের নাম ধরে না বলি। তবে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড নিজেদের মাটিতে খেলছে বলে তাদের অপরাজেয় ভাবার কারণ নেই। এবারও হতে পারে।

অধিনায়কত্ব তো আগেও কয়েকবার করেছেন? বিশ্বকাপের আগে কাজটা কি কঠিন মনে হচ্ছে?

বাংলাদেশ দলকে নেতৃত্ব দেওয়া সব সময় কঠিন। ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করতে না পারলে অধিনায়কত্ব করা কঠিন হয়ে যায়। আমি শেষ পাঁচটি ম্যাচ করেছি এবং জিতেছি। ফলে এখনো কঠিন বলে মনে হচ্ছে না। বিশ্বকাপ শুরু হলে বোঝা যাবে, কাজটা কঠিন, নাকি সহজ!

অধিনায়ক হয়েছেন বলে ব্যক্তিগত লক্ষ্য নিয়ে আলাপ হচ্ছে না। আপনার ব্যক্তিগত লক্ষ্যটা কী?

প্রথমত অধিনায়ক হলে ব্যক্তিগত টার্গেট কমে যায়। আর আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু অর্জন করার লক্ষ্য অনেক আগেই ত্যাগ করেছি। তাই বলে ব্যাপারটা এমন নয়, আমি পারফর্ম করতে চাই না। আমি চাই, নিজের কাজটা করতে। সামনে থেকেই নেতৃত্ব দিতে। কিন্তু সেই পারফর্ম করে নিজে কিছু পেতে চাই না। আমার একমাত্র



২০১০। বিশ্বকাপের কাউন্টডাউন শুরু। সৌরভ গাঙ্গুলীর সঙ্গে
Ⓒ শা. হ. টেংকু



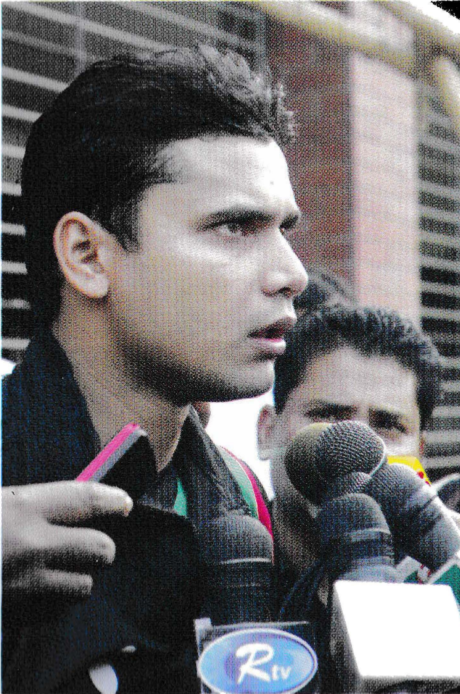
আবার ফেরার লড়াই। ২০১৩ Ⓒ শা. হ. টেংকু



মহান দায়িত্ব তুলে দিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিশ্বকাপের আগে
অধিনায়ক মাশরাফির হাতে জার্সি তুলে দিলেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান
পাপনকে পাশে রেখে © বিসিবি



এ কি চোখের জল! যে মানুষ সারা জীবন শত কষ্টেও হেসেছে, শত যন্ত্রণায়ও উচ্ছ্বাসে মেতেছে। সেই মানুষটাই এই একটা দিন চোখের পানিকে বাঁধ মানাতে পারেননি। ২০১১ বিশ্বকাপের দলে না থাকার যন্ত্রণা বেরিয়ে এল চোখ থেকে © শা. হ. টেংকু

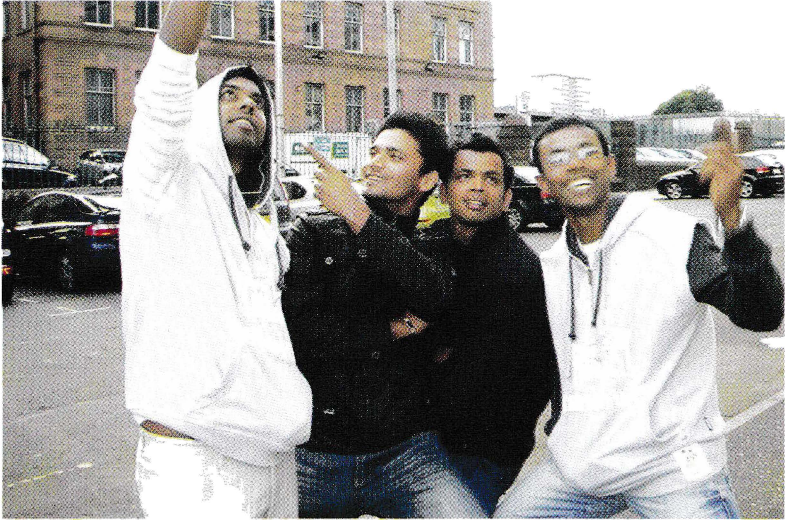




শততম সেঞ্চুরি করে মাশরাফির
শিকার টেন্ডুলকার
© শা. হ. টেংকু



২০১১। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে
সিরিজে বাধ্য হয়ে ফিরলেন
© শা. হ. টেংকু



চির-অম্লান বন্ধুতা (C) সৌজন্য ছবি



গাছের ডালে বড় হয়ে
ওঠা দুষ্টু ছেলের দল
(C) মাশরাফির বন্ধুরা



চায়ের দোকানের আড্ডায় © অনুপম হোসেন পূর্ণম



আদি বাড়ির সামনে বন্ধুদের সঙ্গে © মাশরাফি



এই তো আমার বাংলা। দল পৌঁছে গেছে কোয়ার্টার ফাইনালে। একটু থেমে এসেছে উদ্‌যাপন; তখনো চলছে অভিবাদন ⓒ শা. হ. টেংকু



২০১৩। বিপিএলে সেবারও চ্যাম্পিয়ন © বিসিবি



সুলতান অব সিলেট। এনসিএল টি-টোয়েন্টির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে © বিসিবি

লক্ষ্য বিশ্বকাপের প্রতিটি ম্যাচে ভালো করা এবং প্রতিটি ম্যাচে কন্ট্রিবিউট করা।

আপনার নিজের জন্য দলকে সেরাটা দেওয়ার এখনই পারফেক্ট সময় কি না?
দলকে সেরাটা দেওয়ার আসলে কোনো পারফেক্ট সময় নেই। দলকে কিছু দেওয়ার সময় আগেও ছিল। দিতে পারব সেটা বলা খুব কঠিন। অবশ্যই মনে করি সর্বোচ্চটা দিয়েই চেষ্টা করব।

কন্ডিশন নিয়ে ব্যাটসম্যানদের জন্য বেশ ভাবনা আছে। আপনি কি চিন্তিত?
অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডে যে খেলা হচ্ছে, এখন সবাই দেখছে। টেস্টে এখন প্রায় ৪৫০ রানের মতো হচ্ছে এবং ওয়ানডেতে ২৬৭-২৭০ হচ্ছে। এটা ভালো বোলিং লাইনআপের বিপক্ষে। বোঝা যায় গ্রীষ্মের সময় অস্ট্রেলিয়ার উইকেট বেশ ভালো। আমাদের ব্যাটসম্যানদের প্রথম দিকে একটু কষ্ট হবে। তবে উইকেটে থাকলে যে পরে রান হবে সেটা বোঝা যায়।

এবার দলের ওপর প্রত্যাশার চাপ একটু কম বলে কি নির্ভার থাকতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে?
প্রত্যাশার চাপ কম? আমার কাছে মনে হয় অনেকেরই প্রত্যাশা আছে, কিন্তু কেউ প্রকাশ করছে না। খেলা একটা জিতলেই প্রত্যাশা তৈরি হবে। এই ব্যাপারটা কখন, কীভাবে তৈরি হবে; কে জানে! ফলে প্রত্যাশার ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের খেলোয়াড়দের অন্তত না ভাবাই তো ভালো।

অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন, এই কন্ডিশনে ও দুই নতুন বলের আইনের কারণে পার্টটাইম বোলার এখানে কাজে লাগবে না; পাঁচজন স্পেশালিস্ট বোলার লাগবে। আপনারা কীভাবে দেখছেন?
বাইরে থেকে ওনারা হয়তো এভাবে ভাবছেন। কিন্তু এক একটা দলের এক এক ধরনের কৌশল আছে। বোলিংয়ের দিকটা বেশি শক্তিশালী করতে গিয়ে আরেক পাশ খারাপ করে ফেললাম; তাতে সমস্যা হবে।

বড় বাউন্ডারি, আর্লি মুভমেন্ট; এগুলো নিয়ে ভাবছেন?
অস্ট্রেলিয়ার মাঠ অনেক বড়; কিন্তু ছক্কাও অনেক হয়। কারণ, সহজেই বল ব্যাটে আসে। একটা বিষয় যে রানিং বিটউইন দ্য উইকেট ভালো করতে হবে। দুই রানগুলো তিন করতে হবে। অস্ট্রেলিয়ার উইকেটে, আমার মনে হয় যারা শটস খেলে তাদের জন্য আরো সুবিধা বেশি। খুব মুভমেন্ট থাকবে বলে কিন্তু মনে হচ্ছে না। শেষ কয়েকটি ম্যাচ দেখলাম তাতে মনে হলো যে একটু বাউন্স থাকবে। কিন্তু যারা সাইড শট খেলে তাদের জন্য রান করার সবচেয়ে ভালো সুযোগ এটাই।

কারণ এখানে বাউন্স পাওয়া যাবে। আর বোলারদের লেন্থ খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এখানে যে লেন্থে বোলিং করি ওভাবে বোলিং করলে ব্যাটসম্যানদের ব্যাটে সহজে চলে যাবে বল। একটু ওপরে বল করাটাই গুরুত্বপূর্ণ।

স্পিনারদের ব্যবহার কি সীমিত হয়ে যাবে?
আমি একটা কথা বলি–এবারের বিশ্বকাপেও স্পিনাররাই রোল প্লে করবে। আমার এখনো মনে হচ্ছে এবার অস্ট্রেলিয়া স্পিনারদের ভূমিকা বেশি থাকবে। যতটুকু দেখছি টেস্ট ম্যাচ, ওয়ানডে, বিগ ব্যাশ সব ম্যাচেই স্পিনারদের ইকোনমি রেট ৬; যেখানে পেস বোলারদের ইকোনমি রেট ৭-৮। এখানে অবশ্য কিছু বিষয় রয়েছে। উইকেটে ঘাস না থাকলে আমার মনে হয় স্পিনাররাই রোল প্লে করবে।

আপনার দলের প্রধান ভরসা কারা?
আমার দলে ১৫ জন খেলোয়াড় প্রধান ভরসা, মূল খেলোয়াড়। কারো নাম আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই। কারণ একা ১৫-২০টি ম্যাচ জেতানো সম্ভব না। অন্য খেলোয়াড়দের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। আমার বিশ্বাস, ১৫ জন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়।

আপনার দৃষ্টিতে বিশ্বকাপের মঞ্চে কারা ভালো খেলতে পারে?
ব্যাটিংয়ের কথা বললে বলব মুশফিক আছে। তার ক্ষমতা আছে। আমি বিশ্বাস করি বিশ্বের যারা ভালো ভালো ব্যাটসম্যান সঙ্গে মুশফিকের লড়াই করার ক্ষমতা রয়েছে। সাকিবের বোলিংয়ের কথা অবশ্যই বলতে হয়। আমার বিশ্বাস পৃথিবীর যেকোনো উইকেটেই সাকিব ভালো বল করতে পারে। এ ছাড়া রিয়াদ ফর্মে আসছে।

আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে অনেকে ব্যক্তিগত কিছু লক্ষ্যের কথা বলে গেছেন–পারফরম্যান্সের দিক থেকে সেরা দশে, সেরা পাঁচে থাকতে চান তারা। এ সম্ভাবনাটা আপনার দলের সত্যিই কাদের আছে?
কেউ সেরা দশে আসবে এটা তার ব্যক্তিগত গোল থাকতে পারে। কিন্তু আমি এ নিয়ে ভাবিত না। আমার দলের কেউ সেরা বিশে না আসলেও ক্ষতি নেই; কিন্তু দলটা ভালো জায়গায় যাক, এটা আমি চাই। এতে আমাদের দেশের মানুষও খুশি হবে; আমরাও খুশি হব। কোনো নির্দিষ্ট খেলোয়াড় দশে আছে আমার মনে হয় না এটা তার ক্যারিয়ারেও সাহায্য করবে। হয়তো দেখা যাবে বিশ্বকাপে সে সেরা পারফর্মার; কিন্তু পরবর্তী ৬ মাসে আর কিছুই করতে পারল না। কিন্তু আমরা দলটাকে যদি একটা স্টেজে নিতে পারি সেটা আজীবন মানুষ বলবে এবং ইতিহাস হয়ে থাকবে। আমার কাছে মনে হয় এটাই গুরুত্বপূর্ণ কোনো নির্দিষ্ট খেলোয়াড়দের

বিশেষ কিছু করার চেয়ে দলের ভালো ফল করা।

সাকিব-তামিম-মুশফিক দেশের সেরা; কিন্তু বিশ্বক্রিকেটে এখনো সেরা নয়। বিশ্ব আসরে দারুণ কিছু করার এটা সেরা সময় কি না?

ওরা তিনজন সব সময় পারফর্ম করে আসছে বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য যত দিন ধরে খেলছে। শুরু থেকেই ভালো খেলছে ওরা। অবশ্যই আমি মনে করি ওদের এখন সময় এই স্টেজে ভালো করার। সারা দুনিয়া তাদের যেভাবে চেনে, এখানে যদি আরও ভালো কিছু করতে পারে তবে ফোকাসটা আরও বেশি পাবে। তবে সে জন্য অতিরিক্ত চাপ নেওয়ার কিছু নেই। সবার ফোকাস থাকে বিশ্বকাপে আলাদাভাবে কোনো কিছু করার। তাই বলে এটাই পৃথিবীর শেষ নয়। আমার এখানে ভালো খেলতে হবে, এই চেতনাটা থাকা ভালো কিন্তু চাপটা যেন না থাকে সেটাই চাই।

৬.

ফ্লাইট নম্বর–বি সেভেন সেভেন ডব্লু; বোয়িং ট্রিপল সেভেন সিরিজের টুইন জেট বিমান।

প্রতিদিন সকাল-বিকেল শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে এই প্রতিষ্ঠানের, এই গড়নের, এই সিরিজের গন্ডা খানেক বিমান ছেড়ে যায় দুবাইয়ের উদ্দেশে। রাত ৯টা ৫ মিনিটে রানওয়ে ধরে ছুটতে থাকা বিমানটাকে বাইরে থেকে তাই আলাদা কিছু বলে মনে হওয়ার কথা নয়।

কিন্তু এই বিমানটা বিশেষ কিছু, এই বিমানটা অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই বিমানটা বহন করে নিয়ে গেল বাংলাদেশের বিশ্বকাপ স্বপ্নসারথিদের। হ্যাঁ, বিশ্বকাপ মিশন মাথায় নিয়েই দুবাইয়ে হয়ে অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল।

বাংলাদেশের প্রথম ঠিকানা হলো ব্রিসবেন ওকস টাওয়ার। কাজে হোটেল হলেও নামের ভেতরই তার 'চরিত্র'টা লুকানো আছে।

৪১ তলা এ ভবনটি আক্ষরিক অর্থেই এক টাওয়ার বিশেষ। হোটেল কর্তৃপক্ষের দাবি, ব্রিসবেনের অন্যতম সুউচ্চ ও অন্যতম আকর্ষণীয় ভবন নাকি তাদের এই 'প্রায়' পাঁচ তারকা হোটেলটি। আকাশছোঁয়া এই ভবনের প্রতিটি কক্ষের লাগোয়া ঝুলন্ত ব্যালকনি আছে। এই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েই মাশরাফি বিন মুর্তজা নিজের একটা ছবি তুলে পোস্ট করেছেন; দেখলেই বুক ছলকে ওঠে–পায়ের নিচে মহাশূন্য!

ভয় করে না?

এই টাওয়ারের ৩২ তলায় বসবাস করতে থাকা মাশরাফি সাত সমুদ্দুরের ওপার থেকেই চিরপরিচিত হাসিটা উপহার দেন, 'ভয় পেলে চলবে! এখানে তো আমরা

ভয় তাড়াতেই এসেছি।'

হ্যাঁ, ভয় তাড়ানোর মিশন নিয়ে ব্রিসবেনের এই হোটেলে আছেন মাশরাফি ও জাতীয় দলের অন্য খেলোয়াড়েরা–অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপের ভয় তাড়ানোর মিশন।

একটি বার্তা সংস্থাকে অধিনায়ক মাশরাফি বলেছেন, তারা কন্ডিশন নিয়ে সব আতঙ্ক ও গত বছরের বেশির ভাগ সময় ধরে চলা খারাপ ফলাফলের হতাশাকে ছিটকে ফেলে দিতে চান। সে জন্য তারা প্রস্তুত বলেই দাবি করছেন, 'আমার হাতে যে স্কোয়াড আছে, তাতে আমি আশাবাদী, কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়া সম্ভব। কন্ডিশনের অসুবিধা না ভেবে সুবিধাটাই কাজে লাগাতে হবে।'

কন্ডিশনকে সুবিধায় পরিণত করার আয়োজনে অবশ্য কোনো কমতি নেই।

ব্রিসবেনে নিজেদের আয়োজনে এই ক্যাম্পটা করার উদ্দেশ্যই হলো অস্ট্রেলিয়ান কন্ডিশন ও উইকেটে নিজেদের মানিয়ে নেওয়া। সেই লক্ষ্যে অ্যালান বোর্ডার ওভালের নেটে স্থানীয় লম্বা লম্বা ফাস্ট বোলারকে খেলে নিজেদের প্রস্তুত করে নেওয়ার চেষ্টা করছেন ব্যাটসম্যানরা।

প্রস্তুতির জন্য বোর্ডার ওভালের একাডেমি আরও অসাধারণ একটি সুবিধাও দিয়েছে–ভিডিও সিমুলেশন।

এই পদ্ধতিটা অস্ট্রেলিয়ান একাডেমিগুলোতে ব্যাটিং অনুশীলনের জন্য আগে থেকেই ব্যবহৃত হয়। মূলত বোলিং মেশিনে অনুশীলন করাই। তবে পার্থক্য হলো, এখানে ডেলিভারি প্রান্তে একটা পর্দা থাকে, যেখানে ভিডিওতে কোনো একজন ফাস্ট বোলারকে দৌড়ে আসতে দেখা যায়। ওই ছায়াছবির ফাস্ট বোলার যে মুহূর্তে বল হাত থেকে ছাড়েন, ওই মুহূর্তে মেশিন থেকে বেরিয়ে আসে বল। ফলে এটা সরাসরি নামকরা ফাস্ট বোলারদের খেলার একটা আবেশ তৈরি হয়।

বলাবাহুল্য, এসব চেষ্টাই অস্ট্রেলিয়ার বাউন্সি ও গতিশীল উইকেটে ব্যাটিংটা স্বচ্ছন্দ করে তোলার জন্য। এখন দেখার বিষয়, এসব আধুনিক সুবিধা নিয়ে ভয়টা আসলেই তাড়াতে পারেন কি না খেলোয়াড়েরা।

ব্রিসবেন থেকে সে অর্থে ভালো কোনো স্মৃতি নিয়ে যেতে পারল না বাংলাদেশ দল। উপমহাদেশীয় বিশ্বকাপজয়ী দলগুলো মাস কয়েক এই কন্ডিশনে কাটিয়ে দেওয়ার পর তখনো খাবি খাচ্ছে। তাই বাংলাদেশের প্রথম দুটি অনুশীলন ম্যাচেই পরাজয় হয়তো খুব অস্বাভাবিক নয়। তারপরও পরাজয় তো একটা বিস্মরণযোগ্য স্মৃতিই বটে। এই স্মৃতি সঙ্গে নিয়েই রওনা দিল সিডনির পথে। এখানেই তাদের বেস ক্যাম্প।

আইসিসির অধীনে, তাদেরই ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ দুটি অনুশীলন ম্যাচ খেলবে। সেটাও অনুষ্ঠিত হবে সিডনিতেই। এখানে পাকিস্তান ও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে

প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার কথা বাংলাদেশের। দুটি ম্যাচই সিডনির ব্ল্যাকটাউন অলিম্পিক পার্ক ওভালে।

একটি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দ্বিতীয় ম্যাচের পর মাশরাফি বিন মুর্তজা বলেছেন, তিনি আশাবাদী যে, এখানেই জয় পেয়ে যাবেন তারা। প্রথম দুটি অনুশীলন ম্যাচে পরাজয়টাকে খুব বড় করে দেখতে রাজি নন অধিনায়ক, 'এটা ঠিক, পরাজয়টা কাঙ্ক্ষিত ছিল না। তবে বাস্তবতা হলো, আমরা সেরা কম্বিনেশন পাওয়ার জন্যই ম্যাচ দুটো খেলেছি। জয়ের ব্যাপারটা মাথায় রেখে সেভাবে পরিকল্পনা করা হয়নি। ফলে আমি খুব হতাশ নই।'

অবশ্য মাশরাফিদের হতাশ করল অনুশীলন ম্যাচও। সেখানেও জয় অন্তত পাওয়া হলো না একটা ম্যাচেও।

৭.

এই পাঁচ বছর আগেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহল আফগানিস্তানের নামই জানত না।

এই সময়টাতে আফগানিস্তান শুধু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে উঠে এসেছে, তাই নয়; রীতিমতো বড় দলগুলোর বিপক্ষে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে তারা। পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়ার মতো দলের পরীক্ষা নিয়ে নিয়েছে তারা ক্রিকেট মাঠে। সেই আফগানিস্তানের বিপক্ষে আরেক দফা পরীক্ষা দিতে হবে বাংলাদেশ দলকে।

ক্যানবেরার মানুকা ওভালে বিশ্বকাপে যার যার প্রথম ম্যাচে পরস্পরের মুখোমুখি বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান। বাংলাদেশের জন্য খুবই বাজে খবর হলো, এই দুই দলের এর আগে একমাত্র লড়াইয়ে জয়ী দলের নাম আফগানিস্তানই।

এবার বিশ্বকাপের সূচি ঠিক হওয়ার পর থেকেই আলোচনায় এই আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ। যেহেতু আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত একমাত্র ম্যাচে হেরে গিয়েছিল, তাই আলোচনাটা আরও বেশি। সেই পরাজয়টা ছিল গত বছরের এশিয়া কাপে; ঢাকাতেই।

সেই ভূত মাশরাফিই তাড়ালেন। আফগানিস্তানকে গুঁড়িয়ে দিয়ে শুরু করল বাংলাদেশ। মাশরাফি ৯ ওভারে ২০ রান দিয়ে ৩ উইকেট। এই পরিসংখ্যান বোঝাতেই পারবে না, মানুকা ওভালে কীভাবে ফিরে এসেছিলেন যৌবনের সেই মাশরাফি।

সংবাদ সম্মেলনে কে একজন ভুল করে বলে বসলেন–আপনি তো আজ ১৪৫ কিলোমিটারে কয়েকটা ডেলিভারি করলেন। চমকে উঠলেন তিনি। গলায় পুরো বিস্ময় ঢেলে দিয়ে বললেন, 'আমি! আমাকে না, তাসকিনকে দেখেছেন।'

কথা বলতে বলতেই যেন স্মৃতিকাতর হয়ে গেলেন। নিজে নিজেই বললেন, 'আমিও একসময় এ রকম গতিতে বল করতাম। সে অনেক অনেক আগের কথা।'

হ্যাঁ, মাশরাফির সেই গতির ঝড় অনেক আগেই অতীত হয়ে গেছে। অনেক আগেই

দফায় দফায় ইনজুরি তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে সেই 'এক্সপ্রেস' চেহারাটা। কিন্তু সময় বা ইনজুরি চাইলেই যে মাশরাফিকে দমিয়ে দিতে পারে না, সেটা আরেকবার দেখল ক্রিকেট-দুনিয়া। সত্যিই সেদিন মাশরাফি অন্তত দুটো ডেলিভারি ১৪০ কিলোমিটারের ওপরে করেছিলেন।

গতি নয়; দুমুখো সুইং, কাটার আর অসম্ভব নিয়ন্ত্রিত বোলিং দিয়ে রীতিমতো ত্রাস হয়ে উঠলেন ক্যানবেরার মানুকা ওভালে। আর ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা এই ফর্মে আবির্ভূত হওয়া অধিনায়কের তোপেই একরকম গুঁড়িয়ে গেল আফগানিস্তান। বাংলাদেশের ২৬৩ রান তাড়া করতে গিয়ে মাশরাফিদের সামনে পড়ে ১০৫ রানের পরাজয় মেনে নিতে হলো আফগানদের।

দিন শেষে ম্যাচসেরা হয়েছেন মুশফিকুর রহিম, বল হাতে ঝড় তুলেছেন তাসকিন ও রুবেল এবং ব্যাটে-বলে আরও একবার সবার চেয়ে এগিয়ে সাকিব। কিন্তু ম্যাচে প্রভাব বিবেচনা করলে মাশরাফির আশপাশেও কেউ নেই। ২০০৭ বিশ্বকাপে যেমন ভারতের বিপক্ষে শরীরী ভাষা দিয়ে, বল দিয়ে জয় নিশ্চিত করে ফেলেছিলেন; বিশ্বকাপে ফেরার ম্যাচে তাই করলেন যেন অধিনায়ক।

এই সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারটাকে অবশ্য বড় করে দেখতে রাজি নন মাশরাফি। তার কাছে এটা তার দায়িত্বেরই অংশ বলে মনে করেন তিনি, 'এটা আসলে গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাপারটা আমার বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট খেলোয়াড়ের ব্যাপার নয়। যে শুরু করে, সে ভালো করতে পারলে বাকিদের ভালো করাটা সহজ হয়ে যায়। ফলে ব্যাপারটা আমার কৃতিত্ব নয়। এটা আসলে আমার দায়িত্ব।'

বারবার নিজের প্রশংসা শুনে একটু লজ্জা পেলেন, একটু ভয়ও পেলেন। মাশরাফি নিজেই বললেন, এত 'ভালো' শুনলে এখন তার ভয় লাগে, 'ভালো বলবেন না, প্লিজ। এই ভালো শুনলে ভয় লাগে! ভালো সময় তো ধরে রাখতে পারি না।'

৮.

বাংলাদেশ দল অস্ট্রেলিয়া গেছে; পিছু পিছু মার্সিয়া নামে এক সাইক্লোন কোত্থেকে এসে হাজির হয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়!

সাইক্লোনের তীব্রতায় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের দুদিন আগে থেকেই বোঝা গেল, এই ম্যাচ হওয়ার নয়। বাংলাদেশ মুফতে বিশ্বসেরা স্বাগতিকদের বিপক্ষে ১ পয়েন্ট পেয়ে যাচ্ছে।

এই কথায় অবশ্য খুব চটেছিলেন তখন মাশরাফি। বারবার বলছিলেন, ১ পয়েন্টের দিকে তারা চেয়ে নেই; তারা খেলতেই চান। বিশ্বের অন্যতম গতিশীল উইকেটের জন্য বিখ্যাত গ্যাবায় অস্ট্রেলিয়ান ফাস্ট বোলিং খেলতে না পারায় আফসোস এখনো আছে তাদের।

ম্যাচের আগের দিনও বলছিলেন, খেলা হলে পূর্ণ পয়েন্টটা কারা পেত, সেটা নিয়ে কোনো নিশ্চয়তা নেই; বাংলাদেশও হতে পারত সেই ২ পয়েন্টের মালিক,

'অবশ্যই আমরা স্বস্তি বোধ করছি (পয়েন্ট পাওয়ায়)। তবে ম্যাচটি মাঠে গড়ালে ফল কী হতো তা আমরা কেউ বলতে পারি না। আমাদের হারানোর কিছু ছিল না। আমরা ভালো খেলার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলাম এবং এটা (ম্যাচটি হলে) আমাদের জন্য দারুণ একটি অভিজ্ঞতা হতো।'

খেলা না হওয়ায় সবচেয়ে বড় হতাশা নিশ্চয়ই ইতিহাসের ছোঁয়া লাগা দ্য গ্যাবায় খেলতে না পারা। অস্ট্রেলিয়ায় এমনিতেই বাংলাদেশের খুব একটা যাওয়া হয় না। গেলেও কেয়ার্ন, ডারউইনের মতো অখ্যাত ভেন্যুতে খেলতে হয়। ব্রিসবেন, এমসিজি, অ্যাডিলেডে খেলার ভাগ্যটা তাই বাংলাদেশিদের জন্য ছোট কোনো ব্যাপার। মাশরাফি গ্যাবায় খেলতে না পারার সেই হতাশাটাকেই উল্লেখ করলেন। তারপরও হতাশা কাটিয়ে সামনে তাকাতে চান দেশসেরা এই পেসার, 'গ্যাবায় আমরা খেলতে পারলাম না। এটা নিঃসন্দেহে বড় ধরনের হতাশার বিষয়। সুন্দর এই মাঠটিতে খেলার জন্য সত্যিই আমরা মুখিয়ে ছিলাম। এই অভিজ্ঞতা বিশ্বকাপ আসরে বাকি ম্যাচগুলোতে আমাদের উপকারে আসত। কিন্তু যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। তবে আমি মনে করি, বিশ্বকাপের মঞ্চে পয়েন্ট পাওয়া নিঃসন্দেহে উদ্দীপনাদায়ক বিষয়। দলের সবাই আত্মবিশ্বাসী ও ইতিবাচক মনোভাবে রয়েছে। আমরা যেকোনো কন্ডিশনে যেকোনো প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেলার জন্য প্রস্তুত। বর্তমান মনোভাব ধরে রাখতে পারলে এই আসরে ভালো করতে পারব আমরা।'

শুধু যে ব্রিসবেনের এই রোমান্টিসিজম মিস করল বাংলাদেশ, তা নয়। মাশরাফি ক্রিকেটীয় দিক থেকেও এই ম্যাচটাকে একটা মিস হিসেবে দেখলেন, 'অস্ট্রেলিয়ার পেস বোলিংয়ের বিপক্ষে খেলার অভিজ্ঞতা পরবর্তী ম্যাচগুলোতে কাজে লাগত, আমাদের আত্মবিশ্বাসও বেড়ে যেত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে ম্যাচটি না হওয়ায় আমরা হতাশ। তবে পয়েন্ট পাওয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের তাই নিয়েই খুশি হওয়া উচিত।'

এই পয়েন্টটা যে বাংলাদেশকে অপ্রত্যাশিতভাবে নক আউটপর্বে খেলার দিকে এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে, সেটা মাশরাফি ভালোই বোঝেন। সাধারণত গ্রুপ পর্বের শুরুর দিকে নকআউট পর্ব নিয়ে ভাবতে না চাইলেও এখানে তিনি স্বীকার করলেন, এখন ব্যাপারটা দৃষ্টিসীমায় চলে এসেছে। সে জন্য কী করতে হবে, তাও বললেন, 'আমাদের এখনো দুটি ম্যাচ (নকআউট পর্বে খেলতে চাইলে) জিততে হবে। তবে সবার আগে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আমাদের পরবর্তী ম্যাচটিতেই ফোকাস করছি আমরা। গ্রুপে বাকি ৪টি ম্যাচ খেলার জন্য আমাদের হাতে আরও কিছু সময় থাকছে। তাই সামনে যে ম্যাচটি আসছে সেটি নিয়েই ভাবা উচিত। শেষ অবধি গ্রুপের ফল কেমন হবে তার আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিনই।'

তবে শুধু শ্রীলঙ্কা নয়, মাশরাফিরা প্রতিটি দলকে নিয়েই ভাবতে চান। প্রতিটি দলের বিপক্ষে জয়ের চিন্তায় মাথায় নিয়ে নামতে চান বলে আবারও বললেন, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনো নির্দিষ্ট প্রতিপক্ষকে হারানোর টার্গেট নিয়ে বিশ্বকাপ

খেলতে আসিনি। যদি আমরা দলীয় পরিকল্পনায় অটুট থাকতে পারি এবং মাঠে তা কার্যকর করতে পারি, ওয়ানডে ক্রিকেটে তাহলে আমরা সবকিছুই করার ক্ষমতা রাখি। ভালো খেললে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষেও জিততে পারি আমরা। তবে মাঠে আমরা নিজেদের শতভাগ উজাড় করে খেলব, সবার আগে সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরি।'

আর এসব লক্ষ্য পূরণে মাশরাফিদের একটা বড় হাতিয়ার হতে পারে অস্ট্রেলিয়ায় অপ্রত্যাশিত সমর্থন পাওয়া। ক্যানবেরা থেকে ব্রিসবেন; প্রবাসী বাংলাদেশিরা দলকে পুরো চাঙা করে রেখেছেন। অধিনায়ক আশা করছেন, এই সমর্থন তাদের সঙ্গী হবে আসছে দিনগুলোতেও, 'অস্ট্রেলিয়ায় পা রাখার পর থেকেই এখানকার ভক্তরা আমাদের দারুণভাবে সমর্থন দিয়ে আসছে। আশা রাখি, আমাদের জন্য তাদের এই সমর্থন অব্যাহত থাকবে।'

৯.

আফগানিস্তানের বিপক্ষে জয় ও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এক পয়েন্ট নিয়ে মেলবোর্নে পৌঁছাল বাংলাদেশ। এই ম্যাচটা ছিল বিশ্বকাপে বাংলাদেশের একমাত্র বাজে খেলা ম্যাচ। ৯২ রানে হেরেছিল বাংলাদেশ। মেলবোর্ন থেকে নিউজিল্যান্ডের নেলসন। উদ্দেশ্য স্কটল্যান্ড।

আগে ব্যাট করে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল স্কটিশরা। কাইল কোয়ের্টজারের ঝোড়ো ১৫৬ রানে ভর করে ৩১৮ রানের বিশাল সংগ্রহ দাঁড় করায় স্কটল্যান্ড। বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ইনিংস, তামিম ইকবালের ৯৫ এবং মাহমুদউল্লাহ, মুশফিক ও সাকিবের ঝোড়ো ফিফটিতে ৬ উইকেট ও ২.৫ ওভার হাতে রেখেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় দল।

এর মধ্যে দুটো ঘটনা মনে না করলেই নয়।

বাংলাদেশের জয়ের জন্য তখন দরকার ৫ রান; সাকিব আল হাসানের ফিফটি পূরণের জন্য দরকার ২ রান। ঠিক এ অবস্থায় সাব্বির রহমান রুম্মন 'ভুল করে' একটা বাউন্ডারি মেরে দিলেন। ভুল যে করেছেন, সেটা বোঝাতে সাকিবের বারবার নিষেধ সত্ত্বেও পরের দুই বলে ইচ্ছে করে রান করলেন না। ফলে পরের ওভারের প্রথম বলটায় স্ট্রাইক পেয়ে গেলেন সাকিব। একটুও দেরি না করে বাউন্ডারি হাঁকালেন; দলকে জিতিয়ে, নিজে ফিফটি করে অল্পস্বল্প হাসতে হাসতে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

দলের বন্ধনটা অনুভব করুন।

এর আগে অবশ্য একটা করুণ রসের শিকার হয়েছে বাংলাদেশ। ব্যাটিংয়ের শুরুটাই হয়েছিল আরেকটা কেলেঙ্কারি ঘটনার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। বিশাল এই রান পাড়ি দিতে নেমেছিল বাংলাদেশ ওপেনার এনামুল হক বিজয়কে হারিয়েই। ফিল্ডিংয়ের সময় কাঁধে চোট পেয়ে ব্যাটিং থেকে ছিটকে যান তিনি; পরে

জানা গেছে বিশ্বকাপই শেষ হয়ে গেছে এই ওপেনারের।
স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে এই জয়ের পর সমীকরণটা সহজ হয়ে গেল। ইংল্যান্ড বা নিউজিল্যান্ডের এক দলকে হারালেই কোয়ার্টার ফাইনাল। এর মধ্যে নিউজিল্যান্ডকে সর্বশেষ ৭ ম্যাচে হারালেও ঘরের মাঠে তাদের অস্ট্রেলিয়াই হারাতে বেগ পাচ্ছে, সেখানে তাদের ছেড়ে দেওয়াই ভালো। ফলে লক্ষ্য হলো ইংল্যান্ড।

১০.
রুবেল হোসেনের বলটা গোলার মতো গিয়ে আঘাত করল স্টাম্পে।
এক সেকেন্ডের জন্য যেন থমকে গেল বিশ্ব। মাশরাফি বিন মুর্তজা দৌড় দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। কিন্তু আনন্দ অশ্রু ফেলারও সময় পেলেন না। সতীর্থরা সবাই মাশরাফির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার করে উঠলেন। চিৎকার করে উঠল অ্যাডিলেড, চিৎকার করে উঠল ঢাকা, চিৎকার করে উঠল চট্টগ্রাম-বরিশাল-সিলেট-রাজশাহী; চিৎকার করে উঠল আসলে সারা বাংলাদেশ এবং সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশি মানুষ।
চিৎকার করে উঠতেই হবে। এ শুধু চিৎকার করার দিন, আনন্দ করার মিছিল করার দিন। অ্যাডিলেড ওভালে শ্বাসবন্ধ করে রাখা ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ১৫ রানে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে চলে গেল বাংলাদেশ দল। ইতিহাসের হাতছানি নিয়ে খেলতে নামা এই ম্যাচে মাহমুদউল্লাহর ইতিহাস গড়া সেঞ্চুরি, রুবেল হোসেনের দানবীয় বোলিংয়ে ভর করে নিজেদের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপের প্রথম পর্ব পার করল মাশরাফির দল। আর প্রথমবারের মতো পা রাখল তারা নকআউট পর্বে।
এই ম্যাচ জিতলেই কোয়ার্টার ফাইনাল–এই সমীকরণ মাথায় নিয়েই খেলতে নেমেছিল বাংলাদেশ।
কিন্তু শুরুটা একেবারেই মনমতো হয়নি। টসে হেরে আগে ব্যাটিং করতে নেমে মাত্র ৮ রানে দুই ওপেনার ইমরুল কায়েস ও তামিম ইকবালকে হারিয়ে ফেলল দল। তখন মনে হচ্ছিল, জয়ের স্বপ্ন দেখা কঠিন ব্যাপার হয়ে উঠবে। এখান থেকেই বাংলাদেশকে প্রথম পথ দেখালেন সৌম্য সরকার ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। তৃতীয় উইকেটে ৮৬ রানের জুটি করে তারা একটু স্বস্তি ফেরালেন উদ্বিগ্ন বাংলাদেশের ড্রেসিংরুমে। কিন্তু সৌম্য সরকার এবং উইকেটে এসেই সাকিব আল হাসানের বিদায়ে আবার থরথর অবস্থা। সৌম্য ৫২ বলে ৫টি চার ও একটি ছক্কায় সাজানো ৪০ রান করে ফিরে গেলেন। এর পরই মাত্র ২ রান যোগ করে ফিরে গেলেন সাকিবও।
এ অবস্থায় যে শঙ্কা তৈরি হলো আবার, সেটা কাটাতেই বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাটিং জুটি করলেন দুই পরমাত্মীয় ব্যাটসম্যান–রিয়াদ ও মুশফিক। এই দুজন পঞ্চম উইকেটে করেন ১৪১ রান। একই সঙ্গে আগ্রাসী,

পাল্টা-আক্রমণে ভরপুর এই জুটিই কার্যত বাংলাদেশকে বড় সংগ্রহের দিকে এগিয়ে নিল। এই জুটি ভাঙল মাহমুদউল্লাহর বিদায়ে। তার আগেই মাহমুদউল্লাহ অমোচনীয় ইতিহাসে নাম লিখে ফেলেছেন নিজের।

বাংলাদেশের প্রথম সেঞ্চুরিয়ান হিসেবে বিশ্বকাপে আত্মপ্রকাশ করলেন রিয়াদ। শেষ পর্যন্ত যখন রান বাড়াতে গিয়ে আউট হলেন, তার আগেই নামের পাশে যোগ হয়ে গেছে ১৩৮ বলে ৭টি চার ও দুটি ছক্কায় সাজানো ১০৩ রানের মহাকাব্যিক ইনিংস।

এই সেঞ্চুরিয়ানের তালিকায় নাম লিখিয়ে ফেলতে পারতেন মুশফিকও। কিন্তু নিজের ইনিংসের মায়া না করে দলের জন্যই ছুটছিলেন মুশফিক। ফলে ছক্কার নেশায় তুলে মারতে গিয়ে আউট হলেন ৭৭ বলে ৮টি চার ও একটি ছক্কায় সাজানো ৮৯ রানের ইনিংস খেলে। তারপর বাংলাদেশকে ২৭৫ রানের চূড়ায় পৌঁছে দিল সাব্বির, মাশরাফি ও আরাফাত সানির ছোট্ট ছোট্ট তিনটি ইনিংস।

এই রানটা নিতান্ত কম নয়। কিন্তু তাড়া করতে গিয়ে ইংল্যান্ড যেভাবে শুরু করল, মনে হলো তাদের জন্য লক্ষ্যটা সহজই। বিনা উইকেটে ৪৩ রান তুলে ফেলার পর প্রথম উইকেট তারা হারাল রানআউটের ফাঁদে পড়ে। এরপরই ইয়ান বেল ও অ্যালেক্স হেল দলকে ১ উইকেটে ৯৭ রানে পৌঁছে দিলেন। ২ উইকেটে ১২১ রান পর্যন্তও এগিয়েই ছিল ইংল্যান্ড কিন্তু এরপরই গর্জন করে উঠলেন বাংলাদেশের পেসাররা।

ধরে নেওয়া হয়েছিল অ্যাডিলেডে হিরো হবেন বাংলাদেশের স্পিনাররা। কিন্তু এই জায়গাকেই যেন চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিলেন পেসাররা। মাশরাফি, তাসকিন ও রুবেল নাড়িয়ে দিলেন ইংল্যান্ডের ভিত। সঙ্গে আরেকটি দুরন্ত রানআউট। একপর্যায়ে সব মিলিয়ে ২৩৮ রানে ৮ উইকেট হারায় ইংল্যান্ড। মাশরাফি ৪৮ রানে নেন ২ উইকেট। কিন্তু এখান থেকেই আবার ফিরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিল তারা।

স্টুয়ার্ট ব্রডকে নিয়ে একটা শেষ চেষ্টা করছিলেন ওকস। শেষ পর্যন্ত ২ ওভারে দরকার ছিল তাদের ১৬ রান। এমন সময়ই ৪৯তম ওভারে বল করতে এসে প্রথম বলেই ব্রডকে ফেরালেন রুবেল। আর এক বল বিরতি দিয়েই ফেরালেন অ্যান্ডারসনকে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের উৎসব শুরু হয়ে গেল।

গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচটায় খেলেননি মাশরাফি। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে স্লো ওভার রেটের কারণে জরিমানা দিয়েছিলেন। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আবার একই ঘটনা ঘটলে মিস করতে হতো কোয়ার্টার ফাইনাল। তাই বসে দেখলেন দলের অসামান্য লড়াই, রিয়াদের টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপ সেঞ্চুরি এবং অল্পের জন্য হার।

তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের আগ পর্যন্ত আলোচনায় শুধু ইংল্যান্ড-বধ।

দেশ ছেড়ে যাওয়ার সময়ও কথায় কথায় বলছিলেন–অসুস্থ ছেলেটাকে রেখে যাচ্ছি, মনটা একটু খারাপ।

অস্ট্রেলিয়া গিয়ে খবর পেয়েছেন পাঁচ মাস বয়সী ছেলেটার অসুখ আরও বেড়েছে, হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। দাঁতে দাঁত চেপে রয়েছে, মাঠে কাউকে কিচ্ছুটি বুঝতে দেননি–দেশের জন্য লড়তে হবে। সাত অপারেশনে হাঁটুতে আবারও খেলার সময় আঘাত লেগেছে। টেলিভিশন ক্যামেরাও যন্ত্রণাটা ধরা পড়ল। তিনি দাঁতে দাঁত চেপে হাঁটুর যন্ত্রণাও সহ্য করেছেন–দেশের জন্য কিছু করতে হবে যে।
অবশেষে সেই মুহূর্তটা এল। অবশেষে মাশরাফি বিন মুর্তজা নামের এক মহানায়কের নেতৃত্বে নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবার ক্রিকেট বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল বাংলাদেশ।
বুকের ভেতর জমতে থাকা, শরীরজুড়ে জমতে থাকা যন্ত্রণাগুলো সব আনন্দ অশ্রু হয়ে বেরিয়ে এল। মাথায় জাতীয় পতাকা বেঁধে উল্লাসে মেতে উঠলেন মাশরাফি; বাংলাদেশকে ইতিহাস ভেঙে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উল্লাস।
মাশরাফি এই ম্যাচের আগেও বলেছেন, এটা তার ক্যারিয়ারে তো বটেই, বাংলাদেশের ইতিহাসেও সম্ভবত সবচেয়ে বড় ম্যাচ। ম্যাচের পরও বললেন, এটাই বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ জয়।
বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার এই অপরিচিত কন্ডিশনে এসে দলকে যে বিরূপ পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে, সেটা ভেবেই এই জয়কে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ মনে করছেন মাশরাফি, 'অবশ্যই। এটা আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয়গুলোর একটা। দেশে সবাই আশা করছিলেন, আমরা যেন কোয়ার্টার ফাইনালে চলে যেতে পারি। কিন্তু আমরা জানি, অস্ট্রেলিয়ায় আমরা কী পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। এই মেলবোর্ন, ব্রিসবেন, অ্যাডিলেডের মতো ভেন্যুতে আমরা জীবনে কখনো ক্রিকেট খেলিনি। ফলে এটা খুব, খুব কঠিন ছিল। কিন্তু খেলোয়াড়েরা সবাই আত্মবিশ্বাসী ছিল। তারা কঠোর পরিশ্রম করেছে। যেভাবে সবাই পরিশ্রম করেছে, তার ফলই এসেছে আজ।'

১১.
ক্যাচ ধরেই উল্লাস শুরু করেছিলেন ইমরুল কায়েস।
উল্লাসে যোগ দিয়েছিল বাংলাদেশ দল, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা সমর্থকেরা। ধারাভাষ্যকারেরাও চিৎকার করে বলছিলেন–বাংলাদেশ খেলার নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু হায়!
সব উল্লাস থেমে গেল আম্পায়ারের এক 'নো বল'-এর ইশারায়। হতভম্ব হয়ে সেই ইশারার দিকে চেয়ে রইলেন রুবেল হোসেন। হতভম্ব হয়ে ধারাভাষ্যকার শেন ওয়ার্ন বললেন, 'এটা অসম্ভব।' আসলে হতভম্ব হয়ে গেল ক্রিকেট দুনিয়ায়ই।
বাংলাদেশ-ভারত কোয়ার্টার ফাইনালে রোহিত শর্মার বিপক্ষে রুবেল হোসেনের করা বলটাকে নো বল বলে ঘোষণা করে পুরো দুনিয়াকেই সমালোচনামুখর ও বিস্মিত করে দিয়েছেন আম্পায়াররা। এরপর আরও এক দফা বিস্ময় উপহার দিয়ে

মাহমুদউল্লাহর ছক্কাকে আউট বানিয়ে দিয়েছেন তারা!

প্রথমত রুবেল হোসেনের যে বলটা নিয়ে এত আলোচনা, সেই বলটা কিছুতেই কোমর উচ্চতায় ছিল না। ক্যাচ তুলে দেওয়া ব্যাটসম্যান রোহিত শর্মা প্রায় দুই পা এগিয়ে আসার পরও বল ছিল তার কোমরের নিচেই। ফলে নিয়ম অনুযায়ীই ৯০ রানে থাকা রোহিত শর্মা সে সময় আউট হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু ইয়ান গোল্ড 'নো' ডাকায় তা হয়নি। এটাকে 'মানবিক ভুল' বলে ধরে নেওয়া যেত। কিন্তু সেটা ক্রিকেট-বিশ্ব করতে পারছে না গোল্ড একেবারে নিয়মের লঙ্ঘন করে নো বল ঘোষণার দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নেওয়ায়। কোমর উচ্চতাবিষয়ক নো বল ঘোষণার দায়িত্ব থাকে মূলত স্কয়ার লেগ আম্পায়ারের ওপর। তিনি আগে এই সিদ্ধান্ত দেন। তারপর যদি খুব আঁটসাঁট সিদ্ধান্ত হয়, একবার থার্ড আম্পায়ারের দৃষ্টিভঙ্গি জেনে তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেন স্ট্রাইক প্রান্তের আম্পায়ার। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এই রীতির একটুও অনুসরণ করা হয়নি। ইয়ান গোল্ড বল বাতাসে থাকা অবস্থায়ই তড়িঘড়ি নো বল ঘোষণা করেন।

ঘটনা এখানেই শেষ হলে কথা ছিল না। এরপর বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ের সময় আবার পুনরাবৃত্তি ঘটে এক বিতর্কিত সিদ্ধান্তের। টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের সবচেয়ে সফল এবং বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ যখন সবে রানের চাকা ঘোরাতে শুরু করেছেন, তখন তিনি এক বিতর্কিত সিদ্ধান্তের শিকার হলেন। রিয়াদ বল উড়িয়ে মেরেছিলেন। বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচ ধরেছিলেন শিখর ধাওয়ান। কিন্তু রিপ্লেতে পরিষ্কার দেখা গেল ধাওয়ানের হাতে যখন বল, তখনই তার পা স্পর্শ করে ফেলেছে বাউন্ডারি!

এই দুই সিদ্ধান্তের বলি হয়েছে বাংলাদেশ দল।

মনে হতে পারে, এই দুই সিদ্ধান্তে কী করে ফলাফল বদলে যায়? আসলে যায়। দুটো সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছে খেলার মোড় যখন ঘুরছিল, তখন। বাংলাদেশ যখন ভারতের বিখ্যাত ব্যাটিং লাইনআপকে চেপে ধরেছে, আরেকটা উইকেট হলেই ম্যাচ হাতে চলে আসে; তখন রোহিত শর্মাকে নটআউট জানিয়ে আসলে তাদের ব্যাটিংয়ে প্রাণ সঞ্চার করা হয়েছে। সেই সঙ্গে মানসিকভাবে খেলোয়াড়েরা রীতিমতো ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছেন। এরপর আবার যখন ব্যাটিংয়ে দেশের সবচেয়ে সফল ব্যাটসম্যান চাকাটা ঘোরাতে শুরু করেছেন, তখন এল পরের সিদ্ধান্ত।

এই দুই সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ যে ম্যাচ হেরেছে, সে ব্যাপারে মত প্রকাশ করেছেন ভারতীয় সাবেক দুই কিংবদন্তি ভিভিএস লক্ষ্মণ, সৌরভ গাঙ্গুলী থেকে শুরু করে অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি শেন ওয়ার্ন, ক্যারিবীয় গ্রেট মাইকেল হোল্ডিং, সাবেক ইংলিশ অধিনায়ক নাসের হুসেন, সাবেক নিউজিল্যান্ড গ্রেট মার্টিন ক্রোর মতো মানুষরা।

১২.
বাইরে স্লোগানের পর স্লোগান। প্রকম্পিত পুরো বিমানবন্দর এলাকা।
দীর্ঘ অপেক্ষায় থাকা বিমানবন্দরের ভেতরে কর্মকর্তা-সাংবাদিকেরা অবশ্য একটু উত্তেজনা চেপে রইলেন–সবার মতো তো স্লোগান তারা দিতে পারছেন না। এর মধ্যে হঠাৎ তাদের মুখ দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল আতহার আলী খানের কণ্ঠ–শাবাশ, টাইগার্স; শাবাশ!
এই এক গর্জনে ভেঙে গেল সব আনুষ্ঠানিকতার আবরণ। সাংবাদিক, কর্মকর্তারাও করতালিতে মেতে উঠলেন। আর এই স্লোগান, করতালি, ফুলের মালা সঙ্গী করে ২২ মার্চ রাত পৌনে আটটায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছালেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের বিশ্বকাপ অভিযানে যাওয়া ক্রিকেটাররা। বিমানবন্দরে পৌঁছেই অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা বলে দিলেন–তাদের সাফল্য আসলে তাদের নয়, এই সাফল্য পুরো বাংলাদেশের।
বিশ্বকাপ থেকে কোনো দৃশ্যমান সাফল্য নিয়ে না এলেও অভাবনীয় কীর্তি হিসেবেই প্রথমবারের মতো নকআউট পর্বে খেলার রেকর্ড করে ফিরেছেন ক্রিকেটাররা। সেই সঙ্গে তাদের সঙ্গী হয়েছে আরও অনেক ব্যক্তিগত সাফল্য। সে জন্যই বিমানবন্দরে দুপুর থেকে ভক্তদের ঢল নেমেছিল। শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তার খানিকটা সমন্বয়হীনতার কারণে মূল পথে ক্রিকেটাররা বেরোতে পারলেন না। তবে মাশরাফি তার সংবাদ সম্মেলনে বারবার বললেন, তার এই সাফল্যের মূল কারিগর অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে যাওয়া মানুষগুলোই, 'আমি সব সময় বলি, আমাদের ক্রিকেট এই পর্যন্ত এসেছে মানুষের প্রবল ভালোবাসার কারণে। আজ সবাই এভাবে এসেছেন, এটা অন্য রকম এক অনুভূতি। এর আগেও পেয়েছি। এটা অন্য রকম লাগছে।'
সমর্থকদের বাদ দিলে বিশ্বকাপে মাশরাফিরা যা করতে পেরেছেন, সে জন্য দলের প্রতিটি সদস্যকে, কোচ-ম্যানেজারকেও বারবার ধন্যবাদ দিলেন, 'ধন্যবাদ ছেলেদের, যেভাবে অনুশীলন করেছে। কোচদের ধন্যবাদ যেভাবে অনুশীলন করিয়েছেন। অনুশীলন ম্যাচে সেভাবে রেজাল্ট পাইনি। তারপরও কন্ডিশনে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছি। ছেলেদের কৃতিত্বই বেশি। টিম ম্যানেজমেন্টকে ধন্যবাদ জানাই।'
অনেকেই বলছেন, বাংলাদেশ দল এই যে সাফল্য পেয়েছে, তার প্রধান কৃতিত্ব স্বয়ং অধিনায়ককেই দেওয়া উচিত। কিন্তু মাশরাফি দ্বিমত পোষণ করলেন, 'আমার ব্যক্তিগত কথা বলব না, পুরো টিমই যা করার করেছে। আমরা যেখানে গিয়েছিলাম কিছু করতে। খেলোয়াড়দের সবার বিশ্বাস ছিল এই কন্ডিশনে আমরা কিছু করতে পারি।'
এমনকি তার নিজের ব্যক্তিগত সমস্যা কাটিয়ে উঠে বিশ্বকাপে মন দিতে পারার জন্যও এবং ম্যানেজমেন্টকে কৃতিত্ব দিলেন, 'মাঝখানে আমার ব্যক্তিগত সমস্যা

ছিল। ম্যানেজার অনেক সাহায্য করেছে। বড় সমস্যা হলো, আমি দু-এক দিনের জন্য দেশে আসতে পারি কি না।'

ব্যক্তিগতভাবে খেলোয়াড় চিহ্নিত করেও কৃতিত্ব দিলেন। সেরা বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে রিয়াদ ও মুশফিকের দিকে রইলেন অধিনায়ক, 'মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ অসাধারণ, মুশফিক ৩-৪ বছর ধরে দারুণ। রিয়াদ অনেক চাপে ছিল। অনেক কিছুর ভেতর দিয়ে গেছে। সাঙ্গার পর রিয়াদের নাম আসা উচিত। রুবেল ব্রিলিয়ান্ট, তাসকিন ভালো বোলিং, সৌম্য এক ম্যাচ, সাব্বির রুম্মান খুব ভালো খেলেছে। রিয়াদ ও মুশফিক সম্ভবত আমাদের সেরা পারফরমার।'

তবে সবকিছুর পর গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, কোচের একটা সিদ্ধান্তকে। বাংলাদেশের বদলে যাওয়ার কাজটা আসলে কোচের দেওয়া অসীম স্বাধীনতা থেকেই হয়েছে বলে অধিনায়কের বিশ্বাস, 'কোচ স্বাধীনতা দিয়েছেন। আমরা খুব স্বাধীনতা নিয়ে খেলেছি। বিশ্বাসটা বেড়েছে এর পর।'

এখনো মাশরাফি বিশ্বাস করেন, ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটায় আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত তাদের পক্ষে এলে তারাই জিততেন। তবে কোড অব কন্ডাক্টের কারণেই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন না, 'ওই সিদ্ধান্তগুলো পেলে জিততে পারতাম বলে আমার বিশ্বাস। তবে হেরে গেছি এটাই বেশি কষ্টদায়ক। হয়তো সবাই আশা করেছেন, এ জন্য খারাপ লাগছে। আমরা যেভাবে পারফর্ম করেছি সেভাবে পারিনি। যেটা হয়েছে আপনারা দেখেছেন। জীবন থেমে থাকে না।'

শেষ কথাটা এটাই–জীবন থেমে থাকে না।

শেষের আগে

মাশরাফির চলার পথের গল্প এই পর্যন্তই। ২০০১ সালে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে যে গল্পটা শুরু হয়েছিল নানা নাটকের পর, নানা হাসি-কান্নার পর; সেই গল্পে একটা বিরতি এই বিশ্বকাপ থেকে ফুলের মালা গলায় দিয়ে ফেরার ভেতর থেকে। এর পরের কয়েক মাসে মাশরাফির মুকুটে আরও বেশ কিছু পালক, বলা ভালো আরও রঙিন, আরও উজ্জ্বল সব পালক যোগ হয়েছে।

মাশরাফির নেতৃত্বে বাংলাদেশ পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করেছে। ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দলকে সিরিজ হারিয়েছে। সেসব গল্পই বলা যেতে পারত। কিন্তু এই গল্পের শেষ নেই। বাংলাদেশের সোনালি ভবিষ্যতের মতো চলতে থাকুক এই গল্প। তবে একটা তো স্টেশন চাই জীবন রেলগাড়ির।

এই স্টেশনে থামলাম আমরা।

জনগণের অধিনায়ক



১.

পাকিস্তানের বিপক্ষে চোখ ঝলসানো একটা সেঞ্চুরি করে ম্যাচসেরা হয়েছেন সৌম্য সরকার।

পুরস্কার হিসেবে একটা ঝা-চকচকে মোটরসাইকেল পেয়েছেন। সৌম্য নিজে ভালো মোটরসাইকেল চালাতে পারেন; ভালো বললে কম বলা হয়, তার বেশ মোটরসাইকেলের নেশাই আছে। কিন্তু নতুন বাইকটা চালানোর সুযোগ পেলেন না তিনি। সুযোগ পাওয়ার প্রশ্নই আসে না–কারণ দলে যে তার বাংলাদেশখ্যাত এক মোটরবাইক ছোটানো 'পাগলা' আছেন!

সৌম্যরা পেছনে বসলেন। মাঠজুড়ে মোটরসাইকেল নিয়ে চক্কর দেওয়া শুরু করলেন তাদের পাগলা বড় ভাই, মাশরাফি বিন মুর্তজা।

মোটরসাইকেল মাঠময় ঘুরছে; মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে আছেন কোচ-কর্মকর্তারা আর বাকি খেলোয়াড়েরা হই হই করে উৎসাহ দিচ্ছেন। সুখী পরিবারটার দিকে চেয়ে দলের শ্রীলঙ্কান ট্রেনার মারিও ভিল্লাভারায়ন মুখটা

প্রবীণসুলভ করে হাসলেন; চোখ দুটো চকচক করে উঠল, 'হি ইস দ্য ম্যান। হি ইস দ্য ম্যান বিহাইন্ড দ্য ফ্যামিলি।'
হ্যাঁ, আজ এ কথা আমাদের অস্বীকার করার উপায় নেই। ধুঁকতে থাকা একটা বাংলাদেশ দলকে এক সুরে গান গাইতে থাকা একটা পরিবারে পরিণত করার পেছনের মানুষটা নিশ্চয়ই করে মাশরাফি বিন মুর্তজা।
একটা সরল সোজা তথ্য হলো, ২০১৩ বা ২০১৪ সালে কমবেশি এই বাংলাদেশ দল নিয়েই ওয়ানডে ক্রিকেট খেলছিল। সময়ের সঙ্গে দলে কয়েকজন তরুণ তারকা যোগ হয়েছেন এটা সত্যি। তবে সেই তরুণদের বাদ দিলেও মানতে হবে, সেই পুরোনো দলটাকেই একটা অজেয় রূপ দিয়ে ফেলেছেন মাশরাফি।
এই মাশরাফির রহস্যটা কী? ক্যাপ্টেন মাশরাফির বৈশিষ্ট কী?

২.

অধিনায়ক মাশরাফির প্রথম বৈশিষ্ট্য খুঁজতে আমরা মুশফিকুর রহিমেরই দ্বারস্থ হতে পারি; যাকে সরিয়ে মাশরাফিকে ওয়ানডে অধিনায়ক করা হয়েছিল।
চট্টগ্রামে মাত্রই শেষ হয়েছে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ। দলটিকে হোয়াইটওয়াশ করার আনন্দ নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসেছেন অধিনায়ক মুশফিক। এই আনন্দের পাশাপাশি একটা বিষাদও আছে। আগামীকাল থেকে তিনি আর অধিনায়ক নন। পরদিন থেকে ওয়ানডে দলের দায়িত্ব নেবেন মাশরাফি।
প্রথমবারের মতো দ্বৈত অধিনায়কত্ব যুগে প্রবেশ করছে বাংলাদেশ।
এ অবস্থায় মুশফিকের অনুভূতি কী? তিনি কি ওয়ানডে অধিনায়কত্ব ছেড়ে সহজ থাকতে পারবেন? অনেক অনেক প্রশ্ন ছুটে যাচ্ছে এই ছোটখাটো ব্যাটিং মাস্টারের দিকে। মুশফিক একটু ম্লান হাসলেন, 'একটু তো ধাক্কা লাগছেই। আগে ওয়ানডে দল নিয়ে ভাবতে হতো, এখন ভাবতে হবে না। তবে যা করা হয়েছে, ভালোর জন্য করা হয়েছে। দেখুন, দল হিসেবে আমরা খারাপ নই। তবে অধিনায়কত্বে কিছু পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হলো, ড্রেসিংরুমের হাওয়াটা বদলানো। আর এ কাজে, সত্যি বলি, বাংলাদেশে মাশরাফি ভাইয়ের চেয়ে যোগ্য লোক কেউ ছিলও না, এখনো নেই।'
এর চেয়ে বড় সার্টিফিকেট আমরা কোথায় পেতাম!
যিনি সিংহাসন হারাচ্ছেন, তিনিই বলছেন, ড্রেসিংরুমের হাওয়া বদলানোয় মাশরাফির চেয়ে যোগ্য লোক নেই। আমরাও এটাকেই অধিনায়ক মাশরাফির প্রথম বৈশিষ্ট্য বলে মেনে নিই।
মাশরাফি ২০০১ সালে প্রথম যখন জাতীয় দলে এলেন, সেই থেকে বলা হয় বাংলাদেশের ড্রেসিংরুমের চরিত্র তিনি বদলে দিয়েছেন। একঝলক সতেজ বাতাস বইয়ে দেন তিনি ড্রেসিংরুমে। ড্রেসিংরুম বলতে ব্যাপারটা আক্ষরিক অর্থে শুধু ড্রেসিংরুম নয়–হোটেল, অনুশীলন; সর্বত্রই মাশরাফি চিরকালই প্রাণ।
ক্যারিয়ারে দু-একটি বিরল সময় বাদ দিলে দলের এই মজার মুডটা সব সময়ই

মাশরাফির নিয়ন্ত্রণে থেকেছে। হাসিঠাট্টায় উড়িয়ে দিতে পারেন যেকোনো বিষাদ। নিজে সারাটা জীবন অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করেছেন শরীরে কিন্তু মুখ থেকে হাসি ফুরায়নি। নিজের যন্ত্রণা, ইনজুরি নিয়েও রসিকতায় মেতেছেন।

অনুশীলনে বা হোটেলে এই মানুষটি হয়ে ওঠেন সতীর্থদের খোঁচানোর, চটানোর প্রধান কারণ।

কার কোথায় দুর্বলতা, কে কী বললে রাগ হয়; সব জানেন। এখন দুজনকে সঙ্গে নিয়ে হয়তো তামিমের পেছনে লাগছেন, একটু পর আবার তামিমকে সঙ্গে নিয়ে হয়তো সাকিবের পেছনে লাগছেন।

তাহলে মাশরাফি কি জোকার?

এখানেই তো মজাটা। মাশরাফি স্রেফ মজা করেন না। মজাটা কেন করেন, সেটা জানেন। তার কাছে জীবনটাই মজা। ক্রিকেট এই জীবনের তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র ব্যাপার। এই দর্শনটা ছড়িয়ে দেন তিনি মজা করে। এই কাজগুলো করতে তাকে অধিনায়ক হতে হয় না। তিনি অধিনায়ক না থাকা অবস্থাতেই দলকে হাসিঠাট্টায় মাতিয়ে প্রাণ ফিরিয়ে দিতে ছুটি কাটাতে নড়াইল নিয়ে যান। তিনি অধিনায়ক না থাকা অবস্থাতেও দলের বোলাররা যাতে ঠিকঠাক মতো বোঝেন, তাই কোচের ইংরেজি বক্তৃতা বাংলা করে শোনান।

৩.

মাশরাফির অধিনায়ক হিসেবে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটাও এই দলকে পরিবারে পরিণত করে ফেলাকেন্দ্রিক।

এখনকার বাংলাদেশ দলে মাশরাফি সবচেয়ে সিনিয়র মানুষ। ফলে পুরো পরিবারের কাছে তিনি একজন 'ফাদার ফিগার'। এটা সত্যি, মানুষের বয়স বাড়লেই সে এ রকম ফাদার ফিগার হয়ে ওঠে না। সেটা অর্জন করে নিতে হয়। এই অর্জনটা করে নিয়েছেন মাশরাফি।

সাকিব-তামিম আর মুশফিকের কথাই ধরুন।

মাশরাফির পর এরা তিনজন দলের সবচেয়ে সিনিয়র। আর এরা যেকোনো বিচারে দলের সবচেয়ে বড় তারকা। এবং মজার ব্যাপার হলো, তিনজন চরিত্রে একেবারে ভিন্ন ভিন্ন তিন মানুষ। অথচ এদের কাছে মতনির্বিশেষে বড় ভাই হলেন সাকিব।

সাকিব যে একটু বাংলাদেশের আর দশজন যুবকের মতো নন, এটা সবার জানা কথা। তিনি একটু অবিনীত, পরোয়া না করা মানুষ। সাকিব-মাশরাফির ক্ষেত্রে ঘোরতর সাকিববিদ্বেষী এক ক্রীড়া বিশ্লেষক আমাকে বলছিল, 'সাকিব দুনিয়ায় কাউকে ভয় পায়, এটা তার কোনো শত্রুও দাবি করতে পারবে না। তবে যদি ক্রিকেট মহলে কাউকে সমীহ করে থাকে, সেটা মাশরাফি। একমাত্র এই সমীহ করার কারণেই একাধিকবার সাকিব 'সাকিবসুলভ' কাজ করেনি; মাশরাফিকে সম্মান দেখিয়ে স্বভাববিরুদ্ধভাবে চুপ থেকে।'

সেই সময়গুলো আমরা উল্লেখ না করি। তবে দলের ভেতরের খবর রাখেন, এ রকম প্রতিটা মানুষই জানবেন সাকিবের সেই মাশরাফি ভাইকে সম্মান দেখানোর ঘটনাগুলো।

সাকিবের শাস্তির সময়টার কথা মনে করে দেখুন। মাশরাফি তখন অধিনায়ক নন। সাকিবের শাস্তি কমানোর আবেদন করতে চায় দল। মুশফিক বলতে চান বোর্ড সভাপতিকে। কীভাবে বলবেন? ধরলেন গিয়ে মাশরাফি ভাইকে–আপনি বুঝিয়ে বলতে পারবেন, আপনার কথায় না করবে না বোর্ড; আপনি চলেন।

এরপর আসুন তামিমের প্রসঙ্গে। দলের সবচেয়ে ভালো ছেলেগুলোর একজন তামিম। তবে একটু বেশি অভিমানী। পরিবার থেকে ক্রিকেট দল; সব জায়গাতে সামান্যতে কষ্ট পান, কষ্টের বহিঃপ্রকাশ অনেক সময় অনিয়ন্ত্রিত হয়। খুব ভয় ছিল, তাকে বাদ দিয়ে মাশরাফিকে যখন টি-টোয়েন্টিতে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক করা হলো, তখন না সে রকম কিছু করে বসেন। সে রকম একটা ঘটনার সূত্রপাত হলেও মাশরাফি মুহূর্তের মধ্যে তার সঙ্গে আলাপ করে বুঝিয়ে ফেলেছেন।

তামিম ইকবাল এখন আগের মতোই যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি মাশরাফির অনুরক্ত।

মুশফিকের কথা বলি। আরেকজন অতি ভালো মানুষ। দলের রানমেশিন। সবচেয়ে পরিশ্রমী ক্রিকেটার। তবে খুব আবেগপ্রবণ। বেদনাটা খুব বেশি ছুঁয়ে যায়। এমন ছেলে ওয়ানডে অধিনায়কত্ব, টেস্ট কিপিং হারিয়ে ভেঙে পড়ার কথা ছিল। কিন্তু কার কাছে হারালেন অধিনায়কত্ব? প্রিয় মাশরাফি ভাই। ফলে সমস্যা নাই। মুশফিক জীবনে এই একবার অন্তত বেদনায় ভেঙে পড়েননি।

এর সঙ্গে রিয়াদকে যোগ করুন। এ মানুষটি অযথা সমালোচনার শিকার হওয়ার জন্যই প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তিনি যে দলে কখনো বাড়তি সুবিধা পাননি এটা নিশ্চিত করতে মাশরাফি অধিনায়ক হওয়ার পরও প্রিয় সঙ্গীদের একজন বানিয়ে ফেলেছেন রিয়াদকে। ফলে রিয়াদের সেরাটা দেখছি আমরা।

বিশ্বকাপের আগে রান পাচ্ছিলেন না তামিম। আলাদা করে তাকে নিয়ে বেরিয়েছেন মেলবোর্নের পথে; ঘুরে বেড়িয়েছেন, খেলা নিয়ে একটা কথা বলেননি। আলাদা করে দুজন ডিনার করতে গেছেন, খেলা নিয়ে কথা নেই। রাতে হোটেলে ফেরার সময় বলেছেন–তুই জানিস, তুই কত বড় খেলোয়াড়! পুরো বাংলাদেশ তোর দিকে চেয়ে থাকে, আমরা সবাই তোর ভক্ত।

ব্যস। আর একটা কথাও না খেলা নিয়ে।

মাশরাফির অভিভাবকত্বে সিনিয়ররা কতটা স্বস্তিতে আছেন, তার সাক্ষী স্কোরকার্ডও হতে পারে। তিনি অধিনায়কত্ব নেওয়ার পর প্রথম ম্যাচে সাকিব ম্যাচসেরা হয়েছিলেন, প্রথম সিরিজে মুশফিক ম্যান অব দ্য সিরিজ হয়েছিলেন। তামিম ইকবাল সম্ভবত ক্যারিয়ারের সবচেয়ে ধারাবাহিক সময় কাটাচ্ছেন এখন।

মাশরাফি যে জাদু জানেন, তা নিশ্চয়ই না। তবে একটা ব্যাপার তিনি সিনিয়রদের

নিশ্চিত করতে পেরেছেন যে, সর্বোচ্চ যে মর্যাদা তাদের প্রাপ্য, সেটা তারা পাবেন। প্রতিনিয়ত সংবাদমাধ্যমে, অন্তরঙ্গ মহলে কথাবার্তায় তিনি প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছেন, এদের মূল্যায়নটা তিনি কত বেশি করেন।

এবার আসুন জুনিয়রদের কাছে।

সৌম্যর মোটরসাইকেল কে চালায়? তাসকিনের সঙ্গে কে চেস্ট বাম্প করে? মুস্তাফিজের কপালে কে চুমু দেয়? লিটনের প্রতিভা নিয়ে কে উচ্চকণ্ঠ?

মাশরাফি।

এই এক একটা কাজে পরিষ্কার হয়ে যায়, পরিবারের ছোটদের কী করে তিনি পরিবার-অন্তঃপ্রাণ করে তোলেন। এনামুল হক বিজয় কিছু কৌশলগত সমস্যায় ভুগছেন; দলে জায়গা হচ্ছে না। বোর্ড থেকে তাকে শুধরানোর দায়িত্ব দেওয়া হয় মাশরাফিকে। তাসকিন ইনজুরিতে পড়ে কেমন সময় কাটাচ্ছেন? রোজ সকালে মাশরাফির একটা করে ফোন–কী করছিস?

মুস্তাফিজের শরীরটা যাতে আরও শক্তপোক্ত হয়ে ওঠে, সে জন্য তার খাওয়ার খবর, জিমের খবর নিতে হাজির হয়ে যান মাশরাফি। নিজে সব সময় প্রথম ওভার বল করেন। মুস্তাফিজকে বলেছেন, তুই করবি আজ থেকে; আমার চেয়ে ভালো করবি। জুবায়ের ছেলেটা একটু ভয় পায়। টেস্টে নয়, একেবারে ওয়ানডেতে টান টান সময়ে তাকে দিয়ে বল করিয়ে সাহস দিয়েছেন।

নাসির কেমন যেন আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছিল। প্রায় ব্যাটিং পায় না। বোলিংও তো ১০ ওভার পাওয়ার কথা নয়। প্রায়ই মনে হতো, দলে আমার কাজ কী!

মাশরাফি জানালেন, তুই আমার সেরা অফ স্পিনার। আজ থেকে রোজ ১০ ওভার বল করবি। কথা শুনে হেসে বাঁচে না নাসির, 'বাঘ নাই বনে বিলাই রাজা। তাই আমি মাশরাফি ভাইয়ের সেরা অফ স্পিনার।'

মুখে বলে বটে; কিন্তু ঠিকই বাঘ হয়ে উঠতে থাকে বল হাতে। ব্যাট হাতেও ফিরে আসে আত্মবিশ্বাসটা।

রুবেলের কথা মনে করে দেখুন। বিশ্বকাপের আগে কী একটা বিপদ গেল ছেলেটার। এরও কয়েক মাস আগে এই বিপদের যখন শুরু, তখনই একবার ব্যক্তিগত পর্যায়ে সমস্যাটা সমাধানের জন্য চেষ্টা করেছিলেন মাশরাফি। পরে যখন চূড়ান্ত বিপদ এসে গেল, কারাগারে যেতে হলো; কেউ কোনো দায়িত্ব না নিলেও ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রেখেছেন, চেষ্টা করেছেন সাহস দেওয়ার।

সেই রুবেলকে বিশ্বকাপে কেমন অনুপ্রাণিত করেছেন, তা সেই নাচ যারা দেখেছেন, তারাই জানেন। রুবেল ঠিক কী বললে তেতে উঠবেন, নেচে উঠবেন; জানেন। একেবারেই লাজুক ছেলেটাকেও নাচাতে পারেন।

তবে ছোটদের কাছে কেবল এই মজার বড় ভাই হলে বিপদ। তাহলে অধিনায়কের রাজত্ব থাকে না। এই ছোটরাই আবার কতটা বাঘের মতো ভয় পায়, সেও আমরা ক্যামেরাতেই দেখেছি। একটু ভুল লেন্থে বল করায় শুধু চোখ দিয়ে রুবেলকে সে কী

শাসানি! আবার তাসকিন ভুল লাইনে ডেলিভারি দেওয়ায় মাঠের ভেতরই চিৎকার করে গালিগালাজ করা।
গালি কাকে না হজম করতে হয়!
সবাই সেটা হাসিমুখে হজম করেন। মাশরাফির গালি খেয়ে খেলোয়াড়দের হাসি দেখলে মনে হয়, এটাই তাদের প্রিয় খাবার। হওয়ার কারণ একটাই–তিনি যে আদরটা করতে জানেন।

৪.

ওয়ানডেতে ফিল্ডিং রেস্ট্রিকশন না থাকা অবস্থায় আপনি কয়জন ফিল্ডার ক্লোজ ইন পজিশনে দেখে অভ্যস্ত?
মাশরাফি এই নিয়ম মেনে চলার পক্ষে নন। ক্লোজ ইন ফিল্ডার বেশি রাখায় তো কোনো বাধা নেই। সেটা বেশি রাখলে ভয় হলো, রান বেড়ে যেতে পারে। তাই লোকে সুযোগ মিলতেই ফিল্ডার বাইরে পাঠিয়ে দেয়। মাশরাফি উল্টো আরও ফিল্ডার বাড়ান।
একটা বলে তুলে মেরে চার মারলে মাশরাফি বাউন্ডারিতে ফিল্ডার বাড়ান না; উল্টো বাউন্ডারি থেকে আরেকজনকে তিরিশ গজের ভেতরে নিয়ে আসেন। পারলে আরেকটা চার মারো; সমস্যা নেই। সিঙ্গেল পাবে না।
মাশরাফি নিজেই এর ব্যাখ্যা করছিলেন, 'চার মেরে কোনো ব্যাটসম্যান সেট হতে পারে না। সেট হয় চারটে সিঙ্গেল নিয়ে। আমি কোনো ব্যাটসম্যানকে যেচে সেট হতে দিতে রাজি না। সেরা খেলে সিঙ্গেল বের করো পারলে।'
এই কথায় কি গন্ধ পাচ্ছেন?
হ্যাঁ, সেরা মানের আক্রমণাত্মক অধিনায়কত্ব। কেন এত আক্রমণাত্মক অধিনায়কত্ব। আজকের দিনে সীমিত ওভারে খেলায় যেখানে রক্ষণাত্মক কৌশলটা স্বীকৃত হয়ে গেছে, সেখানে এই সেকেলে আক্রমণাত্মক কৌশল কেন। মাশরাফি এ ক্ষেত্রে ক্লাসিক ক্রিকেটের ভক্ত। তার যুক্তি খুব সরল, 'দেখুন, ডিফেন্সিভও যদি আমি খেলতে চাই, সেটারও সেরা উপায় এই অ্যাটাক করা। আপনি কম রান ডিফেন্ড করতে চান? আপনাকে উইকেট তুলে নিতে হবে। সে জন্য আক্রমণ করতে হবে। আপনি বেশি রান নিয়ে খেলছেন? কেন আক্রমণ করবেন না। আমি তো আক্রমণ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ের কথা ভাবতেই পারি না।'

৫.

ভারতের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডের আগে মাশরাফি যখন 'ডেস্ট্রয়' শব্দটা উচ্চারণ করলেন বিশ্বাস করতে একটু কষ্ট হচ্ছিল।
বিশ্বকাপ থেকে শুরু ওয়ানডেতে বাংলাদেশের ফাস্ট বোলাররা ধ্বংসাত্মক একটা চেহারা দেখাচ্ছেন, এটা সত্যি। তাই বলে বিশ্বের যেকোনো ব্যাটিং লাইনআপকে 'ধ্বংস' করে দেওয়ার মতো ফাস্ট বোলার আছে তার হাতে; এমন দাবি করবেন!

চার ফাস্ট বোলার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে; ওয়ানডে ক্রিকেটে এমন বিরল কোনো ব্যাপার নয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেই পেস কোয়ার্টরেটের কথা নাইবা উচ্চারণ করা হোক। এ ছাড়া আশির দশকে এটা বিভিন্ন দলেরই নিয়মিত ব্যাপার ছিল। আজকালও বিভিন্ন পেসসহায়ক উইকেটে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা চার ফাস্ট বোলার নিয়ে খেলতে নামে।

তবে বাংলাদেশের জন্য জেনুইন চার পেসার নিয়ে মাঠে নামাটা এক অর্থে অনন্য এক ঘটনা।

চার পেসার নিয়ে বাংলাদেশ আগে-পরে বিস্তর ম্যাচই খেলেছে। কিন্তু মোটা দাগে সে চার পেসারের মধ্যে একজন বা দুজনও অলরাউন্ডার ছিলেন। তাই সে অর্থে পরিকল্পনা করে চারজন পেসার নিয়ে নামার উদাহরণ বাংলাদেশের ক্রিকেটে খুঁজে পাওয়া যায় না।

ওয়ানডের জগতে বাংলাদেশ পা রেখেছিলই চার পেসার নিয়ে! নিজেদের প্রথম ওয়ানডেতে ১৯৮৬ এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের নতুন বল হাতে নিয়েছিলেন গোলাম নওশের ও সামিউর রহমান। পরে বোলিং করেছিলেন আরও দুই পেসার জাহাঙ্গীর শাহ বাদশা ও গোলাম ফারুক। এমনকি পরের ম্যাচেও এই চার পেসার নিয়ে খেলেছিল বাংলাদেশ।

নব্বই দশকের শেষ দিকে ও নতুন শতাব্দীর প্রথম দশকের প্রায় অর্ধেকজুড়ে বাংলাদেশের ওয়ানডেতে নিয়মিত ছিলেন খালেদ মাহমুদ। বেশ কিছুদিন নিয়মিত খেলেছেন মুশফিকুর রহমানও। এই দুই পেস বোলিং অলরাউন্ডারের সৌজন্যে অনেক ম্যাচেই চার পেসার নিয়ে খেলার বিলাসিতা দেখাতে পেরেছে বাংলাদেশ। চার ওয়ানডে খেলা পেস বোলিং অলরাউন্ডার মফিজুর রহমান ও দুই ওয়ানডে খেলা নিয়ামুর রশিদের সময়ও একাদশে চার পেসার খেলানোর সুযোগ পেয়েছে বাংলাদেশ। এমনকি ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের প্রথম জয়েও কিন্তু ছিল চার পেসার। ২০০৪ সালে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে ভারতকে ১৫ রানে হারানো ম্যাচে খেলেছিলেন মাশরাফি, তাপস বৈশ্য, নাজমুল হোসেন ও খালেদ মাহমুদ।

কিন্তু ভারতের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডের এই চার পেসার মাশরাফি বিন মুর্তজা, তাসকিন আহমেদ, রুবেল হোসেন ও মুস্তাফিজুর রহমানের কেউই অলরাউন্ডার নন। ফলে এটা নিখাদ চার পেসার নিয়ে ওয়ানডে খেলতে নামার প্রথম ঘটনা বললেও অন্যায় হবে না। ফলে বাংলাদেশ নতুন এক যুগে প্রবেশ করল এই সিদ্ধান্তের ভেতর দিয়ে।

বাংলাদেশের মাঝে ক্রিকেটের বিজ্ঞাপনই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তিন বাঁহাতি স্পিনার আর দুই পেসার; কখনো কখনো এক পেসারও হয়ে যেত।

মাশরাফি এসে একঝটকায় এ ব্যাপারটা বদলে ফেললেন। সোজাসুজি তিন পেসার চাই তার একাদশে। তারপর বাকিটা দেখা যাবে। এর মধ্যে ভারতের বিপক্ষে চার পেসার নিয়েও খেললেন। এমন নয় যে, পেস বোলার বলেই তার এই পেসপ্রীতি।

মাশরাফি বিশ্বাস করেন, সারা পৃথিবীর বিশ্বাস করে, তিন পেসার ও কমপক্ষে চার বিশেষজ্ঞ বোলার খেলানো হলো স্ট্যান্ডার্ড আক্রমণাত্মক ক্রিকেট।

আর ক্রিকেটে মাশরাফির স্লোগানই হলো তিন-চার পেসার লেলিয়ে দাও; আক্রমণে জর্জরিত করে ফেল ব্যাটসম্যানদের।

বাংলাদেশের পেসারদের দিয়ে যে আদৌ এ রকম আক্রমণ শাণানো যায়, তা অন্তত বিশ্বকাপের আগে আমরা বিশ্বাস করিনি।

আমরা একগাদা কেতাবি শব্দ জানতাম। আমরা জানতাম অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডের কন্ডিশন, পেস, বাউন্স, শর্ট বল, চীন মিউজিক, ওয়াকা, অ্যাডিলেড; এ রকম গালভরা সব শব্দ। আর এসব শব্দ শুনে আমার মতো দিনকানা তো বটেই, দেশের ক্রিকেট-পণ্ডিতরাও ধরে নিয়েছিলেন–কিচ্ছু হবে না এবার।

আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি। বিশ্বাস করতে গেলেই বই থেকে উঠে আসা পণ্ডিতরা আমাদের বুঝিয়েছেন, দলে পেসার নেই। আমরাও তাই রোজ রোজ মাশরাফিদের কানের কাছে গিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করেছি, এই পেসার দিয়ে তো আমরা পারব না। কিচ্ছু হবে না রে ভাই।

সেই আদি যুগ থেকেই আমরা কখনো বাংলাদেশের পেসারদের খেলোয়াড় হিসেবেই দেখিনি। দেশে তাদের বিন্দুমাত্র সমর্থন কখনো দেওয়া হয়নি। জীবনে উইকেটে এতটুকু সহায়তা পায় না এই বেচারারা। তার মধ্যে মাশরাফি কতবার গুলি ছুড়েছে, কতবার ওয়াসিমের মতো নিয়ন্ত্রণ দিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। রাসেল বল হাতে ম্যাজিক দেখিয়েছে। তাসকিন, রাজীব, রুবেলরা এই মরা উইকেটেই কতবার ঝড় তুলেছে।

স্পিনাররা আমাদের সেরা শক্তি। সেটা কাল স্পিনাররা খারাপ করার পরও সত্যি কথা। কিন্তু এটাও সত্যি, স্পিনারদের পাশে এতটুকু সম্মান কখনো আমরা আসলেই পেসারদের দিইনি। আমরা বুঝতেই পারিনি যে, এই পেসাররা তাদের সবটুকু জবাব জমিয়ে রেখেছিলেন এই বিশ্বকাপের জন্য।

কার্যত আফগানিস্তানের বিপক্ষে এদের বোলিং দেখেই বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু ওই যে, বিশ্বাস করতে না পারা! তাই ভেবেছিলাম, এ তো আফগানিস্তান, বড় দলের বিপক্ষে বোঝা যাবে।

সেই বোঝাটা গেল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এসে। রুবেল চোখে আঙুল দিয়ে বোঝালেন, মাশরাফি-তাসকিন বল হাতে বোঝালেন এবং শেষবেলায় মাশরাফি একটু দুঃখ করেই যেন বললেন, 'আরেকটু সম্মান অন্তত আমাদের পেসারদের প্রাপ্য।'

ভারতের বিপক্ষে চার পেসার ব্যবহার করে সাফল্য পাওয়ার পর মাশরাফি যেমন এই পুরো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বলতে চান, এটা আসলে একটা বিশ্বাস রাখার ব্যাপার; সমর্থন করার ব্যাপার। স্পিন আমাদের সেরা শক্তি, সেটা থাকছেই। কিন্তু সেই স্পিনেই যদি সব দলের বিপক্ষে চেষ্টা করা হয়, তখন বাংলাদেশ হয় খুব অনুমেয় একটা দল। আর ঘরের বাইরে সাফল্য পাওয়া

একেবারেই কঠিন হয়ে উঠবে।

বিপরীতে এখন যেটা হচ্ছে, পেসারদের সমর্থন দেওয়ার ফলে আমরা উইকেট বানানোতে স্বাধীনতা নিতে পারছি। সব সময় সেই টার্নি, নিচু বাউন্সের উইকেট না বানিয়ে প্রতিপক্ষের ব্যাটসম্যান দেখে উইকেট বানানো ও দল সাজাতে পারছি। এই স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য হলেও দরকার ছিল মাশরাফির হাতে এই পেস বোলারদের উত্থান।

৬.

এই পুরো আলোচনায় মনে হতে পারে, মাশরাফির অধিনায়ক হিসেবে যত শ্রেষ্ঠত্ব, তা মাঠের বাইরেই। মাঠে বুঝি এই লোকটা সেই ক্রিকেটজ্ঞানের পরিচয় দিতে পারেন না। কিন্তু বিস্ময়কর হলো, মাঠেও আমরা প্রতিনিয়ত আবিষ্কার করছি, উদ্ভাবনী শক্তি আর ক্রিকেটপ্রজ্ঞা দিয়ে অবশ করে দেওয়া এক মাশরাফিকে।

মাশরাফির ক্রিকেট বোধ নিয়ে আলাপটা একটু পেছন থেকে শুরু করা উচিত। বিশ্বকাপের পর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খর্বশক্তির মাশরাফি বিন মুর্তজার প্রথম স্পেলের পারফরম্যান্স দেখে জেমি সিডন্স বলেছিলেন, 'মাশরাফি, একমাত্র মাশরাফি বলেই এটা পেরেছে।'

কী পেরেছে মাশরাফি?

একজন পেসার, যে কিনা ফিটনেসের ধারেকাছেও নেই, সে অস্ট্রেলিয়ার মতো দলের বিপক্ষে মান বাঁচিয়ে ফিরেছে। একজন পেসার, যে কিনা গড়ে ১১৫ কিলোমিটারের ওপর বলই করতে পারল না, সে প্রথম ২ ওভারে মাত্র ৩ রান দিয়ে ১ উইকেট তুলে নিল। শেষ ওভারটা বাদ দিলে অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যানদের ফণা দাবিয়েই রাখল এই 'হাফ ফিট' মাশরাফি।

কীভাবে? সিডন্স এক কথায় ব্যাখ্যা করেছিলেন, 'ওর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা আর মেধা দিয়ে।'

যদিও সাধারণ্যে একটা ধারণা আছে, সদা-উচ্ছল মাশরাফির মস্তিষ্কে শ্বেতপদার্থ তুলনামূলক কম। এটা একটা ভ্রান্ত মিথ। এই মিথ প্রথমবারের মতো মিথ্যে মনে হয়েছিল আবাহনীর অধিনায়ক মাশরাফিকে দেখে। বাইরে থেকে হইচই করা, পাগলা মাশরাফি মাঠে অন্য এক চেহারায় আবির্ভূত। কী অসাধারণ ফিল্ড প্লেসমেন্ট, অসাধারণ বোলিং চেঞ্জ।

একটা ম্যাচের কথা মনে পড়ছে; প্রতিপক্ষ কারা মনে নেই। ও নিজে অসুস্থ। আবাহনীর পেসাররা সবাই অসুস্থ বা কোনো সমস্যায় ভুগছে। মাশরাফি মাঠে নামল। পেস বল করার মতো শক্তি ছিল না। অফস্পিন বোলিং করল, তাতেই কেল্লা ফতে।

মাশরাফির ক্রিকেট-মস্তিষ্ক কত ক্ষুরধার, সেটা আরও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল তৃতীয় দফা অস্ত্রোপচারের পর। দুই হাঁটুতে টানা তিন অস্ত্রোপচারে ১৪০ কিলোমিটারের ওপর বল করতে পারা সেই মাশরাফি তখন স্মৃতি হয়ে গেছেন। মাশরাফির গড় গতি

তখন ১২৮ থেকে ১৩২। মাশরাফি কৌশল বদলালেন।
লাইন আর লেন্থের ওপর দারুণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এল। ছোট ছোট ইনসুইং আবির্ভূত হলো, ইয়র্কারের চেষ্টা থাকল না, মাঝে মাঝে কাটার; ঘরোয়া ক্রিকেটে বদলে যাওয়া এই মাশরাফিকে দেখে হঠাৎ চমকে উঠেছিলাম। মাশরাফি, নাকি ওয়াসিম আকরাম!
পেস বোলিংয়ে এই যে মেধার পরিচয় সে দিল, তাতে পেস বোলিং কিংবদন্তির কথা মনে না পড়ে পারেই না। তবে ওয়াসিম কাজটা করেছিলেন পৃথিবী শাসন করার জন্য। আর মাশরাফিকে দফায় দফায় এই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে, শরীরের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে।
কী অপূর্ব অভিযোজন!
ওয়াটসন, পন্টিংরা মাশরাফির নিয়ন্ত্রিত এই স্লোয়ার বুঝতে ঘাবড়াতে লাগলেন।
ক্রিকেটীয় দৃষ্টিতে এ এক অসামান্য দৃশ্য: একজন খেলোয়াড় তার সীমাবদ্ধতাকে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ পর্যায়ে শক্তি হিসেবে ব্যবহার করছেন।
এই মেধাবী মাশরাফিকেই এখন আমরা দেখছি কোনো একজন ব্যাটসম্যান ড্রাইভ খেলতে পছন্দ করেন বলে তাকে ড্রাইভ খেলার জায়গা ফাঁকা করে দিয়ে বরং স্লিপে ফিল্ডার বাড়াতে। এবার বোলারের বেরিয়ে যাওয়া ডেলিভারিতে ড্রাইভ করতে গিয়ে এজ হবে!

৭.
মাশরাফি কী অধিনায়ক হিসেবে তার মিথের মতো বড়?
প্রশ্নটা ওঠা খুব অস্বাভাবিক নয়।
একটু দূর থেকে দেখার চেষ্টা করলে মনে হতে পারে, মাশরাফিকে নিয়ে বাড়াবাড়ি চলছে। মনে হতে পারে বাংলাদেশের মিডিয়া ও সমর্থকদের বৃহত্তর একটা অংশ মাশরাফি বিষয়ে একটা ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।
নিত্যদিন পত্রিকা ও ফেসবুক খুললেই মাশরাফির স্তুতি। মাশরাফির নিত্যনতুন ‘মহত্ত্ব’ ও ‘জাদু’ আবিষ্কৃত হচ্ছে প্রতিটি কোনা থেকে।
সে ক্ষেত্রে একটা সন্দেহ তৈরি হওয়া স্বাভাবিক যে, এই মাশরাফি-বন্দনা কি আদৌ ইটের পর ইট সাজানো কোনো দালান? নাকি একটা বাতাসভর্তি বেলুন!
আমি নিজে এ ব্যাপারে ইদানীং আরও বেশি সংশয়ে পড়ে যাই।
মাশরাফিকে নিয়ে একটা বই লিখছি। মাশরাফির জীবনী লিখছি। ফলে আমার উচিত নির্মোহভাবে মাশরাফিকে নিয়ে একটা বিশ্লেষণ করতে পারা। আমার উচিত মাশরাফির একটা সত্যি চরিত্র খুঁজে পাওয়া।
কিন্তু মুশকিল হলো, আমি নিজে মাশরাফিতে বুঁদ। আমি বুঝতে পারি না; মাশরাফির কতটুকু মিথ এবং কতটুকু সায়েন্স।
এ কারণে বিভিন্ন সময় আমি মাশরাফি-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সমকালীন ও সিনিয়র ক্রিকেটারদেরও জ্বালাতন করেছি। আগেই উল্লেখ করেছিলাম একবার; খোদ সাকিব

আল হাসানকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ক্রিকেটার মাশরাফি কত বড়?
সাকিব চোখ-টোখ পাকিয়ে বলেছিলেন, 'মানে!'
'মানে, মাশরাফি তো একটা হাইপ। আসলে কি ক্রিকেটার মাশরাফি অত বড় কিছু?'
সাকিব আমার দিকে অবিশ্বাসীর মতো চেয়ে থেকে একটু দম নিয়ে বলেছিলেন, 'এই কথার কী উত্তর দেব! বোলার কৌশিক ভাইয়ের কথা বাদ দেন। ব্যাটসম্যান মাশরাফির কথা ভাবেন শুধু। বাংলাদেশের হয়ে কত রান করেছেন উনি? হাজার দেড়েক। এই দেড় হাজার রান দিয়ে উনি বাংলাদেশকে যে কয়টা ম্যাচ জিতিয়েছেন, তা আমরা তিন-চার হাজার রান করে করতে পারিনি। ওনার ১৫ রান মানেই ম্যাচে আমরা এগিয়ে গেলাম। শোনেন, একটা কথা বলি। কৌশিক ভাই নিজেকে নিয়ে খামখেয়ালি না করলে সে থাকত বিশ্বের সেরা অলরাউন্ডার। কৌশিক ভাই কত বড় অলরাউন্ডার হতে পারতেন, উনি নিজেও জানেন না।'
একটু থেমে বলেছিলেন, 'মাশরাফি ভাই মিথ নন; রিয়েল।'
মাঝে আমি আমার কয়েকজন সিনিয়র সাংবাদিককে জিজ্ঞেস করছিলাম, 'মাশরাফি কি সত্যিই তার মিথের মতো বড়ো?'
তারা ইতস্তত করছিলেন।
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের প্রেসবক্সে সাংবাদিকের চেয়ে মাশরাফি-ভক্ত বেশি। তাই সদুত্তর পেলাম না। সেদিনই মাশরাফি পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে এসে ফিফটি করে ম্যাচ জেতাল। ফলে মিথটা আরেক ধাপ এগিয়ে গেল। আমরা সমাধান পেলাম না।
অপেক্ষা করছিলাম বিপিএল শেষ হওয়া অবধি। আসর শেষ হলে ক্রিকেটে কয়েকটা দিন ভাটা পড়বে, তখন আমি মিথ ভাঙার চেষ্টা করব। আমি পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো করে বের করতে চাইব, মাশরাফি-মিথ সত্যি নয়।
ধুঁকতে থাকা একটা ওয়ানডে দল, যারা ২০১৪ সাল জুড়ে ম্যাচের পর ম্যাচ হেরেছে, তাদের বিশ্বের দ্বিতীয় সফলতম ওয়ানডে দলে পরিণত করে ফেলার কোনো সায়েন্স নিশ্চয়ই আছে। স্রেফ মাঠের বাইরে কিছু খ্যাপা, পাগলাটে আচরণ দিয়ে একটা দল কেউ বদলে ফেলতে পারে না।
নিশ্চয়ই ম্যাজিকটা অন্য কোথাও। নিশ্চয়ই মাশরাফি-মিথ সত্যি না।
কিন্তু আবারও মিসটাইমিং হয়ে গেল। মাশরাফির দল মেলোড্রামাটিকভাবে বিপিএলের ট্রফি জিতল। মাশরাফি তিনটি বিপিএলের তিনটিতেই চ্যাম্পিয়ন দলের ক্যাপ্টেন।
এর মধ্যে নিজে লম্বা সময় ধরে অধিনায়কত্ব করা এবং গোটা দশেক ভিন্ন দলের হয়ে দুনিয়ার নামকরা সব অধিনায়কের অধীনে ক্রিকেট খেলা শোয়েব মালিক এক আলোচনায় বলে ফেললেন, মাশরাফি তার দেখা সেরা ক্যাপ্টেন।
আন্দ্রে রাসেল ও আসার জাইদি পরিষ্কার সাক্ষাৎকারে বললেন, এই রকম অধিনায়কের অধীনে তারা জীবনে কখনো খেলেননি।
শেষ উপায় হিসেবে আজ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিনের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। বাংলাদেশি মানুষদের মধ্যে আমার দেখা সবচেয়ে ক্ষুরধার ক্রিকেট-

মস্তিষ্কের মালিক সালাউদ্দিন ভাই। সবচেয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ক্রিকেট কোচও বটে।
সালাউদ্দিন ভাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আসলে মাশরাফি কী? এই যে রূপকথার মতো ব্যাপারস্যাপার, এতে মাশরাফির কি আদৌ কোনো জাদু আছে!'
সালাউদ্দিন ভাই সহজে অবাক হন না। তিনি বরং ব্যাপারটাকে আরেকটা পর্যায়ে নিয়ে গেলেন, 'মাশরাফির সাথে কাজ করতে গিয়ে আমি নতুন একটা ব্যাপার আবিষ্কার করেছি। ওর মাঠের বাইরে দল নিয়ে মোটিভেটর হিসেবে যে ভূমিকা, সেটা নিয়ে এত কথা হয় যে, ওর ক্রিকেট-মস্তিষ্কটার ঠিকমতো মূল্যায়ন হয় না। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, ও অনফিল্ড ক্যাপ্টেন হিসেবে কতটা ভালো। ম্যাচ রিড করায় এখন সম্ভবত বাংলাদেশের বেস্ট ক্রিকেটার। ম্যাচের পরিস্থিতি, বোলিং, ফিল্ডিং, এমনকি ব্যাটিং নিয়ে ওর নিজস্ব অ্যান্টিসিপেশন (পূর্বানুমান) অসামান্য। আমি এখন মনে করছি, সে বাংলাদেশের বেস্ট অনফিল্ড ক্যাপ্টেন।'
একটু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।
মাশরাফি যে বিপিএলে কয়েকটা ম্যাচে হঠাৎ হঠাৎ ওপরের দিকে ব্যাটিং করতে চলে এলেন, দেখে মনে হলো খ্যাপাটে কাণ্ড; রান বাড়ানোর নেশা। কিন্তু আমরা জানতে পারলাম, এটা নাকি দারুণ পরিকল্পিত একটা ব্যাপার।
পরিকল্পনাটা এমন। প্রতিপক্ষ জানে, মাশরাফি এলে পেস বোলিং আনতে হবে। এখন মাশরাফি নামছেন ১২-১৫ ওভারের কাছাকাছি সময়ে। এ সময়ে দলগুলো স্পিন অপারেট করে। মাশরাফি নামায় দুপাশ থেকে তিন দিনই দুজন করে পেস বোলার নিয়ে আসা হলো। একদিন মাশরাফি নিজেই ক্লিক করে গেলেন। বাকি দুদিনও প্রতিপক্ষের বোলিং পরিকল্পনা এলোমেলো হয়ে গেল। পেস বোলারদের এক করে ওভার শর্ট হয়ে গেল। শেষে স্পিনার ব্যবহার করতে গিয়ে অনেকগুলো রান গচ্চা!
সামান্য একটা মুভ।
২০০৯ সালে মাশরাফি যখন প্রথম টেস্ট অধিনায়ক হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ গেলেন। সেখানে বসে এক সাক্ষাৎকারে বলছিলেন, প্রতিপক্ষ জানে আমি পেস বলে দুর্বল। ফলে আমার পেছনে শক্তিটা খরচ করতে চাইবে বেশি। আমি সেটাই বেশি সামলাতে চাই। ওতে আমার বেস্ট ব্যাটসম্যানরা অনেক স্পেস পাবে।
এরও আগে মোহাম্মদ আশরাফুল অধিনায়ক থাকা অবস্থায় প্রথম সীমিত ওভারের ক্রিকেটে নিজের জন্য এই পরিকল্পনা নিয়ে হঠাৎ প্রমোশন দিতে বলেছিলেন তখনকার অধিনায়ক আশরাফুলকে।
বোঝা যাচ্ছে, নিজেকে নিয়েই ট্যাকটিক্যাল বাজি ধরার এ পরিকল্পনাটা তাহলে আজকের নয়। অনেক গোছানো, অনেক ভেবে বের করা বুদ্ধি।
হাউ ক্যান ইউ স্টপ দিস মিথোলজিক্যাল ক্যারেক্টার?

সেরা ভক্তের সন্ধানে



১.

আজকালকের দিনে এমন পুরু দেয়াল, বিশাল থামওয়ালা বাড়ি আর বেশি দেখতে পাওয়া যায় না।

ওপরে সাদা চুনকাম করা হয়েছে। কিন্তু কাছে গেলেই বোঝা যায়, সেকালের মজবুত গাঁথুনির তিনতলা ভবন। ভবনের নকশাও সেই ব্রিটিশ-রাজের সময়ের মতো। সামনে একটা বারান্দা। সেখান থেকে একেবারে ভেতর বাড়ি পর্যন্ত চলে গেছে লম্বা করিডর। করিডরের দুপাশে সারি সারি শোবার ঘর।

নড়াইলে অ্যাডভোকেট আতিয়ার রহমান সাহেবের বাড়ি এটা। মানে মাশরাফির নানার বাড়ি। বিশাল এই বাড়ি অগুনতি ঘরে অগুনতি মানুষ যেন। এ পাশ থেকে কেউ ডাকছে কৌশিক ভাই, ও পাশ থেকে চিৎকার ওই কৌশিক; আবার ভেতর বাড়ি থেকে হয়তো ছোট্ট কেউ ডাক দিচ্ছে, কৌশিক চাচ্চু!

এত লোক কারা?

মাশরাফি হাসেন, 'কেন এই তো আমার সংসার।'

'এত্ত বড় সংসার!'

'এটা আমাদের সংসারের তিন ভাগের এক ভাগ। আরেক ভাগ আছে পাঁচ মিনিটের দূরে বাবার বাড়িতে। আর একটা অংশ ঢাকায়। তিনটে মিলে আমার ঘর-সংসার।'
আচ্ছা, বোঝা গেল।

বোঝা গেল, বাইরে যেমন ডজন ডজন বন্ধু; ঘরটাও তেমনি বিশাল বাজারের মতো যেন। মাশরাফি খুব বুক ফুলিয়ে বলেন, 'আমাদের একান্নবর্তী সংসার। আমার স্বপ্ন, এই সংসারটা যেন এমনই টিকে থাকে।'
একান্নবর্তী সংসার টিকে থাকে মানুষগুলোর মধ্যে ঝুলে থাকা অদৃশ্য সুতোয়। লোকে বলে, যে মানুষের বুক যত চওড়া, সুতোর বাঁধন তত মজবুত। মাশরাফির সংসারে, মাশরাফির বাড়িতে ঘুরে মনে হলো–এখানে একটা প্রতিযোগিতা আছে; কার হৃদয় কত বড়, সেই প্রতিযোগিতা।
আমরা এই সংসারটার একটু খোঁজ নেব। আর অত্যন্ত মজার সঙ্গে আবিষ্কার করব, মাশরাফির সেরা ভক্তটি দেশের অন্য কোথাও নয়, এই সংসারেই আছে। কে সেই ভক্ত?
আসুন খোঁজ করে বের করি।

২.
মাশরাফির দুই চাচা বাড়িতে থাকেন না; তারা সপরিবারে আছেন এখন ঢাকায়। এর মধ্যে তপন চাচাকে আমরা দেখতে পাব, মাশরাফির ঢাকার সংসারে অদৃশ্য বন্ধনে যুক্ত। ফলে কাগজ-কলম বলে, সেই বাড়িতে বসবাস করার মানুষ মাত্র দুজন–মাশরাফির বাবা গোলাম মুর্তজা ও মা হামিদা মুর্তজা।
তবে রহস্যটা এখানে যে, আপনি কখনোই এই বাড়িতে গেলে ১০ জনের কম মানুষ পাবেন না। এই বাকিরা কারা?
মাশরাফির মা হাসেন, 'এই আমার ছেলেমেয়ে।'
মানেটা কী!
আমরা তো জানতাম, মাশরাফিরা দুটো মাত্র ভাই।
এই ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে মুর্তজা সাহেব বা বলাকা আন্টির কাছ থেকে কিছু জানা যায় না। তারা শুধু বলেন, ওরা আমাদের পরিবারেরই সদস্য। তাহলে একটু খোঁজখবর নিতে হয়। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, এরা এই নড়াইল বা আশপাশের কোনো গ্রাম থেকে আসা ভাগ্যবিড়ম্বিত কোনো পরিবারের সন্তান।
কারো মা নেই, কারো বাবা-মা নেই; আবার কারো সব থেকে কেউ নেই। কোনো না কোনো সূত্রে তারা এসে উঠেছে এই বাড়িতে। তারপর হয়ে গেছে এই পরিবারের সদস্য। সেই থেকে এখানে থাকা-খাওয়া, পড়াশোনা। এর মধ্যে যারা বড় হয়ে যায়, তাদের কর্মসংস্থানও হয় মুর্তজা পরিবারের কল্যাণে। তারপর একসময় তারা নিজ নিজ সংসার প্রতিষ্ঠা করে; তারপরও নিকটাত্মীয়ের যাতায়াত টিকে থাকে।

তাহলে এভাবে সংসার করে অন্য কোথাও চলে গেলে তো আস্তে আস্তে সংসার ছোট হয়ে যাওয়ার কথা?
না, তা হয় না। একজন বেরিয়ে যায়; দুজন ঢোকে। যেমন আমরা যখন গেলাম তখন সর্বনিম্ন আট থেকে শুরু করে ১৮-১৯ বছর বয়সী পর্যন্ত আরও আটজনের বাস এই বাড়িতে। এই লালন-পালনের বিপরীত প্রাপ্তি কখনো যে হয় না, তা নয়। কখনো আঘাত পেতে হয়, কখনো মনে হয়–ভুল হয়ে গেছে। সবাই এক রকম সুন্দর, সুশীল হয়ে বড় হয়ে ওঠে না।
নাহিদ মামা প্রায়ই একটু শঙ্কা প্রকাশ করেন, 'অচেনা, অজানা বাচ্চাদের মানুষ করে। আমার ভয় হয়, কখন আমার বোনটা কোন বিপদে পড়ে!'
এসব কথা শুনে হাসেন হামিদা মুর্তজা। ঘর আলো করে দেওয়া হাসিতে বলেন, 'মানুষ তো! মানুষকে বিশ্বাস না করলে কাকে করব!'

৩.
মাশরাফির নানার বাড়িরও একই অবস্থা।
নাহিদ মামা বোনের ব্যাপারে ভয় পান; অথচ নিজের বাড়িভর্তিও এ রকম রক্তের সম্পর্ক না-থাকা অসংখ্য আত্মীয়।
নানা আতিয়ার রহমান ও নানি খালেদা রহমান বেলা প্রয়াত হয়েছেন। বাড়িতে একগাদা ঘরের মালিক আসলে মাশরাফির ছোট মামা নাহিদুর রহমান ও ছোট মামি কুহু।
ছোট মামার কথা তো আমরা অনেকবার বলেছি। এতক্ষণে বুঝে ফেলার কথা যে, মাশরাফির জীবনে এই মামার ভূমিকা যেকোনো বন্ধু, অভিভাবকের চেয়ে কম নয়; কখনো কখনো বেশিই বটে। আবার কুহু মামিও মাশরাফিকে বড় করে তোলার সময়টায় মায়ের ভূমিকা পালন করেছেন অনেকটাই।
অবশ্য এ বাড়িতে লোক কেবল এই দুজন নয়। ইউসুফ মামা আছেন সপরিবারে। মাশরাফির নানার আমল থেকে আছেন তিনি। বাইরে থেকে অনুমান করার উপায় নেই যে, এই মানুষটির সঙ্গে কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই এই পরিবারের। এ ছাড়া এমন আত্মীয় আছেন আরও বেশ কয়েকজন।

৪.
মাশরাফির ঢাকার বাসা?
সে কথা এত দিনে রাষ্ট্র হয়ে যাওয়ার কথা যে, মিরপুরে মাশরাফির বাসাটা প্রচলিত অর্থে বাসা নয়। বরং সেকালের সরাইখানা বললে সেটাকে কল্পনা করা সহজ হয়। বাসায় রক্তের বন্ধনের মানুষ হলেন মাশরাফি, তার স্ত্রী সুমনা হক সুমী, কন্যা হুমায়রা মুর্তজা ও পুত্র সাহেল মুর্তজা এবং মাশরাফির ছোট ভাই মুরসালিন বিন মুর্তজা।

কিন্তু এই পাঁচজন মানুষের সংসারে সব সময়ই সদস্যসংখ্যা দশের ওপরে। এমনিতেই নড়াইল থেকে যাওয়া দু-চারজন স্থায়ী বাসিন্দা আছেন সংসারে। তারা আছেন, থাকছেন, পরিবারের সদস্য হয়ে উঠেছেন। এর সঙ্গে নড়াইল থেকে কে কখন আসছে, কে যাচ্ছে; এর কোনো ঠিকানা নেই।

সকালবেলায় আপনি এই বাসায় গেলেন, যে দরজা খুলে দিল, সে হয়তো ভোরবেলায় এসে নিজ দায়িত্বে বাসায় ঘুম দিয়ে উঠেছে। আবার কেউ একজন নড়াইল থেকে একগাদা কলমি শাক নিয়ে চলে এসেছে। একটু ডাক্তার দেখানো হলো, কৌশিকের বাসাটাও ঘোরা হলো।

এই পুরো ব্যাপারটায় ত্যক্তবিরক্ত হয়ে যাওয়ার কথা মাশরাফির স্ত্রী সুমীর। মনে হতে পারে, এই উৎপাত আমি কেন সহ্য করব?

মনে হওয়ায় অন্যায় কিছু ছিল না। মাশরাফির এই জীবন মাশরাফির জন্য আনন্দের হতে পারে। তিনি কেন এটা সহ্য করবেন? সুমনা হককে কথাটা বলতেই তিনি অবাক হলেন। তিনি তো এসব সহ্য করেন না; এগুলোকেই জীবনেরই অংশ মনে করেন।

সুমনার কাছে এটা বরং বাড়তি একটা পাওয়া। নড়াইলে বসে হাসতে হাসতে বলছিলেন, 'দেখুন, আমি যৌথ পরিবারের খুব ভক্ত। আপনি যদি খুব ব্যক্তিগতভাবেও দেখেন, তাহলে যৌথ পরিবার হলো সন্তানদের বেড়ে ওঠার সেরা জায়গা। ওরা শেয়ারিং শেখে এখান থেকে, কেয়ার পায় অনেকের। শুধু বাবা আর মা নিয়ে জীবন হতে পারে না। আমি সৌভাগ্যবান যে, শ্বশুরবাড়িতে সে রকম বিশাল একটা যৌথ পরিবার পেয়েছি। আবার ঢাকায় এই যে সবাই যাওয়া-আসার মধ্যে থাকেন, অনেকে এক-দুদিন বাসায় থাকেন; এটা আমার ঢাকার বাসাতেও ওই পরিবেশটা তৈরি করে দেয়। আমি বুঝতে পারি না যে, পরিবার থেকে দূরে আছি আমরা। এসব নিয়েই তো আমাদের পরিবার।'

বুঝতে পারছি, মাশরাফি একা নন; এই পরিবারের নেশায় সবাই আক্রান্ত!

৫.

মাশরাফির সেরা ভক্ত কে? আমরা এই ভক্তের সন্ধানে অনেক দূর গিয়েছি।

পঞ্চগড়ের দীপুর কথা জানি। ফটোকপির একটা দোকানে চাকরি করত। মাশরাফির প্রেমে পড়ে গিয়েছিল সে কোনো এক শুভ সকালে। সেই থেকে দোকান মালিকের পিটুনির ভয় উপেক্ষা করে প্রতিদিন ভোরবেলায় পত্রিকার স্ট্যান্ড থেকে সবগুলো পত্রিকা এনে খেলার পাতা খুঁজে খুঁজে মাশরাফিবিষয়ক খবরগুলো কপি করে রাখে।

একদিন সে এসব সংগ্রহ নিয়ে ঢাকায় চলে আসে; মাশরাফির হাতে তার বানানো এই বই তুলে দেবে বলে। সে নিজেকে 'দীপু নম্বর থ্রি' বানিয়ে ফেলে।

ফেসবুকে অনেকগুলো আইডির নাম দেখতে পাবেন, যাদের নামের শুরু মাশরাফি

দিয়ে বা শেষে মাশরাফি আছে। এগুলোকে 'ফেক' আইডি ভেবে বিরাট ভুল করে বসবেন না। এরা মোটেও ফেক নন।

তাহলে এরা কারা?

এরা মাশরাফি-ভক্ত। মানে, মাশরাফির জন্য জীবন দিয়ে দিতে পারা ভক্ত। আমি এদের দু-একজনের সঙ্গে মিশেছি বলেই দায়িত্ব নিয়েই কথাটা বলছি। এ রকম মাশরাফি-ভক্ত বাংলাদেশে কতজন আছেন?

আমি অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ের এক ফাস্ট বোলারকে জানি, সে শুধু মাশরাফিকে কাছ থেকে দেখা যাবে বলে ক্রিকেটে এসেছে। আরেকজনকে জানি, যার নামের শেষে 'বিন মুর্তজা' আছে বলে প্রায়ই বুক চিতিয়ে বলে, 'আমিও একদিন আমার নায়ক মাশরাফি ভাইয়ের মতো হব'! একেবারে জেনেশুনেই বলছি, বাংলাদেশে মাশরাফি-পরবর্তী যুগে যত ফাস্ট বোলার এসেছে, ৯৯ শতাংশরও জীবন-ক্রিকেটের আদর্শের নাম মাশরাফি বিন মুর্তজা। তাহলে সংখ্যাটা কত হবে?

কদিন আগে দন্ত্যন শুভ নামে একটি 'পাগল' ছেলে আমাকে ইনবক্স করেছে, "ভাইয়া আমার একটা কাজ করে দিবেন। কাজটা হলো একটা মেসেজ পৌঁছিয়ে দিবেন আমার গুরু ম্যাশের কাছে একটা কথা ছিল আপনার সাথে, আমি ব্রেইন টিউমারের রোগী। আপনার আর লিগামেন্ট ছিঁড়ুক চাই না। কিন্তু (তারপরও) যদি কিছু হয়ে যায় আমার থেকে (লিগামেন্ট) নিয়েন। কারণ জীবিত মানুষেরটা নিলে আপনি আরও খেলতে পারবেন, গুরু।"

আমার একটা সাধারণ ধারণা ১৬ কোটি মানুষের এই দেশে কয়েক কোটি মানুষ আছেন, যারা আসলেই এই ছেলেটার জন্য নিজের হাঁটুটা খুলে দিতে পারেন–ভাইয়া, এটা দিয়ে খেলেন।

আমি একটি মেয়েকে চিনি। যে সেই দূর মফস্বলের এক শহরে বসে পুরো বাড়ি সাজিয়ে ফেলেছে মাশরাফির ওপর ছাপা হওয়া নানা রকম খবরের কাটিং দিয়ে। শুধু মাশরাফিকে একবার দেখার আশায় পড়াশোনা বদলে ঢাকায় চলে এসেছে। মাশরাফিকে দূর থেকে চেনে এমন কাউকেও সে ভক্তি করে, কারণ লোকটি মাশরাফিকে চেনে!

আমি এমন একটি ছেলেকে চিনি, যার নাম রূপক; সে পারলে নিজেকে বদলে মাশরাফি বানিয়ে ফেলে।

এরা সবাই মাশরাফির ভক্ত; সেরা ভক্ত।

কিন্তু নড়াইলে মাশরাফিদের বাড়িতে বসেই এক গভীর রাতে এক সদ্য কৈশোর পার করা যুবক বলল, 'এরা কেউ নয়, মাশরাফি বিন মুর্তজার এক নম্বর ভক্ত আমি। আপনি দেশ-বিদেশে ভক্ত খুঁজছেন, ওর সবচেয়ে বড় ভক্ত বাড়িতেই আছে।'

কে এই ভক্ত।

নাম তার মুরসালিন বিন মুর্তজা: সিজার। মাশরাফির ছোট ভাই।

এই ভাইটির গল্প করব বলেই এই অধ্যায়ের অবতারণা।
মাশরাফির জন্মের ঠিক ১০ বছর পর জন্ম হয়েছে মাশরাফির এই ছোট ভাইয়ের। ফলে সে জ্ঞান হতেই দেখেছে, ভাইয়া তার জাতীয় দলের তারকা। জ্ঞান হতেই দেখেছে, ভাইয়া দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফলে ভাইয়ার সঙ্গে একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে তার ছোটবেলা থেকে। এখন যদিও ভাইয়ার কাছেই থাকে; কিন্তু সেই অর্থে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কখনোই গড়ে ওঠেনি। বরং বাড়ির সদস্যদের মধ্যে ভাইয়াকেই সবচেয়ে বেশি ভয় লাগে সিজারের।
ছোটবেলা থেকে বাংলাদেশের আর দশটা কিশোরের মতো মাশরাফির খেলা দেখেছে। সেই খেলা দেখায় ভাইয়ের খেলা দেখার ব্যাপারটা একটা পর্যায় থেকে আর নেই। সাধারণ একজন দর্শকের মতোই সে মুগ্ধ হয়ে দেখে মাশরাফির খেলা। আর দেখতে দেখতে তার এই বিশ্বাসটা জন্মেছে, তার চেয়ে বেশি করে মাশরাফির খেলা এই দুনিয়ায় আর কোনো ভক্ত অনুসরণ করে না।
এ ব্যাপারে সিজারের একটা উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ আছে, 'মাশরাফি বিন মুর্তজা এ পর্যন্ত ১৪ হাজারের ওপরে বল করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে; সেদিন উইকিপিডিয়ায় দেখছিলাম। আমি সর্বোচ্চ তার চার শ বল মিস করেছি জীবনে। এ ছাড়া আমি তার সব ডেলিভারি দেখেছি। আমি পরীক্ষা মিস করেছি, ক্লাস মিস করেছি, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মিস করেছি, নিজের খেলা মিস করেছি; তার খেলা দেখা মিস করিনি। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, মাশরাফি বিন মুর্তজার আমার চেয়ে বড় ভক্ত আপনি আর কোথাও পাবেন না।'
দেশে খেলা হলে মাঠে গিয়ে দেখতে কখনোই ভুল করেন না। এই খেলা দেখতে গিয়ে যেমন আনন্দে মেতেছেন, তেমনই সাক্ষী হয়েছেন বেদনার।
তার চোখের সামনেই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেই দ্বিতীয় ওভারে বল করতে এসে ইনজুরিতে পড়েছিলেন মাশরাফি।
সেই সময়ের বর্ণনা করছিলেন সিজার, 'সেদিন ভাইয়া যে বুটটা পরল, আমার মনে কেমন যেন মনে হলো। ভয়ে বলিনি। বল করতে এসে যখন পড়ে গেল, তখনই বুঝেছি কিছু একটা হয়ে গেছে।'

৬.
সিজারের জীবনে একটা সংকট আছে; এটা অনেক বড় একটা সংকট।
এই সংকট আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে সব তারকার পরিবারে দেখতে পাব। সুনীল গাভাস্কারের পুত্র রোহান গাভাস্কার থেকে শুরু করে স্টিভ ওয়াহর ভাই মার্ক ওয়াহকেও আমরা এই সংকটে পড়তে দেখেছি। হ্যাঁ, মার্ক ওয়াহর মতো বিশ্বসেরা স্টাইলিশ ব্যাটসম্যানদের একজন পর্যন্ত একসময় সংকটে পড়েছিলেন তিনি স্টিভের ভাই বলে। লোকেরা তার ভেতরেও স্টিভের মতো নেতা খুঁজত, তার ভেতরেও ওই রকম ফিনিশার খুঁজত। মার্ক বিরক্ত হয়ে একবার বলেছিলেন–আমি

মার্ক; মার্ক ওয়াহ। আমি স্টিভ নই।
এ ব্যাপারটা এমন যন্ত্রণাময় যে ডিয়েগো ম্যারাডোনার এক সন্তান তার বাবার পরিচয় থেকে মুক্তি পেতে দেশান্তরি হয়ে নাম পর্যন্ত বদলে ফেলেছিলেন।
সিজারের জীবনেও এই যন্ত্রণাটা আছে।
এই যন্ত্রণারও আবার দুটি অধ্যায়। একটা হলো ক্রিকেটার জীবনের সিজারের যন্ত্রণা। সিজার বেশ জোরেশোরেই ঢাকার ক্রিকেট খেলা শুরু করেছিলেন। সিজার খেলেছেন, এমন এক ক্লাবের কর্মকর্তা জোর গলায় বলেন, 'সিজার চাইলে ভালো অলরাউন্ডার হতে পারত। কিন্তু ও নিয়মিত খেলল না বলে...'।
এই কথাটা সত্যি না। সিজার এখনো খেলছেন। কিন্তু ঠিক কোন ক্লাবে কোন ডিভিশনে খেলেন, সেটা আমরা প্রকাশ করব না। কারণ, এই প্রাইভেসিটাই সিজার আশা করেন। না করে উপায় নেই। যেই মাত্র লোকেরা জানতে পারে, এই ছেলেটি মাশরাফির ভাই, অমনি তার বলের গতি চোখ দিয়ে মাপার চেষ্টা করে। ভাবে, আরেকটা মাশরাফি পেলাম বুঝি। আর সেই চাপ চাপিয়ে দেয় তারা সিজারের ওপর।
এই কথা শুনতে শুনতে হতাশ সিজার মাথা দুলিয়ে বলে, 'দাদা, সবাই কি মাশরাফি হতে পারে! মাশরাফি দেশে কয়টা জন্মায়? আমি কী করে মাশরাফি হব? আমি আমার মতো ক্রিকেটার হতে পারি। আমি আমার আনন্দে ক্রিকেট খেলি। কিন্তু লোকেরা আমাকে ক্রিকেট মাঠে দেখলেই আমাকে মাশরাফি বানাতে চাইত। তাই এখন ওই পরিচয় যাতে লোকে না জানে, সেভাবে ইউনিভার্সিটিতে আর ক্লাবে খেলি।'
এই খেলোয়াড় হিসেবে সংকটের পাশাপাশি আরেকটা আছে তারকা মাশরাফির ছোট ভাই হওয়ায় লোকেদের বাড়তি 'সমাদর' পাওয়ার সংকট।
লোকে খুব সিজারের বন্ধু হতে চায়; ফেসবুকে বা বাস্তব জীবনে।
এই বন্ধুত্বের আহ্বানে তো বিচলিত হওয়ার লোক সিজার নন। তিনিও তো বন্ধু তৈরি করতে চান। কিন্তু মুশকিলটা হলো, এই যারা বন্ধু হতে চায়, এর একটা বড় অংশ সিজারকে পেতে চায় মাশরাফি পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যম হিসেবে। তারা সিজারকে সিজার হিসেবে নয়, মাশরাফির ভাই হিসেবেই চিনতে চায়।
আরেকটা পক্ষ আছে, তারা সিজারের সঙ্গে বন্ধুত্বটা বড়াই হিসেবে ব্যবহার করতে চায়–মাশরাফির ভাই আমার বন্ধু। এই 'মিডিয়াম' হয়ে ওঠাটা একদম সহ্য হয় না সিজারের; কোনো মানুষেরই সহ্য হওয়ার কথা নয়। নিজেকে তাই লুকিয়ে রাখতে চান তিনি, 'আমি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েও ইলেকট্রনিকসের দোকানে ভাইয়ার খেলা দেখেছি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে চিৎকার করেছি। কিন্তু না পারতে কাউকে আমার পরিচয় দিতে চাই না। আমি সব জায়গাতে ভাইয়ার একজন সাধারণ ভক্ত হয়ে থাকতে চাই।'
৭.

বড় ভাই হিসেবে মাশরাফি কেমন?
এটা বলার জন্য সিজারই সবচেয়ে ভালো মানুষ। মাশরাফির সঙ্গে তার একটা দূরত্ব যেমন আছে। তেমনই জীবনের বিভিন্ন সংকটের সময়ে টের পেয়েছেন বড় ভাই কাকে বলে। সেটা জানা থেকে তারকা নয়, সাধারণ এক অভিভাবকে দেখতে পান সিজার।
এই বয়সী আর দশটা ছেলের মতো সিজারও দুষ্টুমি করেন। কখনো কখনো সে জন্য বাসায় বকাও খেতে হয়। সবচেয়ে ভয় পান, কোনো দুষ্টুমির খবর ভাইয়া না টের পেয়ে যায়। একবার একটা বড় ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। মাশরাফি তখন নড়াইলেই। মারাত্মক ভয় পেয়ে গেলেন সিজার–এবার না জানি কী হয়!
পুরো ঘটনাটা শুনলেন মাশরাফি। তারপর ডাকলেন সিজারকে।
দুই ভাইয়ের কী কথা হয়েছিল, তা সিজার জানান না। তবে এটা বলেন, 'যে ঘটনাটা শোনে, সে ভাবে, আমি অন্যায় করেছি। অন্যায় হয়তো করে ফেলেছি। কিন্তু কেন করেছি, কীভাবে করেছি; কেউ বুঝতে চায় না। একমাত্র ভাইয়াই ব্যাপারটা নিজে নিজে বুঝেছিল। আমি ভাইয়াকে কিচ্ছু বলিনি। কিন্তু দেখতে পেলাম, সে ঠিকই আসল ঘটনা বুঝে ফেলেছে।'
সেই থেকে মাশরাফির প্রতি শ্রদ্ধা আর ভয়টা আরও বেড়েছে।
এমনিতে ভালোবাসা পাওয়ার কখনো অভাব হয় না। দেশের বাইরে গেলেও ছোট ভাইয়ের জন্য কিছু একটা নিয়ে আসা, পুরস্কারে সবচেয়ে ভালো ফোনটা দিয়ে দেওয়া; এসব তো আছেই। প্রতিদিনের খোঁজ নেওয়া, অসুস্থ হলে একটু কপালে হাত রাখাটা তো আছেই।
তবে সিজার লাজুক মুখে জানান, আজ পর্যন্ত যেমন মাশরাফির চোখে চোখ রেখে কথা বলেননি, তেমনই কখনো অন্য ভাইয়েদের মতো জড়িয়ে ধরা, হ্যান্ডশেক করা; এসব হয় না। ভুল বললাম, একবার জড়িয়ে ধরেছিলেন মাশরাফি।
সেই গল্পটাই বলে দেবে দুই ভাইয়ের সম্পর্কটা।
মাশরাফির তখন দারুণ শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। নিয়মিত ইনহেলারটায় কাজ হচ্ছে না। নেবুলাইজ করাতে হবে। সবাই ছোটাছুটি করছে। শুয়ে থাকা মাশরাফির বিছানার পাশে গিয়ে বসেছেন সিজার। কথা বলছেন না, ভাইয়ার সমস্যা হতে পারে ভেবে। হঠাৎ শ্বাসকষ্টটা বাড়ল। মাশরাফি বিছানার ওপর উঠে বসে হাত দিয়ে সিজারের টি-শার্ট ধরে টান দিলেন। বুকে সিজারকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বড় কষ্ট, সিজার।'
বলেন আর কাঁদেন সিজার। চোখ থেকে পানি গড়াতে থাকে। চোখে পানি, মুখে হাসি; স্বর্গীয় দৃশ্য তৈরি করে বলেন, 'আমি সেদিন টের পেয়েছি, ভাইয়ার কাছে আমি কী।'

মাশরাফির নেশা



১.

সৈয়দ রাসেলের কথাটা শুনে মাথায় বাজ পড়ার মতো একটা অনুভূতি হয়েছিল। ঠিক শুনেছি কি না, বোঝার জন্য আবার প্রশ্ন করেছিলাম, 'কী বললেন!'

'ঠিকই বলেছি। আপনি ঠিকই শুনেছেন। মাশরাফির একটা নেশা আছে।'

নিজে প্রায় এক যুগ ধরে এই মানুষটাকে চিনি। তার জন্ম থেকে চেনেন, এমন ডজন খানেক লোকের সঙ্গে গল্প হয়েছে। কিন্তু মাশরাফির নামে এই অভিযোগ তো কখনো শোনা যায়নি!

আরও একটু ব্যাখ্যার জন্য রাসেলকে চেপে ধরতেই একগাল হাসলেন মাশরাফির এই ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ও দীর্ঘদিনের বোলিং পার্টনার, 'মাশরাফির নেশা হলো বন্ধুত্ব। মানুষ জীবনের প্রতিটা ধাপে নতুন নতুন নেশা করে; ও বন্ধুত্বের নেশা করে। যেখানে যায় বন্ধু তৈরি করে। বন্ধু ছাড়া একটা দিনও বাঁচতে পারবে না। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, ও সেই ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর যে জায়গায় যত বন্ধু তৈরি করেছে, সবগুলো সম্পর্ক ধরে

রাখে। এটা হলো বিস্ময়কর ব্যাপার।'

হ্যাঁ, মাশরাফির বন্ধুত্ব একটা বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে।

বন্ধু সবারই কমবেশি আছে। ফেসবুকের 'পাঁচ হাজার বন্ধু' ব্যাপারটার কথা বাদ দিলে; কারো বন্ধুসংখ্যা, রোজকার সম্পর্ক রাখা বন্ধুসংখ্যা দশের ওপরে যাওয়াটা খুব কঠিন। আসলে সমাজ গবেষকেরাই বলেন, একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার ওপরে মানুষের সঙ্গে 'ওয়ান টু ওয়ান ফ্রেন্ডশিপ' মানুষের পক্ষে ধরে রাখা সম্ভব না।

মানুষের মস্তিষ্কের গঠনই নাকি এমন যে, সে অধিক সংখ্যক মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখতে পারে না।

কিন্তু মাশরাফি তো সেই মানুষ, যিনি বহু আগেই চিকিৎসাবিদ্যাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছেন। মাশরাফি তো সেই মানুষ, যিনি বহু আগেই বইয়ে পড়া অনেক কথাকেই মিথ্যে প্রমাণ করেছেন। ফলে এই সমাজ গবেষকদের জন্য তিনি যে এক ব্যতিক্রমের উদাহরণ হয়ে থাকছেন, তাতে আর বিস্ময়ের কী আছে!

একেবারে সরলীকরণ করে আঙুল গুনতে বসলে আমরা আবিষ্কার করব, অন্তত দেড় শ জন বন্ধুর সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখেন মাশরাফি বিন মুর্তজা। শুনতে যতই অবিশ্বাস্য হোক, এটা খুবই সত্যি যে, এই বিশাল সংখ্যায় বন্ধুদের হাঁড়ির খবর, ঘরের খবর তার প্রতিনিয়ত জানা চাই; প্রতিনিয়ত ধারাবাহিকভাবে এই বিশাল বাহিনীর নানা অংশের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া চাই।

মাশরাফির বন্ধুদের সোজা কথায় চার ভাগে বিভক্ত করতে পারি আমরা–১. নড়াইলের ছোটবেলার বন্ধুরা, ২. মিরপুরে তৈরি হওয়া কৈশোরের বন্ধুরা, ৩. ঢাকায় পা রাখা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ক্রিকেটে তৈরি হতে থাকা বন্ধুরা এবং ৪. বিভিন্ন কর্মসূত্রে তৈরি হওয়া সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী বন্ধুরা।

এই চার বন্ধু দলের বাইরেও বিভিন্ন পেশা ও জীবনের বিভিন্ন ধাপে অসংখ্য বন্ধু তৈরি করেছেন। সে বন্ধু তো সবারই তৈরি হয়। তবে মাশরাফির সঙ্গে বাকিদের একটা বড় পার্থক্য হলো–তার পুরো দুনিয়া এক দিকে, আর এই বন্ধুজগৎ আরেক দিকে। বন্ধুদের জন্য ক্যারিয়ার ও জীবনের হেন কোনো সংকট নেই, যা সামলাতে হয়নি তাকে।

শেষ পর্যন্ত কোনো কিছুর জন্যই বন্ধুত্বের সঙ্গে আপস করেননি।

এর মধ্যে প্রথম তিন দলকে বলা চলে মাশরাফির জীবনের তিনটি অঙ্গ।

এদের কারো সঙ্গে তার কখনো বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়নি। কখনো মাসের পর মাস দেখা হয় না, কথা হয় না। কিন্তু এরপর প্রথম যেদিন দেখা হয়, তাদের পরস্পরকে দেখে চিৎকার করে উঠতে হয় না। কারণ, তারা যেন এক জায়গাতেই ছিলেন।

সবচেয়ে বিচিত্র ব্যাপার হলো, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করা এই ভিন্ন ভিন্ন বন্ধুর দলের সঙ্গে তার যে অনবরত আড্ডা চলে, সে আড্ডায় মাশরাফিকে দেখে এদের থেকে আলাদা করাটা অসম্ভব।

নড়াইলের বন্ধুদের সঙ্গে মাশরাফি অনায়াসে এক পেয়ারাগাছ তলায় বসে 'ডাসা পেয়ারা' খেতে খেতে লুঙ্গিটা একটু গুটিয়ে গ্রাম্য একজন যুবক হয়ে উঠতে পারেন। অবশ্য 'উঠতে পারেন' বললে মনে হয়, এটা তিনি চেষ্টা করে করেন; আসলে ওই মুহূর্তে তাকে দেখলে এটাই আপনি বিশ্বাস করতে বাধ্য যে, মাশরাফি এমনই।

তিনি নড়াইলের এই বন্ধুদের সঙ্গে এখনো রাতদুপুরে রাস্তায় বসে গান করার পরিকল্পনা করতে পারেন। পিকনিক করতে হলে কোন বাড়ির নারকেল চুরি করতে হবে, তা এখনো আবিষ্কার করেন। কিংবা এই বন্ধুদের সঙ্গে আদুল গায়ে এখনো তিনি চিত্রা নদীতে তুফান তুলতে পারেন।

আবার এই লোকটিই ক্রিকেটার বন্ধুদের সঙ্গে একেবারে ভিন্ন এক মেজাজে হাজির। এখানে মাশরাফিকে দেখলে বোঝা কঠিন, এই লোকটি জন্ম থেকে বুঝি পেশাদার ক্রিকেটের সঙ্গে পরিচিত। যে লোকটি কিছুক্ষণ আগেই নড়াইলে আদিরসাত্মক রসিকতা করে এসেছেন, তিনিই ক্রিকেটারদের আড্ডায় আবার কাটার আর সুইংয়ের পার্থক্য বোঝাচ্ছেন। আবার খানিক পরে ঝরঝরে ইংরেজিতে সাংবাদিকদের আড্ডায় এক পুরোনো স্কটিশ প্রবাদ শোনাচ্ছেন!

কোনো আড্ডায় বেমানান নন; সবচেয়ে বড় কথা কোনো বন্ধুর কাছে তিনি বড় নন।

এ ব্যাপারটা সবচেয়ে কৌতূহল জাগানোর মতো ব্যাপার। মাশরাফি বিন মুর্তজা অনেক বড় তারকা; বাংলাদেশের বিচারে মহাতারকা বটে। কিন্তু কোনো একটি আড্ডায় এ মানুষটিকে তার আড্ডার বন্ধুদের চেয়ে এক ইঞ্চি এগিয়ে থাকা বলে মনে হবে না। নিজে বলেন–আমি পানির মতো; আর আড্ডা হলো আমার পানির পাত্র!

কখনো কোথাও একটু অভিনয় করা, একটু উপদেশ দেওয়া কিংবা একটা জ্ঞানের কথা বলে বন্ধুদের চেয়ে এগিয়ে থাকা কোনোমতেই নয়। চিত্রা নদীর পাড়ে বসে তিনি ঠিকই বন্ধুদের টেমস নদীর গল্প শোনাবেন। সেই শোনানোর মধ্যে তাদের চেয়ে বেশি কিছু দেখে ফেলেছেন, এমন ব্যাপারটা নেই। বরং মনে হবে, এদের এক প্রতিনিধি লন্ডনে গিয়েছিল, যে নাকি এসে চোখ বড় বড় করে টেমস নদীর গল্প বলছে!

এই দেড়-দুই শ বন্ধু যে সার্বক্ষণিক মাশরাফির সঙ্গে ঘুরতে পারে না, সেটা বলে দিতে হবে না।

এর ভেতর থেকেই কেউ কেউ মাশরাফির সার্বক্ষণিক সঙ্গীও বটে। কেউ মাশরাফির চলার সঙ্গী, কেউ ঘোরার সঙ্গী, কেউ আবার সব ভরসার চূড়ান্ত ভরসা। পক্স হলে মাশরাফির মশারির মধ্যে পাওয়া যাবে এক বন্ধুকে, আইপিএল থেকে বিপুল টাকা এলে সেটা সামলাতে পাওয়া যাবে কোনো বন্ধুকে এবং ইনজুরিতে পড়ে ক্রাচের বদলে কাঁধে হাত দেওয়ার জন্য পাওয়া যাবে আরেক বন্ধুকে।

এক চলচ্চিত্রে কে যেন বলেছিলেন, 'কোনো দিন যেন কাঁধের অভাব না হয়।'

মাশরাফির জীবনে হয়তো অর্থের অভাব হবে, বিত্তের অভাব হবে, খ্যাতিরও কোনো এক দিন অভাব হয়ে উঠতে পারে; কাঁধের অভাব তার হবে না। বন্ধুত্বের মতো সর্বগ্রাসী নেশা যে করতে পারে, তার হাতের নিচে কাঁধের অভাব হয় কী করে!

২.

মাশরাফির জীবনে সবচেয়ে গুরুত্ব বন্ধুর ঝাঁক হলো নড়াইলে।

নড়াইল শহরটাই তো তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আর এই শহরের প্রতিটি প্রাণ, প্রতিটি গাছ-নদীর স্রোতই তো মাশরাফির বন্ধু। এর ভেতর মাশরাফির ভাষায় তাদের '৬১ জন'-এর একটা দল আছে।

আমরা যখন নড়াইল গেলাম, তখন অবশ্য মনে হলো সংখ্যাটা ৬১ নয়, ১০১ হবে বুঝি। সকাল থেকে রাত দুটো আড়াইটা অবধি বাড়ির সামনের দোকানের সামনে জমে আছে আড্ডা। সেখানে বেশ একটা আড্ডার জন্যই জায়গা তৈরি হয়েছে। সেই আড্ডায় মাঝে মাঝে মুখ বদলাচ্ছে। কিছু মুখ সব সময় স্থির হয়ে থাকছে। কিন্তু মাশরাফির বন্ধুদের সংখ্যা কমছে না।

এখনো ছুটি পেলে বাড়ি চলে যান। বাড়ি গিয়ে এই বন্ধুদের সাথে নিয়ে নদী পার হন সাঁতার কেটে। এদের সাথেই স্থানীয় আদিরসের আলোচনায় মাতেন একেবারে দক্ষিণী ভাষায়। রাতের বেলায় ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে আয়োজন হয় ফুটবল ম্যাচ। আবার কখনো বন্ধুদের সাথে মিলে স্থানীয় মসজিদের সংস্কারের কাজ শুরু করেন। আবার তাদের সাথেই জমে ওঠে পিকনিকের পরিকল্পনা।

আড্ডার এই বন্ধুদের অনেকেই আড্ডা ছাপিয়ে হয়ে উঠেছেন জীবনের অংশ। মাশরাফি অসুস্থ হলে এরাই কাঁধ বাড়িয়ে দেন; ক্রাচের বদলে কাঁধে ভর দেন মাশরাফি। অসুস্থ হলে মশারির ভেতরে শুয়ে এরাই গল্প করেন।

আমরা সব বন্ধুর নাম এটুকু জায়গার মধ্যে কী করে উল্লেখ করি। শুধু সার্বক্ষণিক সাথে থাকা মানস কুন্ডু, অসীম, রব্বি, তুষার, মিঠুন, পলাশ, অপূর্বদের কথা হয়তো একটু মনে করতে পারি। তবে সবচেয়ে বেশি করে মনে করা দরকার রাজু-সাজু দুই ভাইয়ের কথা। এর মধ্যে সাজু ছিলেন মাশরাফির স্কুলবন্ধু। একসাথে পড়েছেন। আর রাজু তার একটু বড়। কিন্তু কালক্রমে এই দুই ভাইয়ের সাথে বোধ হয় সবচেয়ে জমে উঠেছে মাশরাফির বন্ধুজীবন।

৩.

তখন কাকার বাসায় থাকেন। 'এ' দলের হয়ে ভারতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

মন ভালো লাগে না। শুধু ইচ্ছে হয়, বাড়িতে ছুটে যাই। বাড়িতে গিয়ে সাজু-রাজুদের সাথে আড্ডায় মেতে উঠি। মনটা ব্যাকুল হয়ে যায়—নদীতে এখন কি পানি বেশি, গাছগুলোর পেয়ারা কি পেকে উঠেছে?

রোজ কতশত খবর জানতে ইচ্ছে করে নড়াইলের।
খবর জানার জন্য একটা মোবাইলের মালিক হয়ে গেলেন মাশরাফি। তখন কার্ড থেকে এক মাসের মেয়াদে তিন শ টাকা রিচার্জ করার যুগ। তিন শ টাকা আজকের দিনে মোবাইলে অনেক টাকা। তখন খুব একটা বড় ব্যাপার ছিল না। এক মিনিট কথা বললেই ১০-১২ টাকা শেষ। মাশরাফির তো চাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলা, দিনের পর দিন কথা বলা।
অতএব প্রায় প্রতিদিন তার কার্ড চাই। কার্ডের জোগান দেওয়ার জন্য লোকও তো চাই। টাকা না হয় মাশরাফি দিলেন। কিন্তু কথায় কথায় তার বাসায় কার্ড পৌঁছে দেবে কে?
চাচার বাসার পাশেই, মিরপুরে 'সি' ব্লকের একটা দোকানে কার্ড কিনতে যেতেন মাশরাফি। দোকানের মালিক ছেলেটির সাথে এর মধ্যে একটু-আধটু পরিচয় হয়েছে। সেই ছেলেটিই সমাধান দিল, 'তোমার যখন কার্ড লাগবে, আমাকে মিসড কল দিও। আমি কার্ড পৌঁছে দেব। টেনশন নিয়ো না, আমি আছি।'
সেই কথাটাই রয়ে গেল–টেনশন নিয়ো না, আমি আছি।
হ্যাঁ, আজও মাশরাফিকে কোনো টেনশন নিতে হয় না। কার্ড থেকে সংসার, বাড়ি থেকে খেলার মাঠ; কোথাও মাশরাফির টেনশন বলে কিছু থাকতে পারে না। কারণ তিনি আছেন। তিনি মোহাম্মদ কাশিফ বাবলু।
বাবলুকে মাশরাফির বন্ধু বললে অনেক অনেক কম বলা হয়। বাবলু হচ্ছেন মাশরাফির ম্যানেজার, মাশরাফির গাইড। পথচলার প্রতিটি পদে মাশরাফির এই বন্ধুটিকে চাই। মাশরাফি নিজেই প্রায় বলেন, 'আমার মাঠে খেলাটা সহজ করে দেয় দুজন মানুষ–আমার স্ত্রী আর বাবলু। এই দুজন আমার যাবতীয় চাপ নিজেদের কাঁধে নিয়ে নেয়। ফলে আমি নির্ভার থাকতে পারি।'
বাবলু এই কথাটা শুনে হাসেন। তিনি এত কিছু ভেবে এই সার্বক্ষণিক মাশরাফির পাশে থাকেন না। তার ভাবনাটা খুব সরল, 'ও আমার বন্ধু। ও তারকা হবে ভেবে আমি বন্ধু হইনি। সাধারণ একটা ছেলে কৌশিকই আমার বন্ধু। বন্ধু হিসেবে আমার দায়িত্ব হলো, তাকে নিশ্চিন্ত রাখা। আমার যদি কখনো মনে হয়, এ ব্যাপারটা ওর চাপ হবে; সেই কাজটা আমি নিজে করে ফেলি। ও নিশ্চিন্ত থাকুক।'
বাবলু আর মাশরাফির রসায়নটা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু মিরপুর সাড়ে এগারোতে এর চেয়ে একটু বেশি; মাশরাফির স্বভাবসুলভ বিশাল একটা বাহিনীর রসায়ন আছে।
মিরপুরের সাড়ে এগারো এলাকার 'সি ব্লকে' এই জটলাটাও মাশরাফিকেন্দ্রিক। একজন নয়, দুজন নয়; জনা বিশেকের একটা বাহিনী আছে এখানেও। বাহিনী ছাড়া তো মাশরাফি চলতে পারেন না।
এই বন্ধু বাহিনীটাও তৈরি হয়েছিল ঢাকায় আসার পরপরই। বাহিনীতে সদস্যসংখ্যা কখনো বেড়েছে, কখনো কমেছে। এখনো শামীম, কবির, সাকিল, আল আমিন,

বাবু, রাসেল এ রকম অনেকেই আছেন; যারা রোজকার বন্ধু। এখন হয়তো আগের মতো রোজদিন আর আড্ডা জমে ওঠে না। রোজদিন আর আগের মতো গভীর রাত পর্যন্ত রাজা-উজির মারা হয় না। কিন্তু একটু বৃষ্টি পড়লে...

ওহ হো। বৃষ্টি পড়ুক আর না-ই পড়ুক; মাঝেই মাঝেই খিচুড়ি আর পিকনিকটা কিন্তু চাই-ই চাই!

৪.

ক্রিকেটেও সেই একই কথা।

মাশরাফির বন্ধু ছাড়া শত্রু কে? শত্রু খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এখানে সবাই বন্ধু। আজকাল অবশ্য ক্রিকেটে তার বন্ধুর চেয়ে ছোট ভাই বেড়ে গেছে। কিন্তু রয়ে গেছে সেই অনূর্ধ্ব-১৭ থেকে শুরু হওয়া নানা পর্যায়ে পাওয়া বন্ধুরা। সেই নাফীস ইকবাল, মোহাম্মদ শরীফ, তালহা জুবায়েররা আছেন। সেই বয়সে বন্ধুত্ব হয়ে পরে দারুণ ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন মোহাম্মদ আশরাফুলের সাথে। কিন্তু এখন সে বন্ধুত্বে দেয়াল তৈরি করেছে মাশরাফির নৈতিকতা।

পরে জাতীয় দলে এসে প্রতিটা ধাপে অজস্র বন্ধু তৈরি করেছেন। দেশে যেমন সবাই বন্ধু; বিদেশে যুবরাজ সিং, ইরফান পাঠানের মতো ঘনিষ্ঠ বন্ধু তৈরি হয়েছে। তৈরি হয়েছে দেশে তাপস বৈশ্য, অলকদের মতো বন্ধু। তবে সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন দুজন–রাজ্জাক ও রাসেল।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট পরিমণ্ডলে মাশরাফি, রাজ্জাক, রাসেলকে ত্রিমূর্তি বললেও কম বলা হয়।

একটা সময় ছিল তিনজন পরস্পরকে ছাড়া কিছু কল্পনাও করতে পারতেন না। জাতীয় দল আর খুলনায় রোজ একসাথে খেলছেন। একসাথে রাতে ঘুমাচ্ছেন এবং দুষ্টুমি করে বেড়াচ্ছেন। এই তিনজনের অনেক দুষ্টুমি জাতীয় দলে এখনো গল্প হয়ে আছে। আজ তিনজনের পথ তিন দিকে বেঁকে গেছে।

মাশরাফি ফোন করে করে খবর নেন, 'রাজ, বন্ধু কী খবর?'

এই খবর নেওয়ার পালা চলে।

অজানা ভবিষ্যৎ



১.

সাল ২০০৯।

আগে থেকেই অ্যাপয়েনমেন্ট করা ছিল ডা. ডেভিড ইয়াংয়ের সঙ্গে।

দরজা ঠেলে ঢুকতেই চেনা হাসিটা উপহার দিলেন ডক্টর ইয়াং। প্রথম প্রশ্নটাই করলেন, 'এখন কী করছ?'

মাশরাফি একটু অবাক হয়ে বললেন, 'কেন! ক্রিকেট খেলছি।'

এবার ডা. ইয়াংয়ের অবাক হওয়ার পালা। চোখ বড় বড় করে বললেন, 'আমার সঙ্গে রসিকতা করো না। আসলে কী করছ? ব্যবসা? নাকি চাকরিবাকরি।'

'আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। ব্যবসা করব কেন? ক্রিকেট খেলছি। এবারও তো ক্রিকেট খেলতে গিয়েই ইনজুরিতে পড়েছি।'

ডা. ইয়াং বজ্রাহতের মতো বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তার কোনো হিসাব মিলছে না। একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। ২০০৩ সালে তোমার হাঁটুতে যখন তিন নম্বর অপারেশন করলাম, তারপর তখনই তোমার খেলা ছেড়ে দেওয়ার কথা।

আমি এত বছরের জীবনে তিনবার হাঁটু ওপেন করার পর কাউকে খেলতে দেখিনি। তুমি কি একটা মিরাকল!'

হ্যাঁ, ডা. ডেভিড ইয়াং সেই তিনটি অপারেশন করার পরই বলেছিলেন, মাশরাফি একজন মেডিকেল মিরাকল। এরপর থেকে প্রতিটি বছর গড়িয়েছে আর ডক্টর ইয়াং এই কথা জোরেশোরে বলেছেন। এরপর গুনে গুনে আরও ছয়টা অপারেশন করেছেন তিনি মাশরাফির। এর মধ্যে তার হাঁটুতেই সব মিলিয়ে আটটা অপারেশন করেছেন। দিনকে দিন তার এই বিশ্বাস আরও শক্ত হয়েছেন–চিকিৎসাবিদ্যার কোনো স্বাভাবিক হিসাবে মাশরাফিকে মেলানো সম্ভব না।

এ নিশ্চয়ই অতিলৌকিক কিছু।

তিনটি অপারেশনের পরই যেখানে লোকেদের অবসরে চলে যাওয়ার কথা, সেখানে মাশরাফি দুহাতে আটটা অপারেশন এবং গোড়ালি, পিঠে আরও দুটো অপারেশন নিয়ে এখনো ক্রিকেট খেলে যাচ্ছেন!

তবে হাজার হলেও শরীরটা একটা মানুষের।

তাই এই জোড়াতালি দিতে থাকা শরীরটা একদিন ধসে পড়বেই। এই এবারও যখন বিশ্বকাপের সময় ডক্টর ডেভিড ইয়াংয়ের সঙ্গে দেখা হলো মাশরাফির, তিনি বুঝিয়ে বলেছেন–সেই সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই যে অতিমানবীয় অত্যাচার শরীরের ওপর; এর একটা ফল অপেক্ষা করছে মাশরাফির জন্য।

সেই ফলটা সম্ভবত, জীবনের একটা বড় সময় প্রায় অচল হয়ে কাটাতে হবে তাকে। আরও নিষ্ঠুরভাবে বললে বলতে হয়, একটা হুইলচেয়ার অপেক্ষা করছে হয়তো মাশরাফির জন্য।

২.

মাশরাফির ইনজুরি, চোটের ইতিহাস ঘাঁটতে গেলে আমরা সেই ছোটবেলায় ফিরে যাব।

সেই যে তিনতলা থেকে পড়ে হাসপাতালে যাওয়া, সেটা নিশ্চয়ই প্রথম উল্লেখযোগ্য আঘাত ছিল। এরও আগে তিন বছর বয়সে পাওয়া গিয়েছিল সেই গাছের শিকড়ে বেঁধে পড়ে হাত কেটে ফেলার ঘটনা। তবে ছোটবেলায়ই লিচুগাছ থেকে পড়ে যাওয়ার একটা ঘটনা আমরা দেখতে পাই; সেটাকে প্রথম ইনজুরি বলা চলে।

ছাদ থেকে পড়ে কেটে-ভেঙে না গেলেও লিচুগাছ থেকে পড়ে সেবার শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে। সেবারের ঘটনাটায় সঙ্গী ছিলেন সাজু। তখন ক্লাস সিক্স কি সেভেনে পড়েন তারা।

ঘটনাটা তেমন কিছু নয়। চিত্রা নদীর ওপরে একটা গাছে চমৎকার মিষ্টি লিচু হয়; রসগোল্লা ফেল। সেদিন ঠিক দুপুর বেলায় কৌশিক আর সাজু ঠিক করল, ওই লিচু পাড়তে যেতে হবে। 'স্পাইডারম্যান' সাজু আগে তরতর করে বেশি দূর উঠে

গেছে। একটু ওপরের দিকে বড় বড় লিচু থাকে।

সাজু হাতের নাগালে সেই রসগোল্লার সাইজের লিচুগুলো পেয়ে গেছে। কিন্তু কৌশিকের এদিকটায় ছোট ছোট লিচু; খেয়ে মজা হচ্ছে না। চোখ গেল মগডালের দিকে। একেবারে ওপরে একটা সরু ডাল আড়াআড়ি দূরে চলে গেছে। ওটার মাথায় একেবারে নারকেলের সাইজের যেন এক একটা লিচু ঝুলে আছে।

কৌশিক বলল, 'সাজু, আমি ওই ডালে যাই।'

সাজু ডালটা দেখে একটু ভয় পেল, 'ডালটা চিকুন রে। ভাঙতি পারে।'

'ভাঙবে না। তুই এট্টু পা দিয়ে নাড়া দিয়ে দ্যাখ, নরম নাকি।'

সাজু ওপরের ডালে বসা; সেখান থেকে ডালটা নাড়া দিয়ে দেখল–মন্দ না।

এবার কৌশিক এগোনো শুরু করল। সেই নারকেল সাইজের লিচুগুলো প্রায় হাতে চলে এসেছে। এমন সময় পেছনে মট করে একটা আওয়াজ হলো; তারপর আর কিছু মনে নেই।

সাজু তো গাছে বসেই অজ্ঞান হয়ে যায় আর কী। কোনোক্রমে পড়িমরি করে নিচে নেমে দেখে কৌশিকের বুকটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। এখন কী হবে? এর মধ্যে ডাল ভাঙার শব্দে ওদিকে কারা যেন ছুটে আসছে। সাজু নিচু হয়ে বলল, 'কৌশিক উঠতি পারবি?'

বুকটা জ্বলে যাচ্ছে, ডান হাতটাও কেমন যেন নাড়ানো যাচ্ছে না। তারপরও উঠতি তো হবেই। সাজুকে শুধু বলল, 'গাছের ওপাশে দেখ, আমার জামা আছে। ওইটা নিয়ে চল।'

ওই অবস্থায় দিল ছুট। ওই অবস্থায় এক হাতে ভর করে নদী সাঁতরে পার হলো। ওরা টেরও পেল না, সাঁতরে পার হতে থাকা মাশরাফির পেছন পেছন পানিতে একটা লাল স্রোত তৈরি হলো; বুক থেকে রক্ত বের হচ্ছে।

এপাশে এসে রক্তের ধারা দেখে দুজনে একটু ভয় পেয়ে গেল। বাড়িতে দেখলে খবর আছে। কিছু জংলি লতাপাতা আর ঘাস এনে ক্ষততে দিয়ে রক্ত বন্ধ করল দুজন। এবার ওপরে জামাটা গলিয়ে ভদ্রছেলের মতো বাসায়।

বাসায় গিয়ে একটু বেশিই ভদ্র হয়ে গেল। জামা আর খুলছে না। খাওয়া, গোসল করা; সব সময় কৌশিক জামা পরা। জিজ্ঞেস করলে বলে, 'ঠান্ডা তো।'

আসলেই তখন ঠান্ডা লাগছে। কারণ ভেতরে জ্বর চলে এসেছে। সন্ধ্যাবেলা বইয়ের সামনে বসেই কেমন যেন চোখ জড়িয়ে এল। বিছানায় শুয়ে পড়ল। নানি এসেছিলেন তাড়া দেবেন বলে। কিন্তু গায়ে হাত দিয়েই দেখেন প্রচন্ড জ্বর। কাত হয়ে শুয়ে থাকা কৌশিককে ঘুরিয়ে দিতেই খেয়াল করলেন জামার ওপর, বুকের কাছে রক্তের ছোপ।

আবিষ্কার হয়ে গেল কাণ্ড। সেই বলা যায় ইনজুরি প্রথম বিছানায় ফেলল মাশরাফিকে।

৩.

আমাদের হিসাব বলছে ঢাকায় আসার পর থেকে ক্রিকেট খেলা, অনুশীলন, বাসায় ও পুনর্বাসনের সময় সব মিলিয়ে ছোট-বড় ১২টি ইনজুরির শিকার হয়েছে মাশরাফি। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল এতবার হাঁটুটা খোলা। দফায় দফায় হাঁটু খুলে লিগামেন্টে এই অপারেশন করতে গিয়ে ভয়ংকর কিছু ক্ষতি স্থায়ীভাবে হয়ে গেছে মাশরাফির।

আসলে ক্ষতিটা শুধু আর হাঁটুতে সীমাবদ্ধ নেই।

মাশরাফির শরীরের কী অবস্থা, এটা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বিসিবির প্রধান চিকিৎসক ডক্টর দেবাশিস চৌধুরী একটা ইংরেজি প্রবাদ উচ্চারণ করলেন—আ চেইন ইস অ্যাস স্ট্রং, অ্যাস ইটস উইকেস্ট লিংক; একটা চেন ততটাই শক্ত, যতটা তার দুর্বলতম সংযোগটা শক্ত!

এখন এটা মোটামুটি দেশবাসীর জানা কথা যে, মাশরাফির শরীরের দুর্বলতর দুটি সংযোগ হলো হাঁটু। ফলে তার শরীরের বাকি সংযোগগুলোও এই দীর্ঘ সময়ে ওই হাঁটুর মতোই বা তার কাছাকাছি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। এটা কেন হয়, বোঝাতে গিয়ে ডা. দেবাশিস আমাদের কিছু মৌলিক কথাও বললেন, 'আসলে শরীরে এত বড় একটা আঘাত যখন থাকবে, তখন আপনার মস্তিষ্ক চেতনে বা অবচেতনে ওই আঘাতের জায়গাটাকে নিরাপদ রাখতে চাইবে। ফলে সে কী করবে, শরীরের ভর ও চাপ ওই হাঁটু দুটো থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে দিতে চাইবে। মানে, আপনার ডান হাঁটুতে ব্যথা থাকলে, আপনি বাঁ পায়ে ভর দিয়ে সব করতে চাইবেন; বাঁ পাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এবার দুটো হাঁটু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর আপনি ভরটা গোড়ালিতে বেশি দিতে চাইবেন; সে দুটোও যাবে। এরপর এমন সব জায়গায় ভর দেওয়ার চেষ্টা করবেন, যেখানে ভর দেওয়ার কথাই নয়। মাশরাফির ক্ষেত্রে গত কয়েক বছর সেটা হচ্ছে। সে হাঁটু ও গোড়ালির ভর শরীরের বিচিত্র সব জায়গায় ছড়িয়ে দেয় খেলার সময়। সেসব জায়গা কোনো চাপ নিতে তৈরি ছিল না। ফলে শরীরের বাকি সংযোগগুলোও মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত এখন। সোজা কথায়, তার পুরো শরীর এখন হাঁটুর মতো হয়ে গেছে!'

ডক্টর দেবাশিসের এই কথাই বুঝিয়ে দিতে পারে, আসলে মাশরাফির শরীরটা কয়েক বছর ধরে ঠিক কী অবস্থায় মাঠে ছোটাছুটি করছে।

শুধু হাঁটুর প্রসঙ্গে যদি আমরা আসি, তাহলে দেখতে পাব, দুই হাঁটুতে সাতটি অপারেশন। সবগুলো অপারেশনের চরিত্র যে ঠিক একই রকম, তা নয়। কোনোটাতে নতুন করে লিগামেন্ট বসাতে হয়েছে, কোনোটাতে হাঁটু খুলে লিগামেন্ট চেপে দিতে হয়েছে। কিন্তু মৌলিক সমস্যা দুই হাঁটুতে একই—এন্টিরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট (এসিএল) ছেঁড়া ও পুনর্গঠিত।

এই লিগামেন্টটিকে বলা যায়, একেবারে হাঁটুর কেন্দ্রে থাকা দড়ি, যা পায়ের ওপর ও নিচের হাড়কে বেঁধে রাখে। এর পাশে আরও কয়েকটি লিগামেন্ট আছে। তবে

এই মূল লিগামেন্টটিই আসলে প্রধান দড়ির কাজ করে। আর মাশরাফির ক্ষেত্রে দুই পায়েই এই লিগামেন্টটা ছেঁড়া, পরে জোড়া দেওয়া।
এতে সমস্যা কী?
আমরা আবারও দেবাশিস চৌধুরীর স্মরণ নেই। তিনি মাশরাফির প্রায় প্রতিটা ইনজুরিই দেখেছেন, বিকেএসপিতে থাকা অবস্থা থেকে শুরু করে দেখছেন এই পেসারকে। তিনি বলছিলেন, 'এসিএল একবার পুনর্গঠন করা (জোড়া দেওয়া) হলেও হাঁটুটা নড়বড়ে থেকে যাবেই। আর ওর তো তিনবারের বেশি করে জোড়া দেওয়া হয়েছে। এই নড়বড়ে ব্যাপারটা খুব সামান্য, কয়েক মিলিমিটার মাত্র। কিন্তু মানুষের শরীরের জন্য এই কয়েক মিলিমিটার মহা ব্যাপার। এই নড়তে থাকার ফলে মানুষের পুরো চলাফেরা অনিশ্চিত হয়ে যায়, মানে সে এক অনিশ্চয়তার অনুভূতি নিয়ে হাঁটাহাঁটি করে। সে জানে না, পরের ধাপটায় সে সঠিক জায়গায় পা ফেলতে পারবে কি না, কারণ হাঁটু সামান্য দুলে যেতে পারে। এক প্রবল নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চয়তার অনুভূতি নিয়ে তাকে চলাফেরা করতে হয়।'
এই অনুভূতির পাশাপাশি এসিএল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পুরো হাঁটুটাই কার্যত আস্তে আস্তে ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে। এসিএলের জন্য নড়তে থাকা হাঁটুর কল্যাণে হাঁটু সামান্যতেই মোড় খেয়ে যায়, ঘুরে যায়। তখন বাইরের দিকে থাকা লিগামেন্টগুলো ছেঁড়ে বা আঘাত পায়। এর পাশাপাশি বারবার এই অস্ত্রোপচারে হাঁটুর নিচের দিকে অংশের ওপরে থাকা মিনিসক্লাস নামে নরম অংশটি কমে আসতে থাকে, যা হাঁটুর ঘর্ষণে হাড়ের ক্ষয় প্রতিরোধ করে। এর ফলে শুরু হয় সরাসরি হাড়ের ক্ষয়; যেটা মাশরাফির শুরু হয়ে গেছে।

৪.

মানুষের সকাল হয় সূর্যের হাসির সঙ্গে হাসি মিলিয়ে। আর মাশরাফির সকালটা হয় প্রতিদিন এক যন্ত্রণার অনুভূতি দিয়ে।
রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই যে ব্যাপারটা টের পান, তা হলো হাঁটু থেকে শুরু করে দুটো পা প্রায় অবশ হয়ে আছে। সরাসরি খাট থেকে নেমে পড়ার উপায় নেই। আস্তে আস্তে শুরু করতে হয় ম্যাসাজ। করতে করতে একসময় অনুভূতিটা ফিরে আসে। এরপর খাট থেকে নেমে একটা-দুটো করে পা বাড়ানো। একটু একটু করে চলার শক্তি ফিরিয়ে আনা।
প্রতিনিয়ত এভাবে নিজেকে নতুন করে তৈরি করে দিনটা শুরু করতে হয় মাশরাফিকে।
এ তো স্বাভাবিক একটা দিনের কথা গেল। খেলার দিনটায় প্রস্তুতিটা আরও অনেক বেশি। সেদিন হোটেল থেকে বেরোনোর আগেই করতে হয় টেপিং। টেপিং ব্যাপারটা হলো একধরনের টেপ দিয়েই দুটো হাঁটুকে শক্ত করে মুড়ে ফেলা। যাতে সেটা আর নড়তে না পারে। এরপর দুটো হাঁটুতে পরতে হয় কৃত্রিম 'নি ক্যাপ'।

যাতে খানিকটা হলেও হাঁটুর অনুভূতি থাকে।
আর এই বর্মটর্ম পরে আসতে হয় মাঠে।
মাশরাফির এই নিত্যদিনকার প্রস্তুতি সম্পর্কে ডা. দেবাশিস বলছিলেন, 'আসলে সকাল বেলায় যেটা হয়, একটা বড় সময় ধরে অসক্রিয়তার ফলে পেশি ও নরম টিস্যুগুলো শক্ত হয়ে যায়। এটা সাধারণ মানুষেরও হয় দেখবেন। যে জন্য ঘুম থেকে উঠে মানুষ শরীরের চলাচলটা একটু ঠিক করে নেয়। এখন যার হাঁটু দুটো, গোড়ালিগুলোর নরম টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত; প্রতিটা সকালই তার জন্য যন্ত্রণাময় হবে। এমন নয় যে, রাতের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। মাশরাফি যদি কখনো দুপুরে ঘুমিয়ে পড়ে বা অনেকক্ষণ ধরে এক জায়গায় বসে থাকে; তাহলেও তার একই ঘটনা ঘটবে। রাতে যেহেতু এই অসক্রিয়তাটা সবচেয়ে বেশি সময় ধরে চলে, তাই সকালে ধাক্কাটা প্রতিদিন বেশি যায়।'
কথায় কথায় ম্যাচের আগের প্রস্তুতির অংশটা আসল। সেটাও ব্যাখ্যা করলেন এই চিকিৎসক। তিনি একটা জিনিস পরিষ্কার করলেন, শুধু ম্যাচের আগের ওই প্রস্তুতিই যথেষ্ট নয়, ম্যাচের সময়ও হিসাব করেই চলতে হবে এ রকম একজন খেলোয়াড়কে। তাকে বুঝতে হবে, তার জন্য কোনটা সঠিক।
আরেকজন খেলোয়াড় যে কাজটা পারবে, সেটা সে পারবে কি না। আর এখানেই গুরুতর প্রশ্নটা। মাঠে কি এত হিসাব করে ক্রিকেট খেলা যায়?
এই প্রসঙ্গে কথায় কথায় হাবিবুল বাশার বলছিলেন, মাশরাফির সব সতর্কতা বা হিসাব-নিকাশ মাঠের বাইরে। মাঠে সে যখন পৌঁছে গেল, তার সঙ্গে আর একজন খেলোয়াড়ের কোনো পার্থক্য নেই। বরং তার কাছে মাঝে মাঝে মনে হয়, মাশরাফি অন্য অনেক খেলোয়াড়ের চেয়ে মাঠে ঝুঁকিপূর্ণ লাফঝাঁপ এখনো হয়তো বেশিই দেন।
তবে ডা. দেবাশিস বলছিলেন, 'মাশরাফির এই দীর্ঘ ইনজুরির অভিজ্ঞতা ওর মস্তিষ্কে একটা ম্যাপ তৈরি করে দিয়েছে। ও জানে এখন বোকামো আর সাহসিকতার মধ্যে পার্থক্য কী। ও মাঠে সাহসী, তবে বোকা নয়। আর এ জন্যই সে এই বিস্ময়করভাবে খেলে যেতে পারছে।'

৫.
লিগামেন্টের ইনজুরিটা কোথায় হয়?
ডা. দেবাশিস হেসে বললেন, শরীরে যত বেশি হয়, মনে তার চেয়ে অনেক বেশি। এই ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করা দরকার। লিগামেন্টের ইনজুরি আসলে মানুষকে একধরনের নিরাপত্তাহীন করে দেয়; বিশেষ করে হাঁটুর লিগামেন্ট। কথায় বলে–মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টায় থাকে। সেই পায়ের ওপর মানুষ আর আস্থা রাখতে পারে না।
আপনি যখন নিজের পায়ের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবেন, তার চেয়ে ভয়ংকর

ব্যাপার আর হতে পারে না। এই অবিশ্বাসের জায়গাটা একটু ব্যাখ্যা করলেন চিকিৎসক মহোদয়, 'ওই যে এক-দুই মিলিমিটার হাঁটু সরে যায়, এর ফলে মানুষ অনুমান করতে পারে না, লাফ দিলে পা কোথায় পড়বে। হয়তো ঠিক থাকবে, হয়তো থাকবে না। আপনি যখন বাস থেকে নামবেন, আপনি এই ভয় পাবেন না যে, আমার হাঁটু প্রতারণা করবে না তো! কিন্তু যার লিগামেন্ট শক্ত নয়, সে ওভাবে নামতেই পারবে না; ভয় পাবে। এখানেই মাশরাফির শ্রেষ্ঠত্ব–সে এই পর্বটা জয় করেছে।'

এই মানসিক চ্যালেঞ্জটা জয় করাই মাশরাফির মেডিকেল মিরাকলের মূল রহস্য বলে মনে করেন চিকিৎসকেরা।

লিগামেন্ট ইনজুরির পর দুই ধরনের অ্যাথলেট আর কখনোই মাঠে ফিরতে পারে না–অতি সাহসী বা বোকা এবং ভীরু। এর ব্যাখ্যাটা পরিষ্কার। অতি সাহসীরা এই হিসাব-নিকাশকে মাথায় না নিলে কিছু একটা করে ফেলতে গিয়ে একেবারেই শেষ করে দেয় নিজেকে। আর ভীরুরা ভয়ে আর এ পথে পা বাড়াতে পারে না। মাশরাফিকে হতে হয়েছে অত্যন্ত সাহসী হিসেবে।

তাকে প্রতিটি অপারেশনের পর আরও বেশি ঝুঁকি আরও বেশি ভয় মাথা থেকে তাড়াতে হয়েছে। আবার অবচেতনে সতর্কতাটা ধরে রাখতে হয়েছে।

৬.

মাশরাফির কী হবে ভবিষ্যতে?

একটা ধারণা জনমনে আছে যে, মাশরাফি একসময় পঙ্গু হয়ে যাবেন, হুইলচেয়ারে জীবন কাটাতে হতে পারে তার। প্রথমেই নিশ্চিত করা যাক, এত ভয়ংকর কোনো সময় আসবে, চিকিৎসাশাস্ত্র তা মনে করে না। মাশরাফিও মনে করেন না।

হ্যাঁ, দুই ধরনের ঝুঁকি মাশরাফির আছে।

প্রথমত নতুন করে আবার যদি ইনজুরি হয়, সেটা যেকোনো সময়ে, তাহলে ভবিষ্যৎ আসলেই খারাপ হতে পারে। এখন যেহেতু আমরা ওপরের আলোচনা থেকে বুঝতে পারছি যে, প্রতিদিন মাশরাফির হাঁটুর ও দেহের অন্যান্য অঙ্গের ঝুঁকি বাড়ছে, তাই যেকোনো সময় ইনজুরির ঝুঁকি তার প্রথম ইনজুরির পর থেকে চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়েছে। ফলে এই নতুন ইনজুরির ঝুঁকি এবং তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি তো থাকছেই।

আরেকটা সম্ভাবনা বা আশঙ্কা হলো, খেলা ছাড়া পরে অসহনীয় ব্যথা ও হাঁটু-গোড়ালির কার্যকারিতা কমে যাওয়া। এই সম্ভাবনা অনেক বেশি। তার কারণ হলো, এখন খেলা চলা অবস্থায় মাশরাফি প্রতিদিন শরীরের যে যত্ন নিচ্ছেন, সেটা না নিলে আস্তে আস্তে আরও অকার্যকর হয়ে যেতে পারে পা দুটো। সে ক্ষেত্রে অচলাবস্থার আশঙ্কা থাকে।

এই আশঙ্কা মাশরাফি দূর করতে পারেন। তবে সে ক্ষেত্রে খেলা ছাড়ার পরও

খেলোয়াড়দের মতো নিয়মিত শরীরের যত্ন নিতে হবে।

তবে এরপরও মাশরাফির যন্ত্রণা থাকবে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু, গোড়ালি, এমনকি পিঠে ব্যথা বাড়তে থাকবে। এ ব্যাপারটা যে ভঙ্গিতে হবে, তাকে লোকে 'বাত ব্যথা' বলে চেনে। বলা ভালো, এই ব্যথা বছর দুয়েক ধরে মাশরাফির শুরু হয়ে গেছে।

কেন এটা হয় এবং হবে, সেটা বলছিলেন ডা. দেবাশিস, 'মানুষ মাত্রেই এই ব্যাপারটা ঘটে–হাড়ের ক্ষয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের ক্ষয় হতে থাকে। এখন মুশকিল হলো, মাশরাফির ক্ষেত্রে এই ক্ষয়টা আগেই হয়ে গেছে বা যাচ্ছে। অন্যদের যখন ক্ষয় হয়, তখন ওর হাড়ের বিভিন্ন সংযোগস্থলে ক্ষয়ের চূড়ান্ত হয়ে যাবে। ফলে যেকোনো বৃদ্ধ মানুষের মতো যন্ত্রণা ওর শুরু হবে খুব অল্প বয়সেই। এটা একটা অবধারিত প্রক্রিয়া ওর জন্য।'

এ ক্ষেত্রে করণীয় কী আছে?

ডা. দেবাশিস খুব আশাবাদী মানুষ। অনেক আশার কথা শোনালেন। এমনকি হাঁটু প্রতিস্থাপন করে ফেলার সম্ভাবনা দিয়েও চেষ্টা করলেন ব্যাপারটা সমাধান হয় কি না। শেষ পর্যন্ত বললেন, 'এই ব্যথা থেকে আসলে ওর মুক্তি নেই।'

আচার্য মাশরাফি, আশ্চর্য মাশরাফি



১.

ছোট্ট ঘরটায় ছোট্ট একটা জানালা।

জানালা ছোট হলেও তাকালে চোখে পড়ে বিশাল একটা আকাশ। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটু নিচের দিকে তাকাতে চোখে পড়ল বিলাসবহুল একটা বাড়ি। সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, 'আপনি চাইলে ও রকম একটা বাড়ির মালিক থাকতে পারতেন।'

চোখটা আকাশ থেকে না নামিয়েই হাসলেন তিনি।

ঠোঁটে বাঁকা হাসিটা ঝুলিয়েই আঙুল দিয়ে দূরের রাস্তা দেখালেন। রাস্তার পাশে পলিথিনের তাঁবু খাটিয়ে একটা পরিবার থাকে বুঝি। ফুটপাতের ওপর সেই পরিবারের একটা বাচ্চা দৌড়ে বেড়াচ্ছে। হেসে বললেন, 'ওই বাড়িটাই শুধু চোখে পড়ল? ফুটপাতের ওই মানুষগুলোকে দেখলেন না! আল্লাহ চাইলে ও রকম জায়গায়ও থাকতে পারতাম।'

একটু বিরক্তি লাগল; আমি কী বলতে চাইছি, তিনি কি বুঝতে পারছেন না!

অসহিষ্ণু হয়ে বললাম, 'তা নয়। আমি বলতে চাচ্ছি, আপনার যে সামাজিক

মর্যাদা, তাতে আপনার আরও ধনী থাকার কথা ছিল। আপনার জুনিয়র অনেক ক্রিকেটার আপনার দশ গুণ ধনী।'

মাশরাফি ভ্রু কুঁচকে বললেন, 'আমার সিনিয়র অনেক মানুষ যে আমার চেয়ে দশ গুণ গরিব, সে খেয়াল আছে? শুধু ধনীদের হিসাব করেন কেন! হিসাবের নেশা খুব খারাপ।'

এই হলেন মাশরাফি বিন মুর্তজা।

মাশরাফি বিন মুর্তজা একটা দর্শনের বইয়ের মতো। আপনি পাতা উল্টাতে থাকলে, চোখ বোলালে মনে হবে–সরল সোজা, এক লহমাতেই বুঝে ফেলা যাবে। বাংলায় লেখা, না বোঝার কোনো কারণ নেই। এবার পড়তে শুরু করুন; লাইনে লাইনে নতুনত্ব, অধ্যায়ে অধ্যায়ে তার নতুন নতুন ভাবনা। সে ভাবনাকে দূর থেকে দেখা সহজ, সরল, খ্যাপাটে মাশরাফির সঙ্গে কিছুতেই মেলাতে পারবেন না। কেবলই মনে হবে–এ এক অচেনা ভুবনে যাত্রা করেছেন বুঝি।

চেনা আলোর কতশত অচেনা রূপ!

অধুনা, বলা ভালো মাশরাফি অধিনায়ক হওয়ার পর থেকে প্রায় প্রতিনিয়ত নানা কারণে মাশরাফির এসব অদেখা রূপ সামনে চলে আসছে। সেগুলো নিয়ে অনেকে অনেক সুন্দর সুন্দর লেখাও লিখছেন। সংবাদ সম্মেলনের এই মাশরাফিকে একেবারে পাশ কাটিয়ে তার জীবনালোচনা কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।

আসুন, একবার ফিরে দেখি সংবাদ সম্মেলন মঞ্চের মাশরাফিকে।

২.

সংবাদ সম্মেলনের মঞ্চটা আসলে একটা রঙ্গমঞ্চ।

কেউ এখানে এসে অভিনয় করে চলে যান। কেউ আবার নিজেকে উজাড় করে দেন ছোট টেবিলটার সামনে বসে। কেউ হাসেন, কেউ কাঁদেন; কেউ হাসান, কেউ কাঁদান।

সংবাদ সম্মেলনের মঞ্চে এই হঠাৎ করেই বৃহত্তর পরিসরকে এনে হাজির করে মাশরাফি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিশ্বকাপের সময়।

দুটো বিষয় খুব তীব্রভাবে আলোচনায় নিয়ে এলেন। প্রথমত বাংলাদেশের ক্রিকেটে সাংবাদিকদের অবদান এবং দর্শকদের হঠাৎ করে ফুটবল ছেড়ে ক্রিকেটে চলে আসা।

এর কোনো কথাই খুব নতুন ছিল না। কিন্তু আলোচনার ভঙ্গি বলে দিল, এ এক অচেনা মাশরাফি।

সংবাদের জন্য ছুটতে থাকা সংবাদকর্মীদের কখনো কখনো খেলোয়াড়দের বিরক্তিতে পরিণত হতে হয়। খেলোয়াড়দের অপ্রিয় কথা, অপ্রিয় প্রশ্ন, অপ্রিয় লেখাও লিখতে হয়। তারপরও খেলোয়াড়েরা সাংবাদিকদের বা সংবাদমাধ্যমকে কীভাবে দেখেন?

প্রশ্নটা বিশ্বকাপের সময় খুব আলোচনায় এল ভারতীয় তারকা বিরাট কোহলি এক সাংবাদিকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করায়। পরোক্ষভাবে প্রশ্নটা মাশরাফি বিন মুর্তজার সামনেও উঠেছিল। মাশরাফি অবশ্য ব্যাপারটা নিয়ে তার নিজের এবং বাংলাদেশের অবস্থাই একটু বিস্তারিত করে তুলে ধরলেন। তিনি পরিষ্কার বললেন, বাংলাদেশে ক্রীড়া সাংবাদিকেরা ক্রিকেট পরিবারের অংশ। আর দেশের ক্রিকেটের উন্নতির একটা বড় কৃতিত্ব দিলেন সংবাদমাধ্যমকে।

বাংলাদেশে ক্রিকেটকে আজকের জায়গায় নিয়ে আসার জন্য মূল কৃতিত্ব পাওয়া নিশ্চয়ই সমর্থকদের। সেটা দিয়েই মাশরাফি শুরু করলেন। বাংলাদেশের সমর্থকেরা যে কিছু না পেয়েও দিনের পর দিন সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন, এটাকেই সবচেয়ে বড় ব্যাপার মনে করেন এই দেশসেরা পেসার, 'আমার মনে হয় আমাদের দেশে যারা ক্রিকেট সমর্থক আছেন, তারা আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছেন। তারা না থাকলে ক্রিকেট খেলার উৎসাহটা আসেই না। অস্ট্রেলিয়া তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে; তারপরও ওদের দেশে অন্য খেলায় আরও বেশি সাপোর্টার হয়। আমাদের দেশের সমর্থকদের জন্য আমরা কিছুই করতে পারেনি। টানা বাজেভাবে হারার পরও মানুষ আমাদের সমর্থন করে যাচ্ছে। এটা সম্ভবও হয়েছে মিডিয়ার কারণে।'

মাশরাফির এখানে যুক্তিটা হলো, সংবাদমাধ্যমই মানুষকে আসলে দলের পাশে রাখার কাজটা করছে।

এই কাজটা কীভাবে, কবে থেকে শুরু হলো, সেটাও মাশরাফি তুলে ধরলেন। তিনি পরিষ্কার সাংবাদিকদের কৃতিত্ব দিয়ে বললেন, 'আমরা একটা সময় ১৯৯৭ সালে ভালো খেলা শুরুও করেছিলাম। ১৯৯৯ সালে আমরা ভালো কিছু পেলাম। ২০০০ থেকে টেস্ট ম্যাচ শুরু করলাম। তখন থেকেই মানুষ খেলাটাকে বেশি ফলো করা শুরু করল। আমার মনে হয় সাংবাদিকদের অবদান অনেক বেশি। আপনারা যদি খেলাটাকে এভাবে তুলে না ধরতেন এই জিনিসগুলো এতটা ফোকাস হতো না। ক্রিকেটাররাও এতটা ফোকাস হতো না। আসলে মিডিয়া যত বেশি একটা জিনিসকে ফোকাস করবে ততই এটা মানুষের সামনে ফোকাস হবে।'

এসব করতে গিয়ে খুঁটিনাটি সব ধরনের অভিজ্ঞতাই হয়। তবে দিন শেষে মাশরাফি অন্তত মনে করেন, এগুলো থেকে তাদের শুধু উৎসাহ আর অনুপ্রেরণাই নেওয়ার আছে, 'আমার কাছে মনে হয় এগুলো সবই উৎসাহ। এগুলো ছাড়া আমরা হয়তো খেলায় এতটা মজা পেতাম না। আনন্দ-দুঃখ কিছু থাকত না। সবকিছু মিলিয়ে ইমোশনটা এক জায়গায় থাকে। সবাই একসঙ্গে থাকলে আলাদা একটা মজাই থাকে।'

দুদিন পরই আরেক সংবাদ সম্মেলনে দর্শকের ভূমিকাটা আরেকটু পরিষ্কার করলেন, '১৫ থেকে ১৭ বছর ধরে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ আমাদের পাশে থেকেছেন। জয়-পরাজয় তারা দেখেননি, তারা মাঠে এসেছেন এবং সমর্থন

দিয়েছেন। তাদের সমর্থন ও ভালোবাসাই আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে। এবার অস্ট্রেলিয়ায় এসে প্রবাসী বাংলাদেশিদের একই রকম সমর্থন দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। আশা করছি, কালও তারা মাঠে থাকবেন।'

আর এখানেই বলতে বলতে এই দর্শকেরা যে কীভাবে ফুটবলের বদলে হঠাৎ করেই ক্রিকেটকে সামনে নিয়ে এসেছেন, সেটাও বলছিলেন, 'এটা আসলে একটা যুগান্তর হয়েছে বলতে পারেন। ১৯৯৭ সালে আমরা যখন আইসিসি ট্রফি জিতলাম, তখন থেকে ক্রিকেট গণমানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এর আগে বাংলাদেশের মানুষ ভারত, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট টুকটাক দেখত। কিন্তু ১৯৯৯ বিশ্বকাপে খেললাম আমরা। এরপর মানুষ বুঝতে পারল এই খেলাটায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে তাদের প্রতিনিধিত্ব আছে। ফুটবল এখনো বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয়। কিন্তু ক্রিকেট সম্ভবত এক নম্বরে উঠে এসেছে। আমি এই সমর্থকদের জোরটা টের পাই। যেটা বলি, এই ১৫ বছরে আমাদের উত্থান-পতন গেছে, কিন্তু সমর্থকেরা পাশে থেকেছেন।'

মানে, তার পয়েন্টটা পরিষ্কার যে, ক্রিকেট যত না নিজে এ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, তার চেয়ে বেশি এটা দর্শকেরই ভালোবাসার ফল; ফলে এটাকে ধরে রাখার দায় ক্রিকেটারদের।

এরপর আরো একটু বড় করলেন আলোচনাকে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের পর। আমরা কথায় কথায় ক্রিকেট আর মুক্তিযুদ্ধকে একাকার করে ফেলি। মুক্তিযুদ্ধের তুলনায় ক্রিকেটটা যে অনেক ক্ষুদ্র একটা ব্যাপার, সেটা মাশরাফি পরে আরও অনেকবার বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওই নাটকীয় জয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে চলে যাওয়া দলের অধিনায়ক হিসেবে বলছিলেন কথাগুলো।

মাথায় জাতীয় পতাকা বেঁধে পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে গিয়ে মাশরাফির এই কথাবার্তা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন কালের কণ্ঠের যুগ্ম বার্তা সম্পাদক মোস্তফা মামুন। তিনি লিখেছিলেন :

সবাই ক্রিকেটটাই দেখছে কিন্তু এর বাইরেও অনেক কিছু আছে। কোন ক্রিকেট অধিনায়ককে কে কবে দেখেছে দেশের পতাকা নিয়ে জয়ের মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ায়! আর তাই নয় শুধু, বিজয়ের মাসে যাঁদের কথাটা সবার মনে রাখা উচিত সবার আগে এবং তাঁদের প্রতি যথেষ্ট দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে না বলে লজ্জাবোধ করা উচিত সেই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে উৎসর্গ করল জয়। সত্যি শুনে চমকে গেছি। আমাদের ক্রিকেট দল ঠিক ঠিক জাতীয় অনুভূতির প্রতীক হয়ে উঠছে। বাংলাদেশে ক্রিকেট নিয়ে যে আবেগ বয়ে যায় তাতে যতটা ক্রিকেট ততটাই জাতীয়তা। জাতীয় দল খেললেই আমাদের সব আকর্ষণ, ক্লাব বা অন্য কোনো ক্রিকেট নিয়ে সে রকম কোনো কৌতূহলই নেই। কারণ? মানুষ জাতীয়তার সঙ্গে এটাকে মিশিয়ে ফেলেছে। সেটার ভালো-মন্দ নিয়ে বিস্তারিত তাত্ত্বিক আলোচনা হতে পারে কিন্তু

এই যে ক্রিকেট এবং বাংলাদেশের মিশে যাওয়া, এর ফলে ক্রিকেটারদের মাঠের খেলার বাইরেও কিছু দায়িত্ব তৈরি হয়ে যায়। সে রকম দায়িত্ব পালনই হলো, মুক্তিযোদ্ধাদের জয় উৎসর্গ। তুমি পরশু আলোচনায় আবার বললে, 'আমরা ক্রিকেট খেলে অনেক কিছু পেয়েছি। কিন্তু দেশকে কী দিয়েছি! আমার তো মাঝেমধ্যে মনে হয় আমরা আর কী এমন দিয়েছি দেশকে, দিয়েছেন তো সেই মুক্তিযোদ্ধারা, যাঁরা জীবন বাজি রেখে দেশ এনে দিয়েছেন অথচ তাঁদের অনেকে এখনো ঠিকমতো খেতে পান না। আসল নায়ক তো ওঁরা, আমরা যেন ভুলে না যাই।' কথায় চোখে পানি আসা অনেক কঠিন কিন্তু সত্যি আমাদের কারো কারো চোখ তখন ছলছল করছিল। এমন কথা অনেকেই বলে কিন্তু তুমি বা তোমরা, যারা নিজেদের কিছু প্রাপ্য সম্মান ছেড়ে দিতে তৈরি মুক্তিযোদ্ধা বা দেশের জন্য আত্মত্যাগী মানুষের জন্য। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা এই কথা শুনলে তৃপ্তি পাবেন এই ভেবে, যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তাঁরা যুদ্ধ করেছিলেন সেই প্রজন্মের কেউ কেউ সত্যিই বড় মানুষ হয়েছে। এবং একই রকম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই যে দেশের জন্য খেলা, মানুষের আবেগকে শ্রদ্ধা করা এটাই এই দলের বড় শক্তি। [১]

৩

এই মিরপুর স্টেডিয়ামের পোডিয়ামটার কথাই ধরুন না কেন। কতশত রঙ্গ-নাটকের সাক্ষী হয়ে আছে এই মঞ্চ।

ব্রায়ান লারার অসহিষ্ণু হয়ে ওঠা, শচীন টেন্ডুলকারের বরফ শীতল কথা কিংবা সৌরভ গাঙ্গুলীর চটে ওঠা বা রিকি পন্টিংয়ের নাটকীয় দুঃখ প্রকাশ; কত কিছুই না দেখেছি এই মঞ্চে। এই মঞ্চে ড্যারেন স্যামি বলেছিলেন, 'আমাকে আপনারা কী ভাবেন, আমি জানি। ব্যাটে-বলে তো পারি না; তাই হাসিয়ে আনন্দ দিতে চাই। ব্রায়ান লারার মতো প্রশ্ন করি, ডিড আই এন্টারটেইন ইউ'!

এই মঞ্চে সাঙ্গাকারাকে জ্ঞানের আসর বসাতে দেখেছি, এই মঞ্চে প্রফেসর নামের হাফিজের বিরক্তিকর সেমিনার মার্কা বক্তব্য শুনেছি, এই মঞ্চে শাহাদাত হোসেন রাজীব বলেছিলেন, পিকচার আভি বি বাকি হ্যায় মেরে দোস্ত!

প্রায় এক যুগ ধরে এতশত আবেগ দেখতে দেখতে মনে হয়েছিল, সংবাদ সম্মেলন ব্যাপারটা দেখা হয়ে গেছে। এই মঞ্চ থেকে নতুন কিছু আর কখনো দেখতে পাব না। কে যেন বলেছিলেন, সব গল্প বলা হয়ে গেছে। এখানে তাই পুরোনো গল্প নতুন বোতলে ফিরে ফিরে আসবে; এটাই নিয়তি ছিল।

কিন্তু নিয়তির ওপর ছড়ি ঘোরাতে এসেছেন তিনি মর্ত্যে। তাই আরেকটা বোতল খুলে ফেললেন; বোতল থেকে বেরিয়ে এল আনকোরা, টাটকা, আদ্যে না বলা এক গল্পের ডালি। আমরা মুগ্ধ হয়ে, হকচকিত হয়ে, অপার বিস্ময়ে দেখলাম মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের সেই মঞ্চ থেকে জীবনের নতুন নতুন বোধ আর ক্রিকেটপ্রজ্ঞার নতুন নতুন স্তর উন্মোচিত করলেন তিনি।

হ্যাঁ, আমাদের মাশরাফি বিন মুর্তজা। আমি তাকে বললাম, তিনি আচার্য মাশরাফি; একজন বললেন, 'না, তিনি আশ্চর্য মাশরাফি।'

সত্যি বলি; মাশরাফিকে আমরা আধা-পাগল বলে জানতাম।

ডেভ হোয়াটমোর তো ওকে 'পাগলা' বলেই ডাকতেন। বয়স বা ইনজুরির ছোবল মাশরাফির পাগলা চেহারাটা এতটুকু ম্লান করতে পারেনি কখনো। এখনো আমাদের সঙ্গে এলাকার ভাষায় অপ্রকাশযোগ্য সব আড্ডা দেন। দুনিয়ার অনেক ভারী ও হালকা বিষয় নিজস্ব শব্দচয়নে একেবারে হাস্যকর বানিয়ে ফেলতে ওস্তাদ এই মাশরাফি।

ক্রিকেটজ্ঞান, নেতৃত্ব, বড় ভাই হয়ে ওঠা; এসব গুণ মাশরাফির ভেতর বিল্টইন ছিল। তাই এগুলো কখনো আমাদের অবাক করেনি। তবে আমরা যেটা কল্পনাই করিনি যে, সেই 'পাগলা' মাশরাফি ক্রিকেটের মাঠে, ক্রিকেটের সেই রঙ্গমঞ্চে এমন করে জীবনকে তুলে ধরতে পারবে। এমন দারুণ স্মার্ট ভঙ্গিতে, সম্ভবত সবচেয়ে স্মার্ট ভঙ্গিতে সে ক্রিকেটের বিরাট বিরাট ব্যাপারকে আমাদের সাধারণের মগজে ঢুকিয়ে দিতে পারবে।

মিরপুর স্টেডিয়ামের পোডিয়ামটার কথা বলছিলাম।

২০১১ সালের মার্চ মাসের এক সন্ধ্যায়, নাকি রাতে এই পোডিয়ামে বসে চোখ মুছতে দেখেছিলাম 'যন্ত্রমানব' গ্রায়েম স্মিথকে। স্বদেশি এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে স্মিথ বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, আজ স্বীকার করে নিই। লোকে সম্ভবত ঠিকই বলে; আমরা চোকার্স।'

সেদিনও বুঝিনি এই শব্দটার মধ্যে কতটা যন্ত্রণা, কতটা অবমাননা লুকানো আছে।

এই তো, দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারানোর পর মাশরাফি মুখটা একটু বাঁকা করে আমাদের চোখে আঙুল তুলে দিলেন। একেবারে শাণিত এক একটা বাক্যে বুঝিয়ে দিলেন সারা পৃথিবীর জন্য যে 'চোকার্স' শব্দটা একটা রসিকতা, একটা বিশেষণ, একটা খোঁচামাত্র; সেটা দক্ষিণ আফ্রিকার বড় যন্ত্রণা।

প্রশ্ন করা হয়েছিল, দক্ষিণ আফ্রিকা কি 'চোকার্স' বলে আবার চোক করল?

শব্দটা শুনে মাথা এপাশে-ওপাশে নাড়িয়ে বললেন, 'আমি জানি না কারো এভাবে কথা বলা ঠিক কি না। আর আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, কোনো জাতিকে এভাবে আঘাত করা ঠিক না। আমি বিশ্বাস করি, ওরা অনেক বড় দল। এমনকি বিশ্বকাপে যখন যায়, অন্যতম সেরা দল হিসেবেই যায়। সেখানে গিয়ে এমন না ভালো খেলে না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ওরা এবারও সেমিফাইনালে গিয়ে হেরেছে। আসলে এই কথাগুলো সব সময় ব্যবহৃত হয়, আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় পুরো দেশটাই এতে কষ্ট পায়। মানুষকে, একটা জাতিকে এভাবে কষ্ট দেওয়ার অধিকার কারো নেই।'

এই আমাদের মাশরাফি। এ জন্যই আমাদের ক্যাপ্টেন মাশরাফি।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নিয়ে যে হাওয়াই উন্মাদনা কিংবা টস নিয়ে যে সর্বব্যাপী কৌতূহল

সে নিয়ে চাঁছাছোলা কথা বলেছেন। চোকার্স নিয়ে এই কথাটা যেদিন হলো, সেদিনের সংবাদ সম্মেলনেই জীবনের অতি তাৎপর্যপূর্ণ আরও কয়েকটা বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন। ওই একটা সংবাদ সম্মেলনই হতে পারে জীবনবোধ নিয়ে মাশরাফির পুরো ভাবনার বিজ্ঞাপন। ওই একটা সংবাদ সম্মেলনই প্রতিটা ক্রিকেট-ভক্তের জন্য অবশ্যশিক্ষণীয় এক আসর বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রতিটি খেলোয়াড়ই তার খেলাকে জীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলতে পছন্দ করেন। সাংবাদিকেরাও এসব প্রশ্নের ক্ষেত্রে গৎবাঁধা উত্তর পাবেন বলে অপেক্ষা করেন। মাশরাফিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দলকে জয়ের পথে ফেরানোটা জীবনের অন্যতম চ্যালেঞ্জ ছিল কি না।

মাশরাফি একটু হাসলেন। একেবারে চমকে দিয়ে বললেন, ক্রিকেট মাঠে কখনো মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ লুকিয়ে থাকতে পারে না, 'মানুষের জীবনে প্রত্যেকটি দিনই একটা নতুন চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জ বলতে আমি শুধু বুঝি, আমার একটা ছেলে আছে, একটা মেয়ে আছে; তাদের মানুষের মতো মানুষ করে তোলাই আমার চ্যালেঞ্জ। খেলাধুলা অবশ্যই বড় ব্যাপার। তবে জীবনের চেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং সেটা হতে পারে না।'

মাশরাফি যখন অধিনায়ক হলেন, জিম্বাবুয়েকে হোয়াইটওয়াশ করলেন; একটা লম্বা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। প্রথম প্রশ্ন ছিল, 'লাইফ ইজ বিউটিফুল, নাহ?'

মাশরাফি একগাল হেসে বলেছিলেন, 'না হারা পর্যন্ত সবই বিউটিফুল। আমি হারের সময়টা দেখতে চাই; জীবন তখন কেমন থাকে, সেটাই দেখতে চাই।'

এই ব্যাপারটা বড় বিস্ময়কর। একজন অধিনায়ক পরাজয় কেন দেখতে চাইবেন!

এই সেদিন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে হারের পর দ্বিতীয় ওয়ানডেতে এসে জয় পাওয়ার পর বললেন তার বোধের কথাটা, 'আমি এই সময়টা দেখতে চেয়েছিলাম। জয়ের সময় তো সব সুন্দর থাকে, ছন্দে থাকে। কিন্তু আমি হারের ঘরে ঢুকে গেলে দল কেমন আচরণ করে, সেটা দেখতে চেয়েছি। এই সময়টাই হলো খেলোয়াড়দের ক্যারেক্টার শো করার সময়। আমি জয়ের আনন্দে ভাসতে থাকা একঝাঁক খেলোয়াড়ের চেয়ে, হারের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে জীবন দিতে থাকা একঝাঁক ক্যারেক্টার দেখতে চেয়েছিলাম। আমি খুশি যে, আমার দলের খেলোয়াড়েরা সেটা দেখাতে পেরেছে।'

৪.

ভাবতাম, মাশরাফিকে চিনি।

আজ থেকে প্রায় দেড় বছর আগে যখন মাশরাফিকে নিয়ে বইয়ের প্রাথমিক কাজ শুরু করেছিলাম, ধারণা ছিল, আমি তাকে চিনি। প্রায় ১২ বছর ধরে চোখের সামনে দেখছি, অফুরন্ত আড্ডা দিচ্ছি, যাচ্ছেতাই রসিকতায় মাতছি; অবশ্যই আমি বুঝি তাকে চিনি।

কিন্তু মাশরাফি অধিনায়ক হওয়ার পর আমি নিশ্চিত, আরও অনেকে আরও বেশি চমকে গেছেন–এই মাশরাফিকে তো আমরা চিনতাম না!

না, অধিনায়ক মাশরাফির কথা বলছি না।

মাঠের বাইরে মাশরাফি কতটা ভালো নেতা, সেটা আমরা জানতাম। অধিনায়ক না হয়েও মাশরাফি সেই তরুণ বয়স থেকে বাংলাদেশ দলের নেতা। ফলে এই দলকে এক সুতোয় বেঁধে ফেলা, দলের জুনিয়র-সিনিয়র সবাইকে আমোদে মাতিয়ে রাখা, সেরাটা বের করে আনার জন্য সেরা সব কাণ্ড করা; এসব আমরা জানতাম।

আমরা জানতাম, মাশরাফি পারফরম্যান্সে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবে। আমরা জানতাম, মাশরাফি সাকিব-তামিম-মুশফিককে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ বন্ধুত্বের একটা ফিলিং দেবে। আমরা জানতাম, মাশরাফি ছোটদের জন্য এক দারুণ আমুদে, কিন্তু কড়া বড় ভাই হয়ে দেখা দেবে।

এমনকি তার অনফিল্ড ক্যাপ্টেনসি নিয়েও আমাদের ধারণা ছিল।

সেই আবাহনী বলুন, কিংবা ২০০৯ সালের ছোট্ট ঝলক; আমরা জানতাম, মাঠের অধিনায়কত্বেও এই ছেলেটি দেশের সেরাই হবে। ফলে এসব কোনো গুণ দিয়ে মাশরাফি আমাদের চমকে দিতে পারেনি।

মাশরাফি চমকে দিল, প্রতিদিন আমাদের বিস্ময়করভাবে চমকে দিচ্ছে, অধিনায়ক হিসেবে তার জীবনবোধ ও দর্শন দিয়ে। প্রতিদিন মাশরাফি প্রমাণ করে চলেছে, সে আসলে সামান্য এক ক্রিকেটের অধিনায়কত্ব নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসে না; সে আসে এক ক্রীড়াদূত হয়ে, আন্তর্জাতিক অলিম্পিকের সত্যিকারের এক প্রতিনিধি হয়ে এখন ভুবনের সামনে প্রকাশিত মাশরাফি বিন মুর্তজা।

একেবারে সুনির্দিষ্ট করে বললে, এই মাশরাফিকে আসলে আবিষ্কার করা গেল ভারত ও পাকিস্তানকে পরপর দুটো সিরিজ হারানোর পর।

একদিন নিজের বাসায় বসে এই সিরিজের আগেই বলছিলেন, ‘জয় খুব ভালো জিনিস। খেলাধুলায় জয় ছাড়া তো কোনো লক্ষ্য থাকে না। কিন্তু কী জানেন, জয়ের নেশা একটা সর্বনাশা ব্যাপার। জয়ের নেশা একবার ঢুকে গেলে খেলাটাই শেষ হয়ে যায়।’

আর এই কথাটাই একেবারে আগুনের মতো বের হয়ে এল বাংলাদেশ দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি হারার পর। টানা একগাদা ম্যাচ জয়ের পর টানা তিনটে পরাজয়; ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুটি টি-টোয়েন্টি। পরাজয় বের করে আনল আরেক মাশরাফিকে। সংবাদ সম্মেলনেও বললেন, ‘একটু পেছন ফেরাটা জরুরি হয়ে পড়েছে। এগোনোর পথে বারবার পেছন ফিরে দেখতে হয়।’

কী দেখতে হয়, সেটা বোঝাতে গিয়েই বলছিলেন এই জয়ের নেশার কথা।

সেদিনের কথাগুলোই যেন আরেকটু বড় করে বলছিলেন, ‘বিশ্বকাপ থেকে আমরা প্রায় সব ম্যাচই জিতেছি। জিততে জিততে জেতার একটা নেশা তৈরি হয়; এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নেশাটা অতিরিক্ত হতে হতে একটা সময় মানুষ মূল ব্যাপারটা

ভুলে যায়; কীভাবে জয় আসে, সেই প্রসেসটা নিয়ে ভাবে না। শুরু থেকেই আমরা যখন জেতা-জেতা করি। মাঝখান থেকে ক্রিকেট অনেক দূরে সরে যায়।'

লক্ষ করুন, 'জয়' আর 'ক্রিকেট' দুটিকে সমার্থক মনে করছেন না মাশরাফি!

মানে জয় বড়, কিন্তু সেটা কিছুতেই ক্রিকেটের চেয়ে বড় হতে পারে না। জয়ের জন্যই আমরা যেকোনো খেলা খেলি। কিন্তু জয়ের চিন্তা কখনো খেলার চেয়ে বড় হয়ে উঠতে পারে না। তাহলেই খেলার চেতনাটা মরে যায়।

এই কথাটা কারা বলে, মনে পড়ছে?

হ্যাঁ, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কাউন্সিল (আইওসি)।

সেই পিয়েরে দ্য কুবার্তিন থেকে শুরু করে আজ অবধি অলিম্পিক আমাদের এটাই বোঝানোর চেষ্টা করছে যে, জয়ের নেশায় খেলাটাকে হারিয়ে ফেলো না। খেলাধুলাকে এই জয়-পরাজয়ের ছোট্ট বৃত্ত থেকে বের করে আনতে অলিম্পিকের চেষ্টার অন্ত নেই।

এই চেষ্টায় তারা পৃথিবীর সবচেয়ে অ্যাথলেট আর উসাইন বোল্টকে এক দাঁড়িপাল্লায় মাপে; এক ট্র্যাকে দৌড় করায় তাদের। এই চেষ্টায় অলিম্পিকে একজন বোল্ট বা ফেল্‌প্‌সের চেয়েও সম্মানীয় হয়ে ওঠেন জীবনে ৫০ মিটার পুল না দেখেও অলিম্পিকে সাঁতার কাটার সাহস দেখানো কোনো এক সাঁতারু।

অলিম্পিক এটাই চায়; অলিম্পিক চায় যে, খেলাটাই বড় হয়ে উঠুক; জয় নয়।

খেলাধুলার প্রধান ও আদিম এই মহৎ দর্শনটাই যেন নানাভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার এবং প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন মাশরাফি। দায়িত্ব না পেয়েও তিনি হয়ে উঠছেন এই মহৎ দর্শনের প্রচারক।

আর এখানে বেরিয়ে আসছেন অচেনা এক মাশরাফি।

আলোচনাটা এখানে থামিয়ে দিলে একটা নেতিবাচক দরজা থেকে যায়। মনে হয় বুঝি, এই 'জয়-পরাজয় বড় নয়, অংশগ্রহণই শেষ কথা' দর্শন ছড়িয়ে মাশরাফি আসলে পালাতে চাইছেন। অলিম্পিকের এই স্লোগান তুলে বুঝি আমরা লুকাতে চাইছি।

তার মানে, আমরা কি জিততে চাই না?

এখানেই একটা দারুণ মার্জিন আছে। একটা সুতোর মতো পথ আছে। খেলাধুলা একদিকে আপনাকে যেমন এমন মহৎ হতে বলে, তেমনই আপনাকে বলে প্রতিযোগিতামূলক হতেই হবে। খেলাধুলায় হাল ছেড়ে দেওয়া বলে কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

আপনি মাঠে নামার আগে বিশ্বাস করবেন, জয় শেষ কথা নয়। কিন্তু মাঠে আপনার সর্বোচ্চ শক্তি উজাড় করে দেবেন জয়ের জন্যই; তাতে ফলাফল যা-ই হোক। সেটা না করে আপনি যদি ভয়ে, আরামে বা অবজ্ঞায় সেরা শক্তি প্রদর্শনে এতটুকু কমতি দেখান, তাহলেই খেলা নষ্ট করলেন। তাহলেই শেষ হলো স্পোর্টস।

আর এখানেই মাশরাফি আজ এই গভীর রাতে আমাকে এই লেখাটা লিখতে বাধ্য

করলেন।

আগের দিন পর্যন্ত মাশরাফি অলিম্পিকের পতাকা বয়েছেন। আজও বহন করলেন। সেই সঙ্গে বুঝিয়ে দিলেন স্পোর্টসম্যান স্পিরিট এবং প্রতিযোগিতার নীতি দুটোর এক অদ্ভুত সমন্বয় করতে পারেন তিনি।

আমরা জানতে চেয়েছিলাম, 'দক্ষিণ আফ্রিকা কি আমাদের জন্য বেশিই শক্ত দল? আমাদের এই ফলাফলই কি তাহলে সত্যি?'

মাশরাফির চোখটা ধক করে জ্বলে উঠল। একটু মুচকি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, দক্ষিণ আফ্রিকা অনেক শক্ত দল। তবে আমরা এর চেয়ে বেটার ক্রিকেট খেলতে পারা দল। আমরা চাইলে অবিশ্বাস্য ক্রিকেট খেলতে পারি। আর সেই ক্রিকেট খেললে আমরা দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতেই পারি। দিন শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা কতটা এগিয়ে, সেটা আমার মাঠের হিসাব নয়। আমার হিসাব হলো, আমরা জেতার জন্য লড়ব। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দলকেও হারাতে পারি, এই বিশ্বাস তো থাকতেই হবে। আশা করি, পরের ম্যাচেই সেটাই হবে।'

এই মাশরাফিকে চিনতাম না।

যে মাশরাফির হাতে অলিম্পিক মশাল, বুকে জয়ের আগুন; সেই মাশরাফিকে চিনতাম না।

[১] প্রিয় মাশরাফি; মোস্তফা মামুন (কালের কণ্ঠ; ১৩ মার্চ, ২০১৫)

বলছেন মাশরাফি



মাশরাফি বিন মুর্তজার সাক্ষাৎকার নেওয়ার চেয়ে আনন্দদায়ক ব্যাপার আর হতে পারে না।

ইচ্ছে ছিল জীবনী উপলক্ষে তার দীর্ঘ একটি সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। কিন্তু সে সাক্ষাৎকার আর নেওয়া হয়ে ওঠেনি। যেটা হয়েছে, দীর্ঘকাল ধরে তার সঙ্গে কথোপকথন, মতবিনিময় বলা চলে। প্রচলিত নিয়মের সাক্ষাৎকারের গণ্ডিতে এই আলাপচারিতাকে আটকে ফেলার আর কোনো উপায় নেই।

এই আলাপচারিতার শুরু ২০১৫ সালের মে মাসের এক সকালে। সেই থেকে চার দফায় আমরা দীর্ঘ সময় ধরে এই জগৎ নিয়ে, ক্রিকেট নিয়ে এবং তার সংসার নিয়ে কথা বলেছি। পর্যায়ক্রমে মাশরাফির মিরপুরের বাসা, নড়াইলের বাড়ি, মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে বসে এই আড্ডা রেকর্ড করা হয়েছে।

কথোপকথনের ভঙ্গি যেহেতু একান্ত আড্ডার মতো ছিল, তাই সেখানে বিষয়ের কোনো ধারাবাহিকতা স্বাভাবিকভাবেই থাকেনি। হয়তো এখনই জীবনের গূঢ় কোনো ব্যাপার নিয়ে

আলাপ হলো, পরক্ষণেই নিতান্ত খেলার মাঠের বিষয়ে গল্প শুরু হলো।
ফলে এই আলাপচারিতাকে লিখিত আকারে উপস্থাপন করতে গিয়ে নানামুখী সমস্যার মুখোমুখি হলাম আমরা। প্রথমত মাশরাফির তরফে প্রতিটি কথা এত মূল্যবান যে, তার কিছুই ফেলে দেওয়ার উপায় নেই। দ্বিতীয় সমস্যা হলো, কীভাবে সাজানো হবে এই আলাপচারিতা?
তারিখ অনুযায়ী যেমন কথা হয়েছে, তেমন সাজিয়ে দেওয়া যেত। তাতে পাঠকের জন্য মুশকিল হলো, বিষয় অবিন্যস্ত হয়ে যেত। একই প্রসঙ্গে কথাবার্তা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকত। সে ক্ষেত্রে সমাধান হলো, বিষয়ের ভিত্তিতে সাজিয়ে ফেলা।
এখানে একটা সমস্যা থেকেই যাচ্ছে যে, কখন কোথায় বসে কোন কথার পর কোন কথা বলেছেন, তা আর বোঝার কোনো উপায় রইল না। শেষ পর্যন্ত আমার মনে হয়েছে, সেটা বোঝা খুব জরুরিও না। যেহেতু সব কথাই সমানভাবে চিরকালীন, ফলে তার দিন-তারিখ উল্লেখ করাটা বাধ্যতামূলক না।
অতএব আমরা এই আলাপচারিতাকে মোটা দাগে দুটি বিষয়ভিত্তিক পর্বে উপস্থাপন করছি।
প্রথম পর্বে এসেছে ক্রিকেট। এখানে মাঠে ও মাঠের বাইরে মাশরাফির ক্রিকেট নিয়ে ভাবনা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে কথোপকথনটা স্থান পেয়েছে। এরপর এসেছে জগৎ ও সংসার; ক্রিকেটার মাশরাফি নন, মানুষ মাশরাফিকে বুঝতে হলে এই জগৎ ও সংসার পর্বটার কোনো বিকল্প নেই। এখানেই আমাদের নতুন করে আবিষ্কার করা মাশরাফির জীবন-দর্শন, রাজনীতি, সমাজ, রাষ্ট্র নিয়ে চিন্তাভাবনাগুলো এসেছে। এটা ক্রিকেটার মাশরাফি বলছেন বলে নয়; কোনো শিক্ষক বা রাস্তায় হাঁটতে থাকা মানুষও যদি বলতেন, সমান গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতো বলে আমি মনে করি।
খেলাধুলার সঙ্গে রাষ্ট্র, জীবন, সমাজের যেন সম্পর্ক নিয়ে মাশরাফি আলাপ করেছেন, তা অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত বললেও অন্যায় হবে না। যে এক ভ্রান্তির জগতে আমরা বসবাস করছি, খেলাধুলাকে আমরা যেভাবে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিজীবনের নানা ব্যর্থতার ঢাল বানিয়ে ফেলছি; তাতে এই সময়ে অন্তত এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আর হতে পারে না।
সব মিলিয়ে একটা কথা সত্যি, এই পুরো জীবনী যদি কুপাঠ্য হয় সে দায় কেবলই লেখকের। সেখানে নতুন কিছু পাওয়া না গেলে তার ব্যর্থতা লেখকের। তবে এটুকু জোর দিয়ে বলা যায় যে, পুরো জীবনী পড়ে লেখকের ব্যর্থতায় যা কিছু বিরক্তি উৎপাদন হবে, তা এই আলাপচারিতা দূর করে দিতে পারে।

জগৎ ও সংসার

২০০১ সালের শুরুর দিকে ঢাকায় এলেন অনূর্ধ্ব-১৭ একটা বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় খেলতে। তরতর করে পরের কয়েক মাসের মধ্যে টেস্ট দলে চলে এলেন। খুব সোজা ছিল জীবনটা?
জীবন! জীবন নিয়ে এই ভাবনা এখনই ভাবি না; আর সেই বয়সে! আমার জীবন নিয়ে ভাবনাটা কি ছিল জানেন?

কী?
আমি প্রতিদিন ভাবতাম, আজকের ম্যাচ কি টিভিতে দেখাবে? যদি জানতাম দেখাবে, ভাবতাম, আজই তো শেষবার বাসায় বসে সবাই খেলা দেখতে পারবে। আজ সেরাটা খেলি। আজই তো শেষ। আর দেখাবে না। আমি এই ভাবনাটাকে হারাতে দিইনি। এখনো আমি প্রতি ম্যাচের আগে ভাবি, এটাই আমার শেষ ম্যাচ টিভিতে দেখা যাবে। তারপর সব শেষ। এই ম্যাচেই যা করার করে ফেলতে হবে।

কোনো পরিবর্তন হয়নি এই ১৪-১৫ বছরে?
একটা পরিবর্তন হয়েছে। আগে প্রতিটা ম্যাচ খেলার আগে একটু নার্ভাস থাকতাম। মনে হতো, নতুন এসেছি, ভালো করতে হবে। একটা চাপ নিতাম। এখন ভাবি, অনেক তো খেললাম। এত ভেবে কী হবে? এখন আমি খেলাটা ছোটবেলার মতো মন খুলে খেলতে পারি। আমি জানি না, বাকিদের কী হয়। তবে আমি টের পাচ্ছি, শেষ বয়সে ক্রিকেটটা একেবারে সেই ছোট্টবেলার মতো আনন্দ নিয়ে খেলা যায়। এই সময় চাওয়া-পাওয়ার চেয়ে ক্রিকেট আর ক্রিকেটের আনন্দ বড় হয়ে ওঠে।

নিয়তির ওপর ছেড়ে দিয়েছেন?
আল্লাহর ওপরে ছেড়ে দিয়েছি। আগে খুঁটিনাটি কত কী ভাবতাম–এই বলটা এমন করব, অমন হবে। এখন ভাবি, এত ভেবে লাভ নেই। আমি মজা করি, আমি আনন্দের জন্য ডেলিভারি দিই। তারপর কী হবে, সেটা আমার হাতে নেই।

ইনজুরির গল্প বলতে বলতে তো আপনি ক্লান্ত। পুনর্বাসন-প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কে বলেন। এই যে এক বছর, দেড় বছরের জন্য বাইরে চলে গেছেন। অপারেশনের পর ক্রাচে ভর করে একা একা সময় কাটানো, বোরিং সব ট্রেনিং। কেমন কাটে সময়টা?
জঘন্য। একটা খেলোয়াড়ের জীবনে সবচেয়ে বাজে সময় সম্ভবত এটাই। এই পুরোটা সময় আপনি একা। ছোট ছোট কাজ করতে হয়; বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় ছোট ছোট কাজ। যখন আপনি সুস্থ থাকবেন, খেলার মধ্যে থাকবেন;

আপনি এসব ছোট কাজ করবেন না। হার্ডওয়ার্ক করবেন। কিন্তু আপনাকে এই সময় এই বিরক্তিকর ছোট ছোট রুটিন মেনে চলতে হবে। আমি বলি একটা ইনজুরির পর রিহ্যাব শুরু করা মানে, সব আবার শূন্য থেকে শুরু করা; কম্পিউটার রিস্টার্ট দেওয়া আর কী!

খুব হতাশার সময়টা?

মারাত্মক। এই যে রুবেল ইনজুরিতে পড়ল; ও টের পাচ্ছে। সবই আবার গোড়া থেকে করতে হবে। আমাদের জন্য আরেকটা যন্ত্রণার ব্যাপার হলো, আমাদের তো আলাদা রিহ্যাব সেন্টার নেই। আমাদের মূল মাঠে গিয়েই এসব করতে হয়। যখন আপনি দেখবেন যে, আমার কলিগরা সবাই চেনা-স্বাভাবিক কাজগুলো সাবলীলভাবে করছে, আপনি পারছেন না; আপনাকে এটা গ্রাস করে ফেলবে। ভয়ানক একটা অনুভূতি।

এটা মানসিকভাবে বেশি চ্যালেঞ্জিং। মানসিক দিকটাই মূল।

ইনজুরি ব্যাপারটা কেমন?

আমার কাছে ইনজুরি মানে হলো একটা অপারেশন। ওই অপারেশন থিয়েটারের ধাক্কাটাই যা ভয় লাগে। তারপর কী হবে, কীভাবে হবে; সব তো মুখস্থ হয়ে গেছে। প্রথম ইনজুরির পর যখন অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাচ্ছে, মনে হলো, ভালোই তো। বেশ কিছুদিন নড়াইল থাকতে পারব।

কখনো মনে হয়েছে, সব শেষ? ক্রাচে করে নড়াইল ঘুরে বেড়াচ্ছেন; যদি আর ফেরা না হয়!

নাহ। কোনো সময় এমন ভাবিনি। আমি আসলে এত গুরুত্ব দিয়ে মাঠে ফেরা নিয়ে কখনো ভাবিইনি। অপারেশনটা খারাপ লাগে। প্রথম অপারেশনের সময় একটাই ভয় ছিল–এত দিন অস্ট্রেলিয়া থাকতে হবে! যখন এয়ারপোর্টে নামলাম, সব ভুলে গেছি। খেলাটেলা কিছুই মাথায় ছিল না। আমার জীবনের একটা সুবিধা হলো, মাঠের বাইরে আমি খেলা নিয়ে বেশি ভাবি না। খেললে কী হবে, না খেললে কী হবে; এসব ভেবে কী হবে!

আপনার ভবিষ্যৎ নাকি হুইলচেয়ারে? ডেভিড ইয়াং নাকি এমন কিছু বলেছেন?

দেখেন, হাঁটুতে একটা অপারেশন থাকলেও একটা বয়সের পর ধুঁকতে হয়। আমার হাঁটুতে সাতটা অপারেশন। ডেভিড না বললেও তো আমার বোঝার কথা, অবশ্যই আমাকে ধুঁকতে হবে একটা সময়। একটা পর্যায়ে হয়তো হাঁটু রিপ্লেস করতে হবে। হুইলচেয়ারে বসতে হবে কি না জানি না, চলাচল সীমিত হয়ে যাবে। আমার সেই স্ট্রাগল শুরু হয়ে গেছে। খেলা ছাড়লে এত জিম থাকবে না, নিয়ম থাকবে না;

একটা বিপর্যয় তো আসবেই।

এই সময়ের জন্য আপনার আর্থিক প্রস্তুতি কি আদৌ আছে? এখন অপারেশন হচ্ছে বোর্ডের টাকায়, আয় করছেন। এদিকে সঞ্চয় নেই বললে চলে। সেই ভবিষ্যতের বিপুল ধাক্কা সামাল দেবেন কী করে?
এই যে পরিবার দেখছেন। এই পরিবারে কার সামর্থ্য কী, সেটা কেউ দেখে না। এখানে যার যতটুকু দরকার, সবাই মিলেই করে। আমি জানি না, সেই সময় যদি আসে, ততদিনে আমার আর্থিক অবস্থা কী হবে। না হলে কিচ্ছু দুশ্চিন্তা নেই। আমার এই পরিবার আছে। এরাই সব করবে। আমার আজ যাদের পাশে আছে, সবাই থাকবে। বিশ্বাস তো রাখতেই হবে। আমার ভরসা এই বিশ্বাস। আমি আসলে এত দূরের ব্যাপার ভাবি না।

খেলোয়াড়ের জীবন আসলে কেমন?
আমাদের এই উপমহাদেশে খেলোয়াড়ের পারফরম্যান্সই তার জীবনের মাপকাঠি। এটা একটু অদ্ভুত। ভারত, পাকিস্তান আর বাংলাদেশে বোধ হয় এটা হয়। শ্রীলঙ্কাতে তেমন হয় না। এখানে একটা খেলোয়াড় মানে, চব্বিশ ঘণ্টাই ওই পারফরম্যান্সের কারণে বিচার হচ্ছে তার। খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত, পারিবারিক জীবনটাও খেলা দিয়ে মাপা হয়। এটা আসলে খেলাধুলার মূল সুরের সঙ্গে ঠিক যায় না। আপনি যদি অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের দিকে তাকান, ওরা খেলোয়াড়ের পারফরম্যান্স দিয়ে তাকে মাঠে বিচার করে। সেই অনুযায়ী তাকে দলে রাখা হবে বা বাদ দেওয়া হবে। আমাদের কী হয়? একটা ছেলে রান না পেলে তার পরিবার সেটার জ্বালা টের পায়। তার পুরো জীবনটা প্রভাবিত হয়।

কেন হয়?
এর একটা বড় কারণ, ক্রিকেট অনুসরণ না করা। আমাদের এখানে জয়ের আনন্দে বা জয় দেখতে চেয়ে প্রতিদিন নতুন নতুন সমর্থক যোগ হচ্ছেন। আমি সমালোচনা করছি না। তবে এই ক্রিকেটের আগে-পরের চরিত্র, ক্রিকেটে কী ঘটে, কী ঘটে না; এসব একেবারেই না জেনে ক্রিকেটের অনুসরণকারী হয়ে যাওয়ার একটা বিপদ আছে। মনে হয়, ব্যর্থতাটা বুঝি খেলার অংশ না। এর ফলে ব্যর্থতা মানেই সেটাকে ব্যক্তিগত অন্যায় ভেবে বসা হয়। এটার খুব বিপদ আছে।

এটা তো আসলে আপনারা ভালো খেলছেন, জয় পাচ্ছেন; তাই জয়ের নেশাটা বাড়তে থাকে।
এটাই আমি ভয়ের জায়গা মনে করি। জয় তো চাইবই। কোনো খেলোয়াড় মাঠে হারার পরিকল্পনা করে নামে না। কিন্তু জয়টা যেন খেলার চেয়ে জরুরি হয়ে

যাচ্ছে। এই লোভটা খারাপ। আমরা লোভী হয়ে যাচ্ছি। এই যে কথায় কথায় 'বাংলাওয়াশ' বলা হয়। এর মধ্যে একধরনের অন্যের প্রতি ঘৃণা আর নিজেদের লোভের প্রকাশ আছে। এই শব্দটাই ভালো না। আপনি কেন 'ওয়াশ' করার লক্ষ্য নিয়ে খেলবেন? আপনি বেস্ট ক্রিকেট এনজয় করার লক্ষ্য নিয়ে খেলবেন। খেলার চেয়ে এই লোভ বড় হয়ে গেলে অনেক বিপদ আছে।

আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করেন, ক্রিকেট এখন দেশপ্রেম প্রকাশের একটা জায়গা হয়ে গেছে।

আমি তো নিয়মিত বলছি কথাটা। দেশের তুলনায় ক্রিকেটটা অতি ক্ষুদ্র একটা ব্যাপার। একটা দেশের অনেক অনেক ছোট ছোট মাধ্যমের একটা হতে পারে খেলাধুলা; তার একটা অংশ ক্রিকেট। ক্রিকেট কখনো দেশপ্রেমের প্রতীক হতে পারে না। সোজা কথায়–খেলাধুলা একটা বিনোদন।

অথচ বিনোদনটা এখন দেশের প্রধান ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।

এটা তো বিস্ময়কর ব্যাপার। খেলা কখনো দেশের প্রধান আলোচনায় পরিণত হতে পারে না। দেশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে, যা সমাধান বাকি। সেখানে ক্রিকেট নিয়েই পুরো জাতি, রাষ্ট্র; সবাই এভাবে এনগেজ হয়ে পড়তে পারে না। আজকে আমাদের সবচেয়ে বড় তারকা বানানো হচ্ছে, বীর বলা হচ্ছে, মিথ তৈরি করা হচ্ছে। এগুলো সব হলো বাস্তবতা থেকে পালানোর ব্যাপার।

তাহলে তারকা কে? বীর কে? আমাদের দেশে তো তারকাও নেই, বীরও নেই।

অবশ্যই আছে। আমাকে প্রশ্ন করুন, তারকা হলেন একজন ডাক্তার। আমি ক্রিকেটার; একটা জীবন কি বাঁচাতে পারি? কক্ষনো না। একজন ডাক্তার পারেন। কই দেশের সবচেয়ে ভালো ডাক্তারের নামে কেউ তো একটা হাতে তালি দেয় না। তাদের নিয়ে মিথ তৈরি করুন, তারা আরও পাঁচজনের জীবন বাঁচাবেন। তারাই তারকা। তারকা হলো লেবাররা। দেশ গড়ে ফেলছে। ক্রিকেট দিয়ে আমরা কী বানাতে পারছি? একটা ইটও কি ক্রিকেট দিয়ে তৈরি করা যায়? একটা ধান জন্মায় ক্রিকেট মাঠে? জন্মায় না। যারা এই ইট দিয়ে দালান বানায়, যারা কারখানায় আমাদের জন্য এটা-ওটা বানায় বা ক্ষেতে ধান জন্মায়; তারকা হলো তারা।

বীর? আপনি বীর নিয়ে অন্য একটা সাক্ষাৎকারে বলছিলেন?

হ্যাঁ, সব সময় বলি। বীর হলেন মুক্তিযোদ্ধারা। আরে ভাই, তারা জীবন দিয়েছে। জীবন যাবে জেনে ফ্রন্টে গেছে দেশের জন্য। আমরা কী করি? খুব বাজেভাবে বলি–টাকা নিই, পারফর্ম করি। এটা অভিনেতা, গায়কের মতো আমরাও পারফর্মিং আর্ট করি। এর চেয়ে এক ইঞ্চিও বেশি কিছু না। মুক্তিযোদ্ধারা গুলির সামনে এই

জন্য দাঁড়ায় নাই যে, জিতলে টাকা পাবে। কাদের সঙ্গে কাদের তুলনা রে! ক্রিকেটে বীর কেউ থেকে থাকলে রকিবুল হাসান, শহীদ জুয়েল।

ক্রিকেটার হিসেবে বললেন?

নাহ। রকিবুল ভাই ব্যাটে জয় বাংলা লিখে খেলতে নামছিল, অনেক বড় কাজ। তার চেয়েও বড় কাজ বাবার বন্দুক নিয়ে ফ্রন্টে চলে গিয়েছিল। শহীদ জুয়েল ক্রিকেট রেখে ক্রাক প্লাটুনে যোগ দিয়েছিল। এটাই হলো বীরত্ব। ফাস্ট বোলিং সামলানোর মধ্যে রোমান্টিসিজম আছে, ডিউটি আছে; বীরত্বের কিছু নেই।

ক্রিকেটে দেশপ্রেম খোঁজে কেন?

কেন খোঁজে! আমি বলি, এই যারা ক্রিকেটে দেশপ্রেম দেশপ্রেম বলে চিৎকার করে, এরা সবাই যদি একদিন রাস্তায় কলার খোসা ফেলা বন্ধ করত, একটা দিন রাস্তায় থুতু না ফেলত বা একটা দিন ট্রাফিক আইন মানত; দেশ বদলে যেত। এই প্রবল এনার্জি ক্রিকেটের পেছনে ব্যয় না করে নিজের কাজটা যদি সততার সঙ্গে একটা দিনও সবাই মানে, সেটাই হয় দেশপ্রেম দেখানো। আমি তো এই মানুষদের দেশপ্রেমের সংজ্ঞাটাই বুঝি না।

যেমন?

আরে সুমন ভাইরা (হাবিবুল বাশার) আইসিএল খেলতে গেল, তারা নাকি দেশদ্রোহী! বোঝেন অবস্থাটা। একটা বোর্ডের সঙ্গে গণ্ডগোল করে একটা সংস্থা আইনের অধীনেই একটা লিগ চালু করেছে। যাদের বিপক্ষে সে দেশেও কোনো অসৎ কাণ্ডের অভিযোগ নেই। সেখানে খেলতে গেলে আপনি প্রতিষ্ঠানবিরোধী বলতে পারেন, কিসের দেশদ্রোহী! দেশপ্রেম, দেশদ্রোহ কোনোটাই এত সোজা না।

আশরাফুল কি দেশদ্রোহী?

এটা তো আমি জাজ করার কেউ না। ঠিক দেশের সঙ্গে প্রতারণা না হলেও মানুষের সঙ্গে প্রতারণা তো। তবে এগুলো অনেক বেশি ভেবে নেওয়া ব্যাপার। আসলে দেশদ্রোহ কোনটা? আপনি রাষ্ট্রের একটা গোপন তথ্য পাচার করে দিলেন, রাষ্ট্রের অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেললেন, রাষ্ট্রকে সংকটে ফেলে দিলেন; এসব হলো দেশদ্রোহ। দেশদ্রোহ শব্দটা অনেক বড়।

জাতীয়তাবাদকে খুব সস্তা করে ফেলছি আমরা?

একদম। কিছু হলেই বলে, এই এগারো জন ১৬ কোটি মানুষের প্রতিনিধি। আন্দাজে! তিন কোটি লোকও হয়তো খেলা দেখে না। দেখলেও তাদের জীবন-

মরণ খেলায় না। মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন রাজনীতিবিদেরা, তাদের স্বপ্ন-ভবিষ্যৎ অন্য জায়গায়। এই এগারোজন পারফরমারের ওপর এই দেশের মানুষের ক্ষুধা, বেঁচে থাকা নির্ভর করে না। দেশের মানুষকে তাকিয়ে থাকতে হবে একজন শিক্ষাবিদের দিকে, একজন বিজ্ঞানীর দিকে।

আরেকটু পরিষ্কার করেন।
ধরুন, এমন একটা আবিষ্কার হবে, যেটা সারা জীবন থেকে যাবে। খেলার পারফরম্যান্স আজ আছে, ভালো লাগছে। কাল যেই খারাপ হবে, ফুরিয়ে যাবে। আজ একজন বিজ্ঞানী বা গবেষক এমন কিছু একটা আবিষ্কার করবেন; যেটা বাংলাদেশের নাম ইতিহাসে লিখে দেবে। যুগের পর যুগ ছাত্ররা সেটা নিয়ে পড়বে। রাষ্ট্রকে এসব কাজে উৎসাহ দিতে হবে।

ক্রিকেটকে কি তাহলে খুব গৌণ মনে করছেন?
জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্র, দেশ–এগুলোর তুলনায় তুচ্ছ একটা ব্যাপার নয়? হ্যাঁ, এটা আমাদের পরিচিতির একটা সিম্বল হতে পারে। একটা সুখী রাষ্ট্রের পরিচয় হতে পারে। তারপরও কথা আছে। শুধু ক্রিকেট কেন? শুধু ক্রিকেট দিয়েই কি আমাদের খেলাধুলার মান যাচাই করা যাবে? আজকে আমরা যদি খেলাধুলার সব সেক্টরেই কিছু এগোতে পারতাম। আমাদের ফুটবল অন্তত এশিয়ান লেভেলে পৌঁছে যেত, একটা অলিম্পিক গোল্ড মেডেলিস্ট থাকত। বৈশ্বিক খেলাধুলার বিচারে এগুলোর চেয়ে ক্রিকেট তো অনেক পেছনের একটা ব্যাপার। তবু একটা জায়গায় আমরা গেছি বলে মনে হতো।

এই যে ক্রিকেটারদের নিয়ে হাইপ তৈরি হয়...
হাইপটা আপনারা যারা তৈরি করেন, আমি বুঝি আপনাদের এটা করতে হয়, আপনাদের পেশার চাহিদা। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা খারাপ। আমরা কিছু একটা হলেই রেকর্ড মাপতে থাকি। এই মুমিনুলের টানা ফিফটি নিয়ে রোজ রেকর্ড মাপা হচ্ছিল। মুমিনুল অনেক ভালো ব্যাটসম্যান। কিন্তু এই যে দাগ টেনে নিজেদের বড় করে ফেলা, এটাই আসলে কৃত্রিম একটা অনুভূতি দেয়। ক্রিকেট এমন একটা খেলা, সবচেয়ে খারাপের মধ্যেও আপনি কিছু রেকর্ড খুঁজে পাবেন। আর সেগুলো প্রেজেন্ট করতে পারলে সবাইকে বিশ্বসেরা মনে হবে।

মিডিয়ার এই চরিত্রে কি ক্রিকেটে সরাসরি কোনো প্রভাব পড়ে?
পড়ে। ক্রিকেটাররা অনেক ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। আপনি যখন একটা ক্রিকেটারের নানা রেকর্ড নিয়ে বা রেকর্ডের সম্ভাবনা নিয়ে এ রকম হাইপ তৈরি করতে থাকবেন, সেও একসময় নিজেকে নিয়েই ভাববে বা তার রেকর্ড নিয়ে

ভাববে। টিম গেম ব্যাপারটার গুরুত্ব কমে যাবে। এমনিতেই তো ক্রিকেটে ইনডিভিজুয়াল পারফরম্যান্সের প্রভাব এত বেশি, এখানে টিম গেম ধরে রাখা শক্ত ব্যাপার।

জীবনে এতবার বাজে সময় দেখেছেন, এত ইনজুরি। কোনো পর্যায়ে কি মনে হয়েছে যে, যথেষ্ট হয়েছে, আর না?

ইনজুরির কারণে কখনো মনে হয়নি। আমি হার মেনে পালিয়ে যাব, এটা আমি কল্পনা করতে পারি না। হ্যাঁ, ছেড়ে দেওয়ার কথা মনে হয়েছে। মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখে অনেকবার মনে হয়েছে। প্রতিক্রিয়াটা যে নেতিবাচক দেখেই হতাশ হয়েছি, সব সময় তা নয়। অতি উচ্ছ্বাস, অতি বাড়াবাড়ি দেখেও হতাশ লেগেছে মাঝে মাঝে। মনে হয়েছে, কী ভুল মেসেজ দিচ্ছি! এর চেয়ে না খেলাও ভালো।

নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া আপনার ব্যাপারে তো মানুষের খুব একটা হয়নি।

নিজেরটাই শুধু ভাবায় তা তো না। সাকিবের ব্যাপারটা ভাবেন। ছেলেটারও তো একটা জীবন। এত বাজেভাবে ওকে একটা সময় আক্রমণ করা হয়েছে। বা তামিমের ক্ষেত্রে হয়েছে। সমালোচনায় আমি অন্যায় দেখি না। খারাপ কাজ করলে নিন্দা হবেই। কিন্তু একটা লোক ঘটনা বোঝার চেষ্টা করবে না? একজন কেউ বলল, অমুক খারাপ কাজ করেছে, এরপর চক্রাকারে শুরু হলো–ঝাড়তে থাকো। এই মানসিকতাটাই আমাকে হতভম্ব করে দেয়। কাদের আনন্দের জন্য খেলি তাহলে আমরা? একটা লোক বিচার-বুদ্ধি খাটাবে না! আমার ক্ষোভের ব্যাপারটা আমি বুঝিয়ে বলতে পারছি না হয়তো...

না, ঠিক আছে।

আমি বলছি, ক্রিকেটারদের অন্যায় অবশ্যই ব্যাপার। সেটা নিয়ে সমালোচনা হবেই। কিন্তু সেটা যখন দেশের বড় বড় অন্যায়কে ছাপিয়ে যায়, সেটা দেখে হতাশ লেগেছে। দেশে অনেক কিছু নিয়ে কথা বলা দরকার। দেশের অবকাঠামোর, অর্থনীতি, দুর্নীতি–এসব নিয়ে জোর কথা হওয়া দরকার। কিন্তু আমরা কী দেখি–সব প্রতিবাদ, আলোচনা ক্রিকেট মাঠের পারফরম্যান্স নিয়ে। আমার হতাশা এগুলো নিয়ে। নইলে আমাদের গালি দিল, আর আমি হতাশ হলাম; ব্যাপারটা তা নয়। এই যে মাইকেল ক্লার্ক পারফর্ম করতে পারছে না; লেখা হয়েছে–সে অবসর নিলে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বাঁচে। এখন কথা হলো, অস্ট্রেলিয়ার সবকিছু থামিয়ে দিয়ে অস্ট্রেলিয়ানরা ক্লার্ককে নিয়ে পড়ে নেই। ওটা নিয়ে ব্যস্ত আছে ক্রিকেটার, সাংবাদিক আর সমালোচকেরা। আমাদের সমস্যা হলো, ক্রিকেট নিয়ে সব সেক্টর এখন ব্যস্ত। রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, ছাত্র–সবাই এখন ক্রিকেটে এনগেজ! ক্রিকেট গোল্লায় যাক না, দেশের কোনো

ক্ষতি হবে না। আমাদের আসল উন্নতির জায়গাগুলো নিয়ে ভাবতে হবে। ক্রিকেট যে সেগুলোকে ঢেকে দিচ্ছে, এতে আমার ভয়ও লাগে।

জীবনে বন্ধুদের ভূমিকা কতটা?
এটা আসলে বলে বোঝানো আমার পক্ষে কঠিন। অনেকে বলেন বা এমন একটা ধারণা আছে যে, একজন খেলোয়াড়ের বন্ধুসংখ্যাটা সীমিত থাকা উচিত। বড় জীবন, সফল জীবন চাইলে বন্ধু নাকি কমাতে হয়। হ্যাঁ, যারা বড়, তাদের জন্য হয়তো ওটাই সত্যি। আমি তো অত বড় খেলোয়াড় নই; ফলে আমি বিশ্বাস করি, আমার জীবনে বন্ধুরাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমার জীবনের তাবৎ অর্জনের চেয়ে আমি বড় অর্জন মনে করি এই অনেক বন্ধু তৈরি করতে পারা।

একটু যদি বুঝিয়ে বলেন, বন্ধুরা ঠিক কী ভূমিকা রাখে আপনার জীবনে?
দেখেন, প্র্যাকটিক্যালি কী ভূমিকা রাখে, এ দিয়ে তো বন্ধু হিসাব করা কঠিন। আর এটা আমার মনে হয় না, মানুষ খুব একটা মনে রাখে। বন্ধুত্ব শেষ বিচারে এসব বাস্তবিক ভূমিকার চেয়ে বড় ব্যাপার। তারপরও একটা ব্যাপার ধরুন, আমার ইনজুরি। ইনজুরি তো আমার জীবনের অংশ হয়ে গেছে। ইনজুরিতে পড়লেই আমি আর কাউকে পাশে না পাই, আমার বন্ধুদের পাশে পাই। ওরা আমাকে নিয়ে ঘুরছে, একটা মুহূর্তের জন্য পরিবেশটা ভারী হতে দিচ্ছে না। সমানে আমরা আড্ডা দিচ্ছি। চেষ্টা করি ওই সময় খেলার চিন্তা থেকে দূরে থাকতে। এই বন্ধুদের কল্যাণে আমার ওই সময় খেলাও দেখা হয় না। আমি বলি, আমার বন্ধুরা সুসময়ের চেয়েও দুঃসময়ে বেশি পাশে থাকে।

একজন তারকার জন্য পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কিছু বিড়ম্বনা আছে। তাদের কাছে তারকা হিসেবে উপস্থাপিত হওয়া যায় না। আমি আপনাকে দেখেছি কীভাবে তাদের একজন হয়ে থাকেন। এই তারকা সত্তাটার সুইচ কীভাবে অফ করে দেন?
এখানে একটা মজা আছে। আমি আসলে জীবনের কোনো মুহূর্তেই নিজেকে তারকা ভাবি না। আসলে আপনার সুইচটা তখনই অফ করতে হবে, যখন আপনি ওটাকে অন করবেন। আমি সেই যে ছোটবেলায় ঢাকায় এসেছি, জীবনে কখনো ওই সুইচ অন করিনি। নিজেকে কখনোই তারকা ভাবিনি। তারকা হয়েই ওঠা হয়নি আমার। আপনারা যারা আমার সঙ্গে মিশছেন, তারাও এটা জানেন। আমি আড্ডাবাজ মানুষ ছিলাম, আড্ডা দিয়েই জীবনটা কাটাতে চাই। তাই ওভাবে ভাবার সুযোগই হয়নি কখনো।

এই আড্ডাবাজির কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও আছে। আপনি সাংবাদিকদের সঙ্গে আড্ডা

দেন। বলা ভালো, এই পেশাজীবীদের মধ্যেও আপনার বন্ধু আছে। এটা কেন করেন?

আমি জানি, এই প্রশ্নটা অনেকের মধ্যে আছে। ক্রিকেটাররা বা খেলোয়াড়েরা সাংবাদিকদের সঙ্গে একটা দূরত্ব বজায়ে রাখবে বা একটা ফরমাল সম্পর্ক রাখবে; এটাই রেওয়াজ। এখন আমার মুশকিল হলো, আমি এমনই। আমি একজন সাংবাদিককে সে সাংবাদিক বলে তো মিশছি না। অনেক সাংবাদিক আছেন, এখন ঠিক কোন পত্রিকায় কাজ করেন, তাও সব সময় জানা হয় না। আমি মানুষটাকে ১৫ বছর ধরে চিনি, প্রতিদিন তার সঙ্গে দেখা হচ্ছে; ওই মানুষটার সঙ্গে আড্ডা দিই আমি। সে সাংবাদিক, নাকি উকিল; এটা তো খুব জরুরি না।

আরেকটু পরিষ্কার করে প্রশ্নটা করি। আমি যতদূর বুঝি, আপনার সতীর্থদের মধ্যেও এ নিয়ে মৃদু অসন্তোষ আছে। কেন ক্যাপ্টেন বা দলের সিনিয়র খেলোয়াড় এভাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মিশবে? কেন এত উন্মুক্ত থাকবে? এটা তারা ঝুঁকিপূর্ণও মনে করেন।

আমি এক বাক্যে বলি—হু কেয়ারস! প্রথমত, আমার সতীর্থরা কেউ এমন কিছু মনে করে বলে আমার মনে হয় না। দ্বিতীয় কথা হলো আমার ক্রিকেট সাংবাদিকেরা খেলে দেয় না, আমি সাংবাদিকদের লেখা লিখে দিই না। আমি বুঝি, আমি খারাপ করলে সাংবাদিক লিখবে, ভালো করলেও খারাপ লিখতে পারে; তার সঙ্গে আমার এই আড্ডার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি মানুষের সঙ্গে মিশি। এখন সেই মানুষের মধ্যে সাংবাদিক আছে, ডাক্তার আছে, উকিল আছে, ভ্যানওয়ালা আছে, মুচি আছে; আমি পেশা দেখে তো বন্ধু করি না। ফলে পেশা দেখে বন্ধু বাতিলও করব না। হ্যাঁ, আমার এই আড্ডার কারণে যদি পেশা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আমার খেলা বা আমার দলের খেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আমি যদি কনফিডেন্সিয়াল কিছু ফাঁস করে দিই; সেটা নিয়ে অভিযোগ চলতে পারে। কিন্তু আমি এটা বলতে পারি, আমি জানি, কোথায় কী বলতে হয়!

আপনার বন্ধু হওয়ার শর্ত কী?

আমাকে আপনি বন্ধু ভাবলে আমি আপনার বন্ধু। কোনো শর্ত নেই, কোনো চাওয়া নেই, কোনো হিসাব নেই। আমি বলতে পারি, আমার যত বন্ধু, এত বন্ধু, খেলোয়াড়দের কারো তো দূরে থাক, আপনি কারোরই খুঁজে পাবেন না। আপনি নড়াইলে আমাদের বন্ধুদের দেখে এসেছেন; ৬০-৬৫ জনের বাহিনী। মিরপুরে আছে, দেশের বাইরে আছে, দেশে আছে। কারোর সঙ্গে কোনো শর্ত নেই, কোনো ফিরতি চাওয়া নেই।

ধর্মীয় জীবনযাপনের সঙ্গে এই পেশাগত জীবনকে কীভাবে মেলান?

আমাদের ধর্মে তো এই ব্যাপারে কোনো বিরোধ নেই। ইসলাম একটা পরিপূর্ণ

জীবনদর্শন। হাশিম আমলা সেটা পুরো অনুসরণ করেই তো ক্রিকেট খেলছে। পরিবার, সংসার, পেশা–সব ক্ষেত্রেই আমাদের ধর্মে পরিষ্কার নির্দেশনা আছে। ধর্ম পালন করে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, উপকৃত হয়।

আপনি কি নিজে ধর্মের দেখানো সব পথ মেনে চলেন?
সেই দাবি করার কোনো সুযোগই নেই। আমার ইচ্ছা আছে। ইচ্ছা আছে নবী করিম যেভাবে জীবনযাপন করেছেন, ধর্মে যা বলা হয়েছে; সেভাবে জীবন কাটানোর। এখনো আমি তার ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারিনি। তবে ইচ্ছা আছে, চেষ্টা আছে।

মাশরাফির এই জীবন নিয়ে খুশি? জীবন নিয়ে আফসোস আছে?
খুবই খুশি। আমার জীবনে আফসোস বলে কিছু নেই। মানুষের জীবনে আপনি চাইলেও সব পাবেন না। দেখেন, যদি এভাবে ভাবি যে, সেই ছোটবেলা থেকে এই যে কত কত অপারেশন হয়েছে এই শরীরে; এরপরও তো ক্রিকেট খেলার কথা না। এর পরও যে আমি ক্রিকেট খেলছি, এটা তো আল্লাহর একটা রহমত। এই রহমতকে অস্বীকার করার ক্ষমতা আমার নেই। আমার জীবনের নীতি হলো, সামনের কোনো কিছু নিয়ে আমি অতিরিক্ত পরিকল্পনা করি না এবং যা ফেলে এসেছি, তার কিছু নিয়ে আমি শোক করি না। আমি সব সময় ভাবি, যা হয়েছে, এটাও তো না হতে পারত। আজ আপনি আমাকে নিয়ে বই লিখছেন, এই সম্মানটা যে পেলাম; এটাই তো অনেক। এই যে কত মানুষ চেনে, এটাই তো অনেক। আমি শুধু আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি। আমি শুধু ভাবি, আমি যে এত রহমত পেয়েছি, আমি যেন এর ভালো ব্যবহার করতে পারি।

আপনার চিন্তাভাবনা লোকদের একটু বিস্মিত করে, ইতিবাচক অর্থে। আপনি যে গভীর জীবনবোধের কথা বলেন, সত্যি কথা বললে আপনার আগের ভাবমূর্তির সঙ্গে এটা ঠিক যায় না। আপনি ছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেটের 'পাগলা'। হয়ে গেছেন এত চিন্তাশীল একজন মানুষ। এটা কি পরিকল্পিতভাবে হলেন?
প্রথমত তো মানুষের বয়সের সাথে সাথে চিন্তায় একটা পরিণতি বোধ আসে। কেউ দেখে শেখে, কেউ পড়ে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে। আমার জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত তো কম এল না। শুধু ইনজুরির কথাই যদি বলি, তাও তো জীবনকে কতবার কাছ থেকে দেখলাম। কতবার অপারেশন টেবিলে উঠলাম; ওটা তো জীবনকে অনুভব করার জায়গা। প্রতিটা ইনজুরির পর, অপারেশনের পর আমি মানুষকে দেখেছি, আমি ভেবেছি। কে আমাকে কীভাবে দেখেছে; মানুষ হিসেবে কেউ দেখে, কেউ ক্রিকেটার হিসেবে দেখে। এই দেখার ভঙ্গি থেকেও তো অনেক কিছু শেখা যায়। আর আমার যে 'পাগলা' ক্যারেক্টারের কথা বললেন, সেটা কিন্তু চলে যায়নি। আমি

ও রকমই আছি। এখনো তো আমি বাড়ি গেলে লুকোচুরি খেলি।

দুটো সত্তা পরস্পরের সঙ্গে বিরোধ তৈরি করে না?
নাহ্। দুটোই তো সহজ। আমি সবার সাথে আমার মতো করে মিশি। আমি মনে করি, যে আমাকে ভালো জানে তার কাছে যেন খারাপ হয়ে না যাই। আর যে খারাপ জানে, তার দৃষ্টিভঙ্গি জোর করে বদলানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। ফলে সহজ করে সব ভাবলেই হলো, বেশি চেষ্টা না করলেই হলো। জীবন-দর্শন যদি বলেন, আমি অনেক ভেবে দেখেছি, জীবনের একটা কথাই সত্যি–একসময় মরে যেতে হবে। ৫০০ উইকেট নিয়ে ফেলব; সঙ্গে যাবে না। ১০ কোটি টাকার মালিক হব; সঙ্গে যাবে না।

টাকা তো জীবনে বদলে দেওয়ারও ক্ষমতা রাখে।
শুধু জীবন কেন, সমাজকেই তো বদলে দিচ্ছে। টাকার টানে আমরা সব যার যার শেকড় ছেড়ে আজ কে কোথায়! টাকা বিচ্ছিন্ন এক গাদা মানুষকে ঢাকা শহরে নিয়ে এসেছে। কারো সঙ্গে কারো সম্পর্ক নেই। একবার ভেবে দেখুন, আপনার পাশের বাসায় একটা মানুষ যন্ত্রণায় মারা যাচ্ছে; আপনি হয়তো জানেনও না। এই যে সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে না মানুষে মানুষে; কেন? ব্যস্ততা। কিসের ব্যস্ততা? টাকার।

এবার হালকা করে ফেলা যাক কথাবার্তা। প্রিয় পোশাক কী?
পোশাক-টোশাক নিয়ে তো ভাবি না। যখন যা সামনে পাই পরি। তেমন কোথাও তো যাই না। ধরেন পার্টি-টার্টিতে যাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। এ ব্যাপারে আমাকে অসামাজিকও বলতে পারেন। আমার সবকিছু আমার গণ্ডিতে। তাই এখানে আমি যা পোশাক পরি, তাই প্রিয়। কেউ সাক্ষাৎকারে জিজ্ঞেস করলে জিন্‌স আর টি-শার্টের কথা বলি; এটা বেশি পরি বলে!

কিন্তু আমি জানি লুঙ্গির প্রতি বিশেষ দুর্বলতা আছে।
ওহ হো। এটা বলা যাবে? আহা। লুঙ্গি পরে তো সব জায়গায় যেতে পারি না বলে বলিনি। নইলে লুঙ্গি তো আমার এক নম্বর পছন্দ। নড়াইলে গেলে তো প্যান্ট-শার্ট আর পরতে চাই না। আমার সবচেয়ে আরামের সময়টা লুঙ্গি পরা সময়। ইদানীং অবশ্য একটু সমস্যা হয়, লোকজন খুব ছবি তুলতে চায় বলে নড়াইল গেলেও সেজেপরে থাকতে হয়। নইলে লুঙ্গির ধারেকাছে কেউ নেই।

প্রিয় খাবার?
এটা কিন্তু অদ্ভুত। ১০ বছর আগেও আমার প্রিয় খাবার যা ছিল, এখনো তাই আছে–ভাত, ডাল, আলুভর্তা আর ডিম ভাজি। এর মধ্যে কত খাবার খেলাম,

আমার এই টেস্ট বদলায়নি। আর আমি বছরের পর বছর, প্রতিদিন তিন বেলা এই খেয়ে থাকতে পারি। আমার বাসায়ও লোকজন বিরক্ত; আমি বিরক্ত হইনি ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত। আসলে ক্ষুধা লাগলে আমার ডাল, আলুভর্তা আর ডিম ভাজির কথা মনে হয়। দুটি জিনিস খাই না; শুঁটকি আর ডালের বড়ি। এ ছাড়া আমি কিন্তু খাদক মানুষ। তবে অনেক কিছু খাই না; ওই একটা মেন্যুই সেরা।

অবসরে কী করেন?

ঢাকায় থাকলে তো বাচ্চারাই অবসরটা পুরো নিয়ে নেয়। মেয়েটা তো সব সময় আমার কাছে থাকে। তার প্রতিটা ব্যাপার আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হয়। আমি জীবনে কারো ভক্ত যদি হয়ে থাকি, সেটা আমি আমার মেয়ের ভক্ত। ফলে তার সাথে থাকাটাই উপভোগ করি। ছেলেটারও বয়স এই নয় মাস। ওদের কাছেই থাকি। আর আড্ডা তো আছেই।

মুভি দেখেন না?

আসলে সেভাবে দেখা হয় না। আমাদের এখানে তো লোকজন প্রচুর হিন্দি মুভি দেখে; আমার দেখা হয় না। একেবারে কেউ দেখতে থাকলে চোখ পড়লে দেখি। তবে নিজে যেচে দেখলে বাংলাদেশি বাংলা সিনেমা দেখি। এ নিয়ে রাসেল-রাজ্জাক ওরা এখনো আমাকে খোঁচায়। সুযোগ পেলে এখনো দেখি। আমার বউ বলে, নতুন সিনেমা দেখো। আমি ওই পুরোনো বাংলা সিনেমা দেখি। জসীমের সিনেমা দেখি, মান্নার সিনেমা দেখি। আসলে সিনেমা নিয়ে আমার খুব আগ্রহ বা জানাশোনা নেই। তাই যেটা বুঝি, বাংলা ভাষাটা বুঝি; তাই এসব দেখি।

হলে গিয়ে শেষ সিনেমা দেখেছেন কবে?

সত্যের মৃত্যু নেই; সালমান শাহর সিনেমা। নড়াইলেরই হলে।

গান কেমন শোনেন?

অনেক অনেক অনেক।

জেমসের নাকি প্রবল ভক্ত?

তা তো বটেই। আমরা যে পুরো সার্কেলটা একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছি, আমরা সবাই জেমসের ভক্ত। আমরা বলতাম, গুরু। এখনো আমি তার দারুণ ভক্ত। এ ছাড়া আইয়ুব বাচ্চু আর হাসান; এ দুজনেরও দারুণ ভক্ত। আমাদের প্রজন্মে এই তিনজনের ভক্ত আপনি বেশি পাবেন। তবে বেশির ভাগ লোক জেমস আর বাচ্চুর সব গান পছন্দ করলেও হাসানের সব গান পছন্দ করে না। আমি তিনজনের সব গানেরই ভক্ত। তবে জেমস একটু আলাদা।

জেমস বা বাচ্চু ভাইয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে কখনো?
বাচ্চু ভাইয়ের সঙ্গে অনেকবার কথা হয়েছে। বাচ্চু ভাইয়ের সঙ্গে আমি গানও করেছি। ক্রিকেট বোর্ডের একটা অনুষ্ঠান ছিল। আমরা সব খেলোয়াড় ছিলাম। ওখানে 'এক আকাশ তারা তুই' গানটা বাচ্চু ভাইয়ের সঙ্গে করেছিলাম। জেমস ভাইয়ের সঙ্গে একবারই দেখা হয়েছে। এই যে মেরিল প্রথম আলো অনুষ্ঠানে গেলাম; ওখানে উনি একটা পুরস্কার পেলেন। আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, মঞ্চে উঠে বলি, আমি আপনার পাগল ভক্ত। কিন্তু সুযোগ তো পেলাম না। সুযোগ পেলে 'গুরু' বলে ডাকতাম।

বই বা পত্রিকা পড়েন?
বই পড়ি না। পত্রিকা পড়ি। খেলার খবরের জন্য দেশের, দেশের বাইরের পত্রিকা প্রচুর পড়ি। এ ছাড়া দেশের পত্রিকায় অন্যান্য খবরও পড়ি। খুব যন্ত্রণা লাগে খেলার বাইরের কিছু খবরাখবর পড়লে। রাজনীতির নিউজ পড়ি।

আপনার পারিবারিক সূত্রে একটা সমৃদ্ধ রাজনৈতিক ইতিহাস আছে। নানা ডাকসাইটে রাজনীতিবিদ ছিলেন। বাবা ছাত্ররাজনীতি করেছেন, ছাত্র সংসদ নির্বাচনে নেমেছেন, জিতেছেন। আপনার রাজনীতি করার ইচ্ছে আছে নাকি?
১৫ বছর ধরে তো ক্রিকেটই খেলছি। ফলে রাজনীতি নিয়ে সেভাবে ভাবার সুযোগ হয়নি। তবে আমার তো ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা কম। কাল থেকে অন্য রকমও ভাবতে পারি। আমার ক্যারিয়ার তো প্রায় শেষ দিকে; এটা অস্বীকার করা যাবে না; অন্তত শুরুর দিকে তো না। তারপরও আমি কিন্তু কোনো পরিকল্পনা করিনি। অনেকেই বলে, পরিকল্পনা করো। আমি করি না। রাজনীতিই যদি আমার জন্য নির্ধারিত থাকে, হয়তো তাই করব।

এমনিতে রাজনীতি আকর্ষণীয় মনে হয়? অনেকে তো নোংরা জগৎ বলে এড়িয়ে থাকতে চায়।
মোটেও না। রাজনীতি দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। আমার কাছে আকর্ষণীয় তো মনে হয়। রাজনীতি আমাদের সবচেয়ে প্রয়োজনের জায়গা। দেখেন এই দেশটার ভালো কিছু করতে হলে রাজনীতিবিদেরাই পারেন এসব ঠিক করতে। আমার ধারণা হয়তো ঠিক না, হয়তো আমি জ্ঞানী না। আমি এটা বুঝি, দেশটাকে বদলালে রাজনীতিবিদেরাই পারবেন। ক্রিকেট দিয়ে, খেলা দিয়ে দেশ বদলাবে না; এগুলো সৌন্দর্য বাড়াবে। দেশ রাজনীতিবিদেরাই সুন্দর করবেন।

আপনার পক্ষপাত কোন দলে?
পক্ষপাত তো আছেই। বইয়ের সাক্ষাৎকারে প্রকাশের সময় আসেনি। এটা একটু

সময় নিয়ে প্রকাশ করি। এখনো তো রাজনীতিতে আসছি না।

আপনাকে অনেকে রাজনীতিতে দেখতে চায়।
দেখতে চাইলে তো হয়তো চলেও আসব। হা হা হা...। না, আবারও বলি, আমি তো আমার ভবিষ্যৎ ঠিক করতে পারি না। সেটা পারলে সবার আগে মৃত্যুকে কিনে রাখতাম। এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে রাজনীতি নয়, মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ করতাম। তাই যখন মানুষ পারে না, বাকি কিছু নিয়ন্ত্রণের আশা করে লাভ নেই।

ভালো সময়ে তো অনুপ্রেরণা দরকার হয় না। খারাপ সময়ে অনুপ্রেরণাটা কোথা থেকে নেন?
আমি যেটা বুঝি, জীবনেই ভালো সময় আপনার একটানা থাকবে না। আবার খারাপ সময়ও স্থায়ী হবে না। এই উত্থান-পতন থাকবে। সেখানে ক্রিকেট তো অনেক ছোট ব্যাপার। এখানকার খারাপ সময় নিয়ে এত ব্যথিত হওয়ার কারণ নেই। আমি বরং খারাপ সময়টাকে অন্যভাবে দেখি। এটার দরকার আছে। এই সময়ে থেমে একবার ভেবে নেওয়া যায়। খারাপ সময়ে আপনি শিখতে পারবেন, বুঝতে পারবেন। ভালো সময় বরং মানুষ পাজলড হয়ে যায়। সব ভালো চললে, টানা ভালো মানুষ মূল কথাগুলো ভুলে যায়। তখন অতি আত্মবিশ্বাস মানুষকে অনেক এলোমেলো পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করে। আমি খারাপ সময়ে নয়; ভালো সময়ে ভয় পাই। কারণ, এই সময়ে বেসিক মনে রাখা, আমার মূল কাজ মনে রাখা, মাথা ঠান্ডা রাখা বেশি জরুরি।

কতটা বদলালেন?
এক বিন্দুও বদলেছি বলে মনে হয় না। বদলানোর কোনো প্রয়োজন তো দেখিনি। হ্যাঁ, ক্রিকেট নিয়ে ভাবনায় একটা পরিবর্তন সম্প্রতি এসেছে। মাঠে কী পেলাম, কী অর্জন করলাম, উইকেট কয়টা হলো; এসব ভাবতাম একসময়। এখন এসব নিয়ে একদম ভাবি না। এসবের প্রতি কোনো মায়া নেই। একটা সদ্য খেলা শেখা ছেলে যেমন আনন্দ নিয়ে ক্রিকেট খেলে এখন আমি তাই করি। ফাঁকা মাথায় মাঠে নেমে আনন্দের জন্য ব্যাট করি, বল করি। স্কোরবোর্ড দেখি না।

এই বৈরাগ্য কীভাবে এল?
দাদা, বৈরাগ্য না। আমি ছোটবেলায় একবার যখন ক্রিকেট নিয়ে ভাবতে শিখেছি, আমার স্বপ্ন ছিল, বাংলাদেশের জার্সি পরব। এখন আমি জানি, আর বেশি দিন এটা পরতে পারব না। প্রতি ম্যাচ খেলতে নামার আগে এই আনন্দটা পাই যে, আজ অন্তত পরছি এটা। কদিন পর আমি চাইলেও আর এই জার্সি পরতে পারব না।

এই জার্সিটা যতক্ষণ পরছি, খুব উপভোগ করতে চাই।

আপনাকে লোকে বলে পিপলস স্টার। দীর্ঘ এই ক্যারিয়ারে কোনো বিতর্ক গায়ে লাগেনি। এটা কীভাবে ধরে রেখেছেন?
দেখেন, নিজেরে এ রকম বিশুদ্ধ মানুষ মনে করি না। জীবনে অন্যায় করিনি, বিতর্ক তৈরি করার মতো কাজ করিনি; এটা সত্যি না। করেছি, হয়তো সামনে আসেনি। এটুকু বুঝি যে, কোথায় কী করা উচিত, বলা উচিত। সেটা মেনে চলি। নইলে কিছু বিতর্কের মতো কাজ করিনি; তা পৃথিবীর কোনো মানুষের পক্ষে তো দাবি করা কঠিন।

কিন্তু আপনাকে বিতর্কের উর্ধ্বে বলে ধরে নেওয়া হয়।
এটা হয়তো আপনি আমাকে অংশত দেখছেন বলে। শুধু ক্রিকেটার হিসেবে দেখছেন বলে মনে হচ্ছে। আমি জানি না, বাইরে আমি কী করেছি। মানুষ যা দেখতে চায়, তাই দেখে। আপনি চাচ্ছেন, আমাকে এমন দেখতে। হ্যাঁ, একটা কথা বলতে পারি, খেলার সঙ্গে আমার জীবনে কখনো অসততা করিনি। মাঠটাকে পবিত্র মনে করেছি। এটা আমার রুটিরুজি। এই খেলা দিয়ে আমার দুটো গাড়ি হয়েছে, একটা ফ্ল্যাট হয়েছে, কিছু টাকাও আছে ব্যাংকে। খেলাধুলাই আমাকে এখানে এনেছে। ফলে এখানে সৎ থাকাটা জরুরি। সেটা আমি মনে করি, সব পেশাতেই খুব জরুরি। তবে মূল যেটা প্রশ্ন ছিল, বিতর্ক নেই; বিতর্ক হয়তো এ মুহূর্তে উপস্থিত নেই, কিন্তু থাকার মতো উপাদান নেই, সেটা আমি মনে করি না।

আপনি কি বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালোবাসা পাওয়া খেলোয়াড়?
আমি মানুষকে ভালোবাসি, এটা জানি। এটা জানি, আমার জন্য অনেক মানুষ দোয়া করেন। নইলে আমি এভাবে খেলে যেতে পারতাম না। আর সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা? এই হিসাব কে করল! এত হিসাব ভালো না। যত হিসাব করবেন, ততই পতনের দিকে এগোবেন।

অন দ্য ফিল্ড আপনার চেয়ে সিরিয়াস ক্রিকেটার আর নেই। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আপনি খেলাটাকে কি কখনোই সিরিয়াসলি নিতে পেরেছেন?
ওই যে অনূর্ধ্ব-১৭ জাতীয় দলে যখন ডাক পেলাম, তখন ভেবেছিলাম, খেলাটায় একটু সিরিয়াস হলাম। তারপরও আসলে সেভাবে সিরিয়াস হওয়া হয়ে ওঠেনি। আমার কাছে এটা জীবনের মজার একটা ব্যাপারই থেকে গেছে। যখন খেলেছি, তখনো বারবার মনে হয়েছে, এখনো মনে হয়–আমার জন্য নড়াইলই জায়গা। ঢাকা বা পৃথিবীর অন্য কোনো জায়গা আমার জন্য নয়। ফলে এসব নিয়ে খুব সিরিয়াস হয়ে উঠতে পারিনি আমি। আমার এই যে ক্যারিয়ার জোড়া ইনজুরি, এর

একটা কারণ হয়তো এটা।

একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন এটা?
আমি তো রেস্টলেস থাকতাম। বাড়ির কথা মনে পড়লেই দৌড়ে চলে যেতাম। প্র্যাকটিস শেষে বা ম্যাচ শেষে মানুষ বিশ্রাম নেয়। আমি বাড়ির কথা মনে হলে বাসে চেপে বসতাম।

এটা শরীরটাকে শুরুতে এলোমেলো করে দিয়েছিল, বলছেন?
তা তো এখন মানতেই হবে। ম্যাচ খেলার পর, একটা ট্যুর শেষ করে ফেরার পর একটু বিশ্রাম চায় শরীরটা। আমি রাতের বাসে জার্নি করে বাড়ি চলে যাই। এটা শরীরে প্রভাব ফেলেছে, শরীর বিদ্রোহ করেছে।

হঠাৎ বাড়ির কথা মনে হওয়ায় সব ফেলে চলে গেছেন বাড়িতে!
এমনও হয়েছে যে, আমি একটা সফর শেষ করে এসে চব্বিশ ঘণ্টা সময় পেয়েছি; ওই সময়ে বাড়ি চলে গেছি। একটা ঘটনা বলি। আমি আফ্রো-এশিয়া কাপ খেলে ফিরলাম। পরের দিন শ্রীলঙ্কা সফরে জাতীয় দল রওনা দেবে। পরের দিন সকালে ফ্লাইট। আমি দুপুর দুইটায় ঢাকায় নেমেছি। বিমানবন্দর থেকে আর ফিরিনি। আবার বিমান ধরে যশোর হয়ে নড়াইল চলে গেছি। গিয়ে তিন-চার ঘণ্টা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে আবার চলে আসছি।

এখনো কি নড়াইল একই রকম টানে?
মনে হয় আগের চেয়েও বেশি টানে। এখন আরও বেশি মনে হয়, এই ঢাকা আমার নয়। আমি নড়াইল চলে যেতে চাই। কিন্তু বাচ্চারা আছে, স্ত্রী আছে; সব ফেলে চাইলেই এখন চলে যেতে পারি না।

কোনটা বেশি টানে–নড়াইল, নাকি সংসার?
নড়াইল। নড়াইল।

সংসার ছেড়ে নড়াইল গিয়ে থাকতে পারবেন?
নাহ্। তা পারব না। বাচ্চা দুটোকে ছেড়ে থাকতে খুব কষ্ট হয়। ভালো হতো, সব নিয়ে নড়াইল থাকতে পারলে। স্বপ্নটা এ রকম যে, এই ঢাকায় আমার যা কিছু ভালো লাগার, তার সব নিয়ে নড়াইল স্থায়ী হতে পারতাম! বুঝি, তা হয়তো সম্ভব হবে না। বাচ্চাগুলোর ভবিষ্যৎ আছে।

রানার ব্যাপারে আপনি ইদানীং বেশি কথা বলতে চান না। একটু বলবেন?

আসলে বলতে গেলে কষ্ট বেশি লাগে। তাই বলে কষ্ট বাড়াতে চাই না। ক্রিকেট-জগতে আমার প্রথম কাছের বন্ধু ছিল রানা। আসলে...আসলে খুব শকিং ছিল। আমি এখনো নিতে পারি না।

বউ কেমন?
বউ! ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। আসলে সেই কলেজ থেকেই তো একসাথে। বন্ধু ছিলাম তো। বন্ধু হিসেবেই তো দেখি প্রায় সময়। তাই কেমন বউ, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।

সিনেমায় যেমন বলে–এই এক প্রেম, এক বিয়ে, এক জীবন? নাকি আরও প্রেম ছিল?
এটা কি বইতে ছাপা হবে?

হ্যাঁ, হবে।
আচ্ছা, ঠিক আছে। ভয়ের কী আছে! ছিল। আরেকটা প্রেম ছিল।

সেই প্রেমিকাকে বিয়ে করলেন না কেন?
সেটা আসলে বেশি ছোট ছিলাম; অল্প সময়ের প্রেম। বাসা থেকে জেনে রাজি হলো না।

এই প্রেমটা টিকে গেল কী করে?
এটা শুরুতেই বাসায় বলে দিয়েছিলাম। ফলে প্রেম ভাঙার সুযোগ হয়নি।

কীভাবে হলো প্রেমটা?
আসলে ছোটবেলা থেকে চিনতাম তো।

বাল্যপ্রেম তাহলে?
নাহ্। মানে, বাল্যকালে চিনতাম। তবে প্রেমে পড়েছি কলেজে ওঠার পর। তারপর বললাম...

আপনি বললেন? নাকি ভাবি? আমি শুনেছি, ভাবি নাকি আগে থেকে...
না, না। আমি আগে বলেছি।

সরাসরি 'আই লাভ ইউ' বলেছেন?
না, মানে...সরাসরি বলা হয়নি। তানিম নামে একটা বন্ধু ছিল। তাকে দিয়ে আর

কী চিঠি পাঠিয়েছিলাম।

একবারে রাজি হয়ে গেল?
নাহ্। একটু একটু করে। তবে আমিও একবারে তো আগাইনি। ধাপে ধাপে। এসবের কিছু কৌশল আছে। দুজনই ওজন ধরে রাখার চেষ্টা করে আর কী!

মেয়ের কথা বলেন। আপনি তো মেয়ে-অন্তঃপ্রাণ। জন্মের সময় কোথায় ছিলেন?
হাসপাতালে। হুমায়রার জন্মঘটনা মনে করলে আমার মনে হয়, আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্য করেন। ২০১১ বিশ্বকাপ খেলতে পারিনি। আল্লাহ আরেকটা পরীক্ষা এদিকে রেখে দিয়েছিলেন। আমার স্ত্রীকে ডাক্তাররা ক্লিনিক্যালি ডেড ঘোষণা করেছিলেন। সেই অবস্থা থেকে...

কী হয়েছিল?
এক রাতের মধ্যে বিলিরুবিন বেড়ে ১২ পার হয়ে গেল। পরদিন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচ। আমি মাঠে থাকলে ওর এই অবস্থা কারো খেয়াল করতে পারার কথা না। মানুষকে নিয়ে আল্লাহর একটা মহাপরিকল্পনা থাকে।

ওটিতে গিয়েছিলেন?
থাকতে পারিনি। তখনো আমার বন্ধুবান্ধবরা খবর পেয়ে এসে পারেনি। আমি রক্তের জন্য দৌড়াচ্ছিলাম। টানা ২৪ ব্যাগ রক্ত দিয়েছে। ৬ ব্যাগ প্লাজমা দিতে হয়েছে। সবাই তখনো নড়াইলে। আমি রাতে ওর শরীর খারাপ দেখে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। সারা রাত স্যালাইন দিল। সকালে টেস্ট করে দেখে বিলিরুবিন আরও বাড়ছে। তখনই ডাক্তাররা বুঝে ফেলেছেন, অবস্থা খারাপ। পেটে হুমায়রা তখন মাত্র ৭ মাস; একেবারেই প্রিম্যাচিউরড।

আপনাকে জানানো হলো আসল অবস্থা?
আমার এক দাদি, আব্বার ফুফু তো বড় গাইনোকোলজিস্ট। উনি লিড করছিলেন। আরেকজন বড় গ্যাস্ট্রোলিভার বিশেষজ্ঞ এলেন। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, ‘বাবা, তোমাকে কীভাবে বলি। তারপরও তোমার জানা উচিত।’ আমি ভাবলাম, বাচ্চার কোনো একটা সমস্যা। বলল, ‘আমরা তোমার বাচ্চাকে বাঁচাতে পারব। মায়ের অবস্থা ভালো না। বলা খুব কঠিন।’ দাদি বলল, একটা ঝুঁকি নিয়ে অপারেশন করে ফেলা যায়। যদি মাকে বাঁচানো যায়। দাদিই ডেকে বলল, ‘ডোনার রেডি করো। আর প্লাজমা ম্যানেজ করো।’ বন্ধুরা খবর পেয়ে গেছে ততক্ষণে।

আপনি প্লাজমা আনতে গেলেন?

এই প্লাজমা নিয়ে ফিরে আসলে জীবনে প্রথমবারের মতো মনে হয় সুমীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা বুঝতে পারলাম। আসলে আমার মতো ছেলের কী হয়? ওভাবে তো স্ত্রীকে কোনো সময়ই দিই না। কখনো সেভাবে একসাথে ঘুরতে যাওয়া হয়নি, হানিমুনে যাইনি। অনেকেই তো করে। আমার করা হয়নি। আমি প্লাজমা নিয়ে এসে দেখি ওকে ওটিতে নিয়ে যাবে। হুইলচেয়ারে করে লিফটে ঢোকাচ্ছে। আমি গিয়ে দাঁড়াতেই বলল, 'কোনো অন্যায় করে থাকলে মাফ করে দিও।' ওই সময় আমি...আমি...আসলে ওই সময় আমি মনে হয় প্রথম অনুভব করতে পারলাম, সুমী আমার কে। আমি ওর সামনে কাঁদতে পারি না। পেছনে এসে হুইলচেয়ার ধরলাম। দাঁড়াতে পারছিলাম না। এটা আসলে...

থাক, তাহলে।

আরেকটা ব্যাপার বলা দরকার। একজন মানুষের কথা বলা দরকার। ওনার নাম জানি না, নম্বর নিইনি। আমি আরেকটা ব্যাগ প্লাজমা আনতে গেলাম। এক ব্যাগ প্লাজমা তৈরি করতে ছয় ঘণ্টা সময় লাগে। ভদ্রলোকও রেড ক্রিসেন্টে এসেছিলেন একটা প্লাজমা নিতে; ওনার হাতে ছিল। আমার এই প্রয়োজন শুনে ওটা আমাকে দিয়ে দিলেন। আমি খুঁজে পাই না, মানুষটাকে। ওনার অবদানটা ভুলব না।

পরের প্লাজমা নিয়ে এসে কী দেখলেন?

এসে দেখি হুমায়রা আব্বার কোলে, সুমী আইসিইউতে। টানা ১১ দিন আইসিইউতে। ডাক্তাররা রোজই যা বলে, তাতে আমরা শুধু সবচেয়ে খারাপ খবরের জন্য অপেক্ষা করি। এর মাঝে বুকে ব্যথা। হার্টে নাকি প্রবলেম। আমরা অবশ হয়ে বসে থাকতাম। শেষ পর্যন্ত আল্লাহই ওকে ফিরিয়ে দিলেন। এই জন্য মাঝে মাঝে বলি, আল্লাহ মনে হয় এমন একটা ঘটনা সামলাতে হবে বলেই আমাকে বিশ্বকাপ খেলতে দেননি।

আপনার মতো একজন মানুষের জীবনে স্ত্রীর অবদানটা আসলে কতটা?

দাদা, আমাকে আপনি তো চেনেন–বাউণ্ডুলে টাইপের লোক। জীবনের বড় একটা অংশ তো হইচই করেই কাটালাম। সংসারে সময় দিইনি, স্ত্রীকে সময় দিইনি। কখনো আসলে মনে আসেনি, এগুলোরও দরকার। অন্যায় করেছি। আমার মতো একজন মানুষের সংসার করার জন্যই শুধু সুমীর কাছে আমার আজীবন কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সুমী আমার চেয়ে অনেক যোগ্য। আমি বরং ঠিক সংসারের উপযুক্ত না।

আপনার ক্রিকেট-জীবনটা নিশ্চয়ই সহজ হয়ে গেছে, তার কল্যাণে?

ও আমাকে কখনো টের পেতে দেয়নি, সংসারটা আসলে কী। এমনও হয়েছে,

মেয়েটা অসুস্থ; ও একটা পর্যায় পর্যন্ত আমাকে টের পেতে দেয়নি। আমার খেলার কোনো ক্ষতি হয়, সেটা তো হতে দেয়নি। আজ পর্যন্ত সংসার, সন্তানদের নিয়ে সিরিয়াস কিছু আমাকে ভাবতে হয় না।

এখনো কি বাউণ্ডুলেই আছেন? নাকি বদলাচ্ছেন?

বদলাতে হবে, বদলাতে হবে। এভাবে চলে না। আমি অনেক অন্যায় করেছি। অন্যায় বলতে, ওদের প্রাপ্য সময়টা দিইনি; রাত-বিরাত পর্যন্ত শুধু আড্ডা দিয়েছি। এটা ঠিক হয়নি। এখন বুঝি। আমি সুমীকে বলি, আমি একটা নিয়মের মধ্যে আসার চেষ্টা করছি। একটা ব্যালান্স করতে হবে জীবনে। শেষবিচারে এই পরিবারই শেষ কথা। তাদের প্রতি এত অবহেলা করে হয় না। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি, ওর মতো স্ত্রী পেয়েছি বলে। ওর জায়গায় দুনিয়ার কোনো মেয়ে এসব সহ্য করত না। জীবনে কখনো অসততা করিনি, কখনো ঠকাইনি; তবে ওর যা প্রাপ্য ছিল আমার কাছ থেকে, সেই সময়টা পায়নি।

মেয়ে হওয়ার পর কী বদলাল জীবনের?

সবচেয়ে বড় কথা, জীবনের কাঠামোটা বদলে গেছে। এখন একটা বন্ধন তৈরি হয়েছে। এই বন্ধনটার দরকার ছিল। আমার জীবনটা খুব এলোমেলো ছিল, অনিয়মে ভরা ছিল। একটা কোথাও ফাইন লাইন দরকার ছিল। মেয়েটা আর সুমী সেটা টেনে দিতে পেরেছে। এটা মানুষের জীবনে খুব জরুরি। একটা জিরো পয়েন্ট দরকার।

মেয়ে তো বাবা বলতে পাগল?

হ্যাঁ, শাসন করে। ছেড়ে থাকতে পারে না। মাঝে মাঝে তো দেখেন, মাঝে চলে যায় সঙ্গে। খেলা থাকলে হোটেলে যেতে হয়। খুব আপত্তি করে। শেষমেশ নিজেই বলে, 'না গেলে কি চাচ্চুরা মারবে?' মারবে বুঝলে ছাড়ে। এটাই এখন সবচেয়ে বড় ব্যাপার। ছেড়ে থাকা যায় না।

ছেলে হওয়ার সময় বা জন্মানোর পরও তো একই রকম কিছু কষ্ট হলো?

ছেলে জন্মানোর সময় তো তেমন সমস্যা ছিল না। তখন আমি গেলাম ইনচিয়নে এশিয়ান গেমস খেলতে। এসব সময় না ওই জেমিদের অভিযোগগুলোর কথা মনে পড়ে। আমি হয়তো বড় খেলোয়াড় না। কিন্তু ছেলে হবে, এ জন্য ছুটি চাইতে তো পারতাম। আজ এবি ডি ভিলিয়ার্সের বাচ্চা হবে, কত দিন ছুটি নিল। আরও কতজন দেখবেন। আমাকে বোর্ড থেকে বলেছে কাজটা করতে; আমি ভেবেছি, এটাই তো কাজ। এশিয়ান গেমস খেলে দেখেছি মায়ের কোলে ছেলেটা।

ছেলেটাকে অসুস্থ রেখেই তো অস্ট্রেলিয়া গেলেন?

আমি রেখে গেলাম টাইফয়েড দেখে। ২১টি ইনজেকশন দিতে হবে। ছেলে হাসপাতালে, আমি বিশ্বকাপ খেলছি। লোকে জানে না, এর মধ্যে ওর আরেকটা কমপ্লিকেসি ডেভেলপ করল। শুধু ওপরের দিকে তাকিয়ে কাঁদত। আর কোথাও তাকাত না। ডাক্তাররা দেখে বলল, ব্রেনে সমস্যা মনে হয়। সুমী অনেক কান্নাকাটি করেছে। তবে বারবার বলেছে, 'আমি দেখছি, দরকার হলে বলব। তখন আসবা।' আমি রুমে কান্নাকাটি করি। রিয়াদ ছাড়া কাউকে বুঝতে দিইনি। পরদিন খেলা আমার। মনে মনে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলাম, চলে আসব হয়তো। দাদা, এরপরও যখন শুনি যে, আমি দায়িত্ববান না; মাথাটা খারাপ লাগে। বোর্ড অনেক হেল্প করেছে। তারপরও শুক্র-শনিবার বলে এমআরআই হলো না। আমি তো বাবা। আমি সহ্য করি কীভাবে।

টিম একদমই টের পায়নি?

রিয়াদ ছাড়া কেউ না। তামিম হয়তো অনুমান করেছে। কাউকে বুঝতে দিইনি। খেতে পারতাম না। বলেন, আপনার ছেলে এখানে এই অবস্থায়, কী করে গলা দিয়ে খাবার নামে! আমার স্ত্রী খুব সাপোর্ট দিয়েছে। বারবার বলেছে, তুমি থাকো।

বিরাট ফ্যামিলি তো তোমাদের। কার ভূমিকাটা সবচেয়ে বেশি জীবনে?

নানি। আমি তো নানির কাছে মানুষ। আমার মা তো আমার মতো–পাগল। মায়ের জন্য বাবা চাকরি করতে পারল না। বড় চাকরি করত ঢাকায়। একদিকে মা তার মায়ের কাছ থেকে আমাকে আনবে না। আবার আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। পরে বাবাকে নিয়ে আবার নড়াইল চলে গেল। আমার সবকিছুই নানি করেছে। পড়াশোনা করানো থেকে বড় করা, খেলা; সবকিছুই নানির জন্য। আমার জীবন নিয়ে সব সিদ্ধান্ত নানিই নিয়েছেন।

নানা-নানি তো নেই এখন?

নানা আর নানির মৃত্যুটা বিস্ময়কর; আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাত। আমি অংকে ভালো ছিলাম না। নানা খুব চাইতেন, অংকে ভালো করব। একবার অংকে ৫০ পেলাম ৫০-এর মধ্যে। কাগজ নিয়ে বাড়ি এলাম; নানাকে দেখাব। নানা বেরিয়ে এসে বললেন, ভাই বুকে ব্যথা করছে খুব। সেই হাসপাতালে নিয়ে এল ঢাকায়। কিন্তু নানা আর সেই অংকের মার্ক দেখতে পেলেন না।

নানি?

নানি ছিল আমার খেলার সবচেয়ে বড় সাপোর্টার। আমার মাকে বলেছিলেন, 'বলাকা, ছেড়ে দে। খেলুক। যেটা করতে চায় করুক।' অথচ বাংলাদেশ দলে

এলাম, ঠিক তার আগ মুহূর্তে নানি চলে গেলেন।

এই প্রশ্নটার উত্তর সবাই নিশ্চয়ই গৎবাঁধা দেবেন। কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে একটু অন্য রকম। মানুষ হয়েছেন নানির কাছে। সেখানেই বড় হয়েছেন। এই জীবনে বাবা-মা আসলে কতটা?

হ্যাঁ, আমি বাবা-মায়ের কাছে কখনো থাকিনি। জীবনের প্রথম দিন থেকে নানির কাছে ছিলাম। ফলে আমার এটা বলা খুব সহজ যে, আমার জীবনে নানা-নানি বা মামা-মামি, এমনকি চাচা-চাচিরও অনেক ভূমিকা আছে। সেখানে বাবা-মা ঠিক কোথায় আছেন? এটা আসলে অদৃশ্য একটা ব্যাপার। সহজ কথায় বলতে পারি, আমার জীবন-দর্শনটা এই দুটো মানুষের ভেতর থেকে এসেছে। আমি দেখবেন, আমার মা আর আমাকে আপনি কয়েকটা দিন দেখলে মনে হবে একেবারে একই রকম।

আপনার মায়েরও ডাকনাম 'পাগলি' ছিল! তিনিও আপনার মতো অনেক মানুষ নিয়ে থাকেন...

হ্যাঁ। আমি এটা প্রচার করতে চাই না যে, আমার মা কাদের নিয়ে থাকেন। তিনি তার মতো করে মানুষকে কাছে রাখেন। তবে মূল ব্যাপারটা ওই একই রকম। মানুষের প্রতি টান, একা থাকতে না-পারা। সেগুলো আমি পেয়েছি। আমার বাবার ভেতরও এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে, যা আমার ভেতর দেখতে পাবেন। খেলাধুলাটা তো একদম বাবার কাছ থেকে এসেছে। ওনারও ওই এলাকার বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দেওয়া, ক্লাব-কমিটি; এসব আছে। আর দুজনের অবদানটা আসলে ঠিক মুখে বলার জিনিস না।

আপনার কোনো ইনজুরি হলেই তো বাবাকে সবার আগে কাছে পেয়েছেন মনে হয়?

হ্যাঁ, এটা খুব মজার ব্যাপার। আমি কিন্তু বাবার সাথে অত খোলামেলাও না। বাবার সঙ্গে মেশাও হয়েছে কম। এখনো তার চোখে তাকিয়ে কথা বলি না। কিন্তু যখনই ইনজুরি হয়েছে, আমি আগে বাবাকে খোঁজ করেছি। আমার প্রতিটা বিপদের সময়ে উনি পাশে থেকেছেন।

আপনার মা তো আপনার জন্য প্রায় সারা বছর রোজা থাকেন।

আসলে এগুলো হয় কী, আমি সেভাবে বলতে চাই না। কারণ, আমার কেন যেন মনে হয়, জীবন সবারই এমন। সবার মা-ই নিশ্চয়ই এমন। আমার খেলা থাকলে মা খেলা দেখে না; তার ভয় হয়। আমার জন্য সারাটা বছর রোজা রাখে। আসলে মায়েরা এমনই। আমি ক্রিকেট তারকা বলে হয়তো আমার মায়ের গল্প সামনে

আসছে। আজ আপনি সকালে উঠে চাকরিতে বের হয়েছেন, ঠিকই আপনার মা বাড়িতে বসে আপনার জন্য প্রার্থনা করছেন। দুনিয়ার সব মা এমন, দাদা।

ছোট মামার কথা বলেন।
নাহিদ মামা! ওরে বাবা, তার কথা কীভাবে বলে শেষ করব? নানি যখন মারা গেল, আমার ওই ছোট মামা আমাকে কোলে জড়িয়ে ধরেছিল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত জড়িয়ে ধরেই আছে। আমার জীবনের সব তার কাঁধের ওপরে। আমার বন্ধু, আমার বড় ভাই, আমার অভিভাবক। রাস্তায় হঠাৎ বাবা-মাকে দেখলে যেমন মনে হয়, ছোট মামা আর মামিকে দেখলেও তেমনই মনে হয়। মামির কথাটা বলা খুব জরুরি। মামি এই বাড়িতে এসে আমাকে অনেক ছোট পেয়েছে। সেই থেকে আমার উৎপাত সহ্য করে। আমার নখ পর্যন্ত কেটে দিয়েছে। এখনো আমার উৎপাত চলে, বাড়ি গেলেও লোকজন, হইচই; সব মামি সামলায়।

ঢাকায় মনে হয় কাকা-কাকি এই জায়গাটা নিয়েছিলেন?
ঠিক। আমার ছোট কাকা তো নিজে অনেক বড় কর্মকর্তা। কিন্তু আমার জন্য রাত জেগে জেগে জামাকাপড় পরিষ্কার করত। আমার খেলায় যাতে কোনো সমস্যা না হয়। সব সময় চেষ্টা করেছে, কী করে আমাকে আরেকটু আরামে রাখা যায়। শোনেন, আমার যে জীবনযাপন, তাতে প্রতিটি পদে আমি পরিবার থেকে এত প্রশ্রয়, এত আদর না পেলে একদিনও টিকতে পারতাম না।

আপনার ইদানীংকালের চিন্তাভাবনার মধ্যে ধর্মচিন্তাটা খুব পরিষ্কার। এই চিন্তায় কি বড় মামার একটা প্রভাব আছে?
শুধু আমার ওপর না, আমাদের পুরো পরিবারেই তার একটা প্রভাব আছে। আবার বলতে পারেন, এই চিন্তায় পুরো পরিবারের প্রভাব আমার ওপর আছে। আমার বড় মামা এমন একজন মানুষ যে, জীবন থেকে অর্থচিন্তাটা দূর করে ফেলতে পেরেছেন। এত বড় একজন ডাক্তার, কখনো বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিকে চাকরি করে ধনী হওয়ার চিন্তাই ঢোকেনি তার মাথায়। একেবারেই ধর্মের দেখানো পথে জীবনযাপন করার চেষ্টা করেন।

ছেলেমেয়ে সম্পর্কে একটু বলেন।
আমি ওদের নিয়ে খুবই ভাবিত। তবে একেবারই আশা করি না বা চাই যে, ওরা খুব বড় কিছু হোক, অনেক ধনী হোক। আমার চাওয়া, ওরা যেন মানুষ হতে পারে। আমি ছেলে হিসেবে আমার বাবা-মায়ের কাছ থেকে কখনো দূরে যাইনি। আমার বিশ্বাস, ওরাও সেটা করবে না। আমার চাওয়াটা খুব পরিষ্কার, যত জন মানুষের সঙ্গে মিশুক, তাদের মধ্যে যেন অন্তত নিজেদের খারাপ মানুষ হিসেবে

পরিচিত না করে। এরপর জীবনে যা হতে চায়, তাই হবে। হ্যাঁ, আরেকটা চাওয়া বা স্বপ্ন আছে। মুসলমানের ঘরে জন্মেছে, আল্লাহ তাদের যতটুকু সুযোগ দেবেন যেন ধর্মের বিচারে সঠিক জীবনযাপন করে। আসলে কী জানেন, এই যে মানুষ এত সব অর্জনের কথা বলে না; শেষ পর্যন্ত যদি দেখি, ছেলেমেয়ে দুটোকে ঠিকমতো মানুষ করতে পারিনি, সব অর্জন মিলিয়ে গিয়ে এটাই জীবনের ব্যর্থতা হয়ে থাকবে।

ওরা বড় হয়ে কী হবে, সে নিয়ে স্বপ্ন দেখেন?
নাহ। ওরা যা চায়, যা ওদের সামর্থ্যে কুলায়। অসৎ না হয়ে যায় যেন সেটা দোয়া করি। টাকাকে যেন জীবনের সবকিছু বানিয়ে না ফেলে। টাকা জিনিসটা তো দরকার। কিন্তু টাকার যে ভূমিকা দেখি আজকাল, ভয় হয়। মানুষগুলোকে টাকাই এখন নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করেছে। আমরা একান্নবর্তী পরিবার–সেটা ধরে রাখতে পারলে খুব খুশি।

ক্রিকেট

আপনি প্রায়ই বলেন, দেশের সেরা দল বলে আলাদা কিছু নেই। ইতিহাসে যত খেলোয়াড় খেলেছেন, সবাই সেরা। একটু বুঝিয়ে বলবেন?
বলি কেন, যারা শুরু করেছেন, আসল কৃতিত্বটা তো তাদের প্রাপ্য। কথার কথা, রকিবুল হাসান যদি সেদিন ব্যাটে 'জয় বাংলা' লিখে মাঠে না নামতেন, হয়তো ক্রিকেট শুরুই হতো না। লিপু ভাইরা সাহস করে লড়াই শুরু করেছেন, এরপর প্রতিটা খেলোয়াড় একটু একটু এগিয়ে দিয়েছেন। তারা না করলে আজ সাকিব বিশ্বসেরা হতে পারত না, মুস্তাফিজের মতো বোলার বের হতো না। এটা একটা ধারাবাহিকতা। ফলে প্রতিটা খেলোয়াড়ই সমান গ্রেট।

পূর্বসূরিদের প্রতি এই শ্রদ্ধাটা প্রকাশ করতে পারাটাও একটা ব্যাপার।
না, আমি মনে করি এটাও হওয়া উচিত। আপনি জানেন, ওনারা কী কষ্ট করে ক্রিকেট খেলেছেন? আমরা এক বোতল পানিকে এক চুমুক দিয়ে ছুড়ে মারি। আর ওনারা নিজেরা টিউবওয়েল চেপে বালতি ভরে পানি এনে মাঠের পাশে রেখে একটু একটু করে খেতেন। টাকা ধার করে মাঠে আসতেন। এরাই হলো ক্রিকেটযোদ্ধা। আমরা তো সাজানো বাগান পেয়েছি। এর মধ্যে কিছু প্রজন্ম সময় বদলে দিতে শুরু করে।

বদলের কথাই জানতে চাচ্ছিলাম।
হ্যাঁ, সেটা শুরু করেছে সুমন ভাইয়ের টিম। এর আগে সুজন ভাই প্রথম একটা

নতুন ধরনের ক্রিকেট-সংস্কৃতি চালু করে। আমরা এখন যেটা স্বাভাবিক জানি। সিনিয়র-জুনিয়র এক হয়ে মেশা, দলটাকে এক সুতোয় বাঁধা; এগুলো সুজন ভাইয়ের শুরু। সুমন ভাই সেটাকে একটা দারুণ মাত্রা দিয়েছিল। সুমন ভাই তো তখন সুপার স্টার। সে সব ভেঙে আমাদের পরিবারের প্রধান হয়ে গেল। সে অধিনায়ক হিসেবে বাকিদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেল।

আপনার ক্রিকেট ক্যারিয়ারের টার্নিং পয়েন্টটা কি অ্যান্ডি রবার্টসের ক্যাম্প?
ঠিক। ওর কথাবার্তাগুলোও তো এ রকম সবার চিন্তা বদলে দিল। ও হাইলি রেট করত। কেন ঠিক জানি না। এটা হতে পারে, খুব জোরে বল করতাম ওই সময়। সেটা হয়তো ওর খুব পছন্দ হয়েছিল।

অনেক জোরে বল করতেন?
অনেক। অনেক জোরে বল করতাম। ১৪৫-এর ওপরে বল করতাম। ১৪১ খুব নিয়মিত ছিল। সেই জোর তো আর নেই।

এবার বিশ্বকাপেও অন্তত দুটো ডেলিভারি ১৪১-এর ওপরে ছিল?
এবার? নাহ্। ২০০৭ বিশ্বকাপে করেছিলাম। ভারতের বিপক্ষে; রানা মারা যাওয়ার পরদিন।

না। এবার, ২০১৫ বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে অন্তত একটা ডেলিভারি অস্ট্রেলিয়ান মিডিয়া খুব পিক করেছিল। আপনি সংবাদ সম্মেলনে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু আমরাও দেখেছি, স্পিড গান ১৪১ দেখাচ্ছিল।
কী জানি! খুব রিদমে থাকলে হয়ে যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার উইকেট একটা ভূমিকা রেখেছিল হয়তো। তবে আমার মনে হয় ১৩৫ আমি চাইলে নিয়মিত করতে পারি। সেটাও করতে চাই না।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২০০১ সালে দ্বিতীয় টেস্টটা খেলা কি ভুল ছিল?
আমার কাছে মনে হয় ভুল ছিল। এক দিনে ৩১ ওভার বল করলাম; তার ওপর ব্যথাটা পেলাম। এরপর দ্বিতীয় ম্যাচ খেলাটা আমার মনে হয় ভুল ছিল। তখন তো আমরা চাইলেই তো নিজেদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম না। সে সময় কথা বলার মতো অবস্থা দলে তৈরি হয়নি। মাত্র তিন নম্বর টেস্ট শেষ করলাম।

আপনার তো তখন এসব বোঝারও কথা না। কেমন পরিমাণে চাপ দিলে কী হবে, জানার কথা না।
আমি তো জানতামই না, শরীরে লিগামেন্ট বলে একটা ব্যাপার আছে। পিঠের

পেশি কোনটা তা কে জানত! পাড়ায়, স্কুলের মাঠে যে ক্রিকেট খেলেছি; তাই খেলতাম টেস্টে। বল দিয়েছে, বল করব। ২০ ওভার টানা বল করলে কী হয়, এক দিনে ফাস্ট বোলারের ৩০ ওভার বোলিংয়ের ঝামেলা কী; কিছুই জানতাম না। এটাকে আমি আবার পজেটিভলিও দেখি।

এর মধ্যে পজেটিভ কী দেখেন!

এই যে কিছু বুঝতাম না, শুধু ক্রিকেটের ভালোবাসার জন্য, ক্রিকেটের নেশার জন্য খেলে গেছি; এটা খুব ভালো ব্যাপার ছিল। ইনজুরি হয়তো আমার কপালে ছিল, আমার দোষ ছিল। সেটা না ভেবে এই যে মাথা ফাঁকা রেখে, আগে-পেছনে না ভেবে খেলে যাওয়ার আনন্দ পেয়েছি, সেটা জরুরি ছিল। ক্রিকেটের নেশাটা ছিল; আজও আছে। আমার ধারণা, এত ইনজুরির পরও আমি ক্রিকেট খেলে যেতে পারছি এই কিছু না ভেবে খেলতে পারার জন্য। নেশা থাকাটা জরুরি।

আপনি কেন ক্রিকেট খেলেন?

এখন তো এটা আমার পেশা। এই যে আমার ঘর, সোফা-টিভি যা দেখছেন সব ক্রিকেট থেকেই আয় করা। ফলে ক্রিকেট তো খেলতেই হয়। এটা অবশ্য একটু নিষ্ঠুর করে বললাম। আমি ক্রিকেটে কোনো লাভালাভের কথা ভেবে আসিনি। স্রেফ মজা করতে ক্রিকেট খেলতাম। আমি ভাগ্যবান যে, এখনো এটাতে মজা পাই; ক্রিকেট খেলার চেয়ে বেশি মজা আর কোনো কিছুতে তো পাই না। খেলা না থাকলে কী করব, জানি না।

মুলতান টেস্টটা অনেক বড় মিস?

অনেক বড় একটা মিস। যে উইকেট ছিল, আমি খুব মিস করছিলাম। ডেভ অবশ্য সিরিজের আগেই বলেছিল, আমাকে তিন টেস্টের যেকোনো দুটো টেস্ট খেলাবে। এটা আমার কথা ভেবেই করেছিল। পরপর দুটো টেস্ট খেলে ফেলায় শেষ টেস্টটা আর খেলায়নি। এরপর আবার পাঁচটা ওয়ানডে ছিল, সেটা একটা কারণ। তবে উইকেট দেখার পর সুজন ভাই এসে অনেক বলল, আমাকে খেলানোর জন্য। ডেভ খেলায়নি। আমি ফিল্ডিং করলাম, সবার বোলিং দেখছিলাম।

নিজের সেরা সময় নিয়ে কথা বলতে চান না কেন?

দেখেন ক্যারিয়ারের সেরা ফর্মে কখন ছিলাম। ২০০৩ সালে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আমার বিচারেই অসামান্য বল করছিলাম। আমি টের পাচ্ছিলাম, এর চেয়ে ভালো কখনো করিনি। সেই সময়ই ইনজুরিতে পড়লাম। আবার ফিরে ২০০৬-০৭ সালে পিকে ওঠা শুরু করলাম। ২০০৬ সালে তো মনে হয় কী একটা সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি-টিকারিও হলাম। আমি বলি সেরা ফর্মে এলাম আবার ২০০৮

সালে। উইকেট দিয়ে ঠিক বোঝা যাবে না। আমি ওই সময় আক্ষরিক অর্থেই দুর্দান্ত বল করছিলাম। তামিম-সাকিব বলতে পারবে। ওরা নেটে পর্যন্ত খেলে বলত। এরপর ক্যাপ্টেনসি পেলাম। আবার ইনজুরিতে পড়লাম। এ জন্যই সেরা সময় এলে ভয় করে। আমি এভারেজ থাকতে চাই, সেরা হতে চাই না।

অধিনায়কত্ব তো কম করলেন না। আবাহনী, খুলনা, টি-টোয়েন্টি, এশিয়ান গেমস। সব মিলিয়ে অধিনায়কত্ব ব্যাপারটা নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী?
ক্রিকেট তো অবশ্যই ক্যাপ্টেনস গেম। অধিনায়কত্ব এখানে অনেক বড় একটা ব্যাপার। ফলে যখনই এই দায়িত্বটা পাই, খুবই ভালো লাগে। চেষ্টা করি, যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সততার সঙ্গে এবং নিজের সর্বোচ্চ পরিশ্রম করে দায়িত্বটা পালন করার। তবে অধিনায়কত্বের ব্যাপারটা হলো, সময় সব সময় আপনার পক্ষে থাকবে না। কিছু ছোটখাটো ভাগ্যের সহায়তা লাগে। সেগুলো না পেলে আবার সময়টা বদলে যায়। আমি মনে করি, খুব সাধারণ একটা ব্যাপার। এটা একটা কাজ, এর বেশি কিছু না।

আপনি কেন এভাবে দেখেন, সারা দেশ মনে করে আপনার ভেতর ক্যাপ্টেনসিটা বিল্ট-ইন আছে।
আপনি যেটা বিল্ট-ইন বলছেন, সেই ব্যাপারগুলো কাজে লাগানোর জন্য ঘোষণা করে ক্যাপ্টেন কেন আপনাকে করতেই হবে। আমার ভেতরে থাকলে তো সেই ব্যাপারগুলো আমি এমনিতেই করব। সে জন্য ক্যাপ্টেন হওয়া জরুরি না। অনেকে যেমন বলে, দেশের জন্য কাজ করতে আপনার পাওয়ার দরকার; আসলে কি তাই? আসলে আপনি কাজ করতে চাইলে কিচ্ছু দরকার নেই। ক্রিকেটেও তাই। আপনি কাজ করতে চাইলে ক্যাপ্টেনসি পাওয়ারের কোনো দরকার নেই। বরং ক্যাপ্টেন না থেকে আমি যদি টিমকে গোছানোর কাজ করি, সেটাকে টিম আরও বেশি ভালোভাবে নেবে। একটা ব্যাপার হয়, ক্যাপ্টেন যখন এসব করে, মনে হয়–সে তো ক্যাপ্টেন, এটা করবেই। ফলে প্রভাব বরং কমে।

বাইরে থেকে আপনি টিমকে মোটিভেটেড করার চেষ্টা করলে উল্টো ফল হতে পারে না?
পারে। মনে হতে পারে, ও বাড়াবাড়ি করছে। এখন এই বাড়াবাড়ি হলো কি না, এ নিয়ে তো আমি জীবনে ভাবিনি। আমি বরং ভাবি, কেউ একজন হলেও ভাববে, ম্যাশ এত আবেগ দেখাচ্ছে, চল আমরাও দেখাই।

মাঠের ক্যাপ্টেনসি উপভোগ করেন? মাঠের মধ্যে ব্যাটসম্যানের কিছু একটা দুর্বলতা আবিষ্কার করে ফেললেন, একটা নতুন মুভ দিলেন...

এটা তো হয়। এটা সব ক্যাপ্টেনকেই করতে হয়। আবার আমি সঙ্গে সঙ্গে ভুলেও যাই। এটা নিয়ে বসে উপভোগ তো করা যাবে না। হ্যাঁ, এগুলো কিছু করে সফল হলে ভালো লাগে। তবে এটা প্রকাশ করলে কী হয়, নিজের কৃতিত্ব নিয়ে কথা বলা হয়। সেটা আসলে ভালো কাজ না। এটাকে তাই আমি পার্ট অব জব হিসেবে বলতে চাই।
অধিনায়ক হিসেবে তো গর্ব করার মতো সময় এটা। টানা পাঁচটা ওয়ানডে জয়। মাঠে যা করছেন, তাতেই সাফল্য পাচ্ছেন।

যেভাবেই আপনি দেখেন না কেন, বাংলাদেশের ইতিহাসের সফলতম অধিনায়কদের একজন আপনি। এই টানা জয়, যেখানে হাত দিচ্ছেন সাফল্য; এসব নিয়ে গর্ব হয় না?
না, আমি গর্ব করার কিছু আছে বলে মনে করি না। ক্রিকেটে তো বলাই হয়, একজন অধিনায়ক ততটাই ভালো, যতটা ভালো তার দল। আসলে দলের সবাই যখন পারফর্ম করে, একটা টিম হয়ে খেলে; তখন সবকিছু সোজা হয়ে যায়। এই যে টানা জয়গুলো পেলাম, এগুলো নিয়ে দল হিসেবে আমরা গর্ব করতে পারি; অধিনায়ক হিসেবে আমি গর্ব করি না।

মাঠে তো কিছু বাজি ধরতেই হয় ভাগ্যের ভরসায়। এখন এই বাজিগুলো কি খুব ভেবেচিন্তে ধরেন? নাকি এমনিতেই মাথায় চলে আসে?
কিছু পরিকল্পনা থাকে। আবার কিছু হঠাৎ কাজ করে মাথায়। এটা আসলে ব্যাখ্যা করে বলা কঠিন। এই জিম্বাবুয়ে সিরিজের শেষ ম্যাচের কথা বলি। মাসাকাদজা আর সিবান্দার জুটিটা জমে যাওয়ার পর জুবায়ের এসে ব্রেক থ্রু দিল। তারপর একবার ভাবলাম, এক প্রান্তে সাকিবের বদলে সৌম্যকে আনি। ওকে ডাক দিতে গিয়েও আবার সাকিবকে বল দিলাম; ও-ই দুটো উইকেট তুলে নিল। এখন এটাকে ঠিক পরিকল্পিত বলা যাবে না। কিছু ব্যাপার ভেতর থেকে চলে আসে। কখনো কাজ করে, কখনো করে না।

এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে ভয় লাগে না? মাথায় এটা কি কাজ করে যে, হারলে সমালোচনার ঝড় উঠবে?
না। এই ভয় নিয়ে এই পর্যায়ে তো কিছু করা যাবে না। প্রথমত এ ধরনের সিদ্ধান্ত আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিই। আমি একা এসব সিদ্ধান্ত নিই না। কিন্তু আমি জানি, দায়টা আমার; ব্যাপারটা আমাকেই সামলাতে হবে। অধিনায়ক হিসেবে আমি সব সময় এসব প্রশ্নের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত থাকি। কারণ ব্যাপারটা সঠিক মনে করেছি বলেই আমরা কাজটা করেছি। কখনো ভুল হলেও আমি সেটা স্বীকার করতে পারি। ফলে ভয় আমি পাই না।

বলা হয়, আপনার অধিনায়কত্ব ড্রেসিংরুম বদলে দিয়েছে।
এটা ঠিক ধারণা না। এটা এমন না যে, অন্য কোনো কারণে ভালো হয়ে গেছে। আমরা জিতছি এখন। যেকোনো জয়ী দলের ড্রেসিংরুম পরাজিত দলের চেয়ে একটু ভিন্ন থাকে। সে অর্থে অবশ্যই আমাদের পরিবেশও এখন দারুণ।

আপনার দলে বেশ কয়েকজন সিনিয়র খেলোয়াড়। টেস্ট অধিনায়ক মুশফিক, আপনার ডেপুটি সাকিব, সাবেক সহ-অধিনায়ক মাহমুদউল্লাহ আবার টেস্টের সহ-অধিনায়ক তামিম আছেন। এদের কাছ থেকে কেমন সহায়তা পান?
খুবই ভালো। ইনফ্যাক্ট ওরা সব সময়ই এ রকম ভালো। এই সিনিয়ররা শুধু সিনিয়র, তা তো নয়; ওরা দেশের সেরা পারফর্মারও। একটা ব্যাপার হলো, এদের পারফরম্যান্সই কিন্তু আমাদের জয়গুলো এনে দেয়। ওরা পারফর্ম করে পাশে থাকছে। যখন যেটা দরকার, আলোচনা করছে। আমি খুব খুশি।

বাংলাদেশের ক্রিকেটে আপনি এক ধরনের নিঃশর্ত সমর্থন পেয়ে থাকেন–সমর্থক, খেলোয়াড়, সাংবাদিক; সব মহল থেকে। এটা কি আপনি উপলব্ধি করেন?
নিঃশর্ত সমর্থন আমি বলি না বা আশা করি না। খারাপ কিছু করলে সমালোচনা তো হবেই। তবে ভালোবাসাটা বুঝতে পারি। একটা কথা বলি, আমার এই ক্যারিয়ারে এই ভালোবাসা ছাড়া আমার আর অর্জনটাই বা কী! যা যখন পুরস্কার বা কিছু পেয়েছি; তার চেয়ে অনেক বড় করে দেখি মানুষের এই ভালোবাসা। ক্রিকেট তো একসময় থাকবে না। সাফল্য-ব্যর্থতাই বা আর কয় দিন সঙ্গে থাকবে? এই ভালোবাসা আমার সারা জীবনের সঙ্গী।

ক্যাপ্টেন হিসেবে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে কি আপনি প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি অ্যাটাকিং?
আমি চিরকালই অ্যাটাকিং ক্রিকেটের পক্ষে। আপনি আবাহনীর সেই ২০০৭-০৮ সালের ক্যাপ্টেনসির কথা বলছিলেন। এখনো দেখেন। আমি বিশ্বাস করি, শর্টার ফরম্যাটেও অ্যাটাক করেই বেস্ট রেজাল্ট পাওয়া সম্ভব। হ্যাঁ, টেস্ট হচ্ছে অ্যাটাক করার সেরা জায়গা। কিন্তু ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতেও আমি অ্যাটাক করতে চাই ব্যাটসম্যানকে। আপনি দেখবেন, আমি সিলিতে ফিল্ডার রেখে নাসিরকে দিয়ে বল করিয়েছি। সে কিন্তু সফলও হয়েছে। মিড অফ, মিড অন ওপরে তুলে আনি। এটাই ক্রিকেট।

আপনি বলেন, চার মেরে ব্যাটসম্যান সেট হতে পারে না। এই ক্লোজ ইন ফিল্ডিংয়ের ব্যাখ্যায় বলছিলেন।

হ্যাঁ, সেটা সব সময় বিশ্বাস করি। মারুক না একটা চার। চারটি চার মেরেও ব্যাটসম্যান সেট হয় না। তিনটি সিঙ্গেল নিতে পারলে শরীরের, মনের জড়তা কেটে যায়। আমি ওই সেটটা হতে দিতে রাজি না। একটা চার মারো, বিনিময়ে দশটা ডট নেব আমি। তুমি আরও আনসেটেল হবে চার মেরে। আমি তো বিরাট কিছু জানি না, বুঝি না। তবে ১৫ বছর ধরে খেলাটা খেলছি, দেখছি। ফুটবলে যেটা বলে, আমার মনে হয় ক্রিকেটেও খুব সত্যি—অ্যাটাক ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স। এই থিওরির কারণেই আমি তিনটা ফাস্ট বোলার নিয়ে খেলতে চাই।

তিনটা ফাস্ট বোলার নিয়ে বলেন তো।

আমি ক্যাপ্টেন হওয়ার পর একবার পেছন ফিরে তাকিয়েছিলাম। আমি একটা জিনিস দেখেছি, বাংলাদেশের সব উল্লেখযোগ্য জয়ে তিনজন পেসার খেলেছে। এটা কাকতালীয় হতে পারে না। আসলে এটা ক্রিকেটের মৌলিক একটা ব্যাপার। আপনি তিনজন পেসার খেলাচ্ছেন মানে, সর্বোচ্চ আক্রমণ করতে প্রস্তুত আছেন। আমাদের পেসাররা একটা সময় তত সমর্থন পেত না। দেখেন, তারা যেই সুযোগ পাচ্ছে, বুঝতে পারছে ওদের ওপর বাজি ধরা হচ্ছে, পারফর্মও করছে।

আপনি অস্ট্রেলিয়ায় বসে বলেছিলেন, বাংলাদেশের পেস বোলাররা প্রাপ্য সম্মান পান না। কিন্তু সত্যি সত্যি তাদের পারফরম্যান্সে কি আপনিও সারপ্রাইজড হননি?

না, সারপ্রাইজড হয়েছি বলব না। আসলে পরিবেশটা তো একটা বড় ব্যাপার। বাংলাদেশে সব মিলিয়ে যে পরিবেশ থাকে, সেটাই ঠিক পেস বোলারদের পক্ষে নয়—মানুষের চাহিদা, উইকেটের চাহিদা; কিছুই পক্ষে থাকে না। তাই বোঝা যায় না, এরা কী করতে পারে। আপনি যখন ফাস্ট বোলারদের ধারাবাহিকভাবে অন্তত স্পোর্টিং উইকেটে খেলাবেন, তখন আসলে বুঝতে পারবেন যে, এদের মানটা আসলে কেমন। আমার মনে হয়, এবার বাংলাদেশের সবাই-ই দেখতে পেয়েছেন, এরা সেই সুযোগ পেলে কী করতে পারে। এখন অন্তত আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশের পেসারদের নিয়ে যা ধারণা করা হয়, তার চেয়ে যে এরা ভালো, সেটা প্রমাণিত। কারণ তারা ওই পরিবেশটা পেয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ইতিহাস, টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ; এসবে আগ্রহী আপনি? পড়েন?

পড়ি খুব কম। দেখি। প্রচুর খেলা দেখি। ধারাভাষ্য শুনি। যখন থেকে খেলাটা বুঝতে শুরু করেছি, আমি খুব খেলা দেখি। একটা সময় পর্যন্ত কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই মজা নিয়ে খেলা দেখেছি, ক্যাপ্টেনদের কাজ-কারবার দেখেছি। প্রথম ক্যাপ্টেন হওয়ার পর পেছনে ফিরে ভাবার চেষ্টা করেছি, কী দেখেছি জীবনে। রিকি পন্টিং কী করত, স্টিফেন ফ্লেমিং কী করত এ অবস্থায় কল্পনা করার চেষ্টা করেছি।

ভালো ক্যাপ্টেন কে?

এই বৈশিষ্ট্যটা বলা খুব কঠিন। ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতা থাকে একেকজন ক্যাপ্টেনের। রিকি পন্টিং। দৃশ্যত সেরা ক্যাপ্টেন। কিন্তু তার হাতে ছিল সর্বকালের সেরা একটা দল। তার চ্যালেঞ্জটা ছিল অন্য রকম। ১১ জন সেরা ইন্ডিভিজুয়ালকে এক মাঠে ঠিকঠাক রাখা, তাদের সেরাটা পাওয়া; এটা অন্য মাত্রার চ্যালেঞ্জ। আবার সৌরভের কথা ভাবেন। হাতে দেওয়া হয়েছিল অগোছালো একটা দল। শচীন-দ্রাবিড় ছাড়া দলে কিচ্ছু নেই। তাকে ওই দল নিয়ে পারফর্ম করতে হচ্ছে। আসলে এভাবে ভালো ক্যাপ্টেন খুঁজে বের না করে অনেক ভালোকে দেখা যেতে পারে।

বাংলাদেশের সেরা ক্যাপ্টেন কে?

এটা...হ্যাঁ, স্টিল সুমন ভাই। সাকিব ওয়ান অব দ্য বেস্ট। আমি মুশফিককেও বেশ বড় ক্যাপ্টেন মনে করি।

মুশফিকের ক্যাপ্টেনসি নিয়ে সমালোচনা আছে।

আছে। তবে কি জানেন, ক্যাপ্টেনসি আসলে শুধু মাঠে কয়েকটা সিদ্ধান্ত নেওয়া না। এর অনেকগুলো অংশ আছে। একটা বড় অংশ হলো খেলোয়াড়দের কাছে আদর্শ হতে পারা। মুশফিক সেটা হতে পেরেছে। শুধু মুশফিককে দেখে অনেক ছেলে আমি জানি বদলে গেছে। এটা শুধু মাঠে ওর পারফরম্যান্স দেখে টের পাবেন না। অনুশীলন, আদর্শ জীবনযাপন, কীভাবে বলা উচিত, কীভাবে চলা উচিত; প্রতিটা ক্ষেত্রেও ও অনুকরণীয়। এমন মানুষ ক্যাপ্টেন হিসেবে ভালো মার্ক পাবেই। মুশফিকের চেয়ে এসব ব্যাপারে আমরা কেউ ভালো না।

২০০৭ বিশ্বকাপটা কি বিশেষ কিছু?

হয়ে আছে তেমন। আমার জন্য বিশেষ করে। বিশ্বকাপের সময় রানা মারা গেল। এমনি খেলোয়াড়ি অর্থেও তো বিশেষ। আমরা ভালো খেলেছিলাম। তবে আমার কাছে রানা মারা যাওয়ার বছর ওটা।

হোটেল ছেড়ে দেওয়ার ঘটনাটা কী ছিল?

টিমটা খুব এলোমেলো ছিল তখন। সবকিছুই এলোমেলো ছিল। আমার কোনো রাগ ছিল না। আজও নেই। আমার সিনিয়র প্লেয়ার হিসেবে মনে হয়েছিল, এভাবে আসলে চলতে পারে না। তবে এসব কারণে আমি হোটেল ছাড়িনি। আমার মা অসুস্থ ছিলেন। তাই চলে আসলাম। সবকিছু মিলিয়েই হয়েছে। ওই একবারই মনে হয় জীবনে খেলাটা বিরক্তিকর লাগছিল। পরিবেশটা স্বাভাবিক থাকলে হয়তো

আম্মাকে দেখার জন্য না-ও আসতে পারতাম। বাসায় তো লোক ছিল। কিন্তু ওই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, ক্রিকেটের চেয়ে বাসাটা উপভোগ করব বেশি।

পরে দুজনই বলেছিলেন, আপনাদের ভাই ভাই সম্পর্কই আছে।
আসলে ওই সময় তো কেউ কাউকে আমরা ফোনে পাচ্ছিলাম না। সাকিব মিডিয়ায় বলেছিল, ও ছোটবেলা থেকে আমাকে পছন্দ করে; আমাকে বড় ভাই মনে করে। আমিও তাই মনে করি, সাকিবকে তো ওর প্রথম ক্যাম্প থেকে চিনি। হ্যাঁ, অনেকে বলেছিল, মিটমাট করতে। আসলে এমন ফরমাল মিটমাট করাটা আমরা কখনো জরুরি মনে করিনি। কারণ, এটা একটা পরিবার। পরিবারে একসঙ্গে থাকলে ঠোকাঠুকি হয়; এর চেয়ে বেশিও হয়। সেটা কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে স্যরি বলে মেটায় না। এটা সে রকম একটা ব্যাপার ছিল। এটা মিডিয়ায় এসেছে বলে বেশি মনে হয়েছে। আমাদের ভেতরে এর চেয়ে বেশি কথা-কাটাকাটি হয়। এখনো অনেকে আমাকে বলে।

সিরিয়াসলিই আপনাকে কেউ কিছু নিয়ে চ্যালেঞ্জ করে?
হয়তো বয়সের কারণে খুব নরমভাবে করে। কিন্তু করে। বলে–ভাই, এটা কেন করলেন? এটা ঠিক হয়নি। নরমভাবে বললেও মুখ দেখলে বোঝা যায়, অনেক রাগ হয়েছে বলেই সে আমার সামনে বলছে। এসব না বলাটাই তো খারাপ। একটা টিম হতে গেলে মনের কথা চেপে রেখে হওয়া যায় না।

টিম মিটিংয়ে আসলে কী হয়?
এটা আসলে খেলোয়াড়ি জীবনে পুরো ডিসক্লোজ করা ঠিক না। তবে এটুকু বলতে পারি, খুব সিরিয়াস পরিবেশ থাকে সাধারণত। এখানে যা বলবেন, সবাই সিরিয়াসলি নেবে।

টিমে নাকি একটা ওয়েলকাম কালচার আছে?
এটাও পুরো বলা যাবে না। আছে একটা। ওয়েলকাম করা হয়। একটা প্রোগ্রামে টিমের আপন হয়ে যায়। এটা টিমে ডাক পেলে টের পাবেন। এটুকু বলতে পারি, দারুণ একটা ব্যাপার। সবারই হয়। এখন সবাই ওয়েলকামটা আমার কাছ থেকে পায়। রুবেলকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন, তার ওয়েলকামটা কেমন ছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিচে হয়েছিল। বেশি বলা যাবে না।

প্রিয় বোলিং পার্টনার কে?
রাসেল আর তাপস। প্রথম রাসেলের কথা বলব। ও আমাকে এত ভালো বুঝত।

দারুণ ইকোনমি বোলার ছিল। আমার বোলিং কেমন হচ্ছে, ওকে কী করতে হবে; আমাদের আলোচনার দরকার হতো না। আবার এমন দিন গেছে আমি উইকেট পাচ্ছি না, ইকোনমি করছি। ও তখন উইকেটের জন্য যাচ্ছে। ইংল্যান্ড ট্যুরে এ রকম একটা ব্যাপার ছিল মনে পড়ে।

২০১১ বিশ্বকাপের কান্নাটা মনে আছে?

কান্নাটা আসলে উচিত হয়নি। জীবনের সব কান্নাই এমন। পরে মনে হয় সামলানো উচিত ছিল।

অবিচারের শিকার ছিলেন?

সবাই না বুঝে করেছিল। আমি বলি চিত্রটা। আমার লিগামেন্টে স্ট্রেস ছিল সেবার; ছেঁড়েনি। মাইক হেনরি তখন ফিজিও। ডেভিড ইয়াং শ্রীলঙ্কায় এল। দেখে বলল, এ অবস্থায় খেলতে পারো। ভয় শুধু আবার ছিঁড়ে গেলে অপারেশন লাগবে। আমি ভাবলাম ছিঁড়ে গেলে আর কী হবে! আরেকবার টাস করে একটা ভয়াবহ ব্যথা হবে; এরপর বরফ, অপারেশন। কতই তো হলো। আরেকবার না হয় হবে। কিন্তু দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ তো আর খেলতে পারব না। সেই ব্যাপারটা জানিয়ে আমি যে খেলার মতো ফিট, এটা বলে ডেভিড বোর্ডে একটা মেইলও দিয়েছিল।

জেমির ভূমিকাটা কী ছিল?

আমি ওর একটা ব্যাপারে খুব অবাক হয়েছিলাম। বেশি বিতর্কে নতুন করে জড়িয়ে লাভ নেই। শুধু ওর মিথ্যা বলাটা আমাকে খুব অবাক করেছিল। ও আমাকে বলেছিল, তুমি প্রাইমারি স্কোয়াডে থাকবা, তোমার ফিটনেস নিজেরা দেখে টিমে রাখা বা না রাখার সিদ্ধান্ত হবে। আমি তো ভাবলাম, এটা একটা গ্রেট অপরচুনিটি। এর মধ্যে আমি মোহামেডানের হয়ে খেললামও একটা ম্যাচ। পরে সে এটা পুরো অস্বীকার করল। একদিন ইনডোরে এ নিয়ে আমি ওকে বলেছিলাম; আপনারা অনেকে সেই দৃশ্য দেখেছিলেন। আমি বলেছিলাম, 'তোমাদের সংস্কৃতিতে মিথ্যা বলাটা আছে বলে জানতাম না। তোমাকে দেখে জানলাম।'

পরে নাকি জেমি আফসোস করেছিল?

এটা আপনি সাকিব আর তামিমের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। ওদের সামনেই জেমি আমার নেট বোলিং দেখে আফসোস করেছিল, ইস, তোমাকে যদি বিশ্বকাপ দলে পেতাম!

জেমির সঙ্গে শুরু থেকে সমস্যা ছিল?

কোনো কোচের সঙ্গে আমার কোনো সময় সমস্যা ছিল না। জেমি আমার বিপক্ষে বলবে কী নিয়ে? ওর সময়ে আমি আমার ক্যারিয়ারের সেরা বোলিংটা করছিলাম। ও পারফরম্যান্স নিয়ে বলতও না। বলত আমার ইনজুরি নিয়ে। আমার খেলা নিয়ে বলেন, আমি তো কারো করুণায় এক ঘণ্টাও দলে থাকতে চাই না। সহানুভূতি চাই না আমি। আপনি কেন আমার ইনজুরি নিয়ে খোঁচা দেবেন? আমার জীবনে কখনো এটা সহ্য করতে পারিনি।

একটা অন্য হাইপোথিসিস আছে এখানে। আপনি ছিলেন ডেভ হোয়াটমোর যুগের সবচেয়ে পছন্দের খেলোয়াড়। আপনার মনোবল ভেঙে দিয়ে জেমি আসলে ডেভ-যুগের শেষ করে দিতে চাচ্ছিল; এমন কিছু?

নাহ। নাহ। এত ছোট মনের জেমিকে আমার কখনোই মনে হয়নি। আর সেটা করার সুযোগ ছিল না, আমি জেমির সময়ে কিন্তু অন্যতম সেরা পারফর্মার ছিলাম। আরেকটা কথা মনে পড়ল। আমি ইনজুরির কথা বলে যদি ফাঁকি দিতাম, চার বছর ধরে ফাঁকি দিয়েও জেমির দলেই কী করে থাকলাম? একজন কোচ, যে আবার আমাকে পছন্দ করে না, তার পক্ষে এ রকম ফাঁকিবাজ কেউ হলে তাকে বাদ দিয়ে দেওয়াটা নিশ্চয়ই কঠিন কিছু ছিল না।

সে বিমানবন্দরে নেমেই বলেছিল, মাশরাফি হোক আর যেই হোক, বিশেষ সুবিধা আমার দলে কেউ পাবে না।

তা তো আমি এখনো বলতে চাই। কারো দলে কোনো বিশেষ সুবিধা পাওয়া খেলোয়াড় কেউ থাকতে পারে না। সেটা দলের প্রতি অন্যায়। আমি কখনো বিশেষ সুবিধা কোনো কোচের কাছে চাইনি, নিইনি।

আপনি কি কোচদের বাধ্য থাকেন?

খুব। আমি সারা জীবন একটা জিনিস চেষ্টা করেছি, কোচ যেন আমার দিকে চোখ মোটা করে তাকানোর সুযোগ না পায়। কোচ কথা বলার আগে আমি কাজ শেষ করেছি। আমি কোচদের সব সময় মেনে চলি। জেমির ব্যাপারে বলতে পারি, তার সঙ্গে ওই একবার ছাড়া কখনো আমি কোনো বিষয়ে তর্কও করিনি। আমার পক্ষ থেকে আমি কখনোই কোনো সমস্যা তৈরি করিনি।

ডেভ কি আপনাকে বাড়তি একটু সুযোগ দিত আসলেই?

জীবনেও না। ডেভ সবচেয়ে বেশি গালি আমাকেই দিত। হ্যাঁ, আদর করত। সেটা প্র্যাকটিসের বাইরে, খেলার বাইরে। বরং এই আদর করার কারণটাই ছিল যে,

আমি কখনো ফাঁকি দিতাম না। সেটা শুধু ডেভ না, সেই ট্রেভর চ্যাপেল থেকে শুরু করে এই চন্ডিকা পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে না। ভাই, আইপিএল থেকে এসে আমি একটা দিন ছুটি নিইনি। আমি নেক্সট ফ্লাইট ধরে ইংল্যান্ড চলে গেছি। কতজনের কত বিশ্রাম লাগে। আমারও তো লাগত। আমি বাড়তি এ রকম ছুটি নিইনি কখনো। ক্রিকেট অপারেশনস থেকে খাতা বের করে দেখতে পারেন।

ডেভের সঙ্গে সম্পর্কটা আসলে কেমন ছিল?

লাইক ফাদার-সন। আমার ব্যক্তিজীবনের ব্যাপারগুলোও ও জানত, পরামর্শ দিত। আমাকে এক শ টেস্ট খেলতে হবে; এই স্বপ্ন নিয়ে ছিল লোকটার। কী করব, কী খাব; সবকিছুতে ওর পরামর্শ আর আলোচনা ছিল। আবার দুষ্টুমির সম্পর্ক ছিল। বাসার ভেতরে বাবা-ছেলের সম্পর্ক যেমন থাকে, তেমনই। অনেক সময় আমি টের পেতাম না; সব সময় আমার খোঁজখবর রাখা, টেক কেয়ার করা। এখনো; এখনো আমি কী করছি, কোথায় যাচ্ছি, কী হচ্ছে; সব খবর রাখে। এখনো আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগে।

অ্যান্ডি রবার্টসের ক্যাম্পটা কতটা ব্রেক দিয়েছিল ক্যারিয়ারে?

সম্ভবত আমার ক্যারিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট ছিল ওটা। খুব ভালো ট্রেনিং ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, সে-ই প্রথম আমাকে ওভাবে রিকগনাইজ করল। আমার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা কিন্তু ছিল পরেই। ২০০৭ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যখন গেলাম, তখন দেখা করেছি। একটা সেশনও করেছি তখন ওর সঙ্গে। অসাধারণ বোলার, অসাধারণ মানুষও বটে।

আইসিএল ছেড়ে আইপিএলে গেলেন। সেখানেও তো অভিজ্ঞতাটা ভালো ছিল না।

একদমই না। আমার ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা ফর্মে থাকা অবস্থায় আমি আইপিএল খেলতে গেলাম। গিয়ে দেখি, কিছুই আমার জন্য ঠিক নেই। বুঝতে পারছি, খেলা পাব না। কারো সঙ্গে সেভাবে সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। একা একা ঘুরে বেড়াই, টুকটাক নেট পাই কখনো। ৫৪-৫৫ দিন পর হঠাৎ একদিন আমাকে বলা হলো, তাও মাঠে দলের সঙ্গে যাওয়ার পর বলা হলো, তুমি আজ খেলছ। এটা খারাপ খেলার অজুহাত না। আসলে পুরো অভিজ্ঞতাটা আমার জন্য কঠিন ছিল।

আইসিএলে কেন জাননি?

টাকাই তো; টাকার চেয়ে বেশি কিছু তো পেতাম না। টাকার জন্য বাংলাদেশ দলে খেলা ছেড়ে দেওয়া যায়! আমার কখনোই এত টাকার প্রয়োজন ছিল না।

আপনি আবার আইসিএলে যাওয়াটাকে দেশদ্রোহ মনে করেন না? একটু স্ববিরোধিতা হয়ে যায় না।

না। আইসিএলকে আমি অন্যায় কিছু মনে করি না। এটা ভারতের মূল ধারার বিরোধী একটা লিগ হয়েছিল। তাকে কাউন্টার দিতে পারে আইপিএলও হলো। ফলে আমি ওখানে যাওয়াটাকে অন্যায় হিসেবে দেখিনি। এখন একটা নিয়ম করা হলো, ওখানে যারা খেলবে, তারা জাতীয় দলে খেলতে পারবে না। এটা কিছু মানুষের তৈরি নিয়ম। কিছু মানুষের তৈরি নিয়ম ভাঙা তো রাষ্ট্রদ্রোহ হতে পারে না। হ্যাঁ, নিয়মটা যেকোনো ক্রিকেটারের ওপর প্রয়োগ হতে পারে। আমি সেই আওতায় পড়তাম বলে যাইনি। আমি বাংলাদেশের হয়ে খেলার চেয়ে ওটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করিনি। দেখেন, আমি এত কষ্ট করে ঢাকায় যে পড়ে আছি, সবাইকে ছেড়ে থাকি; এটার কারণ বাংলাদেশের জন্য খেলব। এখন টাকার জন্য সেটা ত্যাগ করতে পারব না। আমার ক্রিকেট খেলার মোটিভেশনই হলো বাংলাদেশের হয়ে খেলা; আন্তর্জাতিক খেলা। টাকার জন্য নয়। টাকার জন্য হলে আমি খেলব কেন? অন্য কিছু করব।

ফিক্সিং কেন করেননি?

এটা আসলে আমার মনে হয় একটা অনুশীলনের ব্যাপার। ভেতরে থাকা লাগে। আমি ধরুন, আজ একেবারে অসহায় হয়ে গেলাম, খুব বিপদে আছি, তারপরও সামনে পড়ে থাকা একটা টাকা লুকিয়ে নেব না। আমি পকেটে ভরলে যদি একজন মানুষও হাসে, ওর চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া ভালো না? ওর চেয়ে আপনাদের কাছে হাত পাতব। আসলে আমি ওইভাবে কখনো বড় হয়ে উঠিনি। আমার ছোটবেলা থেকে আমি বাসায় কোনো দিন টাকা চাইনি, মনে হয়নি আমার দরকার। আমার মনে পড়ে না, বাচ্চা বয়সে আমি খেলনার জন্য কোনো দিন বায়না করিনি। টাকা তো দরকার; বাঁচতে দরকার। কিন্তু আমার দরকার ততটাই, যতটা আমার প্রয়োজন। বাড়তি একটা টাকার স্বপ্নই তো দেখি না। ফিক্সিং করব কেন!

দ্বিতীয় বিপিএলে আপনাকে ফিক্সড ম্যাচটায় ড্রপ দেওয়া হয়েছিল। আপনাকে কি অফার করতে ভয় পাচ্ছিল?

প্রথম বিপিএলের আগে প্লাবন ভাইকে রিফিউজ করা-টরা মিলিয়ে একটা ভাবমূর্তি হয়তো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যদি সত্যিই তারা এটা ভেবে থাকে যে, আমাকে কেনা

যাবে না; এটা আমার জীবনের একটা অর্জন। অন্তত এটা লোকেদের বোঝাতে পেরেছি।

প্রিয় ব্যাটসম্যান কে?

শচীন টেন্ডুলকারকে খুব পছন্দ। শুধু খেলার জন্য না। শুধু ব্যাটসম্যানশিপ না। জীবনযাপন বলেন, মানুষ বলেন; সে একটা পছন্দ করার মতো ক্রিকেটার। ব্যাটসম্যান হিসেবে ব্রায়ান লারা। ভিভ রিচার্ডসের নাম শুনতাম; ইউটিউবে দেখে খুব পছন্দ করে ফেলেছি। রাহুল দ্রাবিড়কে বেশ পছন্দ ছিল। আর ছোটবেলায় সাঈদ আনোয়ারের ভক্ত ছিলাম। তবে সব মিলিয়ে শচীন টেন্ডুলকার একটু আলাদা।

প্রিয় বোলার?

কোর্টনি ওয়ালস, ওয়াসিম আকরাম, ওয়াকার ইউনুস। সবার আগে কোর্টনি ওয়ালস। পরে ম্যাকগ্রা, ব্রেট লি; শোয়েব আখতারকে খুব পছন্দ করি।

ম্যাকগ্রা কি আপনার আইডল ছিল?

নাহ। ওয়ালস। ওর সবকিছুই ভালো লাগত। ওই মাথা নাড়ানো, অ্যাটিচিউড। স্মুথ বোলিং, স্মুথ রানআপ।

প্রিয় বোলারের তালিকায় কোনো স্পিনার নেই। তার মানে কি পেসার হিসেবে পক্ষপাত?

নাহ। ভালো তো লাগত শেন ওয়ার্নের বোলিং। ম্যাজিক তো। এখনো সময় পেলে যেসব পুরোনো ফুটেজ নিয়মিত দেখি, তার মধ্যে ওয়ার্নের কিছু ডেলিভারি আছে। এত ম্যাজিক্যাল সব ডেলিভারি আছে। ওর বোলিংয়ে সবচেয়ে বড় ব্যাপার দেখেন, কোনোরকম অ্যাকশন বিতর্ক ছাড়া একটা স্পিনার সাত শ উইকেট নিয়েছে। বাইরের জীবনে যা খুশি করেছে; দুই বছর নিষিদ্ধ থেকে অ্যাশেজে এসে আবার চল্লিশ উইকেট নিয়েছে!

নিজের সেরা পারফরম্যান্স কি চিহ্নিত করতে পারবেন?

হুম...। ভারতের সঙ্গে টেস্টের ওই ৪ উইকেট (চট্টগ্রাম; ২০০৭)। তারপর বিশ্বকাপের (২০০৭; ৪-৩৮ বনাম ভারত) পারফরম্যান্সটা। আইসিএলে যখন অনেক খেলোয়াড় চলে গেল, তারপর প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পারফরম্যান্সটা (৪-৪১)। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওই যে টেস্টে (চট্টগ্রাম; ২০০৩) ৪ উইকেট পেলাম।

কেনিয়ার বিপক্ষে ৬ উইকেটটা?

উইকেটসংখ্যার দিক থেকে ওটা সবচেয়ে বড়। কিন্তু ক্যারিয়ারের সেরা বোলিংয়ের একটা ঠিক মনে হয় না।

নিজের পাওয়া সেরা উইকেট।

বলা তো উচিত শচীন টেন্ডুলকারের উইকেট। কিন্তু ক্রিকেটীয় দৃষ্টিতে দেখলে রাহুল দ্রাবিড়কে (ঢাকা টেস্ট; ২০০৪) বোল্ড করাটা। আমি এক বছর পর মাঠে ফিরলাম। টেস্টের মাঠে নেমেই উইকেটটা। দ্রাবিড় বল ছেড়ে দিয়ে বোল্ড হলো। স্টাম্প দুই-তিনটা পাক খেল। আসলে রাহুল দ্রাবিড়কে আপনি যেভাবেই আউট করেন, এটা ব্যাপার। সে তো আউট হতো না মনে হয়। মানে, আপনি ওকে এভাবে পরাস্ত করার কথা কেবল কল্পনা করতে পারে। ওই সময় সে সেরা ফর্মে।

কোনো ব্যাটসম্যান ছিলেন, যাদের বল করতে একটু ভয়, অস্বস্তি লেগেছে?

ভয় ঠিক না; অস্বস্তি বলি। দুজন ব্যাটসম্যান। গৌতম গম্ভীর ও হাশিম আমলা। এখনো একই অনুভূতি হয়। এদের দেখলে বোলিংটা হয় না। ভালো করে বললে, বিরক্ত লাগে এদের বল করতে।

খুব চাওয়া ছিল, কিন্তু পাওয়া হয়নি কার উইকেট?

ব্রায়ান লারার উইকেট। আচ্ছা, স্টিভ ওয়াহও যোগ করি।

বাংলাদেশের সেরা ব্যাটসম্যান কে?

একজন বলতে হবে? সেটা পারব না।

ঠিক আছে। আপনি একাধিক নামই বলেন।

শুরুর দিকের থেকে বলি। মিনহাজুল আবেদীন নান্নুর কথা বলি। খুব একটা সরাসরি দেখিনি। বাবু ভাই (আরিফুর রহমান) বা অনেকে খুব গল্প করতেন। পরে ভিডিও দেখেছি। কিন্তু অসামান্য ব্যাটসম্যান ছিলেন। সেদিনও একটা ফুটেজ পেলাম। অবিশ্বাস্য। এরপর বুলবুল ভাই, আকরাম ভাই। পরের ব্যাচে অপি ভাই আমার খুব পছন্দ ছিল। আমাদের সময়ে এসে মোহাম্মদ আশরাফুলের কথা বলতে হবে। সম্ভবত বাংলাদেশের ইতিহাসের সেরা ব্যাটসম্যান ছিল। যেকোনো কারণেই হোক, ওর সেরাটা পাওয়া গেল না। তারপর তামিম আর মুশফিককে রাখতে হবে। সাকিবকে আমি কিন্তু রাখব।

ভবিষ্যৎ সেরা কারা?

সৌম্য, বিজয়, সাব্বির এবং বিশেষ করে লিটন। আমি জানি না, ওরা কে কতটা

প্রমাণ করতে পারবে। এভাবে বলাটা ঝুঁকিপূর্ণ। লিটনের যেমন যোগ্যতা আছে সেরা হওয়ার। তবে কপালে আছে কি না, আর নিজের পরিশ্রমটা কী; তার ওপর নির্ভর করে।

অবসর নিয়ে কী ভাবেন?
অনেক বেশি দূর নেই। ৩২ বছর বয়স। এটা ঠিক যে, আমার বয়সে দুনিয়ায় অনেক ক্রিকেটার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শুরু করে। আমি অতটা ভাবছি না। তবে শরীরটা এখন তো একটু ভালো আছে। দেখি। এখনই কিছু ভাবছি না। পারফরম্যান্স খারাপ হয়ে গেলে তো বাদ পড়ে যাব। নইলে ইচ্ছে আছে, একটু ভালো কোনো একটা সময়ে বের হয়ে যাব। একটা দিনও পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন মাথায় নিয়ে খেলতে চাই না।

সাফল্যের বিচারে আপনি দেশের সেরা অধিনায়ক। অধিনায়কত্বের অর্জনগুলোকে কীভাবে দেখেন?
এটা আসলে খুব অদ্ভুত একটা ব্যাপার। সারা দুনিয়ায়ই এটা হয়, দলের সাফল্যকে অধিনায়কের খাতায় যোগ করে দেওয়া হয়। কিন্তু বারবার বিভিন্ন সফল অধিনায়ক যেটা বলেছেন, আমিও বলি, আসলে টিম ভালো না খেললে কোনো ম্যাচই জেতা সম্ভব না। ফলে এই সাফল্যটা দলের, এখানে অধিনায়কের বাড়তি কোনো অর্জন আমি দেখি না। হ্যাঁ, বরং নেপথ্যে যারা কাজ করছেন, এদের কথা বলা যেতে পারে তাদের বড় অর্জন। কোচ আছেন, অন্যান্য সাপোর্ট স্টাফ আছেন। আমরা যারা খেলি, তারা তো যা সাফল্য পাই, সেটার স্বীকৃতিও পাই। কিন্তু ওনারা তো আলোচনারই বাইরে থাকেন। অথচ আমাদের এই সাফল্য, ব্যর্থতা যা-ই বলেন, এর ভিতটা ওনারা তৈরি করে দেন।

এমনিতে এই যে সফল সময়টা ২০১৫ সালে বাংলাদেশ কাটাল, সেটাকে দেশের ক্রিকেটের ইতিহাসে কত বড় ব্যাপার বলে মনে হয়?
অনেক বড়। দেশের ক্রিকেটের অর্থে একটা বড় পদক্ষেপ বলতে পারেন। আমরা সামনে পথচলা শুরু করেছি। তবে এই সময়টা আসলে কত বড়, সেটা আরও সামনের সময়ে বোঝা যাবে। এর ধারাবাহিকতায় কী হয়, আমরা কোথায় যেতে পারি; এগুলো আসলে ঠিক করে দেবে এসব জয়ের মূল্য।

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে যখন আপনাকে অধিনায়ক করা হলো, তখন কি কল্পনা করেছিলেন, কয়েক মাসের মধ্যে এ রকম সফল একটা দল থাকবে আপনার সামনে?
সত্যি বললে, না; কল্পনা করিনি। তবে আমি কখনো এ রকম লম্বা সময় একসঙ্গে

ভাবারও চেষ্টা করিনি। আমি চেয়েছি, দলও যেন একটা একটা করে ম্যাচ নিয়ে ভাবে। আমরা সেটা করেছি। চেষ্টা করেছি, ভুলের পরিমাণ যত কমিয়ে আনা যায়। নইলে যেভাবে ম্যাচের পর ম্যাচ উন্নতি হয়েছে, তা তো একবারে সামনে তাকালে কল্পনা করা কঠিন ছিল।

মাশরাফি মিথ নয়

হাবিবুল বাশার



প্রকাশ্যে মাশরাফির বিপরীত চরিত্র–মাশরাফি হইচই করেন, তিনি চুপচাপ; মাশরাফি উত্তেজিত হন, তিনি নির্লিপ্ত। কিন্তু ভেতরে ভেতরে দুজনই একই রকম মজার মানুষ। ঢাকায় ক্রিকেট খেলতে আসার পর থেকে মাশরাফি সম্ভবত সবচেয়ে বেশি সময় মাঠে ও মাঠের পাশে কাটিয়েছেন এই হাবিবুল বাশারের সাথে। হাবিবুলের মাশরাফিপ্রীতি গোপন কিছু নয়। তাই এমন বিষয়ের আলোচনায় খুলে দিলেন সব দুয়ার

মাশরাফিকে প্রথম দেখার কথা বা ওকে নিয়ে প্রথম স্মৃতি মনে করতে পারেন? জাতীয় দলের আগে দেখেছিলেন?

না। জাতীয় দলে আসার আগে দেখিনি। তবে শুনছিলাম। তখন মনে হয় আমরা প্রথম টেস্ট খেলে ফেলেছি। তারপর থেকে শুনছিলাম যে, এজ লেভেলে এ রকম একটা ফাস্ট বোলার এসেছে–ভয়ানক জোরে বল করে এবং নাকি খুব ভালো ব্যাটও করে। সবাই বলছিল, অল্প কিছুদিনের মধ্যে জাতীয় দলে চলে আসবে। তখন মনে হয়, ওরা একটা ভারত সফরে গেল। ওখান থেকে সরাসরি জাতীয় দলে এসে ঢুকল। আমরা তখন জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজের প্রস্তুতি নিচ্ছি। আসলে ওখানেই প্রথম দেখলাম।

সেই দেখায় কেমন মনে হয়েছিল?

একেবারে প্রথম দেখায় কী মনে হয়েছিল, সেটা মনে করতে পারব না। তবে ওর সম্পর্কে প্রথম যে ধারণাটা তৈরি হয়, সেটা খুব মনে আছে। একটা-দুটো দিন যেতেই মনে হয়েছিল, দিস গাই ইজ ক্রেজি। বলা ভালো, পাগল।

এই 'পাগলা' নামটাই আসলে সবচেয়ে ভালো বর্ণনা করতে পারে। আজ সত্যি কথা বলি, ওকে আমি ভয় পেতাম।

কেন! খুব বেশি পাগলামি করত বলে?
সেটা তো ছিলই। তবে আমি আসলে ওর শরীরের শক্তির জন্য ওকে ভয় পেতাম। দেখেন, জীবনে কখনো শরীরে বল লাগার ভয় পাইনি। আউট হয়ে যেতে পারি, রান করতে পারব না হয়তো; এসব ভয় পেয়েছি। শরীরে বল লাগার ভয় কখনো পাইনি। ম্যাশের ক্ষেত্রে এসে আমার প্রথম এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। একে আমি নেটে খেলতে চাইতাম না; কিছুতেই না। ওর বোলিং নেটে দেখে আমার ভয় লাগত। এটা আসলে বাস্তবতা ছিল। ওর আগে আমরা কখনো সে রকম কোনো ফাস্ট বোলার তো নেটে খেলিনি কখনো। আমাদের দেশে মিডিয়াম ফাস্ট বোলার ছিল, পেসার ছিল; কিন্তু জেনুইন ফাস্ট বোলার ছিল না। সেটাই মাশরাফি প্রথম আসল। যাকে জেনুইন ফাস্ট বোলার আপনি বলতে পারেন।

তাহলে বলের এই ঝড়ের মতো গতিটাই আপনাদের কাছে মাশরাফির প্রথম পরিচয় হয়ে উঠল?
শুধু বলে না, বলুন ওর শরীরে যে শক্তি। আমি আসলে ওর ব্যাপারে দুটো ব্যাপার থেকে দূরে থাকতাম। একটা তো নেটে ওর বোলিং খেলতাম না। আরেকটা হচ্ছে, ফিল্ডিংয়ে ওর থ্রো ব্যাকআপ করতে চাইতাম না।

সেটা কেন?
দেখেন না, খেলোয়াড়দের ফিল্ডিং প্র্যাকটিসের একটা ড্রিল আছে এ রকম–একজন খেলোয়াড় দৌড় দিয়ে গিয়ে বল দূর থেকে থ্রো করবে, লাইনে তার পরে দাঁড়ানো ফিল্ডার ছুটে গিয়ে স্টাম্পের পেছনে বল ধরবে। এখন ওর শরীরে এত ভয়াবহ শক্তি, ও থ্রো করলে সেটা আটকাতে গেলে আপনি ব্যথা পাবেনই। আর ইচ্ছে করে ভয়ানক জোরে থ্রো করত। স্টাম্পে লাগুক আর না-ই লাগুক, হাত ভেঙে যাবে। আমি কখনো ওর পাশে দাঁড়াতাম না ফিল্ডিংয়ে এই ড্রিলের সময়।

কেমন ছেলে মাশরাফি
লাভলি ক্যারেক্টার। এখন তো ওকে দেখে অনেকে হয়তো ওর দুষ্টুমির পুরোটা কল্পনা করতে পারবে না। খুব দুষ্ট, খুবই পাগল। তবে বিরাট একটা হৃদয় আছে। সেই প্রথম দিন থেকে দেখছি, ও এমন একটা ছেলে, যাদের ভালোবাসে, তাদের জন্য জীবন দিয়ে দিতে পারে। আর সেই ভালোবাসা থেকে খুব বেশি লোক বঞ্চিত হয় না। ছেলেটার আরেকটা বৈশিষ্ট্য বলা উচিত–এই একটা ছেলে আমার এই লম্বা ক্যারিয়ারে দেখেছি, যে কখনো কারো পেছনে লাগেনি। ও জীবনে কারো ক্ষতি করার চেষ্টা বা একটু মন্দ কোনো আলোচনার মধ্যেও কখনো জড়িয়েছে, এমন

দেখিনি। খুবই দুষ্টু।

এই যে আপনারা সবাই দুষ্টু বলেন। দুষ্টুমিটা আসলে কেমন?

ওরে বাবা! সব তো বলাও যাবে না। ওর দুষ্টুমির শিকার হয়নি, বাংলাদেশের ক্রিকেটে এমন লোক পাবেন না। দুষ্টুমির শিকার না বলে নিগ্রহের শিকার বলা ভালো! হা হা হা...শরীরে প্রবল শক্তি। আর ওর দুষ্টুমি খুবই ফিজিক্যাল, কাউকেই ছাড়বে না। কখন কাকে পেটাবে, কাকে খোঁচা দেবে; বলতে পারবেন না। ওর সঙ্গে শক্তিতে কে পেরে উঠবে যে, উল্টো মারামারি করতে যাবে! ফলে সেই সবাইকে নিগ্রহ করত।

আপনারা তো ওর চেয়ে অনেক সিনিয়র। ও নিজেই বলছিল, জাতীয় দলে সে যখন এসেছে, তখন সুমন ভাই দূর আকাশের তারা। তো এই সিনিয়রদের সঙ্গে এসব করতে সাহস পেত? আপনারা স্পেস দিতেন?

হ্যাঁ, আমরা ওকে স্পেস দিয়েছিলাম। আমরা ওকে ওভাবেই নিয়েছিলাম। একটা ছোট ভাই, যে পাগলা ধরনের, যার পাগলামি আমরা উপভোগ করতাম। এটা সত্যি, যে নতুন একটা ছেলেকে এভাবে নিতে সময় লাগে। ওর ক্ষেত্রে সেটা হয়নি। প্রথম থেকেই একটা ব্যাপার বোঝা গেছে, এটা একটা খুব ভালো ছেলে। এখানে আসলে একটা সূক্ষ্ম মার্জিন আছে। আপনি আসলে কাকে সুযোগ দেবেন? যে সুযোগটার অপব্যবহার করবে না, তাকেই। এই জায়গাটায় ওর বিবেচনাবোধটাও আবার চমৎকার। ওকে আমরা এত উন্মুক্ত করে দিয়েছি, এত মেশার সুযোগ দিয়েছি; ও কিন্তু সুযোগটা কখনোই নেতিবাচকভাবে নেয়নি। সোজা কথায়, সে বেয়াদব নয়। সে জানে, মার্জিনটা কোথায়। আজ পর্যন্ত একইভাবে জানে। আমি ওর বড় ভাই, কোন কাজটা করলে আমি ছোট হব, সেটা ও জানে; তেমন কিছু করবে না সে। অনেকেই আছে, এ ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। কোথায় গেলে সীমানাটা ভেঙে যায়, সেটা জানে না। ও জানে। ও হয়তো আমার পেছনে একটা ব্যাপার করে; আমি জানি, করে। আমার সামনে করবে না। এমন না যে, সে আমাকে এড়ায়; আসলে এই একটা রেসপেক্ট লাইন সে তৈরি করে। এ জন্যই ওর সঙ্গে দেখবেন সিনিয়রদের সম্পর্কটা এখনো আগের মতোই আছে। ওর বয়স হয়েছে, নিজে সিনিয়র হয়ে গেছে। কিন্তু কারো সঙ্গে সম্পর্কের ফরম্যাট বদলে ফেলেনি।

কত ভালো বোলার? একটা তো আপনি বললেনই যে, প্রথম জেনুইন ফাস্ট বোলার। সামগ্রিকভাবে বোলার হিসেবে কেমন?

দেখুন, আমাদের এখনকার ক্রিকেট সিস্টেম তো অসাধারণ। ট্রেনিং সুবিধা, জিম, ফিজিও অনেক সাপোর্ট আছে। মাশরাফি যখন শুরু করেছে, এসব কিন্তু কিছুই ছিল না। জাতীয় দলে একজন ফিজিও ছিল। এ ছাড়া কোনো সাপোর্ট ছিল না। এখন একজন ফাস্ট বোলারের সেরাটা নিয়মিত পেতে আপনার এসব সাপোর্ট খুব

জরুরি। আমি এক কথায় বলতে পারি, এই মাশরাফি অন্য কোনো দেশে জন্মালে সে দীর্ঘ সময় ধরে জেনুইন ফাস্ট বোলার থাকত এবং হয়তো সেরাদের কাতারে ওর নাম উচ্চারিত হতো।

এসব সাপোর্ট না থাকায় তো ওর ইনজুরি বা ইনজুরি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে ঝামেলাও তো হয়েছে।

এটা খুব সত্যি যে, ওর প্রথম চার বছর আমরা ওর দেখাশোনা করতে পারিনি; সেটা আমাদের জানা ছিল না, সুবিধাও ছিল না। এখন তো পুরো একটা সেটআপ আছে। ২০০৫ পর্যন্ত আমরা ট্রেনিং করতে বিকেএসপি যেতাম, ডাক্তার দেখাতেও তাই যেতে হতো। এটা ওর জন্য খুব দুর্ভাগ্যজনক, বাংলাদেশের জন্যও। কারণ, বাংলাদেশও ওর সেরাটা দেখতে পেল না। এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে, ও নিজেও প্রথম দিকে এই প্রয়োজনগুলো বুঝত না। একটা ফাস্ট বোলারের শরীরের যে এত যত্ন দরকার, এত কিছু করতে হয়; এটা ওকে জানানোর মতোও কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আমি বিশ্বাস করি, ও যদি এই সুবিধাগুলো পেত, একটু যত্ন নিতে পারত শরীরের, দুটো ব্যাপার ঘটত–প্রথমত, ওর এত ইনজুরি হতো না। ফলে ওর জীবন থেকে এত সময় নষ্ট হতো না। তাহলে তো যে হারে উইকেট পায়, তাতে এমনিতেই আরও অনেক ওপরে চলে যেত ওর নাম। আর এই ব্যবস্থাগুলো থাকলে ওর বোলিংয়ের গতিটা, শুরুর সেই আতঙ্কটাও এত সহজে যেত না; ফলে উইকেট নেওয়ার ক্ষমতাটাও আজও আরো অনেক বেশি থাকত।

অধিনায়ক হিসেবে মাশরাফিকে কেমন পেয়েছেন?

প্রথমে একটা অভিযোগ করব। এটা আমার সব সময়ের অভিযোগ। জাতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে আমি ওর ব্যাটিংটা সেভাবে পাইনি কখনো। আমি কিন্তু ওর বিভাগীয় দলেরও অধিনায়ক ছিলাম। ফলে আমি জানি, ও কত ভালো ব্যাটসম্যান। বিভাগীয় দলে ওর যেসব ইনিংস দেখেছি, তাতে আমি নিশ্চিত যে, তার খুব ভালো একটা অলরাউন্ডার হওয়ার একেবারে সত্যিকারের সম্ভাবনা ছিল। হ্যাঁ, কিছু কিছু পেয়েছি। ছোট ছোট কিছু ইনিংস খেলেছে। ভারতের বিপক্ষে ফিফটি করল টেস্টে। কিন্তু এটুকু না। আমি ওকে ব্যাটসম্যান হিসেবে আরও বেশি মূল্যায়ন করি। আমি পরিষ্কার করেই বলি, ওর কপিল দেব বা এ রকম কারো মতো জেনুইন অলরাউন্ডার হওয়ার কথা ছিল। এই বড় নাম নেওয়ায় অনেকে অনেক কিছু বলতে পারেন। এটা আমার মূল্যায়ন। আমি মনে করি, ওর এ রকম হয়ে ওঠার শক্তি ছিল। টেকনিক ভালো ছিল, পাওয়ার ছিল দারুণ। তার আরও ওপরে ব্যাট করা একজন ব্যাটসম্যান হওয়ার কথা ছিল। আমি সেটা জাতীয় দলে মিস করেছি।

বোলার মাশরাফির সেরাটা তো পেয়েছেন। তার ক্যারিয়ারের সেরা পারফরম্যান্সগুলোর অনেকটাই আপনার অধিনায়কত্বে।

অবশ্যই, অবশ্যই। সে ছিল আমার প্রধান বোলার। হয় না যে, একজন অধিনায়কের একটা মূল ভরসা থাকে যে, একে আনলে আমি উইকেট পাব। ও ছিল আমার সেই বোলার। আমার উইকেট দরকার, অতএব মাশরাফিকে নিয়ে আসব। মনে রাখতে হবে, আমি যখন অধিনায়ক হয়েছি, তার আগেই কিন্তু ওর অনেকগুলো ইনজুরি হয়ে গেছে। ফলে ওকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাকে অনেক কিছু মাথায় রেখে করতে হয়েছে। তারপরও আমরা ওই আমলে যতগুলো ম্যাচ জিতেছি, এর একটা প্রধান কারণ ছিল মাশরাফি।

একটা মিথ ছিল তখন–মাশরাফি শুরুতে ব্রেক থ্রু দিলে আমরা জিতব।

মিথ নয়, সত্যি। দেখেন, এই সময়ে আমরা অনেক জয় পেয়েছি, আজ স্কোরকার্ড দেখলে বা পত্রিকা দেখলে আপনি দেখবেন, ওর চেয়ে হয়তো অন্যদের বেশি নায়ক মনে হয়েছে। ওর কথা কম এসেছে। কিন্তু সে-ই আসলে ব্যাপারটার শুরু করেছে। আসলেই আমরা সে সময় যে বড় ম্যাচগুলো জিতেছি, ওর শুরুর ব্রেক থ্রু ছিল বলেই জিতেছি। হ্যাঁ, মনে হতে পারে ও দুটো মাত্র উইকেট নিয়েছে বা একটা উইকেট নিয়েছে। কিন্তু আমরা যারা মাঠে ছিলাম, তারা বুঝতে পারছি, ও উইকেট দুটো নিয়েছে বলেই জয়ের পথে হাঁটতে পেরেছি আমরা। এটা আসলেই সত্যি ছিল যে, মাশরাফি শুরুটা করে দিলে আমরা পারব। আমি ক্যাপ্টেন হিসেবে জানতাম, এটা কতটা সত্যি। কার্ডিফের কথাটা ধরুন...

গিলক্রিস্টের উইকেটটা।

হ্যাঁ, উইকেট পেল কিন্তু ১০ ওভার বল করে ওই একটাই। কিন্তু ওটার গুরুত্ব আপনি বুঝতে পারবেন না, যদি খেলাটার ভেতরে না থাকেন। ওই একটা উইকেট আমাদের ম্যাচ জেতানো পারফরম্যান্স ছিল।

আপনাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা একটু বলেন। মাঠের বাইরে...

এটা তো বর্ণনা করা একটু মুশকিল। সেই প্রথম দিন থেকে আমাদের সম্পর্ক যেমন ছিল, আজও তেমনই আছে। ভেবেছিলাম, আমি নির্বাচক হলে একটু বদলাবে সম্পর্কটা। আমাকে একটু ভয়-টয় পাবে। কিন্তু মুশকিল হলো, এখনো সে ভয় পায় না। হা হা হা...এখনো শরীরে পানি ঢেলে দেয়, এখনো সেই দুষ্টুমি করে। ওর কাছে এলে মনে হয়, আমাদের কারোরই বয়স বাড়েনি। সেই তারুণ্যে আটকে আছি। একটু সিরিয়াসলি বলি, মাশরাফি হচ্ছে এমন একজন মানুষ, আপনার মনটা যতই খারাপ থাকুক, ওর সঙ্গে সময় কাটাতে ভালো লাগবে আপনার। সফরে বলেন, হোটেলে বলেন; সব জায়গায়। আসলে এ রকম একটা মানুষ খুব দরকার একটা দলকে পরিবার করে ফেলতে। আমি মনে হয় একটু প্রশ্রয়ও বেশি দিতাম, আমি চাইতাম ও এমন করুক। কে কী ভেবেছে জানি না, আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই–ওর প্রতি আমার একটু বাড়তি দুর্বলতা ছিল।

এটা কিন্তু বাজারে একটা অভিযোগ আকারেও হাজির আছে। বলা হয়, আপনি আর ডেভ হোয়াটমোর মাশরাফিকে বাড়তি সুবিধা দিতেন।
এটাকে আমি বাড়তি সুবিধা বলব না; এটা ছিল ভালোবাসা। সেটা মাশরাফিকে কে না বাড়তি ভালোবাসে? আজকের তরুণ ক্রিকেটাররাও তো ওকে অন্যদের চেয়ে একটু বেশি ভালোবাসে। আর একটা ব্যাপার হলো, ওকে আমাদের খুব সাবধানে সামলাতে হয়েছে। ওর কোনো ক্ষতি হয়ে গেলে ওর চেয়ে দল বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফলে ওর কথা মাথায় রেখে অনেক কিছু করতে হয়েছে। সেটা তো আর ব্যক্তি মাশরাফির জন্য করিনি আমরা। সেটা করা ছাড়া উপায় ছিল না। মাশরাফি ছাড়া আমাদের হাতে আজকের মতো অপশন ছিল না। সে যেমনই ফিট থাকুক, সে সেরা। ফলে তার যত্ন না নিয়ে তো উপায় নেই। আর যখন আপনি সেরা হবেন, কিছুটা প্রিভিলেজ পাবেন। এখন কথা হলো মাশরাফি সেই সুবিধাটা নিয়ে অন্যায় করছে কি না। জীবনেও করেনি। তাকে আমরা বাড়তি যত্ন নিয়েছি, অনেক কিছু করেছি; ক্রিকেটে ষোলো আনা সেটা প্রতিদান দিয়েছে। জীবনে কখনো বাউন্ডারি পার হয়ে মাঠে ঢোকার পর আমাদের হতাশ করেনি। ফলে কেন দেব না!

মাশরাফি 'পারব' বললে পারে, 'পারব না' বলে পারে না; এমন কিছু ছিল আসলেই?
ছিল। এটাই বলতে চাচ্ছিলাম, ও সবচেয়ে ভালো টের পেত ওর কী অবস্থা। ফলে ওকে ওই গুরুত্বটা দিয়ে ওর কথার ওপরই ভরসা করতে হতো। হয়তো ম্যাচের আগের দিন কিছু একটা বড় সমস্যা হয়ে গেল। শারীরিক বা মানসিক সমস্যার কারণে একদম বিপর্যস্ত। অনেক সময় ভয়াবহ সমস্যা হয়েছে। সব বলাও যায় না। অন্য কোনো খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতাম, পরদিন সে থাকবে না; পারবে না। ওর ক্ষেত্রে আমরা অপেক্ষা করতাম, ও কী বলে সেটা শোনার জন্য। মাশরাফির সঙ্গে বাকিদের পার্থক্য কী, ও যদি বলে 'খেলব', তাহলে মাঠে নেমে ওর দুই শ শতাংশের নিচে আপনি পাবেন না। ফলাফল যা-ই হোক না কেন, ও নিজের সেরার চেয়েও বেশি দিয়ে ফিরবে। আমি একটা ব্যাপার ভালো বুঝি, মাশরাফি কখনো আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেনি; ফলে সে ডিজার্ভ করে যে, আমরা তাকে একটু অন্য কোনো চোখে দেখব।

একটা ভালো উদাহরণ মনে হয় এই কথার পক্ষে রানার মৃত্যুটা। পরদিন ওই অবস্থায় ভারতের বিপক্ষে সেই ম্যাচ...
হ্যাঁ, সেটা ভালো উদাহরণ। তবে ওই সফরেই এর চেয়ে ভালো একটা উদাহরণ আছে। লোকে জানে না। আমরা তো বিশ্বকাপের প্রায় ১৫ দিন আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজে চলে গেলাম। তখন সম্ভবত আমরা ত্রিনিদাদে। একদিন খবর পেলাম, মাশরাফির পিঠে খুব ব্যথা। ও নড়তে পারছে না। ছুটে গিয়ে দেখি, ঠিক। ও

আক্ষরিক অর্থেই প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে, একদম নড়তে পারছে না। ফিজিও দেখে বলল, সিরিয়াস সমস্যা। ওর সামনেই বলল, কমপক্ষে তিন সপ্তাহ লাগবে। মাশরাফি কাঁদছিল। মানে তো সোজা, মাশরাফির বিশ্বকাপ শেষ। তখন অন্য কেউ হলে কী করতাম? আমরা দেশে ফেরত পাঠাতাম। আমি ওর বেলায় চান্স নিতে চেয়েছি। অন্য কেউ হলে চান্স নিতাম না। ওর বেলায় আমি জানি, ও পারবে বললে পারবে। পরদিন জিজ্ঞেস করলাম, পারবি? ও বলে, দুদিন পর পারবে। জানেন, দুদিন পর ও ক্যারিয়ারের সবচেয়ে জোরে সম্ভবত বল করেছিল নেটে। এটাই মাশরাফি। চিকিৎসকেরা বলবে তিন সপ্তাহ লাগবে, ও বলবে দুই দিন; দুই দিনটাই ও সত্যি করে ফেলবে। দেখেন, মাশরাফি সারা জীবন ব্যথা নিয়ে খেলেছে। আমি খেলোয়াড় তো জীবনে কম দেখলাম না। সামান্য ব্যথা থাকলেও খেলোয়াড়েরা মাঠে নেমে একটু নিজেকে চেপে রাখে; সেটা খারাপ না। কিন্তু মাশরাফি সারা জীবন কখনো কখনো ভয়াবহ ব্যথা নিয়েও খেলেছে; জীবনেও সে জন্য এক সেন্টিমিটারও কম পারফর্ম করেনি।

এটা তো কখনো কখনো বেশি বেশিও মনে হয়। সে মাঠে নেমে ব্যথা নিয়েও যে ঝুঁকিপূর্ণ সব লাফঝাঁপ দিয়েছে...

এখনো দেয়। আপনি দেখবেন, কিছু অহেতুক ডাইভ দেয়। হয়তো ও ডাইভ দিলেও সিঙ্গেল হবে, না দিলেও হবে। ও বল আটকানোর জন্য সর্বোচ্চটাই করবে। এখনো বলি–এসব কেন করিস? ও হেসে বলে, ‘ভাই, আমি পারি না। শরীর চলে যায়।’

২০১১ বিশ্বকাপের সময় আপনি কোনোভাবে দলের সঙ্গে ছিলেন না। তারপরও ঘটনাগুলো তো দেখেছেন। মাশরাফির প্রতি কি অবিচার হয়েছে?

এখানে আমি দুটো দিকই দেখতে চাই। আমি এখন নির্বাচক তো, আমি এখন বুঝতে পারি নির্বাচকদের আসলে ফিটনেসের ব্যাপারে কিছু বলার থাকে না। ফিজিও-ট্রেনার যদি বলে যে, সে আনফিট, তাহলে কিছু করার থাকে না। আমি জানি না, তখন ফিজিও এ রকম কোনো রিপোর্ট দিয়েছিলেন কি না যে, তাকে সিলেকশনের জন্য পাওয়া যাবে না। যদি সেটা হয়ে থাকে, তাহলে তো কিছু বলার নেই। এটা বললাম, পুরো আইনি কথা। কিন্তু আমি তখন অনুভব করেছিলাম, কাজটা ঠিক হয়নি। কারণ খেলা ছিল বাংলাদেশের মাটিতে, খেলা আরও প্রায় দেড় মাস পরে। আমি হলে হয়তো সুযোগ নিতাম। এই সময়ের মধ্যে তার সুস্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তো আমি সুযোগ নেবই। এখানে দেশের মাটিতে খেলা ছিল বলে রিপ্লেসমেন্টের সুযোগ ছিল। অস্ট্রেলিয়ায় যেমন খেলা হয়েছে, আমাদের ১৫ দিন আগে চলে যেতে হয়েছে। তারপরও কিন্তু এ রকম খেলোয়াড় নিয়ে আপনি ঝুঁকি নিতে পারেন; অনেকেই নেয়। কারণ, ও এমন একজন খেলোয়াড়, যার উপস্থিতি শুধু মাঠে নয়, তার বাইরেও জরুরি। সে দলটাকে এক করে ফেলতে পারে। এ রকম কিছু খেলোয়াড় থাকে, যাদের জন্য ঝুঁকি নেওয়া যায়। তারপরও

আমি জানি না, বলে পরিষ্কার কিছু বলা কঠিন।

অধিনায়ক মাশরাফিকে দেখে কি একটু অবাক লাগে? একটা ছেলে, যে ছিল আপনাদের আদরের 'পাগলা' সে এত চমৎকার পরিণত অধিনায়ক হয়ে গেল।
নাহ। ও কিন্তু ভিন্ন কিছু করছে না। ও যা করে, তাই করছে। ও মানুষ হিসেবে মাঠের বাইরে যেমনই হোক, ক্রিকেটে কিন্তু অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ একটা ছেলে। আর নিজের কোনো কিছু নিয়ে পরোয়া না করার কথা বলছি; সেটাও কিন্তু বছর তিনেক আগে ও বদলে ফেলেছে। ও বুঝতে পেরেছে যে, ওর আর টিকে থাকতে হলে নিজের যত্ন নিতে হবে। ফলে সে অধিনায়ক হওয়ার আগেই অনেকটা শৃঙ্খলার মধ্যে চলে এসেছে। হ্যাঁ, মাঠের বাইরে নিজেকে একটুও বদলায়নি। কিন্তু 'পাগলা' মাঠে যেমন ছিল, সেটাই আছে। অধিনায়ক হিসেবে তাই করছে। আর বয়সের সাথে সাথে ও পরিণত হয়েছে। আর দুষ্টুমির কথা যদি বলেন, সেগুলো আছে, সেগুলো বরং ওকে ক্যাপ্টেন হিসেবে আরও কিছু সুবিধা দিচ্ছে; সবার সাথে একাকার হয়ে যেতে পারছে। অধিনায়ক হিসেবে অনফিল্ড গুণগুলোর কথা বললে বলব, এগুলো ওর মধ্যে ছিল। কিন্তু অধিনায়ক না হলে তো এর প্রকাশ দেখতে পাবেন না। তাই একটু নতুন মনে হচ্ছে। আমার মনে হয় না, অধিনায়কত্বের জন্য ও নিজেকে একটুও বদলেছে। বদলালে মানুষ সাফল্য পায় না। আমি নিজেকে দিয়ে বুঝি। মানুষ হিসেবে আপনি যেমন, অধিনায়ক হিসেবে তাই। ও যেমন মানুষ ছিল, তাই আছে।

তারপরও মানুষের একটা ভাবমূর্তি থাকে। হাবিবুল বাশার একজন রাশভারী, রসিক মানুষ। তার কাছ থেকে আমরা ওটা পাব বলেই আশা করি। মাশরাফির ভাবমূর্তিটা ছিল একটু খেয়ালি, একটু অস্থির, খুব একটা চিন্তা করে না। অথচ এখন দেখা যাচ্ছে, মাঠে সে খুবই চিন্তাশীল, শান্ত। সংবাদ সম্মেলনে জীবনবোধের ছড়াছড়ি। এগুলো একটু বিস্ময়কর না?
হ্যাঁ, আমি আগে যেটা বলেছি, মূলত খেলোয়াড় সামলানোর দিকটা বলেছি। ওটা ওর ভেতর ছিল, ছোটবেলা থেকেই ছিল। সবাইকে এক হাতে সামলাতে পারে, আনন্দে রাখতে পারে। হ্যাঁ, এখন মাঠের এই শান্ত থাকা, চিন্তা করা বা কথা বলায় পরিণত হয়ে ওঠা; এগুলো সম্ভবত কিছুটা শিখেছে। তবে কি জানেন, আমি এই শেখার তত্ত্বটায় খুব একটা বিশ্বাস করতে পারি না। কিছুটা তো মানুষ সময়ের সঙ্গে শেখেই। কিন্তু কোথাও না কোথাও ভেতরে থাকতে হয়। সেটা দায়িত্ব না পাওয়া পর্যন্ত প্রকাশিত হয় না। আমরা কাউকে অধিনায়ক হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করি, অনেক কিছু করি। মনে হয়, বড় হলে ভালো ক্যাপ্টেন হবে। কিন্তু দায়িত্বটা দিলে বের হয়ে আসে, আদৌ পারে কি না। আবার কারোটা লুকানো থাকে। দায়িত্ব দিলে সে তার পুরোটা সত্তা বের করে আনে। আমার মনে হয়, ওর কিছু গুণ তো আছে সবাই জানত; বাকিটা আমরা কেউ জানতাম না। এখন বের হয়ে আসছে। এটাই মাশরাফি।

এ রকম চরিত্র আর পাবেন না

সাকিব আল হাসান



সাকিব আল হাসানের সাথে কথা বলাটা ঝুঁকিপূর্ণ। মুড থাকলে অনেক কথা বলবেন, অনেক মজা করবেন। না হলে পেটে বোমা মেরেও কথা বের করা যাবে না। সেই দিনটায় তার মুড ছিল বলে মনে হচ্ছিল না। কিন্তু প্রসঙ্গ যখন মাশরাফি বিন মুর্তজা, সাকিব আশ্চর্য করে ফেললেন। এক লহমায় নিজেকে ঝেড়ে ফেলে কথা বলতে শুরু করলেন। মাশরাফির বিষয়ে যে সাকিবের এতটা বলার ছিল, সে আগে কল্পনা করা যায়নি।

মাশরাফির সাথে প্রথম পরিচয়ের কথা মনে আছে?

হ্যাঁ, মনে আছে। নড়াইলে। ওই যে ওনাদের ওখানেই তো বিকেএসপির ক্যাম্প হয়েছিল। যেটা থেকে আমাকে বিকেএসপির জন্য সিলেক্ট করল। বাপ্পী স্যার আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। ওখানেই কৌশিক ভাইকে প্রথম দেখি। তখনই তো উনি অনেক বড় তারকা।

আগে থেকে তার সম্পর্কে জানতেন?

ঠিক জাতীয় দলের তারকা হিসেবে জানতাম না। হয়েছে কী, আমি তো টিভিতে খেলা কম দেখতাম। ফলে ওনার বোলিং যে টিভিতে খুব দেখেছি, তা মনে হয় না। তবে নাম জানতাম। হয় না? পাশের জেলায় একজন ক্রিকেটার দেশ-বিদেশে খেলছে, তার খবর ছাপা হচ্ছে পত্রিকায়। নাম জানতাম। লোকে বলতও খুব ওনার কথা।

আমি শুনেছিলাম, নড়াইল ক্যাম্পে আপনার যাওয়ার একটা বড় আগ্রহ ছিল

মাশরাফির সাথে দেখা হওয়া...
বলতে পারেন। ওই সময় আমাদের বয়সী ক্রিকেটারদের কাছে উনি হিরো ছিলেন। ঠিক ওনার সাথে দেখা করব বলেই ক্যাম্পে গিয়েছিলাম, তা নয়। তবে ক্যাম্পে তো শুরুতে যেতে চাইনি। পরে বাপ্পী স্যার বললেন, কৌশিক নড়াইলে আছে। ওখানে গেলে ওর বিপক্ষে বল করতে পারবি।

মানে, তখন ব্যাটসম্যান মাশরাফি বেশি আলোচিত ছিলেন?
হ্যাঁ। অবশ্যই। ওনার ব্যাটিং নিয়ে তখন অনেক গল্প ছিল।

বাপ্পী স্যার নাকি মাশরাফিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যে, পারলে এই পিচ্চিটাকে ছক্কা মেরে দেখাও।
(হাসি)। ঠিক, ঠিক। এটা আমার মনে আছে। তখন উনি ছিলেন ভয়ানক ব্যাটসম্যান। নেটে ওনার সামনে কেউ বল করতে চাইত না। সবাইকে খালি ছক্কা মারত। বাপ্পী স্যার বলল, এই ছেলেটাকে ছক্কা মারো। আমি ভয় পাইনি, আমি ঠিক গিয়ে বল করেছিলাম।

আপনাকে ছক্কা মারতে পেরেছিল?
মনে হয় না। (একটু ভেবে)। না, না। পারেনি। আমাকে ছক্কা মারতে পারেনি। (আবার হাসি)।

নড়াইল তো একটা মজার জগৎ। ওখানে গিয়ে আপনি মজা করতেন?
প্রথম কয়েকটা দিন মন খারাপ ছিল। তারপর আপনি তো জানেন, ওনারা কেমন মানুষ। প্র্যাকটিস, বাইরের সময়; সব সময় মজা করে। আমরা ওনাদের সাথে খুব একটা মেশার সুযোগ পাইনি। ওনারা তো একটু বড় ছিল আমাদের চেয়ে। তবে মনে আছে, একটা নদীতে কৌশিক ভাইদের সাথে সাঁতার কাটতে গিয়েছিলাম। ওনারা ওই নদীটাকে খুব পছন্দ করে।

ওটাই কি চিত্রা নদী?
মনে হয়। আমার ঠিক মনে নেই। তখন কি নাম শুনেছিলাম কি না...। মনে হয় চিত্রা নদীই হবে।

জাতীয় দলে এরপর একসময় সতীর্থ হয়ে উঠলেন। মাশরাফি কেমন সতীর্থ?
জাতীয় দলে আপনি সবচেয়ে ভালো যে ধরনের সতীর্থ কল্পনা করতে পারেন। উনি কেমন মানুষ, সে তো আপনারাও জানেন। বাইরে সবার সাথে যেমন মজা

করেন, দলে তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম করেন না। ওনার সবচেয়ে বড় গুণ হলো, যে কারো মন খারাপ ভালো হয়ে যায়, ওনার কাছে থাকলে। ড্রেসিংরুমে, ছোট-বড় সবার সাথেই সমান দুষ্টুমি করতে পারেন। আমার ক্ষেত্রে একটা মজা হলো, মাশরাফি ভাইয়ের সাথে ড্রেসিংরুমে দেখা হওয়ার পর আমার একবারও মনে হয়নি, উনি নতুন কেউ। মনে হয়েছে, অনেক বছর ধরে আমরা একসাথে খেলছি।

সেটা কি নড়াইলে ওই পরিচয়ের কারণে?
খানিকটা। তার চেয়ে বেশি ওনার স্বভাবের কারণে। আমার মনে হয়, ওনার সাথে যারই প্রথম পরিচয় হোক, প্রথমবারেই মনে হবে, অনেক দিনের পরিচয় আছে।

একটা সময় আপনি মাশরাফির ডেপুটি হলেন। সাথে সাথে মাশরাফি ইনজুরিতে পড়ল, আপনাকে ক্যাপ্টেন্সি করতে হলো। এ রকম অনেকবার হয়েছে। একসময় আপনি বলছিলেন যে, আপনি মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকেন।
(হাসি) প্রস্তুত থাকি মানে, ওনার ইনজুরি হোক, সে জন্য না। কিন্তু এত ঘন ঘন হচ্ছিল, সব সময় এই শঙ্কাটা থাকত যে, উনি ইনজুরিতে পড়তে পারেন। ওনাকে ডাইভ দিতে দেখলেই ভয় লাগত। মনে হতো, পরের বল থেকেই আবার আমাকে ক্যাপ্টেন্সি করতে হবে। সেটাই বলেছিলাম মনে হয়।

এই যে হঠাৎ হঠাৎ অধিনায়কত্ব পেয়ে যেতেন, মনে হতো না যে, এটা আমার দল নয়? মাশরাফির দল।
নাহ। আমি তখনো বলেছি, এখনো বলছি, আমি মনে করতাম, উনিই যোগ্য অধিনায়ক। দল ওনারই চালানোর কথা। আমি জাস্ট ওনার কাজটা করে দিচ্ছি। আমি ক্যাপ্টেন্সি পেতে হবে, এভাবে কখনো ভাবিনি। ফলে ও রকম মনে হওয়ার সুযোগই নেই। আমি জানতাম যে, মাশরাফি ভাই-ই সেরা অধিনায়ক। তখনো আমি মিডিয়ায় এ কথা বলেছি।

পরে তো মাশরাফি আপনার ক্যাপ্টেন্সিতে খেলেছেও। তখন সমস্যা হয়নি যে, আমারই সাবেক ক্যাপ্টেনকে এখন সামলাতে হবে...
সামলানোর তো কিছু নেই (হাসি)। ওনাকে আমার সামলাতে হবে কেন? আর আমি একটা কথা বলি, ক্যাপ্টেন-ট্যাপ্টেন ব্যাপারগুলোকে বাইরে থেকে কেমন যেন মনে হয়। আমাদের দলে অমন কিছু নেই। আমি ক্যাপ্টেন, মাশরাফি ভাই একজন খেলোয়াড়; এতে এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের সম্পর্ক বদলায়নি। আমি ওনাকে বড় ভাই মনে করতাম আগেও, তখনো তাই করেছি। উনি আগেও আমাকে

যা বলতেন, তখনো তাই বলতেন। ক্যাপ্টেন জাস্ট একটা দায়িত্ব; এর চেয়ে বেশি কিছু তো ছিল না।

ক্যাপ্টেন মাশরাফির প্রসঙ্গে পরে শুনব। আগে একটু বলেন, এই যে আবার সেই মাশরাফির ডেপুটি হলেন, এটা মেনে নিলেন কী করে? আপনি একজন সাবেক অধিনায়ক। আরেকজন সাবেক অধিনায়কের ডেপুটি হওয়াটা কি মাশরাফি বলেই মেনে নিলেন?

হুম... (ভাবছেন)। এটা বলা মুশকিল। আসলে বললাম না, আমি এভাবে ভাবি না। মাশরাফি ভাইয়ের ডেপুটি তো আমি হতেই পারি। আমি তো আগেও সেটা ছিলাম। ফলে আমাকে যখন বলা হলো, আমার কাছে এটা স্বাভাবিক মনে হয়েছে। ওনার ডেপুটি হওয়ার কথা আমার। আমার তাই মনে হয়েছে। আমি ওনার ক্যাপ্টেন ছিলাম বলে আর কখনো ডেপুটি হব না, এমন কিছু তো নাই। আমি ওনার সাথে ভালো কাজ করতে পারি। উনি ভালো বোঝেন ব্যাপারটা। ফলে আপত্তির কোনো সুযোগ তো নেই।

আরেকটু তীক্ষ্ণ করি প্রশ্নটা। মাশরাফি ছাড়া অন্য কারো ডেপুটি হতে বললে কি মানতেন?

(হাসি) এমন প্রস্তাব তো আসেনি। তাহলে ভাবব কেন? জীবন এত জটিল করে লাভ নেই। আমি এই ভূমিকাটা এনজয় করছি। ফলে এটা ঠিক আছে।

ওকে। এর মধ্যেও দুটো ম্যাচে আপনাকে ক্যাপ্টেনসি করতে হয়েছে। সেই আগের মতো। এ রকম স্টপ গ্যাপ ক্যাপ্টেনসির ক্ষেত্রে নিজের চিন্তাই থাকে? নাকি মাশরাফির প্রক্সি দিতে হয়?

আমাদের দলে সবাই নিজের চিন্তা করার সুযোগ পায়। আমি ক্যাপ্টেন না থাকলেও মাঠে নিজে ক্যাপ্টেন হিসেবে যা ভাবতাম, সেভাবে ভাবি। প্রয়োজন হলেই মাশরাফি ভাইকে বলি। দেখেন, একটা ব্যাপার সহজ করে দিই। ক্যাপ্টেনসির কঠিন সময়গুলোতে কোনো ক্যাপ্টেন কিন্তু একা সিদ্ধান্ত নেয় না। তার একটা সিনিয়র কোর গ্রুপ থাকে। সে আমাদের ডাকে। আলোচনা করে। হ্যাঁ, শেষমেশ হয়তো সেই সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এটা সবাই মিলে একটা ব্যাপার।

একটু পেছন ফিরে যাই। ২০১০ ও ২০১১ সালে আপনার ও মাশরাফির এই যে দারুণ উষ্ণ সম্পর্ক এটাতে একটু চিড় ধরেছিল বলে গুঞ্জন আছে।

আমি তো শুনিনি এমন কথা।

মাশরাফির সেই হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া, একাদশে না থাকা এবং আপনার মিডিয়ায় কিছু কথা বলা...

কী বলেছিলাম? আমার সত্যি মনে নেই (হাসি)। দেখেন, এত পুরোনো কথা মনে না থাকা ভালো।

আসলেই মনে নেই!

আচ্ছা, শোনেন। আমি এককথায় বলি, অনেক সময় অনেক মানুষই যা করা উচিত ছিল, তা করতে পারে না। মানুষ তো কিছু ভুল করবেই। ধরে নিন, আমি ভুল করেছিলাম এবং মাশরাফি ভাই ভুল করেছিল। তাহলেই তো মিটে গেল। আপনার সেই কথা মনে আছে, অথচ আমরা দুজন পরে হাত ধরে বিসিবি অফিসে হাঁটলাম। একসাথে দাঁড়িয়ে ছবি তুললাম। কত মজা করলাম। সেটা ভুলে যাবেন কেন? অনেক কিছুই হয়। সারা জীবন সব সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় না। আমি শুধু পরিষ্কার বলে দিই, কখনোই আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক খারাপ হয়নি; হবেও না। ক্রিকেটের বাইরেও আমরা যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ। সামান্য কিছু ব্যাপারে তাতে প্রভাব পড়ার কথা নয়।

ওকে। ২০১১ বিশ্বকাপে মাশরাফি স্কোয়াডেই জায়গা পেলেন না।

আমি একটা সত্যি কথা বলি? আমি এবং কোচ (জেমি সিডন্স) একসাথে গিয়ে নির্বাচক কমিটিতে বলেছিলাম, মাশরাফি ভাইকে দরকার। অবশ্যই দরকার ছিল। এ বিষয়ে আমি আর কিচ্ছু বলব না।

আপনি এবং কোচ দলে চাইলেন, নির্বাচকেরা বলেছিলেন, তারাও চান। তাহলে মাশরাফি বাদ পড়ল কী করে!

আমি আসলেই আর কিছু জানি না। তবে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, যতবার কথা উঠেছে, মাশরাফি ভাইকে চেয়েছি। আমি এবং কোচ দুজনই অবাক হয়েছিলাম, ওনাকে দলে না দেখে। বাকিটা মন্তব্য করব না।

আচ্ছা, বাদ দিলাম। এবার একটু মূল্যায়ন করেন। মাশরাফি কেমন মানুষ?

ওয়ান অব দ্য গ্রেটেস্ট মোটিভেটর। যেকোনো পরিস্থিতিতে একটা দলকে, পুরো একটা গ্রুপকে কীভাবে চাঙা করে তোলা যায়, ওনার চেয়ে ভালো কেউ জানে না। ওনার আশপাশে থাকা মানেই, আপনাকে উনি ফুরফুরে করে রাখবেন।

অধিনায়ক হিসেবে কেমন?

যা বললাম, সেটা আসলে ক্যাপ্টেন্সির সেরা বৈশিষ্ট্য। আপনি যদি দলকে সব সময়

মোটিভেটেড রাখতে পারেন, মাঠে গিয়ে নিজের সেরা পারফর্ম করতে উৎসাহ দিতে পারেন; আর কী চাই! উনি যে কারো সেরাটা বের করে আনতে পারেন। দলগতভাবে যেমন পারেন, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে আলাদাভাবে ইনস্পায়ার করতে পারেন।

অনফিল্ড? অনফিল্ড ক্যাপ্টেনসিতে কে ভালো—সাকিব, নাকি মাশরাফি?

অনফিল্ড ক্যাপ্টেনসি ব্যাপারটার ভালো-মন্দ বিচার করাটা আমার কাছে সঠিক মনে হয় না। প্রত্যেক ক্যাপ্টেনই তো প্রতিটি সিদ্ধান্ত দলের ভালোর জন্য নেয়। আমি মনে হয় এটা আপনাকে আগেও বলেছি। একটা ক্যাপ্টেন একটা বোলারকে আনল, সে পিটুনি খেলে মনে হবে খারাপ সিদ্ধান্ত। আবার সে-ই যদি উইকেট পায়, মনে হবে দারুণ ক্যাপ্টেনসি। এটা আসলে অনেকটা ভাগ্যের ব্যাপার। আর এই পর্যায়ে একজন সিনিয়র ক্রিকেটার, কেউ কারো চেয়ে ক্রিকেট ম্যাচ কম বোঝে, তা মনে হয় না। আরেকটা ব্যাপার হলো, মাঠে আমরা সবাই অনেক বেশি অ্যাকটিভ থাকি। ফলে আমি বা মাশরাফি ভাই বা মুশফিক ভাই, সবার ক্যাপ্টেনসিতে সবার অবদান থাকে।

কঠিন একটা প্রশ্ন—মাশরাফি আসলে কতটা ভালো ক্রিকেটার?

মানে!

মানে, মাশরাফি তো একটা মিথ। সে উইকেট না পেলেও মিথ। তার আচরণ, তার ক্যাপ্টেনসি, তার ইনজুরি মিলিয়ে বিরাট একটা মিথ। আসলে কি অত ভালো ক্রিকেটার?

এই কথার কী উত্তর দেব! বোলার কৌশিক ভাইয়ের কথা বাদ দেন। ব্যাটসম্যান মাশরাফির কথা ভাবেন শুধু। বাংলাদেশের হয়ে কত রান করেছেন উনি? হাজার দেড়েক। এই দেড় হাজার রান দিয়ে উনি বাংলাদেশকে যে কয়টা ম্যাচ জিতিয়েছেন, তা আমরা তিন-চার হাজার রান করে করতে পারিনি। ওনার ১৫ রান মানেই ম্যাচে আমরা এগিয়ে গেলাম। শোনেন, একটা কথা বলি। কৌশিক ভাই নিজেকে নিয়ে খামখেয়ালি না করলে সে থাকত বিশ্বের সেরা অলরাউন্ডার। কৌশিক ভাই কত বড় অলরাউন্ডার হতে পারতেন, উনি নিজেও জানেন না।

সুমন ভাইয়ের (হাবিবুল বাশার) সাথে কথা বললাম, তিনিও দেখলাম অলরাউন্ডার মাশরাফিকে নিয়ে আফসোস করছেন।

করারই কথা। আমরা তো ওনার ব্যাটিং সম্পর্কে জানি। ওনার অ্যাবিলিটি সম্পর্কে জানি। আমি অবশ্য আফসোস করছি না। আমি বলছি, ব্যাটেই ওনার যে অবদান

আছে, শুধু তারপরই ওনাকে নিয়ে মিথ-বিষয়ক আলোচনা আর থাকতে পারে না।

বোলার হিসেবে? বোলার মাশরাফির অবদান কী?
বোলার হিসেবে ওনার অবদান দুই রকম। একটা তো আছে, উনি আমাদের একটা সময় অনেক ম্যাচ জিতিয়েছেন। বহু ম্যাচ আছে, যেটা আমরা অন্য কারো ওপর ভর করে জিতেছি, কিন্তু শুরুর ব্রেক থ্রুটা উনি এনে দিয়েছেন। বোলার হিসেবে তো লম্বা সময় ধরে সার্ভিস দিচ্ছেন। আমি টেকনিক্যালিও ওনাকে অনেক বড় বোলার মনে করি। ওনার মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, একেবারে সঠিক জায়গায় বল করা, কাট করানো, সুইং করানো; এগুলো অসাধারণ। আরেকটা ব্যাপার হলো, বোলার হিসেবে কিন্তু ওনাকে অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে। ইনজুরি খুব ভুগিয়েছে। ইনজুরিতে বড় বড় সময় বাইরে তো ছিলেনই। পাশাপাশি ইনজুরির পর রিদমে ফিরতে সময় লেগেছে। তবে এসবের চেয়ে আমি বড় করে দেখি, বাংলাদেশের ক্রিকেটেই উনি বোলার হিসেবে একটা নতুন চিন্তা তৈরি করতে পেরেছেন।

সেটা কেমন?
একটা উদাহরণ নেন। এখন গিয়ে জাতীয় দলের যেকোনো ফাস্ট বোলারকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার আদর্শ বোলার কে? এই তাসকিন, রুবেল, মুস্তাফিজ, আল আমিন; এদের সবার আদর্শ দেখবেন মাশরাফি ভাই। এর বাইরেও যত ফাস্ট বোলার আপনি গত দশ বছরে দেখতে পাবেন, সবার আদর্শ মাশরাফি ভাই। এটা এমনি এমনি হয়নি। বাংলাদেশ ফাস্ট বোলিং করার জন্য একেবারে ভালো জায়গা না। এখানে কন্ডিশন আপনার পক্ষে না। উইকেট থেকে এক ফোঁটা হেল্প পাবেন না। দলগুলোতেও ফাস্ট বোলারদের কোনো দাম নেই। ফলে এখানে হলে সবাই ব্যাটসম্যান বা স্পিনার হয়। সেই রকম একটা জায়গায় মাশরাফি ভাই হিরো হওয়াতে এই ছেলেগুলোকে আপনি পেলেন। আমি মাশরাফি ভাইয়ের বাংলাদেশে অবদান দেখি এসবগুলোকে যোগ করে। তার কারণেই বাংলাদেশ আজ তিন-চারটে পেসার নিয়ে খেলতে পারছে; সে রকম পেসার তৈরি হয়েছে। এর চেয়ে বড় অবদান একটা মানুষের জীবনে আর কী আশা করা যায়?

আচ্ছা। আমরা প্রায় শেষ করে ফেলেছি। আপনার আর মাশরাফির সম্পর্কের কথা বলেন। এখন দুজনের সম্পর্ক কেমন?
বাকিদের সাথে যেমন, তেমনই (হাসি)।

না। শুনলাম, আপনি নাকি একান্ত কিছু আলাপ কেবল মাশরাফির সাথেই করেন?
সেটা তো বলা যাবে না (হাসি)। সত্যি বলি? আমি ব্যক্তিগত ব্যাপার-স্যাপার বেশি

একটা কারো সাথে আলাপ করি না। ওনার সাথে একটু করি। আবার জিজ্ঞেস কইরেন না, কেন করি। এমনিই করি। আলাপ করে মজা পাই, তাই করি। আরও অনেক আলাপ করি, সব বলা যাবে না। কিছু কথা পরে বলব।

সম্পাদনার গল্প

আরিফুল ইসলাম রনি



কয়েকটা দিন ঘোরের মধ্যে ছিলাম!

রোগটা পুরোনো। সেই ক্লাস এইট-নাইন-টেনে পড়ার সময়টায়, মোটা মোটা বই যখন পড়া শুরু করেছি। 'আমি বিজয় দেখেছি' বা 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে' পড়ার সময় চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠত মুক্তিযুদ্ধ। মাথায় ঘুরত, ঘোরের ভেতর থাকতাম। সমরেশ-সুনীল-শীর্ষেন্দুর মোটা উপন্যাসগুলো পড়ার সময় চরিত্রগুলো চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ঘোরাফেরা করত। যে কটা দিন লাগত বই পড়তে, চরিত্রগুলোর সঙ্গেই ছিল নিত্য বসবাস, যেন আমিও তাদেরই একজন! বই পড়া শেষেও আরও কয়েক দিন থাকতাম ওই রকম ঘোরের মধ্যে।

'মাশরাফি' পড়ার সময়ও সেই একই অবস্থা, সেই ঘোর! এখানে কিন্তু ঘোর লাগানোর কাজটি লেখকের জন্য সহজ ছিল না। এটা তো আর সমরেশের অনিমেষ বা শীর্ষেন্দুর জমিদার হেমকান্ত-কৃষ্ণকান্তের মতো কল্পিত চরিত্র নয় যে নিজেদের মতো করে কল্পনায় সাজাব! এখানে মূল চরিত্র আমাদের চোখের

সামনে। মাশরাফি বিন মুর্তজা!

সম্ভবত এ মুহূর্তে বাংলাদেশের জনপ্রিয়তম ব্যক্তিত্ব, নিশ্চিতভাবেই দেশের সব সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রিকেটার। প্রায় ১৫ বছর ধরে মাশরাফিকে নিয়ে এত লেখা, এত কথা হয়েছে এবং হচ্ছেই, যেভাবে সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন, তাঁর ক্রিকেট বা উঠে আসার গল্প তো বটেই, তাঁর জীবন-পরিবার-চারপাশের সব খুঁটিনাটিও অনেকের জানা। সেই মানুষটির জীবন নিয়ে লেখা সহজ ছিল না। ভীষণ দুঃসাধ্য কাজটি করতে পেরেছেন লেখক, আমি ঘোরের মধ্যে ছিলাম!

বইটির জন্মপ্রক্রিয়ার পুরো সময়টাতেই সম্পৃক্ত ছিলাম আমি। একদম লেখকের ভাবনার পর্যায় থেকেই। সেই ভাবনাটির বাস্তবের আলো দেখা এবং নানা বাঁক পেরিয়ে সত্যিকার অর্থেই পুরো পাণ্ডুলিপি দাঁড়িয়ে যাওয়া–এ পথচলার প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপে ছিলাম সঙ্গী। বইয়ে কী কী থাকছে, সেসব তাই ভালোমতোই জানতাম। তো এই সবকিছু জেনেই বই পড়তে শুরু করা একজনকে ঘোর লাগিয়ে ফেলা চাট্টিখানি কথা নয়!

সম্পাদনার কঠিন দায়িত্ব দিয়ে বইটির পাণ্ডুলিপি আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন লেখক, গত বিপিএল চলার সময়। ওই চরম ব্যস্ততার সময়টাতেও আমি বইয়ে ডুব দিয়েছিলাম এবং ঘোরের ভেতর ছিলাম। মাশরাফির জীবনের আশ্চর্য ভ্রমণে আমিও যেন ছিলাম সঙ্গী। আখ চুরির সঙ্গী, চিত্রায় সাঁতারের সঙ্গী, কৈশোরের যাবতীয় দুরন্তপনার সঙ্গী, নড়াইল থেকে ঢাকায় ক্রিকেট সফরের সঙ্গী। বারবার চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়া আর পুনর্বাসনের যন্ত্রণাময় কিন্তু চোয়ালবদ্ধ প্রতিজ্ঞার দিনগুলোর সঙ্গী। মনে হচ্ছিল গোলাম মুর্তজার আশ্চর্য মায়ায় ভরা পরিবারের আমিও একজন!

বিপিএল চলছে তখন। প্রেসবক্স থেকে মাঠের মাশরাফিকে দেখতে দেখতে নিজের অজান্তেই বইয়ের মাশরাফি সামনে চলে আসে। প্রেস কনফারেন্সে মাশরাফির কথা শুনতে শুনতে আনমনা হয়ে যাই, নড়াইলের দুরন্ত কিশোর কৌশিক ভাসতে থাকে চোখে। এই যে প্রায় প্রতিদিনই মাশরাফির সঙ্গে দেখা, মাঝেমধ্যেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা, এত ফাজলামো–এসবের মধ্যেই হুট করেই মুহূর্তের জন্য মনে হয়, 'এটাই কি সেই কৌশিক!'

সেই কৌশিক, ওই মাশরাফি, এই ক্যাপ্টেন–আমি ঘোরে পড়ে যাই, ঘোরে ডুবে থাকি। আমাদের চোখের সামনের এমন রক্ত-মাংসের একটা চরিত্র, আমাদের এত চেনা-জানার মাশরাফিকে নিয়ে ঘোর লাগাতে পারাই 'মাশরাফি' বইয়ের লেখকের সবচেয়ে বড় সাফল্য। আমাদের আপন মাশরাফিকেও বারবার নতুন রূপে আবিষ্কার করা যাবে এই বইয়ে। বইয়ে আছে পরিবার, পারিবারিক গাঁথুনি, ভালোবাসা, বিশ্বাস, ত্যাগ, পরিশ্রম, লড়াই, সাফল্য, হাসি, কান্না, জীবনবোধ, দর্শন–সবকিছুর গল্প। বইটি পড়ে আপনি হাসবেন, কাঁদবেন, আবেগে ভাসবেন,

উত্তেজনায় কাঁপবেন, গর্বে ফুলে উঠবে বুক।

একটি ব্যাপার আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে, লেখনীতে পরিমিত আবেগ। বইয়ের কাজ শুরুর দিকের এক দিনের স্মৃতিচারণা করা যায়। শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে আড্ডা দিচ্ছিলাম মাশরাফির সঙ্গে। বইটির প্রসঙ্গ উঠতে একপর্যায়ে মাশরাফিকে বলেছিলাম, 'দেবুদা এমন আবেগ দিয়ে লিখবে, দেখবেন নিজের জীবনকাহিনী পড়ে আপনি নিজেই কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়ে পড়বেন!'

মজা করেই বলা। তবে সত্যি বলতে, শঙ্কার জায়গাটিও ছিল। দেবুদার আবেগময় লেখনীর গুণগান বাংলাদেশের ক্রিকেট-আঙিনায় কান পাতলেই শোনা যায়। আর মাশরাফির ক্রিকেট ক্যারিয়ার তথা গোটা জীবনেই তো ছড়িয়ে আবেগের হাজারো রসদ! আবেগের আতিশয্যে কোথাও কোথাও লেখা খানিকটা ঝুলে যাওয়ার শঙ্কা আমার নিজেরই ছিল। কিন্তু বইটি পড়তে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, লেখক এ জায়গাটিতে ছিলেন দারুণ সংযত, পরিমিত। এটার জন্য আলাদা করে প্রশংসা অবশ্যই পেতে পারেন।

এত কিছুর পরও অতৃপ্তির জায়গা থাকতে পারে। মাশরাফি ও তাঁর পরিবার এতটা বর্ণময়, এতটা বিস্তৃত, এতটা গভীর, এত বিশালতা যে দুই মলাটের ভেতর তাঁদের ধরে রাখার কাজ ভীষণ রকমের কঠিন। এই বই পড়ার পরও অনেকের মনে হতে পারে, আরও কিছু পাওয়ার ছিল, আরও কিছু জানার ছিল, ওটা জানা হলো না, এটা শোনা হলো না। আমার নিজের যেমন মনে হয়েছে, মাশরাফির জীবন যতটা বন্ধুময়, সেই বন্ধুদের কথা আরেকটু বিশদ থাকতে পারত।

কিংবা মাশরাফির ক্যারিয়ারে যেটি ছিল সবচেয়ে নিয়মিত, চোট থেকে ফেরার পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার দুঃসহ ও কষ্টকর দিনগুলোর বর্ণনা আরেকটু বেশি থাকতে পারত। এই ইতিহাস-সেরা সাফল্যপ্রসবা সময়টাতেও মাঠের ভেতরে-বাইরে মাশরাফির প্রতিদিনই যে নিজের শরীরের সঙ্গে বোঝাপড়া ও লড়াইয়ের নিয়ত গল্প, সেটার ছোঁয়াও কিছু থাকতে পারত।

কিন্তু ওই যে, একজন মাশরাফির সবকিছু স্রেফ একটা বইয়ে বেঁধে ফেলা অসম্ভব! আর সেই অতৃপ্তি নিশ্চয়ই সবচেয়ে বেশি আছে লেখকের! বরং এই বইয়ে লেখক যতটুকু বাঁধতে পেরেছেন, ততটুকুই আমার কাছে কেমন যেন মনে হয় অসম্ভব!

দেবব্রত মুখোপাধ্যায় যতটা পেরেছেন, সেটা একরকম অসম্ভবকে সম্ভব করাই। টুপিখোলা অভিনন্দন!

পুরো বইয়ের প্রথম পাঠক সম্ভবত আমিই, এটা অনেক বড় সম্মান। আমি ঘোরে ছিলাম, আমার বিশ্বাস যাঁরাই পড়বেন, সবাইকে ঘোরে ডুবতে হবেই!

মিরপুর ২, ঢাকা।
২৯-১২-২০১৫



দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

১৯৭৯ সালে বাগেরহাট জেলার সাংদিয়া গ্রামে জন্ম। পড়াশোনা ও বেড়ে ওঠা বাগেরহাটেই। পেশায় একজন ক্রীড়া সাংবাদিক।

সাংবাদিকতার পাশাপাশি সাহিত্য চর্চা করেন। 'হরিপদ টিম' নামে তার লেখা একটি ছোটদের অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ প্রকাশিত হয়; যা সাত পর্ব প্রকাশিত হয়েছে। এর বাইরে কিশোর ফ্যান্টাসি, ক্রীড়া-উপন্যাস লিখেছেন। একটি ছোটগল্পের সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। সাকিব আল হাসানকে নিয়ে প্রথম বই লিখেছেন। সাকিব সম্পর্কে তার পরিবার, বন্ধু, সতীর্থ ক্রিকেটার, কোচ এবং বিশ্বের কিংবদন্তী ক্রিকেটারদের সাক্ষাতকারভিত্তিক বইটির নাম– 'সাকিব আল হাসান : আপন চোখে, ভিন্ন চোখে'।

বর্তমানে কাজ করছেন 'তামিম ও চট্টগ্রামের খান পরিবার' এবং 'কিংবদন্তী' শীর্ষক দুটি ক্রিকেট-গবেষণা বিষয়ক বই নিয়ে।